নবম তরঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইলিয়া এরেনবুর্গ

নবম তরঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ : সত্য গুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক :
সুরেন দত্ত
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক :
নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস প্রাঃ লিঃ
১৪১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ১৩

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

দাম ছ টাকা

একত্রিশ

মেট্রোপোল রেস্তোরাঁয় মার্কিন সাংবাদিক স্মাইলস্-এর সঙ্গে বসে গোমড়া মুখে ভদকা খাচ্ছিল সাবলং।

বলল, কাভিয়ার সুস্বাদু বটে. কিন্তু কেউ এখানে কাজ করতে পারে না। আজ এগারো দিন হল মস্কোয় এসেছি কি-ই বা দেখতে পেলাম রুশদের? শুধু মন্ত্রিসভার একটি লোক আর ভ্রমণ-বিভাগের একটা মেয়ে—প্রায় কোঠা ঘরের মতো দেখতে। মোটার মতো মোটা বটে!

দে'তো হাসি হাসল স্মাইলস্। ওর সোনায় বাঁধানো দাঁতগুলো চকচক করে উঠল। যখন হাসে, একটা বুড়ো জাপানীর মতো দেখায় ওকে। আর এ ব্যাপারটা সম্পর্কে ও এতো সচেতন যে যখনই কোনো নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে জানিয়ে দেয় যে ওর বয়েস মাত্র চৌত্রিশ বছর আর ওর পূর্ব-পুরুষেরা কেন্ট থেকে এসে বসবাস করেন আমেরিকায়।

আমি তো এই আঠারো মাস আছি এখানে—বলল স্মাইলস্—কিন্তু এর ভিতরে ক'জন রুশের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়েছে তা আঙুলে গুনে বলে দিতে পারি। ভাষা শেখার চেষ্টাও করেছিলাম। বলতেও পারি একটু আধটু। কিন্তু তা-ই কি কোনো কাজে এল? রাস্তায় কাউকে পথের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে দেবে। হয়তো বা সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে দেখিয়েও দেবে। কিন্তু যখনই কোনো কাজের কথা পাড়ার চেষ্টা করা যায় অমনিই মুখ বন্ধ। আমি লোকেদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি কি ভাবে ওরা জার্মানী সম্পর্কে, আর একটা যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে কি না। ওরা হয়তো কোনো জবাবই দিল না. নয় তো খবরের কাগজের বুলি কপচে এড়িয়ে গেল। একটি লোকও আসবে না তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আর সবচাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল এই যে কেউই তোমার সঙ্গে বসে মদ খাবে না। লোহ-যবনিকা আর চীনের প্রাচীর এ দুটোই হচ্ছে অকহতব্য। রুশিয়া হচ্ছে একটা মহাশূন্যের বায়ুহীন স্তর, এখানে বাস্তবিকই কোনো পশ্চিমী নিশ্বাস নিতে পারে না। মাথা-মোটা জাত। প্রত্যেকটা স্কুলের ছাত্রও নিজেকে মনে করে ট্রুম্যানের চাইতে মাইলখানেক উঁচু। হয়তো বা এ সব কিছুই ওদের ভড়ং। লক্ষ্য করেছি ওরা আমার গাড়িটার দিকে কেমন প্যাটপ্যাট করে তাকায়। আমার শেভর্লে গাড়িটা দেখেই যদি ওরা এতোটা মুগ্ধ হয়ে পড়ে তবে আমার চেহারা দেখে ওরা কি পরিমাণ স্তম্ভিত হতে পারে ভেবে দেখুন একবার। তবু তো আমি নেহাত মামুলি একজন আমেরিকান মাত্র।

অন্য যারা খেতে বসেছিল একান্ত উৎসুক দৃষ্টিতে সাবলং তাদের দেখছিল তাকিয়ে তাকিয়ে। দেখেই বুঝে নিল, পাশের টেবিলের ঐ যে যুগল তরুণ-তরুণী, ওরা হচ্ছে প্রেমিক-প্রেমিকা। মেয়েটি যখন অন্যদিকে তাকায়, ছেলেটি তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে চোখ নামিয়ে নেয়। মেয়েটি লাজুক। সম্ভবত ওদের খিদে পেয়েছে খুব, কিন্তু খাচ্ছে যেন একান্ত অনিচ্ছায়। ভাবখানা এই, যেন দেখাচ্ছে যে ওরা এসব তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপারে নেহাতই উদাসীন। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু দেঁতো হাসি হাসল সাবলং— যেন নিজেও সে ওদের ষড়যন্ত্রের ভিতরের একজন।

অবাক হয়ে যাই, কি নিয়ে ঐ প্রণয়ী যুগল আলাপ আলোচনা করছে?— স্মাইলস্-এর দিকে ফিরে বলল সাবলং।

স্মাইলস্-এর সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলো আবার চকচক করে উঠল।

এদের চালচলন আদপেই আপনি বুঝে উঠতে পারেন নি এখনো। ওরা হচ্ছে জি. পি. ইউ-র চর। আমাদের পিছনে ঘুরছে। তাছাড়া, রুশিয়ায় কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার বালাই নেই। ঘরকে ওরা বলে মাথা গোঁজার ঠাঁই। সেটা কার আছে সেটুকুই মাত্র ওরা হিসেব করে দেখে, আর তারপরেই বিয়েতে শুরু করে দেয়।

সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ে সাবলং।

আমার তো দেখে মনে হচ্ছে ওরা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা। রুশরা যে ভালো অভিনেতা তা আমি জানি। কিন্তু এমনভাবে অভিনয় কেউই করতে পারে না।

আরো খানিকটা ভদকা টানল সাবলং। তারপর গজর গজর করতে শুরু করল ঃ

হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক। আফ্রিকায় যে-বার প্রথম গেলাম, কিছুই বুঝতে পারতাম না। সব কিছুই বাছবিচার করে নেয়া দরকার। আমার এজেন্সিকে কথা দিয়েছি, ছ-মাস থাকবো এখানে। কিন্তু ভয় হচ্ছে বুঝি বা এক হপ্তার বেশি আর বরদাস্ত করতে পারবো না।

পারীতে সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতো সাবলং। বলতো তাদের সঙ্গ ওর ভালো লাগে না। কারণ তারা পুরনো জিনিস নিয়ে দিন গুজরান করে। ফলে আনন্দ, রাগ ইত্যাদি আবেগের অনুভূতি তাদের ভোঁতা হয়ে এসেছে। তাই ওদের কথা শুধু প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু মস্কোয় এসে ও জুটে পড়েছে মার্কিন সাংবাদিকদের দলে। কারণ ও মিশুক লোক। তা ছাড়া অন্য কোনো সঙ্গী-সাথীও নেই। রুশরা হয়তো যান্ত্রিক,—ক্ষুণ্ণ মনে ভাবে সাবলং,—কিন্তু ভগবান জানেন, স্মাইলস্ও তেমন কিছু আহামরি নয়।

যে সাংবাদিকদের ভিতরে এসে জুটেছে সাবলং তাদের জীবন-যাত্রাও এক-ঘেয়ে, নিরানন্দ। প্রত্যেক মাসেই কোনো না কোনো দূতাবাসে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হয়। তাদের নিমন্ত্রণ হবে কি হবে না এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাল কাটে সাংবাদিকদের। মস্কোয় কাজ করা কি যে অসম্ভব ব্যাপার সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করে কূটনীতিকদের সঙ্গে। এখানে প্রত্যেকটি সুন্দরী মেয়ে হচ্ছে জি. পি. ইউ-র গুপ্তচর। এ দেশের চাইতে পর্তুগাল বা আইসল্যান্ডও

হয়তো ভালো জায়গা। এমন একটা কিছু নেই যা নিয়ে মানুষ লিখতে পারে। তুলা, যেখানে সব বড়ো বড়ো অস্ত্র-তৈরির কারখানা রয়েছে সেখানেই যদি না থাকতে পারা গেল তবে ইয়াসনায়া পলিয়ানায় যাওয়ারও কোনো মানে হয় না। ওদের ভাবনার সঙ্গে সায় দেয় কূটনীতিকেরা। ওরা ককটেইল খেতে শুরু করে তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে টানে হুইস্কি আর ভদকা। কেউ টানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মস্কো থেকে বিদায় নেবার কামনা করে. আবার কেউ কামনা করে রুশিয়া জয়ের। সাংবাদিকদের ভিতরে কয়েকজন আছে পুরনো-ঘুঘু। তাদের মুখে শুধু লড়াইয়ের জমানার সুখের দিনগুলোর কথা:

প্রেস-কনফারেন্স ডাকতেন ভিসিনিস্কি। বহু রুশ আসতো সে সভায়। কোনো কোনো সময়ে রুশ মেয়েরাও নাচতো বিদেশীদের সঙ্গে। আ, কি দিনই না গেছে! তখনকার জীবন ছিল ঘটনাবহুল: একবার তো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা সহযোগী ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতার গাড়ির চাকার টায়ারই ফাটিয়ে দিয়েছিল যাতে না সময় মতো সে প্রেস-কনফারেন্সের রিপোর্ট তার করতে পারে। আর এক বার অনেক ক'জন সাংবাদিক মিলে তাদের এক সহযোগীকে দূতাবাসের ভিতরে ফেলেই আচ্ছা করে ঠুকে দিল রুশদের সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছিল বলে। সে এক ভারি চমৎকার দিন ছিল বটে। এখন অবশ্য মস্কো যেন হয়ে উঠেছে একটা নির্বাসনের স্থান বিশেষ। খবরের কাগজে যা বের হয় তা ছাড়া আর কিছুই রিপোর্ট করার জো নেই। এ করে কেউ আর কিছু নাম করতে পারে না।

সাবলঁ যখন বলল যে সে চায় রুশদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির সম্পর্কে লিখতে, সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর টমসন বলল:

রেড স্কোয়ারের কুচকাওয়াজ ছাড়া কি আর আপনি দেখবেন? যদি খুব নাছোড়বান্দা হয়ে উঠে পড়ে লাগেন তবে মাস তিনেকের ভিতরে ওরা বড়ো জোর একটা শিশুসদন দেখাতে পারে। বিশেষ করে বিদেশীদের দেখাবার স্থান। আর সেখানে বাচ্চাগুলোকেও আনবে মাত্র আধ-ঘণ্টা আগে, যাতে না ওরা জায়গাটা হেগে মুতে নোংরা করে ফেলে। তার চাইতে হুইস্কি খান পেটভরে, দেখবেন যেন না ওটাই আপনাকে গিলে ফেলে। তারপর যখন প্যারীতে ফিরে যাবেন, তখন লিখবেন যা মনে চায়। আপনি মস্কোয় ছিলেন সুতরাং দেখবেন সবাই আপনার প্রবন্ধে গুরুত্ব দেবে।

ফরাসী দূতাবাসের সেক্রেটারী দ্য শমঁকে ফোন করল সাবলঁ। ওর সম্পর্কে বলেছিল নিভেল। খুব খুশী হল দ্য শমঁ। চমৎকার একটা লাঞ্চের ব্যবস্থা করে নিমন্ত্রণ করল ওকে। দ্য শমঁ ছিল সুন্দরের উপাসক। যৌবনে নিভেলের অনুকরণে কবিতা লিখতো। মার্কিন সাংবাদিকদের দেখার পরে ওকে দেখে সাবলঁর মনে হল বুদ্ধি বিচক্ষণতার এক অপূর্ব সমাবেশ। কিন্তু যখন ওরা রুশদের কথায় এল, সেই একই কথা বলল কূটনীতিক:

অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গেই তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে। খুব উদ্দীপনাপূর্ণ রিপোর্ট পাঠাবেন। সাংকেতিক ভাষায় আমি জানিয়ে দেবো প্যারীকে সে রিপোর্ট যেন ছাপা না হয়। আর এখানে

বলে বেড়াবেন যে এজেন্সি খুবই আপনার পেছনে লেগেছে। কাজে বাগড়া দিচ্ছে। তাই পারীতে ফিরে গিয়ে সত্য কথা লিখবেন। তখন ওরা আপনার কাছে ঘেঁসবে। আর কিছু রুশিয়ান পাবেন, যাদের কাজই হচ্ছে বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ করা। ওরা যা বলবে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু শুনবেন খুব মন দিয়ে—মাঝে মাঝে ছিঁটে ফোঁটা বেফাঁস কিছু বেরিয়েও পড়তে পারে।

নিভেল বলেছিল আমাকে......যে......এই......কিছু বিক্ষুব্ধ লোকজন আছে এখানে।

মুচকি হাসলো দ্য শর্ম।

উনি বোধহয় আমার পাঠানো রিপোর্ট থেকেই জেনেছেন এ কথা। এ সব লিখি ওদের মনোবল ঠিক রাখার জন্যে—। হয়তো শুনে থাকবেন এখানে এদের বাছাই করার দিকে খুব তীক্ষ্ম নজর। একবার আমাকে মিচুরিনস্কে জন্মানো যুঁই ফুল দেখিয়েছিল। তার গন্ধ গোলাপজামের মতো। আমি এর কোনো মানে খুঁজে পাই না। যুঁই ফুলের গন্ধ ঢের বেশি সুন্দর। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে মনে রাখবেন, বাছাই করাটা ওদের একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছে। ওরা নতুন এক জাতের মানুষ তৈরি করেছে যারা খবরের কাগজে যা লেখা হয় ঠিক সেই রকম করেই ভাবে। এ আমলে যে সব লোক জন্মেছে, স্বভাবতই তারা এ আমলেরই ভক্ত। কিন্তু যেহেতু ওরা নিজেদের স্বার্থচিন্তায় অভ্যস্ত নয় তাই বেশ একটু কৌশল করে কাউকে চেপে ধরতে পারলে হয়তো কিছু বের করে নেয়া যেতে পারে। যদি সফল হতে পারেন তবেই সোবিয়েতের দোরের চাবিকাঠি আপনার মুঠোর মধ্যে আসবে।

কূটনীতিক মহলে মাদাম দ্য শর্মর খ্যাতি আছে সুবেশা সুচতুরা হিসেবে। যতক্ষণ তাঁর স্বামী কথা বলছিলেন সাবলঁর সঙ্গে ততক্ষণ তিনি একটা ফ্যাশান-পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিলেন আর থেকে থেকে মিষ্টি মিষ্টি মুচকি হাসি ছুঁড়ে মারছিলেন অতিথির দিকে। ওর মুখের হাসিটি বেশ মানানসই। শুধু রাত্রে যখন মুখের রঙ মুছে ফেলেন তখন তারই সঙ্গে হাসিটিও ফেলেন মুছে।

যা-ই কিছু করুন না কেন, কোনো মস্কোবাসিনীর সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করবেন না যেন—একটু হেসে বললে দ্য শর্ম।—ওরা ওটা তেমন পছন্দ করবেন না। ফলে আপনার উপরে দেশ-ত্যাগের হুকুমও জারী হযে যেতে পারে।

রুশ মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার জন্যে মাঁসিয়ে সাবলঁ আদৌ প্রলুব্ধ হবেন না।—মন্তব্য করলেন দ্য শর্মর স্ত্রী, অবশ্য এ কথা বলবো না যে সবাই ওরা ঘৃণ্য কিন্তু ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ ভয়ংকর। ফ্যাশান পৌঁছায় এসে ওদের কাছে দশ বছর পরে। তা ছাড়া এখানকার মেয়েরা প্রণয় নিবেদন-আবেদনের ব্যাপারে মোটেই অভ্যস্ত নয়। পুরুষের মতো ওরা কাজ করে। দেখে কি বিশ্রীই না লাগে আমার!

এক মার্কিন সাংবাদিকের কাছে শুনেছি, এ দেশে কেউ না কি প্রেমে পড়ে না।--বলল সাবলঁ। তবুও মেট্রোপোলে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা দেখেছি আমি।

তারা বিদেশীও হতে পারে,—বললেন মাদাম দ্য শর্ম।—আর তা যদি না হয় তবে আপনার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। আপনি এক জোড়া শাদা কাক দেখতে

পেয়েছেন। এখানকার তরুণেরা জানেই না যে প্রেম কাকে বলে। ওদের উপন্যাসে ওরা পড়ে কি করে মেশিন চালাতে হয়। ফিল্মে দেখায় শুধু যুদ্ধের ছবি, নয় তো গৃহ নির্মান পরিকল্পনার। এমন একটা সোবিয়েত ফিল্ম কখনো দেখিনি যাতে ওরা একবারও একটা চুমু খেয়েছে।

না হেসে থাকতে পারল না সাবলঁ। কারণ কথাটা ভাসা ভাসা ওর কানে এসেছিল যে মাদাম দ্য শমঁ স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে প্রেম করার ব্যাপারে সুনিপুণ। ভাবলো, তাই নিশ্চয়ই মস্কোতে ওঁর সেই প্রতিভা বিকাশের ব্যাপারে একটু অসুবিধায়ই পড়েছেন।

যতোই দিন যেতে লাগল, সাবলঁর মনমরা ভাব ততো বেশি বেড়ে যেতে লাগল। না চায় প্রেম, না খোঁজে খবরের কাগজে রোমাঞ্চকর সংবাদ। চায় শুধু সোবিয়েত ইউনিয়নের শান্তি-বিরোধী কার্যকলাপের জলজ্যান্ত প্রমাণ খুঁজে বার করতে। ওর প্রায়ই মনে হয় যে যদি এমন কিছু দেখতে পেত যাতে করে ওর আশঙ্কা যে অমূলক তা প্রমাণ হয়ে যেত তবে সানন্দে সে তার ভুল স্বীকার করে নিত। কিন্তু যে প্রাচীরের দুরপনেয় ব্যবধান রুশদের থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাতেই অদূর ভবিষ্যতে আর একটা যুদ্ধের ভবিষ্যদ্‌বাণীকেই যেন স্বীকৃতি দিচ্ছে।

তবুও চলে যাওয়া সম্পর্কে মনস্থির করতে পারল না সাবলঁ, কারণ সে তার কাজটাকে সুসম্পন্ন করতেই পছন্দ করে। আফ্রিকা, মেক্সিকো, স্পেন, যেখানেই যখন ওকে পাঠানো হয়েছে সেখানকার সমস্ত স্তরের লোকদের সঙ্গেই ও যোগা-যোগ স্থাপন করেছে, সবার সঙ্গেই করেছে আলাপ আলোচনা। মানুষের বিশ্বাস অর্জনের ক্ষমতা থাকায় বহু লোকের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। আব তা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে যা কিছু দেখেছে যা কিছু শুনেছে তা নিয়ে বহু ভেবেছে, চিন্তা করেছে। কিন্তু এখানে, ওর চারদিক ঘিরে যেন বিরাজ করছে এক অখন্ড নীরবতা।

শহরের সব কিছু থেকেই পাওয়া যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ জীবনের সঙ্কেত—আপন মনেই বলল সাবলঁ। পার্কে পার্কে বাচ্চাশুদ্ধ মায়েদের ভিড়। অন্তঃসত্ত্বা মহিলারাও রয়েছেন। প্রেক্ষাগৃহ সব সময়েই ভরপুর। বাইরের হল ঘরে সুবেশা তরুণীরা মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ায়। দর্শকদের চাইতে সংখ্যায় কম নয় এরা। মাদাম দ্য শমঁ কি বলেছেন না বলেছেন কিছুই এসে যায় না তাতে। সকোলনিকি পার্কে যে কোনো লোকেরই চোখে পড়বে শত শত জোড়া জোড়া প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণী। দুনিয়ার যে কোনো দেশের প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই তাদের হাবভাব। রবিবার রাস্তার লোকজন দেখে মনে হয় যেন আরো মন্থর আলস্যে ভরপুর, আরো হাসিখুশী। গর্কি স্ট্রীটে বসে ফুলের মেলা, চলে ফুলের বিকি-কিনি। সে যেন এক সর্বজনীন উৎসব। কিছু কিছু সামরিক লোকও দেখা যায় আশেপাশে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু একটা চোখে পড়ার মতো ব্যাপার নয়। লোকজন দেখে মনে হয় বেশ শান্ত। উত্তেজনা যা দেখা যায় তা ভিড়ভর্তি বাসে বা দোকানে যখন কাউন্টারের কাছে পৌছানো দুরূহ হয়ে ওঠে। হাঁ পারীর চাইতে মস্কোকে ঢের বেশি শান্ত মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি—এ কি ওদের

শান্তিপ্রিয়তা না নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সুদৃঢ় নিশ্চয়তা?

সাবলংকে কয়েকটা খবরের কাগজের কাটিং দেখালেন দ্য শম'। তাতে যুদ্ধের কোনো হুমকি নেই। কিন্তু একটা সান্ধ্য কাগজের একটা প্রবন্ধ পড়ে দারুণ বিরক্ত হল সাবলং। প্রবন্ধটায় ফরাসী চিত্রাংকন সম্পর্কে শ্লেষাত্মক মন্তব্য ছিল। অন্যান্য কয়েকটা কাগজের সুর ঔদ্ধত্যপূর্ণ। নব্য সমাজকে ওরা এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছে যাতে করে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করে,—মনে মনে ভাবল সাবলং। এটাই হচ্ছে ওদের দুনিয়া জয়ের প্রস্তুতি। যাই হোক সম্ভবত ওরা গর্কি স্ট্রীটের উপর দিয়ে ট্যাংক ডিভিশন চালাবে না বা পার্কে জেট-বিমানের মহড়াও দেবে না।

ভকস্-এর এক সভায় সাবলংর আলাপ হল একটি তরুণীর সঙ্গে। ওর চোখ দুটি সরল, নীল; আর ভালো ফরাসী বলে মেয়েটি। মেয়েটি ওকে জানাল যে সে করে দো-ভাষীর কাজ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে করে ওকে বিব্রত করে তুলল সাবলং। মেয়েটি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল কি করে নির্বাচন পরিচালনা করা হয়, কি করে উৎপাদন সংগঠিত করা হয়, কেমন করে আইন-আদালতের কাজ চলে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার খাতে কি পরিমাণ টাকা খরচ করা হয়ে থাকে রাষ্ট্র থেকে। মেয়েটি প্রত্যেকটি কথাই শুরু করছিল এই বলে যে 'ধনতান্ত্রিক দেশের মতো নয়' আর শেষ করছিল এই বলে যে 'ফ্রান্সে অবশ্য এ ধরণের কিছু নেই'। খুব মন দিয়ে শুনছিল সাবলং যাতে মেয়েটির ধারণা হয় যে এই সন্দেহবাদী ফরাসী ভদ্রলোককে সে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে।

তরুণী থামতেই প্রশ্ন করল সাবলং:

আচ্ছা বলুন তো আপনাদের এমন কোনো দিক নেই যে দিকটা দুর্বল? ধরুন যেমন, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল হওয়া সম্ভব?

আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের আদালত শ্রেণী-আদালত নয়।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কোনো একটা কারখানার পরিচালক নির্বোধ, বা তার চাইতেও খারাপ—একটা চোর?

এ ধরণের প্রশ্ন করছেন কেন? সব চাইতে যাঁরা সৎ ও দক্ষ তাঁদেরই পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

তাই তো বটে,—হেসে উঠে বলল সাবলং—এর পরে যা আপনি বলবেন তা আমি বলে দিতে পারি। বোধহয় আপনাদের দেশে অনাবৃষ্টি নেই কারণ আপনাদের আছে কৃষি-পরিকল্পনা। পারিবারিক অশান্তি যে কখনো ঘটে না সেটা তো সুস্পষ্ট। কারণ শ্রেণীসচেতন নাগরিক বেছে নেয় তার যোগ্য স্ত্রী। আর নাগরিকা বেছে নেয় তার অনিন্দনীয় স্বামী। ক্যানসার অবশ্য ছিল কিন্তু সেটা নির্মূল করা হয়েছে। কারণ ওটার যোগাযোগ ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার সঙ্গে।

চলে যাওয়া সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছে সাবলং। কারণ প্রাচ্য খণ্ড থেকে আক্রমণ-আশংকা সম্পর্কে লেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে মনে মনে। তবুও ঠিক করল আরো এক মাস মস্কোয় থেকে যাবে। যতোটা পারে মাল-মশলা সংগ্রহ করে নেবে। কিছু স্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল পরিদর্শন করার ইচ্ছে প্রকাশ করল

সাবলং প্রেস-ডিপার্টমেণ্টের এক কর্মকর্তার কাছে। তারপর একটু পরিহাসের সুরেই বলল:

অবশ্য যদি আপনাদের সামরিক গোপনীয়তার ব্যাপার না থেকে থাকে।

ও দেখল স্কুল, দেখল শ্রমিক-ক্লাব। একটা লাইব্রেরিতে গিয়ে কাটিয়ে এল একটা সন্ধ্যে। ফরাসী ভাষার এক শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ হল ওর। নিজের খারাপ উচ্চারণের জন্যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিলো থেকে থেকে। কিন্তু তাঁর বিনয়নম্র ব্যবহার মুগ্ধ করল সাবলংকে। মোট কথা যা-কিছু দেখেছে সবই ওর ভালো লেগেছে: স্কুলে ছাত্রেরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু বিরতির সময়ে হৈচৈও করে। ক্লাবে একটা বক্তৃতার পরে নাচল তরুণেরা, যদিও নাচ দেখে ওর হাসি পাচ্ছিল। হয়ত ওর মা নাচতেন এমনি করে—তবুও সব কিছু বেশ মজারই লেগেছিল। লাইব্রেরিতে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখল কোন বইয়ের চাহিদা বেশি: সোবিয়েত লেখকদের বই ওরা পড়ে কিন্তু সাবলংর পরিচিত পুরানো লেখকেরা খুবই জনপ্রিয়। যেমন তলস্তয়, তুর্গেনিভ, শেখভ। একটি ছেলে এসে চাইল লে মিজারেবল। আর একটি মেয়ে নিয়ে গেল মোপাসাঁর একটা বই। যাই-হোক, যা কিছু সম্পর্কেই ওর সন্দেহ জেগেছে সে-সব কিছুই ও টুকে নিয়েছেঃ কেন ছেলেরা আর মেয়েরা আলাদা পড়ে? শিক্ষিকার জবাব ভাসা ভাসা, এড়িয়ে-যাওয়া জবাব। এর সঙ্গে কি সামরিক ব্যাপারের কোনো যোগসূত্র আছে? বক্তা যখন আমেরিকার সাধারণ লোকের শান্তিপ্রিয়তার কথা বললেন সেটা চীনের জয়ের কথা উল্লেখ করার সময়ে যেমন জোর হাততালি পড়েছিল তার চাইতে অনেকটা মৃদু। একজন শিক্ষিকা বলেছিলেন আমাকে রাজনৈতিক শিক্ষার পাঠের কথা। এটা নিশ্চয় নৈতিক সমর-প্রস্তুতি। আমি যখন নাৎসীবাদের কথা উল্লেখ করলাম তার কাছে, সে বলল, ওসব হচ্ছে অতীতের ঘটনা। এখন ওদের স্থান অধিকার করেছে আমেরিকানরা। ওদের লাইব্রেরিতে দেখেছি টাঙানো রয়েছে প্যারীর শহরতলির বস্তির ফটো। তার তলায় লেখা: 'কেমন করে ফরাসী দেশের মজুরেরা বাস করে।' এ-ধরনের প্রচারের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

একটা হাসপাতালও পরিদর্শন করেছে সাবলং। সেখানে গিয়ে শুনেছে যে বড়ো ডাক্তার একজন ডেপুটি। অল্প বয়সী নন। তিনি একজন কমিউনিস্ট—ইংরেজী বলতে পারেন। ডাক্তারকে ভালো লাগল সাবলংর। দেখল ভদ্রলোক বেশ বুদ্ধিমান, চটপটে। ডাক্তারের চুলগুলো সব পেকে গেছে, মুখখানা ক্লান্ত, চোখের নিচের দিকটা ফোলা ফোলা। দেখে মনে হয় অন্তত ষাট বছর বয়েস। কিন্তু চোখ দুটো তীক্ষ্ম আর স্বাস্থ্যখানাও বেশ ভালোই রেখেছেন। সাবলংর মনে হল হাসপাতালের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু উনি যে বলবেন ওঁর সময় নেই বা যদি বলতেও রাজী হন তো সেই দোভাষী মেয়েটির মতোই যে জবাব দেবেন এ-সম্পর্কে ও নিঃসন্দেহ। তবুও, একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

খানিকক্ষণ সময় হবে কি আপনার? ডাক্তার হিসেবে নয়, বা ডেপুটি হিসেবেও নয়, সহজ সরল মানুষ হিসেবে দু-চার কথা আলোচনা করার ইচ্ছে আছে আমার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার।

বেশ। এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আপনাকে। বলুন তাহলে। কি সম্পর্কে আলোচনা করতে চান?

বলুন তো ডাক্তার, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব কি আপনাদের দেশে?

কেন নয়? আমাদের কি দেবতা বলে মনে করেন না কি? এমন হতে পারে যে জনগণের আদালত একটা ভুল করল। তার আপীল আছে। কিন্তু আঞ্চলিক আদালত সেই রায়ই বহাল রাখল। গত শীতে ডেপুটি হিসেবে আমি এই ধরনের একটা মামলার জট ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলাম। একটি নির্দোষ লোকের সাজা হয়েছিল, সমস্ত প্রমাণ ছিল তার বিপক্ষে, কিন্তু আমি দেখলাম লোকটি সৎ। একটা বিদঘুটে অবস্থার ভিতরে পড়ে ভুল করে বসে আছে। আর. এস. এফ, এস. আর-এর সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করলাম। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, আবার তারা ঐ রায়ই বহাল রাখল। পুনর্বিচারের কোনো যুক্তি নেই, ব্যস পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু আমি ছেড়ে দিলাম না। এইমাত্র আপনি বললেন না, যে ডাক্তার হিসেবে নয় বা ডেপুটি হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমি বুঝতে পারি না যে এই ধরনের পার্থক্য টেনে আপনি কি বলতে চান। স্বভাবতই একজন লোক মানুষ হিসেবে খুব চমৎকার মানুষ হতে পারে কিন্তু সে ডেপুটি হল না। যে কেউ-ই এর মানে বুঝতে পারে। কিন্তু ডেপুটি হতে হলে তাকে আগে মানুষ হতে হবে। তারপর আমি গেলাম ইউ. এস. এস, আর-এর প্রোকিউরেটারের আফিসে। আমার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপার বললাম গিয়ে সেখানে। গত পরশু দিন একটা চিঠি পেলাম যে মামলাটার পুনর্বিচার হয়েছে। লোকটি ইতিমধ্যেই বাড়ি এসেছে আর আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে তার বাড়িতে গিয়ে থাকতে। আমাদের বিচার আদালত ন্যায়নিষ্ঠ। কিন্তু মানুষমাত্রেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন? কারুর পক্ষে কোনো কিছু আপীল করতে চান নাকি?

না না! এখানে কাউকেই আমি চিনি না। আমি এসেছি এদেশের লোক-জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু এ পর্যন্ত যা কিছু দেখেছি শুনেছি তা হল আমেরিকান সাংবাদিক আব মেট্রোপোল।

হাঁ, তেমন বিশেষ মুখরোচক নয়। যুদ্ধের সময়ে এমনি একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলেছে আক্রমণ, অবস্থা বেশ সঙ্গীন। প্রায় মস্কোর দরজার সামনে এসে পড়েছে জার্মানরা, আর তিনি কি না খুঁজে বেড়াচ্ছেন উত্তেজনার খোরাক। বেশ, এখন কি বিষয় সম্পর্কে আপনি আলোচনা করতে চান আমার সঙ্গে বলুন?

আদৌ কোনো বিষয় সম্পর্কে নয়। কিন্তু যদি আপনি অনুমতি দেন তো দু-তিনটে প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আমি জানি আপনি একজন কমিউনিস্ট। তার মানে আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চাইতে আপনি আপনাদের ব্যবস্থাই বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, আপাতত আমি আমাদের ব্যবস্থার সপক্ষে কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু বলুন তো, আপনাদের দেশে এমন একজন কি কেউ কারখানার পরিচালক থাকতে পারেন না যিনি কাজের দিক থেকে অযোগ্য,—মানে ধরুন এই

অনভিজ্ঞ বা আনাড়ি ?

মাপ করুন, আপনার বয়েস কত ?

চুয়াল্লিশ বছর।

তাহলে শিশু তো আর নন। তবুও এমন শিশুসুলভ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কেন ? আমাদের কি মনে করেন আপনারা ? দেব-দূত ? নেহাৎ সাদামাঠা কথায় বলছি শুনুনঃ আমরা একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চলেছি। আর চেষ্টা করছি যাতে যা কিছু সন্দেহ তা থেকে মুক্ত হতে। ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছি আমরা। আপনি যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে দেখেছেন সেটা। কিন্তু এখনো বহু কিছু করবার আছে। যখন বাড়ি তৈরি করেন তখন কিছু আর ছাদ থেকে গড়তে শুরু করেন না। ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে সব চাইতে বড়ো কথা। কিন্তু সেটা খুব তাড়াতাড়ি করা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে দীর্ঘতর সময়ের দরকার। মিনিট দিয়ে তার হিসেব করা যায় না। হিসেব হয় দীর্ঘ বছরের পরিমাপে। কিন্তু সবচাইতে দীর্ঘ সময় যাতে প্রয়োজন তা হচ্ছে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার ব্যাপারে। আপনি জিজ্ঞেস করছেন এখানে মূর্খ অনভিজ্ঞ লোক আছে কিনা ? আছে। পাজী বদমায়শও আছে। আমাদের সংবাদপত্র পড়ে দেখুন, দেখবেন কোনো দিন হয়তো একটা আহাম্মকের সম্পর্কে লিখছে, আবার কোনো দিন হয়তো একটা বদমায়েশের মুখোশ খুলে দিচ্ছে। দেখুন আমরা এ-সব ব্যাপারে চোখ বুজে থাকি না। কোনো বেকুফকে যদি কোনো ভুল জায়গায় বসানো হয় তবে তার মানে হচ্ছে কেউ হয়তো অজ্ঞাতসারে পিছলে চলে গেছে। তখন তাকে সরিয়ে দিতে হয়। জানতে চান, কোনো বদমায়েশ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হতে পারে কি না ? নিশ্চয়ই পারে। অমনি অমনি কেউ আর বদমায়েশ হয় না। কিন্তু, অবশ্য যদি আমি ভুল বলি তো শুধরে দেবেন—একটা খবরের কাগজে দেখেছিলাম ফ্রান্সে চেক সংক্রান্ত ভারি একটা বিশ্রী নোংরা ব্যাপার ধরা পড়ে। কিন্তু তবুও জোচ্চোরেরা বহাল তবিয়তে তাদের পার্লামেন্টের আসনে আসীন রয়ে গেল। এটা সত্যি কিনা বলুন ?

মৃদু হাসলো সাবর্ল:

মোটামুটি, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে।

বেশ তাহলেই দেখুন। আমাদের মধ্যেও একটা জোচ্চোর গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। আর তার মাথায় যদি খানিকটা ঘিলু থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গেই সে আর ধরা পড়ে যাবে না। কিন্তু আজ হোক কাল হোক তাকে ডিগবাজি খেতেই হবে। তাছাড়া এ-ধরনের লোককে আমরা কিছু আর মখমলের দস্তানা দিয়ে আপ্যায়িত করি না !

ডাক্তারকে ক্রমেই ভালো লাগছে সাবর্লের। ভালো লাগছে এই জন্যে যে, তাঁর স্বভাবের কর্কশ রূঢ়তার ভিতর থেকেও যে কেউ-ই অনুভব করতে পারে যে তিনি একটি নিখাদ ভালো মানুষ। ভালো লাগছে ওঁর জবাব দেবার সরল ঐকান্তিক ভঙ্গির জন্যে, কণ্ঠের সজীব ওজস্বিতার জন্যে।

আর একটা কথা। এই একই প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একটি দোভাষী মেয়ের কাছে। কিন্তু সে যা জবাব দিল তা সম্পূর্ণ আলাদা। বলল, বিচার

সংক্রান্ত কোনো ভুল হয় না। কোনো জোচ্চোর বদমায়েশ নেই। দুনিয়ার বুকে স্বর্গ। কোথা থেকে এই ধরনের—দম্ভই বলা যাক, আসে বলুন তো?

সাধারণ মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান বোধ হয় ওর খুবই কম। সামনের বছর আমার বয়েস ষাট পূর্ণ হবে। অবশ্য এটা আনন্দ করার ব্যাপার নয়। কিন্তু এতে আমাকে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছে। আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে একটা নোংরা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন সাংবাদিক দেখা করতে আসবে আমার সঙ্গে। কোনো এক সাবর্ল......। কি একটা কথা যেন আমার মনে নাড়া দিয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম: এই কি সেই লোক যিনি কেমন করে ওরা শিশুদের উৎপীড়ন করে তাই নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন? ওরা বলল: হাঁ এই সেই লোক। অবশ্য, সে দশ বছর আগের কথা। মানুষ তো বদলায়। আমি আপনাকে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ আপ্যায়ন করি নি। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম, দুনিয়াটা তো একটা শয়তানের কারখানা হয়ে উঠেছে। কারা আবার ওঁকে পাঠালো এখানে? ওরা জানিয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানটির পঞ্চাশ ভাগ ফরাসী আর পঞ্চাশ ভাগ আমেরিকান। কিন্তু সে যাই হোক, শতকরা একশ ভাগই শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু তবুও আমি দেখা করলাম আপনার সঙ্গে। মনে হয় আপনি একজন সৎ লোক। আর তাই আমি আপনার সঙ্গে মানুষের মত আলাপ-আলোচনা করছি। যদি ঐ আমেরিকান লোকটা আসতো তবে আপনার সেই দোভাষী যেমন জবাব দিয়েছিল আমিও তেমনি জবাবই দিতাম। ঐ ধরনের লোকের সঙ্গে মানুষের মতো আলাপ-আলোচনা করা যায় না। তরুণী মেয়েটি জানতো কোন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আপনি এসেছেন। সে কি করে জানবে যে আপনি কি ধরনের লোক? তার জীবনে হয় তো আড়াই জন মানুষের বেশি লোকের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। তাই সে আপনাকে অমন চটপট জবাব দিয়েছে। আমি তাকে দোষ দিই না। যদি কাউকে দোষী করতে হয় তো আপনাকে। কেন ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন?

সাবর্ল কোনো জবাব দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ঃ

বেশ। মেয়েটির কথা ছেড়ে দিন। আমি আজ দুমাস আছি এখানে। অনেকবার চেষ্টা করেছি লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে। হয় তারা ফরাসী বোঝে না, নয় তারা চায় না আলাপ করতে।

স্বাভাবিক! ভাষার দিক থেকে যেটা, সেটা হল অর্ধেক বাধা। অবশ্য ওরা বেশি ভাষা যে জানে না সেটা ঠিক। বহুদিন আগে স্কুলে আমি ফরাসী ভাষা শিখেছিলাম। পড়তে পারি, কিন্তু বলা—। ইংরেজী শিখেছি অনেক পরে। তাও যে খুব ভালো শিখিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। অভ্যাস নেই। শুধু বিজ্ঞান বিষয়ের সাহিত্য বুঝতে পারি। আমার মেয়েও ফরাসী শিখেছিল। আশা করা যেত যে সে হয়তো ফরাসী বলতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধের পরে যখন এক নারী প্রতিনিধিদল এলো তখন এক ফরাসী মহিলার সঙ্গে দেখা হল ওর। ভয় পেয়ে গেল, বলল যে পারবে না কথা বলতে। গত গ্রীষ্মে আমি গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মস্কো থেকে দুশ কিলোমিটার দূরে এক গাঁ। দশম শ্রেণীর একটা স্কুল আছে সেখানে। ছোট ছোট ছেলেরা সে-স্কুলে ফরাসী শেখে। ওরা

কিন্তু একটুও ঘাবড়ায় না। কিছু একটা যখন জিজ্ঞেস করলাম ওরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে কি যেন জবাব দিল। এটাও ভালো করে বুঝে দেখা দরকার আপনার যে আমাদের সাহিত্য খুবই উন্নত, তাছাড়া আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা যাইহোক কিছু একটা বটে। এ সম্পর্কে বহু কিছু জানবার আছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ফরাসী দেশের গ্রামাঞ্চলে এমন কোনো স্কুল আছে যেখানে রুশ ভাষা শেখানো হয়। অবশ্য এ নয় যে এতে বড়ো একটা কিছু এলো গ্যালো। আমাদের দেশের লোকেরা কেন আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে তেমন বেশি উৎসুক নয় সেটা আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে এই যে আমার হাতে সময় বেশি নেই। টেলিফোন করে দেখি—হয়তো সভার কাজ শুরু হতে একটু দেরি আছে। আমাদের খুঁত হল এই যে, বলা হয় দুটোয় কিন্তু সবাই এসে পৌঁছায় তিনটেয়—।

ডাক্তার টেলিফোন তুলে নিলেন. তারপর কি যে খানিকটা বললেন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে, পরে ফিরে এলেন সাবলঁর কাছে।

জিজ্ঞেস করে ভালোই হল—তিনটের আগে শুরু হচ্ছে না। যদিও ঠিক হয়েছিল দুটোয়। আপনি বলেন যে রুশরা আপনাকে সন্দেহের চোখে দেখে? সেটা স্বাভাবিক। নিজেই একটু ভেবে দেখুন। আমাদের পক্ষে যুদ্ধটা ছিল একটা দারুণ বিভীষিকা। এমন কি আজও ভাবতে গেলে মানুষের বুক ব্যথায় মুচড়ে ওঠে।

প্রতিরোধ-আন্দোলনের ভিতরে ছিলাম আমি—ওঁকে বাধা দিয়ে বলে উঠল সাবলঁ।—একটা গোপন সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলাম আমরা। গেস্তাপোরা যখন আমাকে গ্রেপ্তার করল 'স্তালিনগ্রাদের আলো' নামে একটা প্রবন্ধ পেয়েছিল আমার কাছে। এক বছরের বেশি ছিলাম আমি অশ্চুইৎস-এ। আপনাদের লোকেরা আমাকে মুক্ত করে।

তবেই দেখুন, ঐ সব আমেরিকানদের মতো শিশু নন আপনি। কিছুটা বুঝতে পারবেন। রুশরা যখন আপনাকে মুক্ত করেছিল, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে তারা কেউই আপনার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়নি। তারা আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, আপ্যায়িত করেছে ভদকা দিয়ে,—করে নি? আমি অশ্চুইৎস-এ ছিলাম না। আমরা পোসেন থেকে গিয়েছিলাম ব্রেস্‌ল। কিন্তু আমিও কতগুলো বন্দীশালা দেখেছি। বহু ফরাসী বন্দীদের মুক্ত করেছি আমরা। একবার মুক্ত করেছি তিন শ ইংরেজকে। কেউ-ই আমাদের অবিশ্বাস করে নি। এলব-এর পারে দেখা হল আমাদের আমেরিকানদের সঙ্গে। আমাদের লোকেরা বলল ঃ চমৎকার ছেলে সব! ওরা নাচল. গাইল। আমার মেয়ে নাতাশা বলেছিল আমাকে যে নয়ই মে রেড স্কোয়ারে দুজন আমেরিকান বৈমানিককে কিভাবে তারা সম্বর্ধিত করেছিল। আমাদের লোকেরা শত্রুভাবাপন্ন নয়। রেগে গেলেও বেশিক্ষণ তা মনে রাখে না। দ্বিতীয় মোর্চা খোলার আগে ওরা শেষ বোতাম লাগাতে এতোই ব্যস্ত ছিল যে যার ফলে আমাদের বহু লোক মারা গেল! কিন্তু পুরানো রাগ কে আবার কবে মনে করে রাখে? মোট কথা সেদিন কারুর মনে এতটুকু বৈরীভাবের চিহ্নও ছিল না। নয়ই মে সব কিছুই উৎসব আনন্দে ভরপুর।

কিন্তু দশ তারিখ ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখলাম—বড়ো বড়ো শহর সব ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। কী ভয়ঙ্কর দৈন্য দারিদ্র্যই না এনে দিয়েছে যুদ্ধ। জানেন আমি তখন যাচ্ছিলাম বাইলোরুশিয়ার ভিতর দিয়ে। যে কোনো কুঁড়ে ঘরেই যান একটি কাপও দেখতে পাবেন না কোনো ঘরে। পুরানো টিনের কৌটায় করে মানুষ জল খেতো। কতো যে জীবন ধ্বংস হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই আমি বলতে চাইছি না! নিদারুণ তিক্ত অবস্থা। কিন্তু জনসাধারণ বুঝলো। তারা আবার তাদের ঘাম ঝরিয়ে গড়ে তুলল সব কিছু। তারা লড়েছেও একা আর নতুন করে গড়ে তুলেছেও একা। ছেচল্লিশ সালে এল দারুণ অজন্মা। এক কথায় দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা। কিন্তু জানেন আমাদের দেশের লোক খুবই শক্ত। অবশ্য এ কথা ঠিক যে যুদ্ধের শেষে ওরা চেয়েছিল একটু বিশ্রাম। ডাক্তার হিসেবে আমি জানি যে ওরা রোগে পড়তে শুরু করল। যত দিন যুদ্ধ চলেছে ওরা রোগে পড়ে নি। নিজেদের খাড়া রেখেছে। কিন্তু এখন ওরা ভুগছে কঠিন রক্তের চাপে, স্নায়বিক দৌর্বল্যে, স্নায়ু ঘটিত রোগে। তবুও দেখল এটা বিশ্রামের সময় নয়। কিন্তু আমি শপথ করে বলছি ওরা যেন ভেল্‌কি দেখিয়ে দিয়েছে! আমাদের যে কোনো একটা বিধ্বস্ত শহর আপনার দেখে আসা উচিত। স্তালিনগ্রাদ যদি খুব দূর মনে হয় তাইলে অন্তত মিনস্ক। আমার জামাই কাজ করে ওখানে। খুব হাসিখুশী ছেলে, ফরাসী বলতে পারে। তার সঙ্গে আলাপ করে দেখুন। ধ্বংস স্তূপের ভিতর থেকে ওরা শহরটা গড়ে তুলেছে। কিন্তু তখন —সেই ছেচল্লিশ সালে, সবেমাত্র আমি ফিরেছি জার্মানী থেকে—একটু গান শুনবো বলে রেডিওর চাবি ঘোরাচ্ছিলাম। শুনলাম কে যেন ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছে। খানিকক্ষণ শুনলাম। ওটা হচ্ছে আমেরিকান প্রেসের মতামত। আজও এমন পরিষ্কার মনে আছে যেন কালকে মাত্র শুনেছি। জানি না কোন বদমায়েশ প্রস্তাব করেছিল এই মুহূর্তেই আমাদের উপরে এটম-বোমা ফেলার কথা, কিন্তু ভাষাটা ছিল 'ওরা সামলে ওঠার আগেই'। দারুণ রেগে গেল আমাদের দেশের লোক। তারা বলল,—আমাদের আপন জনেরা প্রাণ দিয়েছে, আমাদের শহর জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর এসব ওরা ঐ সাগরপারের লোকেরা এমনই সহজভাবে নিল! তাছাড়া এখন আবার ওরা চায় আমাদের উপরে বোমা ফেলতে? এ কথা বেরিয়ে এল এখান থেকে—সোজা অন্তরের অন্তস্তল থেকে। আপনি বলতে পারেন,—আমি ফরাসী, আমি দোষী নই। কিন্তু প্রচুর লোক আছে আপনাদের ভিতরে যারা দোষী! অবশ্য আমাদের দেশের লোকেরা জানে যে ফরাসীরা সবাই এক ছাঁচের নয়। গত শীতে যখন আপনার দেশের খনিমজুরেরা ধর্মঘট করেছিল আমাদের ঝাড়ুদারণী পাশা একটা দশ রুবলের নোট এনে দিয়েছিল আমার হাতে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে। যার মাসের মাইনে মোটে তিনশ আশি রুবল, তার কাছে দশ রুবল যে কতোখানি তা বুঝতে পারেন? আপনার সম্পর্কে লোকেরা সাবধানী। কারণ তারা জানে না আপনি কি? আমি নিজেও তো জানি না। আমার ধারণা অবশ্য ভালো—আপনার সপক্ষে। এক কালে আপনি একটা ভালো বই লিখেছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানটা যে কি তা তো আমাকে ভেঙে বললেন না—

এবারও সাবল' কোনো জবাব দিল না। নিজের চিন্তায়ই নিজে বিভোর হয়ে রইল। ডাক্তারের জবাব খুবই তারিফ করার মতো মনে হল ওর কাছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। পুরনো যুক্তিকেই আবার আঁকড়ে ধরল।

কিন্তু আপনারা এতো বড়ো একটা সেনাবাহিনী রেখেছেন কেন?

আপনি কি আশা করেন যে আমেরিকানরা সামরিক ঘাঁটি তৈরি করে যাবে আর দিনের পর দিন আমাদের এটম বোমার আক্রমণের ভয় দেখাবে তবুও আমরা আত্মরক্ষার কথাটুকুও না ভেবে চুপ করে বসে থাকবো? আপনি একজন সাংবাদিক, সুতরাং নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। বলুন দেখি আমাকে, সামগ্রিকভাবে অস্ত্রসম্ভার কমানোর প্রস্তাব কারা তুলেছে?

তাতে প্রমাণ হয় না যে আপনারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন না। জানেন কেন আমরা আপনাদের ভয় করি? কারণ আপনারা স্থির-নিশ্চিত যে আপনাদের ধারণাই হচ্ছে একমাত্র অভ্রান্ত।

কথাটা যুক্তিহীন। এমন কি আমি বলতে চাই যে ওটা বোকার মতো কথা। স্বভাবতই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ঢের বেশি যৌক্তিক ঢের বেশি ন্যায়নিষ্ঠ। আমরা প্রগতিতে আস্থাবান। আমরা মনে করি যে যদি সমস্ত দেশ না ধ্বংস হয়ে মুছে যায়, আর যুব-সাধারণ না নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা হলে অন্য দেশের লোকেরাও আমাদের আদর্শ গ্রহণ করবে। আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেখুন আমেরিকানরা তাদের সমাজ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ স্থির নিশ্চিত নয়। তারা চায় আমাদের ধ্বংস করতে, যাতে পশ্চিমের মজুর শ্রেণীর মগজে আমাদের ভাবধারা না ঢুকে যায়। আপনি দেকার্তেকে পছন্দ করেন? তা হলে ন্যায়-শাস্ত্র ভুলে যাবেন না। ফরেস্টলের ব্যাপারটা আপনার মনে কোনো রেখাপাত করেছে কি? আমাকে তো দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। পাগল সর্বত্রই আছে। কিন্তু একজন যুদ্ধ-মন্ত্রীর পক্ষে তার অফিস থেকে সোজা পাগলা গারদে গিয়ে ওঠা—ওটা বুঝলেন, রোগের লক্ষণ—

ডাক্তার তাঁর ঘড়ি দেখলেন।

সময় হয়ে গেছে। আর একবার যদি আলোচনা করতে চান তবে আসতে পারেন। কিন্তু আগে ফোন করে নেবেন। আজ আপনার কপাল ভালো। আজকের দিনটায় ফুরসৎ আছে মাঝে মাঝে। নইলে আমাকে তো খাঁচায় বন্দী কাঠবেড়ালীর মতো চক্কর দিতে হয়। ডাক্তার ক্রিলভের খোঁজ করবেন। আমার নাম দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ। ফরাসীদের তো কোনো পৈত্রিক নাম থাকে না, তাই আপনার অসুবিধে হবে মনে রাখতে। তাছাড়া আপনাদের দেশে দিমিত্রি নামও নেই। আমাদের প্রত্যেক গাঁয়ে অন্তত একজন মিতিয়া আছে। আচ্ছা, আসি তা হলে। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এখনো তো কিছুই বললেন না আমাকে—

হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসতেই সাবল'র মন কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। এই প্রথম ওর মনে জেগে উঠেছে সন্দেহের ছায়া। যদি ডাক্তারের কথাই

সত্যি হয়ে থাকে, তবে? এই সব বিচলিত করা ভাবনা-চিন্তা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল মন থেকে। মনে পড়ল, ডাক্তার বহুবার ওকে জিজ্ঞেস করেছে ট্রানজকের কথা। কি জবাব দেবার ছিল ওর? বোধ হয় এটা খুবই একটা নোংরা ব্যাপার। নিভেল চতুর লোক। কিন্তু ওর মনের কোনে কালিও আছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না ওকে। তা ছাড়া সব সংবাদ পত্রই বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অতো কাছে গিয়ে গন্ধ না শোঁকাই ভালো। ডাক্তার যা কিছু বললেন তা ওকে ভেবে দেখতে হবে ভালো করে। কিন্তু একজন পছন্দসই কমিউনিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলেই ওকে মত বদলাতে হবে এটাও হাসির কথা। এতো সহজেই হেলে পড়বে, এমন কিছু আর কচি খোকা নয় ও।

গাড়ি হাঁকিয়ে দূতাবাসে চলে গেল সাবলং। কিছু খবরের কাগজ নেয়ার আছে সেখান থেকে। পরিহাসভরা কণ্ঠে দ্য শমং বলল ওকে:

আগের বার বলেছিলেন যে একটা স্কুল দেখে এসেছেন। আজ নিশ্চয়ই একটা শিশুসদন দেখতে গিয়েছিলেন? এ্যাটলাণ্টিক প্যাক্ট সম্পর্কে কী বলল খোকা-খুকুরা?

ওর পরিহাসে সাবলংর মুখে কিন্তু কোনো হাসি ফুটে উঠল না।

একজন সোবিয়েত ডাক্তারের সঙ্গে দু'ঘণ্টা আলাপ আলোচনা হয়েছে। তিনি বুদ্ধিমান লোক। স্বীকার করলেন যে সূর্যেও কলঙ্ক আছে। কিন্তু মূলত অবশ্য তিনি অনমণীয়—একজন কমিউনিস্ট।

সে কি কোনো কিছু সমালোচনা করল?

না তা নয়। কিন্তু স্বীকার করলেন যে ভুল হওয়া সম্ভব—যেমন ধরুন বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে।

দ্য শমংর কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল।

চমৎকার আবিষ্কার। বলুন তো তার নামটা কি?

তা জানি না। জিজ্ঞেস করিনি।—ভ্রূ-কুঁচকে জবাব দিল সাবলং।—হঠাৎ দেখা হয়েছে কাফে মেট্রোপোল-এ।

আচমকা উঠে দাঁড়াল সাবলং:

যদি অনুমতি করেন তো এ কাগজগুলো নিয়ে যাই আর এখন চলি। শহরতলীর থিয়েটার দেখার ব্যবস্থা করছি। এক ধরণের নট-নটী আছে সেখানে যারা পেশাদার নয়। মাদামকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন।

বত্রিশ

ডাক্তার ক্রিলভ যখন সাবলকে বলেছিলেন যে আজকের দিনের কাজকর্মের ভিতরে খানিকটা খানিকটা অবসর আছে, তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে তাঁর লাঞ্চে যাবার কথা ছিল। কারণ মিটিং-এর পরেই ফিরে যেতে হবে তাঁকে ক্লিনিকে। তারপর আটটায় আছে একটা বক্তৃতা। সমবায় ইউনিয়ানেও যেতে হবে একবার। ঘড়ির দিকে তাকালেন: ধরতে গেলে লাঞ্চের সময় পেরিয়েই গেছে, বাদ দিতে হবে। যেতে হবে একটা রেস্তোরাঁয়। বেশি সময় লাগবে না তাতে। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে গরম চা-এ ফু দিলেন তারপর খুশী মুখে আরাম করে স্যাণ্ডুইচ চিবোতে লাগলেন। লোকে বলে সিদ্ধ সসেজ খসখসে লাগে। কিন্তু ওঁর মনে হল অপূর্ব।

লেলিয়া তোমার সসেজটা চমৎকার হয়েছে!—দোকানের পরিচালিকাকে বললেন। ক্লান্ত পাণ্ডুর চেহারার মহিলাটি হাসল। ক্রিলভ ভাবতে লাগলেন:

দু ঘণ্টা কেটেছে ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে। কে জানে কি ধরণের লোক? হয়তো গুপ্তচরও হতে পারে। কিংবা হতেও বা পারে ভালো লোক। বলা মুস্কিল। চোখ দুটো সুন্দর। মামুলি প্রশ্ন করে নি। যে কেউ বুঝতে পারে লোকটা নিজের সম্পর্কেই স্থির-নিশ্চিত নয়। ভালোই হয়েছে যে ডাক্তার খোলা-খুলিভাবেই আলোচনা করেছে ওর সঙ্গে। কিছু খোরাক দিয়েছে ওকে ভাববার। কি সব আজেবাজে পচা জিনিসই যে ওরা পড়ে তা ভগবান-ই জানেন। কেমন করে বুঝবে এসব। যদি সৎ লোক হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত হয়তো বুঝবে। আর তা যদি না হয় তবে যাকগে, বলুকগে এক গাদা মিথ্যে কথা। ও কিছু আর এই প্রথম নয় আর ওসব তেমন বড়ো কিছুও নয়। ওতে আর আমাদের ভেঙে ফেলতে পারবে না.... .কিন্তু আর এক গ্লাস চা, উহুঁ তা আর জুটল না তোমার কপালে দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ—মিটিং-এ যাবার সময় হয়ে গেছে।

ধাক্কাধাক্কি করে ভিড়ভর্তি বাসে গিয়ে উঠলেন। ফুট-বোর্ডের মাঝখানে দুটো সবল পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল যে যুবকটি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

দুঃখিত. ধাক্কা লেগেছে বুঝি?

না, না. মোটেই না,—একটু লজ্জিত হয়েই বলে উঠল যুবকটি। তারপর ভিতরে ঢুকে এসে জায়গা ছেড়ে দিল। মায়াকোভস্কি স্কোয়ারে এসে যান-বাহনের ভিড়ে বহুক্ষণ আটকা পড়ে রইল বাসটা। ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার ক্রিলভ:

ঠিক সময় মতোই পৌঁছাতে পারবো। বাস-স্টপ থেকে মাত্র তিন মিনিটের

পথ। কিন্তু কী চমৎকার—এতো গাড়ি! গত গ্রীষ্মেও এতো গাড়ির ভিড় ছিল না। সবগুলোই কারখানা থেকে টাটকা বেরিয়ে এসেছে এক বছরের ভিতরে।

আধ ঘণ্টা পরে চেতনা-বিলোপের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়েইসব্লাৎ একটা কাগজ পড়ছিলেন আর তিনি শুনছিলেন বসে বসে। ডাঃ ক্রিলভের পাশে বসেছেন ডাঃ বরশ্চেভস্কি—রোগা রুক্ষ চেহারা মানুষটি। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে গভীর অবিশ্বাসের ছায়া। পেন্সিলটা টেবিলের উপরে ঠুকতে ঠুকতে বিড় বিড় করে বলে চলেছেন:

পরীক্ষা করে দেখা দরকার—খুবই সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার—।

অন্য দিকে একটা ছোট্ট নোট বইতে নোট নিতে নিতে ডাঃ ক্রিলভের চোখে মুখেও ফুটে উঠেছে খুশিভরা মৃদু হাসির ছটা:

কতো কি-ই না ওরা ভাবে!—নিজের পেশায় ডাঃ ক্রিলভ খুবই সাবধানী. খুবই যত্ন নেন, বলেন, 'হাঁ মেয়েটির নাকটা আমি সারিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে এমনও হতে পারে যে দাগ থেকে গেল। নিজের উপরেই পরীক্ষা করে দেখে নেবো না কি ?' কিন্তু কোনো নতুন পদ্ধতি বা কোনো নতুন ঔষধের কথা শুনলেই তিনি দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন:

চমৎকার! মানুষ কি-ই না আবিষ্কার করতে পারে!

আপনার কথাই ঠিক,—বক্তৃতার পরে পাশের সন্দিগ্ধ ভদ্রলোককে বললেন ডাঃ ক্রিলভ,—আগে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কিন্তু মতটা খুবই চমৎকার, তাই না ?

জীর্ণ নোট-বইটা পকেটে পুরে তিনি চলে গেলেন সমবায় ইউনিয়নে। সেখানে ম্যানেজার ওরলভস্কি ওঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

'ইলিচ সড়ক যৌথখামারের লরির জন্যে এসেছি—কোনো রকমের ভূমিকা না করেই স্বভাবসুলভ দরাজ গলায় বললেন ডাঃ ক্রিলভ।—বহুদিন আগে ফেব্রুয়ারী মাসেই আমি লিখে জানিয়ে ছিলাম।

এ অঞ্চলের জন্যে দু'শ চল্লিশটা লরি আমরা বরাদ্দ করেছি,—বললেন ওরলভস্কি,—এর বেশি আর কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি কি মনে করেন আঞ্চলিক কার্যকরী সমিতির কাছে আমি গিয়ে দেখি নি ? ওখানেই গিয়েছিলাম সবার আগে। আপনাদের বিলিবণ্টনের আগেই ওরা ঐ লরিগুলো চিহ্নিত করে রেখেছিল। কিন্তু দেখুন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই: এই যৌথখামারটা হচ্ছে অনন্যসাধারণ। আমি নিজে গিয়েছিলাম সেখানে। ওদের যদি একখানা লরি দেন, তবে ওরা আরো ভালো কাজ করবে। আর তা না হলে শুধু কথাই বাড়বে। বীজ-বোনার সময় এসে গেল বলে। নিশ্চয়ই একখানা লরি ছাড়তে হচ্ছে আপনাদের ওদের জন্যে—

আরো দশ মিনিট ধরে বলে চললেন। গলার স্বর ক্রমেই উঁচু হতে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। তাঁর সেই বিরাট লাল মুখ, বেগুণী রঙের কাল-ছায়া ঘেরা ঐকান্তিকতাভরা কালো চোখের দিকে তাকিয়ে ওরলভস্কি বুঝতে পারলেন যে এ লোক লরি আদায় না করে যাবেন না। বাইশ খানা লরি আছে যে-গুলো কোনো অঞ্চলের জন্যে নির্ধারিত করা হয়নি—বললেন ওরলভস্কি,—জমা করে রাখা

হয়েছে বর্ষার দিনের জন্যে। যৌথ-খামারের কয়েকজন টিম-লীডারের প্রতিভা সম্পর্কে ক্রিলভের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ওরলভস্কি:

বেশ, একখানা লরি দেবো আমরা ওদের।

খুশিভরা হাসি হাসি মুখে চলে গেলেন ক্রিলভ। মনে মনে আন্দাজ করতে পারছেন কী আনন্দই না হবে ওদের! লোকটির নাম লিখে রাখা উচিত ছিল। সত্যিই বেশ বুঝদার লোক। পরের বার সোজা ওর কাছেই আসা যাবে।—কিন্তু, দূর ছাই, কি যেন ওর নাম? কখনো কারুর নাম মনে রাখতে পারেন না ক্রিলভ। নোট-বইতে লিখলেন ইয়াত্রেভৎসব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে ধোঁকা লাগল: ভুল মনে হচ্ছে।

ক্রিলভ আশা করেছিলেন ঘণ্টাখানেক কাটাবেন সমবায় ইউনিয়নে। কিন্তু বিশ মিনিটের ভিতরেই মামলা খতম। দিনটা ভারি চমৎকার, ঘন ঘন অবসর। তাহলে গায়িকা মেয়েটির বিষয় কিছু একটা বন্দোবস্তের চেষ্টা দেখতে পারেন তিনি এখন। গানের স্কুলের অধ্যাপক জভিয়াজিনৎসেভকে বহুবার চিকিৎসা করেছেন ক্রিলভ। তাই অনায়াসেই তিনি তাঁকে বাগে আনতে পারলেন।

একটি মেয়ের ব্যাপার নিয়ে আমি এসেছি আপনার কাছে। জিলসুরের গলা চমৎকার। সঙ্গীত-বিশারদ যাঁরা সব ওর গান শুনেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু বলতে গেলে মেয়েটার প্রতিভা নষ্ট হতে বসেছে। ওর মা মারা গেছেন, বাবা আধা-পঙ্গু। চমৎকার মানুষ ভদ্রলোক, বীর। কিন্তু গোলার আঘাত খাওয়ার পর থেকে আর সেরে উঠতে পারেন নি। তাই তিনি মাশেঙ্কাকে—ওর নাম মাশা—ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে। ওর গলাটি যেমন অপূর্ব, বুদ্ধিবৃত্তিটা ঠিক ততখানি তীক্ষ্ন নয়। চিন্তাশক্তি একটু ধীর: 'বাবা বলেন' মেয়ে গোছের আর কি; এক কথায় যেখানেই ওকে পাঠানো হয় সেখানেই চলে যায়। অবস্থাটা দেখুন একবার: একটি নাইটিঙ্গেলকে কি না চালান করে দিয়েছে বেচা-কেনার কাউণ্টারে—

মেয়েটি কি আপনার কোনো আত্মীয়া?

না। কেন?

মাপ করুন।—মৃদু হাসলেন অধ্যাপক,—বুঝে উঠতে পারি নি যে একজন ডেপুটি হিসেবে আপনি কি না—

কিন্তু মেয়েটি আমার নির্বাচনী এলাকারও নয়। আমি এসেছি এই জন্যেই যে ওর বাবার শেষ পর্যন্ত চৈতন্য হয়েছে। তিনি আমাকে ধরে পড়েছেন মেয়েটাকে আপনার কাছে বদলী করে দেবার জন্য। মেয়েটাও হেদিয়ে মরছে। যুদ্ধের সময়ে ওর বাবার সঙ্গে আমি একত্র ছিলাম। এক সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিলাম এক অবরোধ ভেঙে। সেই তখন থেকেই ওঁকে খুব দুর্বল মনে হতো। কিন্তু জানেন, নিজের পরিচয়টা বেশ ভালো করেই দিয়েছিলেন। একচল্লিশ সালের সেই চরম সঙ্কটের দিনে আমরা অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলাম। ক্যাপটেন ......নামটা মনে আসছে না আমার। বোধহয় জুবারিন—দাঁড়ান দেখছি—

দ্রুত নোট-বইয়ের পাতা উলটে চলেন ক্রিলভ।

জুখিন। হাঁ ঠিক। জুখিন। মারিয়া মিখেইলোভনা জুখিনা। জন্ম উনিশ শ ত্রিশ সালে—

হাসপাতালে এসে সন্ধ্যের রোগী দেখার কাজ সেরে নিলেন। সবাই ভালো আছে। ডাক্তার সেমুস্কিনকে বললেন:

মামিকোনিয়ানের জ্বর হচ্ছে। ব্যাপারটা খুবই খারাপ। মোটেই স্বাভাবিক নয়। কাল আমাদের ওকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ছাত্রী জায়েৎসেভাকে জানালেন সু-সংবাদ:

কাল আমরা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। বলিনি তোমাকে যে ওটা নেহাতই একটা তুচ্ছ অস্ত্রোপচার। আর কোনো দিন তোমার গলায় ঘা হবে না দেখো। কোন্ বিষয় নিয়ে পড়ছো?

ভাষাতত্ব। থিসিসের জন্যে খাটছি।

কিসের উপরে?

রোমাঁ রলাঁ।

নির্বাচন খুবই ভালো করেছ। সত্যি কথা বলতে কি, জাঁ ক্রিস্তফ কোনো দিনই আমি শেষ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু কোলা ব্রুগঁ পড়েছি আমি তিনবার। মনে হয় যেন কাগজে নয়, জ্যান্ত মানুষ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তোমার চোখের সামনে। তাই না?

ক্রিলভ ঠিক সময় মতোই এসে পৌঁছালেন বক্তৃতা সভায়। এসে বসলেন পিছনে, মাথাটা বাঁ দিকে একটু হেলিয়ে যাতে ডান কানটা মঞ্চের কাছাকাছি থাকে। বক্তা জীববিদ্যা-বিশারদ সেবারশিন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বন গড়ে তোলার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। ক্রিলভ ওঁর কথা শুনেছিলেন নাতাশার কাছে। নাতাশা যখন ওকের বীজে 'মাইকোরাইজা'র প্রভাব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছিল তখন তিনি ওকে সাহায্য করেছিলেন প্রচুর।

উনি একজন চমৎকার তত্ত্ববিদ—বলেছিল নাতাশা তার বাবাকে,—ওঁর বইখানা জীববিদ্যার জগতে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। যখন উনি খানার ভিতরে ওকের ফল নিয়ে কাজ করেন তখন ওঁকে দেখবে! মনটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে কিন্তু পা দুটো মাটির উপরে দৃঢ়সংলগ্ন। কখনো যদি সাফল্য অর্জন করতে পারি তবে তার জন্যে ওঁর কাছেই ঋণী থাকবো বেশির ভাগ।

অধ্যাপক পাশকভ বসেছিলেন পরের সারিতে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি ক্রিলভকে অভিনন্দিত করলেন:

দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ! আপনি এখানে? গত শরৎকালের পরে আর আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি। দুদিক থেকেই বক্তৃতাটা আপনার খুব ভালো লাগবে। শুনলাম নাতাশা একটা অরণ্যবলয়ের কর্মকেন্দ্রে কাজ করে। বোধহয় আপনার মুখেই শুনেছিলাম বলে মনে হচ্ছে।

ওখানে গেছে সে সেপ্টেম্বর মাসে। একটা চিঠি পেলাম সেদিন। জানিয়েছে ওর চিঠিপত্র লেখার সময় নেই মোটেই—ভীষণ ব্যস্ত। মনে হচ্ছে নাতাশা কাজের ভিতরে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। ব্যাপারটা সহজবোধ্য। বিরাট

এক অসমসাহসিক কাজ—বলতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে দৈবত লড়াই। নাতাশা লিখেছে ওদের ওখানকার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছেন:

শিগ্‌গিরই আমরা আমাদের এখানকার শুকনো বাতাসকে পোষ মানাচ্ছি!

পরম আগ্রহের সঙ্গেই বক্তৃতা শুনতে লাগলেন ক্রিলভ। সব কিছুতেই দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠছেন: এক জাতের দ্রুত বেড়ে ওঠা পপলার গাছ নিয়ে অধ্যাপক ইয়াব্‌লকভের পরীক্ষামূলক কাজের গল্প, ঘনবিন্যাসে বোনা ওকের কথা, এমন কি নীরস হিসেবের কথাও—যেমন প্রথম মাসে চারাগাছ লাগানো হয়েছে তিরানব্বুই হাজার হেকটর জমিতে। ক্রিলভ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, হলদে বিবর্ণ স্তেপ-ভূমির রুক্ষতা ঘুচে গিয়ে সেখানে হচ্ছে জীবনের সঞ্চার, তরঙ্গায়িত তাজা সবুজের সমারোহ। ঐ ফরাসী ভদ্রলোকটি বলেন ওরা ভয় করেন আমাদের। তাই ওরা অনেক সামরিক চুক্তি সম্পন্ন করেছেন। আর এখানে, যদি বলেন তো আমরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছি—অবশ্য ওদের উপরে নয়। অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে।

বক্তৃতার পরে ক্লোক-রুমে এসে ক্রিলভের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল অধ্যাপক মিখেইয়েভের সঙ্গে। দুজনেই হেসে উঠলেন হো হো করে। আনন্দের প্রাণ-খোলা হাসি। বিয়াল্লিশ বছর আগে এমনি করেই একদিন দুজন দাঁড়িয়ে ছিলেন ডিপ্লোমার জন্যে মস্কোর প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশস্ত হলঘরে। এখন দেখা হয় কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হলেই ঠিক আগের মতোই দুজনে আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠেন। স্কুলে-পড়ার দিনের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা করেন সে সময়ের দুষ্টুমির কথা, শিক্ষকদের কথা, সহপাঠীদের কথা নিয়ে।

এক সঙ্গেই বেরুলেন দুজনে। সব কিছু ঘিরে নেমে এসেছে স্নিগ্ধ কমণীয়তা। বাতাসে প্রথম ফাল্গুনের ফুল-ফোটানো উষ্ণশ্বাস। যে বাতাসে পাখিরা দ্রুত উড়ে চলে উত্তরের দিকে। তরুণীরা উদাস মনে কান পেতে শোনে পাশের বাড়ির পিয়ানোর সুর, শোনে বাতাসের গান, বৃষ্টির রুমঝুম আর শোনে অন্ধকার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

চলো না আমার সঙ্গে দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ! দেখবে চলো কেমন থাকি। একটু গল্পগুজব করা যাবেখন। সেই ছেচল্লিশ সালের পরে তো আর দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেছেন ক্রিলভ।

পুশকিন স্কোয়ারের কাছে একটা নতুন বাড়িতে থাকেন মিখিয়েভ। লিফট অচল। নোটিশ ঝুলছে: "মেরামতের জন্যে বন্ধ।"

আগে বলিনি তোমাকে, মাপ করো,—মৃদু হেসে বললেন মিখেইয়েভ,—প্রায়ই এটা মেরামতের জন্যে বন্ধ থাকে। সংখ্যার দিকটা ওরা হিসেবেই আনে না।

সংখ্যা কি?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন ক্রিলভ।

ভারি সোজা—আমার বয়েস একষট্টি আর বাস করি আমি ন' তলার উপরে। বেশ খানিকটা থেমে থেমে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। ওঠাটা

ক্রিলভের পক্ষেও তেমন সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তিনি সেটা বুঝতে না দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ছুটো না. দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ—তীক্ষ্ণ শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মিখেইয়েভ,—আমরা খেলোয়াড় নই। ফোঁসানো ইঞ্জিনের মতো তোমার হাঁপানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

এই প্রথম এসেছেন ক্রিলভ তাঁর বন্ধুর বাড়ি। উৎসুক দৃষ্টিতে ছোট্ট ফ্ল্যাটটির চারদিক দেখছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। একটা ঘরে রয়েছে একটা বড়ো ডেস্ক। বই. পাণ্ডুলিপি আর খবরের কাগজে বোঝাই। একটা সোফা। সোফাটার উপরে ঘুমোন মিখেইয়েভ। আর রয়েছে একটা সরু ছোট্ট বিছানা ওর ছেলের। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে ছেলেটি। পাশের ঘরে ঘুমোন ওর স্ত্রী। সে ঘরে আছে একটা ডিনার টেবিল আর একটা ড্রেসিং টেবিল। সব কিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জানালায় চৌকাঠে ফুলের টব, ড্রেসিং টেবিলের উপরে ফুলদানি।

গিন্নী গেছেন পার্টি-মিটিং-এ। আর মিশা গেছে সিনেমায়। জায়গা কম তাই একটু ঠাসাঠাসি হয়ে আছি নইলে অন্য সব দিক থেকে খুবই আরামে আছি।

বেশ সুন্দর, আরামদায়ক। আমার একটা বাড়তি ঘর ছিল—নাতাশার ঘরটা। ওটা আমি একটি ছাত্রকে দিয়ে দিয়েছি। গলার স্বরে কি মুখের চেহারার ওর নিঃসঙ্গ জীবনের একাকীত্বের চাপা বেদনা অপরিস্ফুটই রয়ে গেল।

অনেক বই আছে তোমার দেখছি।

প্রচুর। বইয়ের ভিড়ে আমার নিজেরই ঘরছাড়া হবার দশা। মিশার তো হাত-পা ছড়াবার মতো স্থানটুকুও নেই। ওর আবার লাইন আলাদা। বাপ নিয়ে আছে মহান পিটারের আগের রুশ ইতিহাস আর ছেলে ঢুকেছে স্থাপত্য বিদ্যালয়ে।

আমার মনে আছে এক কালে তুমি অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে।

তখন ইতিহাসের উপরে ছিল আমার দারুণ বীতশ্রদ্ধা। আমার এক জ্ঞাতি ভাই যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়ছিল আমি বলেছিলাম তাকে-ফ্যারাওদের নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে লাভটা কি হবে তোমার ? কি হে নোংরা-ঘাটা ছেঁড়া-ন্যাকড়ার ব্যাপারী! আমি পড়ছিলাম আইন। পরে মত বদলে ঝুঁকলাম ইতিহাসের দিকে। আমাদের সেই ইতিহাসের শিক্ষক মশাইকে মনে আছে তোমার ? তিনি সব সময়েই বলতেন: ওহে পড়া-না-করা মিখেইয়েভ, এই নাও তোমার নম্বরের ঝুড়ি।

স্কুলের সহপাঠীদের স্মৃতিকথায় দুজনে ডুবে গেলেন। সিলেজনেভের নাক দিয়ে সর্দি ঝরত অনর্গল। তাই ওর নাম দিয়েছিল সবাই 'সিশি'। কিন্তু মরেছে বীরের মতো। আর্চএঞ্জেলে হানাদারেরা অমানুষিক নির্যাতন করেই মেরে ফেলেছে ওকে। চেবিশেভ চলে গিয়ে বসবাস করছিল টার্কিতে। লোকে বলে সে বিষাক্ত কীটের প্রদর্শনী করতো। মারা গেছে কপর্দকশূন্য অবস্থায়। কোভালেভস্কি হয়েছিল সাংবাদিক। যুদ্ধে মারা গেছে—

'ক্যানারি'কে মনে পড়ে তোমার দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ, শেভেলেভকে ? ওর

চুল ছিল খাড়া খাড়া, শুয়োরের কুচির মতো শক্ত। মনে আছে জার্মান ভাষার ক্লাশে সে একবার হাঁচি পায় এমন একরকমের গুঁড়ো এনেছিল। কার্ল ফ্রিড্রিখোভিচ তো ক্লাশে যতক্ষণ ছিলেন শুধু হেঁচে মরেছেন। তাঁরা ওকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন—সে হয়েছিল নৃতত্ত্ববিদ। উনিশশো ছেচল্লিশে পেয়েছিল স্তালিন পুরস্কার। এই সেদিন শুনলাম মারা গেছে তাসখন্দে। আমাদের ভিতরের খুব বেশি কেউ আর বেঁচে নেই।

হাঁ, খুব কাছাকাছিই বোমা পড়ছে।—বললেন ক্রিলভ।

একটু পরেই আবার তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন:

আমার এখনো মনে আছে কেমন করে তুমি একটি স্কুলের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে। আর নিজের জন্যে কিনেছিলে একটা অদ্ভুত ধরনের টুপি—হালকা নীল রঙের, ভীষণ চওড়া। একদিন স্কুলের উলটো দিকের বাগানে মেয়েটির সঙ্গে গোপনে মিলতে গিয়েছিলে। আমি বসে পড়েছিলাম তোমার টুপিটার উপরে। ফলে ওটা থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছিল। আর তুমি বেল্ট নিয়ে তাড়া করেছিলে আমাকে। মনে পড়ে?

অতীত দিনের মস্কোর কথা নিয়ে দুজনে আলোচনা করতে লাগলেন:

সেই ঘোড়া-টানা ট্রাম, বিরাট হৈ-হল্লার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেত প্রেচিসতে-কার উপর দিয়ে। ওটের দাম বাড়া নিয়ে গাড়োয়ানদের সেই অফুরন্ত বগবগ করা। শহরতলীর সেই ক্ষুদে ক্ষুদে কাঠের বাড়ি আর আগুনে পাহারার বরুজ ঘর। যেমন কোন প্রদর্শনী দেখতে যাচ্ছে এমনিভাবেই মানুষ ছুটতো সে আগুন দেখে। সেই রবিবারের বাজার—যেখানে বিক্রি হতো নানা রকমের পুতুল—'মার্কিনী' আর 'শাশুড়ীর জিভ'। সেই সারি সারি খাবারের দোকান—ওযোতনি রিয়াদ, মুদি-দোকান, চাবুক হাতে কানে আংটি-পরা কশাক। সেই অফুরন্ত চা খেয়ে চলা। ওদের উদ্দাম যৌবনকালের সেই ঝিমানো স্থবির দিনগুলোর কথা।

সেকালে যদি আজকের মস্কোর চেহারা কেউ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতো, বিশ্বাসই করতাম না,—বললেন ক্রিলভ।—ভেবে দেখো, শুধু বাড়ি-ঘরই যে কতো তৈরি হয়েছে! সেদিন মোটর হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম ভ্লাদিমির সড়ক ধরে। ওদিকটায় ছিল শুধু সব্জীর খেত আরা ভাঙা কুঁড়ে। কিন্তু এখন সে সমস্ত জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে বিরাট শহর। আত্মহারা হয়ে পড়লাম। কী চমৎকার দিনেই না বেঁচে আছি আমরা। মরতে ইচ্ছে করে না—আগামী বিশ বছরে আরো কতো কি-ই যে হবে শুধু সেটুকু যদি চোখে দেখা যেত।

হঠাৎ কেমন যেন অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালেন:

এক টুকরো কাগজ আর একটা খাম হবে তোমার কাছে? আবার একটা জিনিস ভুলে বসে আছি। ডেপুটির কর্তব্যের দিক থেকে একটা কাজ। আমার এলাকায় একটা কারখানা গড়ে উঠেছে। চমৎকার কারখানাটা। দুবার আমি গিয়ে দেখে এসেছি। সত্যিই ওটাকে শহরের একটা গর্বের জিনিস বলতে পারো। শ্রমিকদের বাসস্থান তৈরি করার জন্যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে-টাকা খরচ হয়ে গেছে। একটা নতুন কারখানা তৈরি করতে সব খরচ করে ফেলেছে। কারখানার পরিচালক খুবই বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু বড্ডো উচ্চাভিলাসী। বলতে

গেলে, হাঁ একটু এক-চোখা। ওর দুটো চোখই নিবদ্ধ রয়েছে উপরওয়ালাদের দিকে। কিন্তু শ্রমিকদের দিকে একটুও দৃষ্টি নেই। অনেকে শহরের ভিতরে ঘর খুঁজে নিয়েছে। বাকি সব রয়েছে হোস্টেলে। এখন ওদের ভিতরেরই এক-জন চিঠি লিখেছে আমাকে, চিঠিটা আমার পকেটেই রয়েছে। একটা প্রাচ্য নাম—আলিবেকভ। সে রয়েছে হোস্টেলে। তাঁর স্ত্রীও সেখানে। এখন আছেন প্রসবকালীন ছুটিতে। এখুনি আমাকে লিখতে হচ্ছে জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদকের কাছে। জ্ঞানগম্যি আছে লোকটার, নইলে চিঠিটা আবার পকেটের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখবো আর ভুলে যাবো। তিন দিন ধরে পকেটে পকেটে ঘুরছে। কী কেলেঙ্কারি!

ক্রিলভ যখন চিঠি লিখছেন তখন মিখেইয়েভের স্ত্রী ফিরে এলেন ঘরে। এসেই তিনি টেবিল সাজালেন আর মিখেইয়েভ বললেন:

এসো, আমরা একটু চা-টা খাই।

প্রাণ ভরে খেলেন ক্রিলভ কিন্তু পরক্ষণেই কেমন যেন একটু অশ্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

ইভজেনিয়া আইভানোভনা, আমি সব কিছুই, বলতে গেলে, গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছি দেখে অবাক হবেন না। আজ দুপুরের খাওয়াটা বাদ পড়ে গেছে আমার। কোনো রকমেই সময় করে উঠতে পারিনি।

শেষ খবর শোনার সময় হয়ে এলো। রেডিওটা খুলে দিচ্ছি।—বললেন মিখেইয়েভের স্ত্রী।

"চেলিয়াবিনস্ক থেকে জানাচ্ছে যে ওখানকার ট্রাকটর কারখানার শ্রমিকরা একটা নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।—আলমা-আতায় নতুন ক্লাবটা আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়েছে—উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টা ব্যাপকতা লাভ করছে—রিগা তামাক-কারখানার শ্রমিকেরা নতুন সাফল্যের ভিতর দিয়ে মে-দিবসের অভিনন্দনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।—ইসমাইল আঞ্চলিক কমিটি অবহিত হয়েছে যে এবারের আগ-ফলনের শস্য-বোনার ধরন বেশ উঁচু ধরনের হয়েছে—"

কী একঘেয়ে বিরক্তিকর লাগে শুনতে।—গজ গজ করে উঠলেন ক্রিলভ,—অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তবুও কেউ সেদিকে কান দিতে চায় না। এক এক সময়ে আমি তো রেডিও খুলে গাল পাড়তে থাকি। সব কিছুরই পরিবর্তন হতে চলেছে। মানুষ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু যারা ঘোষণা করেন তাঁরা তাঁদের সেই মান্ধাতার আমলের কেত্তনই গেয়ে চলেছেন।

এখন আমরা বিদেশী সংবাদ শোনাচ্ছি......

মানে, এখন পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতির উদ্দেশ্যে সমবেত প্রার্থনা,—মৃদু হাসলেন মিখেইয়েভ।

'ডেইলি নিউজ' কাগজে সংবাদ দিচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সর্বশেষ বক্তৃতার দরুন অস্ত্র-শস্ত্র তৈরির কারখানার শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে—, ওলন্দাজ সংবাদ-পত্র 'দ্য ওয়ারহিদ' খবর দিচ্ছে যে ওলন্দাজ সশস্ত্র বাহিনী আরো বাড়ানো হবে। শুধু গত মাসেই ইতালিতে বেকার শ্রমিকের সংখ্যা এক লক্ষ সত্তর হাজার বেড়ে গেছে—

এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি দিমিত্রি আলেকসেয়েভিচ ?

আমার চাইতে তুমিই ভালো জানো। তুমি ঐতিহাসিক। আমি যা জানি তা হল, নাক আর গলার সম্পর্কে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন দেখাচ্ছে এ-সব ?

ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থা সব সময়েই দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত থাকে। বহু দূর অতীতে উদাহরণ খোঁজার দরকার নেই। তৃতীয় নেপোলিয়ান, কাইজার নিকোলাস এদের কথা মনে করো। অতীত বলে এদেরকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না—

এরা তাহলে নিতান্তই মূর্খ। হিটলারের জানোয়ারগুলোকে কেমন প্রহারটি দেওয়া হয়েছিল সে-কথা ভুলে গেছে নাকি ওরা ? যাই-হোক সেটা খুব বেশি দিনের কথা নয়। এ-থেকে ওদের খানিকটা শিক্ষা অন্তত নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না। ওরা চেঁচায়, চিৎকার করে, শাসায় আর তার ভিতরেই আমরা আমাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আগে আগে যখন শেবারশিনের কথা শুনতাম, মনে মনে ভাবতাম: এই উন্মত্ততার মানে কী ? ধরো, যেমন আমরা ওক গাছ লাগিয়ে যাচ্ছি অনাগত বহু শতাব্দীর জন্যে। মনে আছে একটা আমেরিকান কাগজে পড়েছিলাম টেকসারের প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ের কথা। বেশ রসান দিয়েই বর্ণনা করেছিল ওরা—সে এক চমকপ্রদ ঘটনা। ঘূর্ণি-ঝড়ের আঘাতে ফসলের জমির উপরের এক পরত মাটি সম্পূর্ণই উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ হল অন্নহীন। ওদের উচিত ছিল গাছ লাগানো। টাকা আছে ওদের, আছে অনেক বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তা না, ওদের মাথার ভিতরে ঢুকেছে শুধু বোমা আর বোমা ! কোথায় যেন পড়েছিলাম একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের কথা, তিনি কি করে সমস্ত গাছপালা উদ্ভিদ ধ্বংস করা যায় তাই নিয়ে গবেষণা করছেন। ঘৃণ্য কাজ। ওদের মানুষ বলে বিশ্বাস করা শক্ত। হাসপাতালে আজ এক ফরাসী সাংবাদিক এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে একেবারে নাজেহাল করে তুলেছিল। রোগীদের সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন নয়; এই এটা ওটা সেটা নিয়ে। সে বললো পশ্চিমের লোকেরা ঘাবড়ে গেছে। আর একটা নতুন যুদ্ধের কথা সবার মুখে মুখে। ওদের মাথায় ঢুকেছে আমরা নাকি ওদের আক্রমণ করার মতলব আঁটছি। তাহলে দেখো ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই: ওরা চাইল আমাদের ভয় দেখাতে কিন্তু তার বদলে নিজেরাই ভয় পেয়ে গেল।

মিখেইয়েভের ছেলে মিশা এসে ঢুকল ঘরে। বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন। হাত দুটো বেঢপ লম্বা, গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। কেমন যেন একটু লাজুক-লাজুক ভাব, সময় সময় মনে হয় যেন একটু রূঢ়। ক্রিলভের সঙ্গে করমর্দন করেই গো-গ্রাসে ঠাণ্ডা খাবার খেতে শুরু করে দিল।

এতো দেরি হল কেন মিশা ?—জিজ্ঞেস করলেন ওর মা।

সে-কথা তো তুমি ভালো করেই জানো যে নাদিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হল আমাকে। আর সেই ট্রলি বাসে ফিরতে পুরো এক ঘণ্টা।—একটু বিব্রত বিরক্ত হয়েই জবাব দিল। তারপর ক্রিলভের দিকে ফিরে বললো যে ওদের ইনস্টি-টিউটের একজন অধ্যাপক বহুতলার বাড়ি তৈরির পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ

করেছেন। আগ্রহের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলেন ক্লিলভ। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে সানন্দে আবেগের সঙ্গে বলে চললো মিশা:

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটাই হবে প্রথম বাড়ি যেটা আধার ও আধেয় উভয় দিক থেকেই হবে সাম্যবাদের ভাবধারার অভিব্যক্তি।

স্বাভাবিক।—বললেন ক্লিলভ। পরক্ষণেই হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সওয়া দুটো বেজে গেছে, ভাবতে পারো। মাপ করুন, ইভজেনিয়া আইভানোনা, আপনাকে এত রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছি। ছেলেবেলার দুই স্কুলের বন্ধুর দেখা হয়ে গেলে এমনিই ঘটে থাকে।

সন্ধ্যেবেলার চাইতে বাইরের আবহাওয়া আরো গরম। মনে হয় দখ্নে-হাওয়া মস্কোয় বসন্তের আবির্ভাব ঘটানোর জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাড়ি-মুখো হেঁটে চলেছেন ক্লিলভ। বিশেষ করে কোনো কিছুই ভাবছেন না। শুধু লোভীর মতো ঐ তীব্র, চঞ্চল-করা বাতাস নিশ্বাসে নিশ্বাসে শুষে নিয়ে চলেছেন।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই তমকা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ওকে অভ্যর্থনা জানালো। দু বছর আগে একটা পথের কুকুরকে কুড়িয়ে এনেছিলেন ক্লিলভ। বুড়ো মঙ্গরেল জাতের কুকুর। ধূর্ত চকচকে দুটো চোখ, শাদা শাদা দাগভরা কালো মুখ আর বাঁকা পা। ক্লিলভ বলেন পইন্টার আর দাচশুন্দের বর্ণসংকর—বলতে গেলে একটা নতুন জাতের। বন্ধুদের কাছে বলে বেড়ান যে তিনি কুকুর পুষছেন শিকার করতে ভালোবাসেন বলে। আসলে কিন্তু তিনি যে ওটাকে তুলে নিয়েছিলেন, তার কারণ যে নিঃসঙ্গ একাকীত্ব তাঁর উপরে ভারি হয়ে চেপে বসেছিল। সোরগোল তুলে তমকা যে ওঁকে অভ্যর্থনা জানায় এটা খুবই ভালো লাগে ক্লিলভের। ভালো লাগে ওর রাতভোর ছুটোছুটি হুটোপুটি, ঘুমের ভিতরে নাক-ডাকানো আর কখনো কখনো কুঁই কুঁই করে ওঠা। ঘরময় লাফঝাঁপ করতে শুরু করে দিল তমকা, তারপর হয়রান হয়ে শুয়ে পড়ে লাল জিভটা বের করে হাঁপাতে শুরু করে দিল।

কচি ছানার মতো করছিস,—কুকুরটাকে তিরস্কার করলেন ক্লিলভ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ওঁর নিজেরই মতো কুকুরটাও বুঝতে পারছে না যে বয়সের দিক থেকে বুড়ো হয়ে এসেছে। এটাই হচ্ছে মুস্কিল! মানুষের অন্তর কখনো বুড়িয়ে যায় না। ছুটাছুটি করে বেড়ায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠে কিন্তু দেখে আগের সে-শক্তি সামর্থ চলে গেছে।

নাতাশার ঘরে যে ছাত্রটি থাকে সে এখনো বাইরে। হয়তো কোনো নাদিয়া বা মাশাকে বাড়ি পেঁছে দিতে গেছে।—মৃদু হেসে মনে মনে বললেন ক্লিলভ। এমন রাতে কেমন করেই-বা তরুণ বয়সের ছেলেরা ঘরে থাকতে পারে?

তিনি তমকাকে বাইরে নিয়ে গেলেন একটু ছোটাছুটি করাবার জন্যে। তারপর ঘুম পাচ্ছে না দেখে একটা বই নিয়ে বসলেন।

ক্লিলভ যখন উপন্যাস পড়েন, আনন্দ পান। মনে মনে তর্কবিতর্ক করেন। লেখকের সঙ্গে নয়, তর্ক করেন উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে। এখনই ঘটল তাই। হঠাৎ চশমাটা খুলে রেখে মনে মনে তর্ক করতে শুরু করে দিলেন:

না, কমরেড লিস্তোপাদ* এটা ঠিক নয়। অমন চমৎকার মা পেয়েছ তুমি, তাঁর কাছ থেকে কিছুটা শেখা উচিত ছিল তোমার। তোমার আগের স্ত্রীকেও বোঝনি তুমি। অবশ্য একটা যন্ত্রকে বোঝার চাইতে রক্তমাংসের মানুষকে বোঝা শক্ত। কিন্তু তুমি তো কমিউনিস্ট, সেদিক থেকে খানিকটা দায়-দায়িত্ব আছে বৈকি তোমার।

বইটা রেখে দিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দিনের আলো ফুটে উঠছে। ওঁর চোখের সামনে মস্কো। বড়ো বড়ো নতুন ইমারত আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ওঁর ছেলেবেলার দেখা সেই ছোট বাড়ি। দূরে নদী, পুল আর ক্রেমলিনের চূড়া—দেখার চাইতে অনুমানই করছেন বেশি। মনে পড়লো প্রায়ই এই জানলার সামনে এসে দাঁড়াতেন স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি। ভার্য়া বলতেন: আমাদের ফ্ল্যাটটা ছোট কিন্তু এখান থেকে দৃশ্য যা পাওয়া যায়, চমৎকার। মৃত স্ত্রীর স্মৃতি ওঁকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলল যে ক্ষণিকের জন্যে মস্কো ওঁর চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এল, মুছে গেল। অনুভব করলেন ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে ভার্য়া, অনামিকায় তাঁর মায়ের দেওয়া সেই ছোট্ট আকাশ-রঙের আংটি; অনুভব করলেন তার শীর্ণ হাতের ছোঁয়া। ভার্য়া, আমার ভার্য়া, কী চমৎকার দিনগুলোই না কাটিয়েছি দুজনে মিলে—

ছুটির দিনগুলি কাটাতেন নাতাশার সঙ্গে। ওর স্বামী ভাস্যাও আসত। কথাটা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল: সময় নেই তাদের ওকে সঙ্গ দেওয়ার মতো। নাতাশা বড়ো হয়ে গেছে এখন। শনিবার ওর জন্মদিন। ঐদিন ওকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে ভুলবেন না কিছুতেই—ঊনত্রিশ বছর বয়েস হল। চমৎকার মেয়ে। নিজের মেয়ে বলে নয়, ওর মনটা খুবই উচু। লিস্তোপাদ যদি ওর মতো একটি মেয়ে পেতো সে খানিকটা শিখিয়ে দিতে পারতো ওকে। নোননার মতো অসার সূত্র-সর্বস্ব নয়। নাতাশা জীবন্ত, ওর অন্তর উষ্ণ আবেগে ভরপুর। একবার যাকে ভালোবেসেছে, তার সম্পর্কে ধীরে ধীরে বিক্ষোভ জমিয়ে তুলে অন্তর ভারাক্রান্ত করে তোলে না। ক্ষুদে ভাসকাও যে কালে কালে একটা বলিষ্ঠ তেজী মানুষ হয়ে উঠবে তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বড়ো ইচ্ছে হয় ওঁর ভাসকাকে দেখতে। ছ মাস হলো ওরা চলে গেছে—

নাতিটিকে দারুণ ভালোবাসেন ক্রিলভ। ভাসেঙ্কাকে মনে হয় ওর নিজেরই আর এক রূপ। কিন্তু 'নিষ্পাপ সংস্করণ'। ভাসেঙ্কা চঞ্চল, প্রাণবন্ত আর সব সময়েই ওর মুখে একটিমাত্র প্রশ্ন 'কেন'? ক্লাশের ভিতরে সবচাইতে দুষ্টু ছেলে বলে ওর নাম আছে। কিন্তু ছাত্র ভালো। বোঝে তাড়াতাড়ি। ছবি আঁকতে ভালোবাসে আর সবসময়েই আঁকে জাহাজের ছবি। হয়তো কালে কালে একজন নাবিক হবে,—ভাবলেন ক্রিলভ। এই তো সেদিন চিঠি লিখেছে: "দাদামশাই, আমাকে রঙ আর মাছ ধরবার বঁড়শি কিনে পাঠাও।" আর তলায় এঁকে দিয়েছে ঝড়ের সমুদ্রের ছবি, পাহাড় আর সবচেয়ে উঁচু ঢেউয়ের মাথায় পতাকা-ওড়ানো

পাশোভার 'কারখানা' উপন্যাসের নায়ক।

জাহাজ। কোত্থেকে পেল এসব? এখন পর্যন্ত দেখেছে তো বড়জোর খানা-ডোবা। আর এঁকেছে কিনা সমুদ্রের ছবি।

পথের বুকে পায়ে-চলা পথিকের প্রথম আবির্ভাব। জানালায় জানালায় আগুনের আভার মতো সূর্যের আলোর প্রতিফলন। গোলাপী আলোর উষ্ণতায় স্নান করছে মস্কো নগরী। অন্তত ঘণ্টাদুই ঘুমিয়ে নিতে হবে ওঁকে। প্রচুর কাজ করতে হবে কাল। কাল? কেন, আজই তো—

ওঁর সমস্ত চিন্তা সামনের কর্মবহুল জটিল কৌতূহলভরা দিনটিকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়ে চললো: অপারেশন আছে দুটো। হাসপাতাল-কর্মীদের নিয়ে একটা বক্তৃতা সভা। হয়তো এমন শত শত দিন আসবে। ক্রিলভ জানেন যে তিনি নিজে অসুস্থ। অতি শ্রম করা উচিত নয় তাঁর পক্ষে। এই নির্দেশই দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আর নাতাশাও এ-কথাই লিখেছে চিঠিতে। কিন্তু এটা বিশ্রামের সময় নয়। তাছাড়া যে মুহূর্তে তিনি কোনো স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে ঢুকবেন তখনই ভেঙে পড়বেন। নিজেকে শক্ত করো দিমিত্রি আলেকসিয়েভিচ। যেমনভাবে শুরু করেছিলে তেমনিভাবেই শেষ করো—সর্বাঙ্গীনভাবে।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে পড়লো ওঁর সেই ফরাসী ভদ্রলোকের কথা। দুঃখ হল তার জন্যে। ওর চোখ দুটো ভালো. কিন্তু কী বিকট জীবন: ঐ এজেন্সিটা, ঐ আমেরিকান সাংবাদিকগুলো আর সব সময়েই কিনা ওদের মাথায় ঘুরছে যুদ্ধের চিন্তা। বোঝা যায় লোকটা দম ফেটে মরছে। তপ্ত কড়ায় ফুটছে সব সময়ে, কিন্তু নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন। মানুষ অমন করে বেঁচে থাকে কী করে? একবার ও যদি ওই দুনিয়ার কাছে আসতে পারতো, এই গোলাপী উষ্ণতাভরা জগতের কাছাকাছি—

ভাবতে ভাবতে মাঝপথেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তেত্রিশ

বক্তৃতার পরে অধ্যাপক শেবারশিন মোটরে বাড়ি ফিরে এলেন। বাকি সন্ধ্যেটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটাতে পারবেন জেনে মনে মনে ভারি খুশী। বেশি রাত হয়নি এখনো—মোটে সাড়ে দশটা। ওঁর মনে হল কি যেন একটা দরকারী কথা বলবার আছে লেলিয়ার কাছে। কিন্তু তাকে চুমু খেতে খেতে এটুকুই শুধু বললেন: 'জানো লেলিয়া.. ...' তারপরেই চুপ করে গেলেন। ওকে একান্ত কাছে পেয়ে দারুণ সুখী শেবারশিন। তাছাড়া এক্ষুনি যে আবার আকাদামি বা বিমান ঘাঁটিতে ছুটে যেতে হবে না তাতে আরো খুশী। ওর মুখের দিকে তাকালেন। মনে হল ঐ মুখখানা যেন তাঁর বুকের ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে। ধূসর-নীল দুটো উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন:

আমি কী সুখী!

নভোসিবির্স্কে কেমন করে আমাদের দেখা হয়েছিল মনে আছে তোমার? তুমি আমার কাছে এসে বলেছিলে:

অধ্যাপক লোবভ আমাকে বলে দিয়েছেন আপনাকে বলতে যে অনেক অসুবিধে সত্ত্বেও বন তৈরির কাজ তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কালই আমি লেনিনগ্রাদ থেকে এসেছি।

ঠিক সাত বছর আগে। আচ্ছা, আমি কি বলেছিলাম তোমাকে যে লোবভের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া গেছে? তিনি যা যা লিখেছিলেন তার বেশিরভাগই কাজে পরিণত হয়েছে। ওঁর ইচ্ছে-শক্তি ছিল অদ্ভুত। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মারা গেলেন। তবুও তাঁর শেষ লেখা সম্পূর্ণ করেছিলেন মরার মাত্র চার দিন আগে।

টেলিফোন বেজে উঠল।

তোমার ফোন।

রিসিভার হাতে নিলেন:

ঠিক আছে, বিশ মিনিটের ভিতরেই গিয়ে পেঁাছোচ্ছি।

আমার জন্যে বসে থেকো না,—স্ত্রীকে চুমু খেয়ে বললেন,—হয়তো রবিবার গাঁয়ের দিকে কটেজে গিয়ে থাকবো। অবশ্য সেটা নির্ভর করছে যদি না দূরে কোথাও উড়ে যেতে হয়।

উনিশশো বিয়াল্লিশে লেনিনগ্রাদ ত্যাগ করে আসা একটি ছাত্রীকে বিয়ে করেন অধ্যাপক শেবারশিন। ওঁর বয়েস তখন পঁয়তাল্লিশ আর লেলিয়ার চব্বিশ। বয়সের ব্যবধানের দুরতিক্রম্য বাধার জন্যে প্রথম প্রথম চেষ্টা করতেন তিনি তাঁর মনোভাব চেপে রাখতে। দু মাস ধরে ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছেন। জীবনে কোনোদিনই তিনি অন্তর-আবেগের এই ঝড়ঝঞ্ঝার সঙ্গে পরিচিত নন। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার বহু পরে যখন প্রেম এলো তাঁর জীবনে, অন্তরের সুগভীর অন্তস্তলে এক দূরপনেয় ক্ষতের বেদনায় দেহমন বিকল করে তুলল। বার বার করে বুঝাতে লাগলেন নিজেকে যে, না, এটা ঠিক নয়। কোনো অধিকার নেই তাঁর একটি তরুণী মেয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনকে বেঁধে দেয়ার। ওঁর এ-ধরনের আবেগ কুৎসিতই শুধু নয়, হয়তো বা এটা একটা ঘৃণ্য অপরাধ। এক-দিন রাতে লেলিয়া খুঁজে বের করলো ওঁকে। নিঃশব্দে ঢুকলো গিয়ে ওঁর ঘরে। তিনি যুক্তি-তর্ক শুরু করে দিলেন ওর সঙ্গে। বললেন, খুবই ব্যস্ত তিনি। মোট কথা দুজনার দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই দুজনার দিক থেকে ভালো। অনুরোধ করলেন ওকে চলে যেতে, মিনতি জানালেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো লেলিয়া। কাছে এগিয়ে গেলেন শেবারশিন। দেখলেন ও কাঁদছে।

যদি আঘাত দিয়ে থাকি তো রাগ ক'রো না,—বললেন তিনি।

তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না,—প্রত্যুত্তরে বলল লেলিয়া।

এক বছর পরে ওদের একটি ছেলে হল। নাম রাখলো তার কনস্তানতাইন। ওর বাবা ডাকেন কুকসা। ইনস্টিটিউটের পড়া শেষ করে একটা লেবোরেটারিতে কাজ করতে আরম্ভ করল লেলিয়া। আরো গভীরভাবে ভালোবাসতে লাগলো শেবারশিনকে। বিনিময়ে শেবারশিনও অনাবিল স্নেহ ও যৌবনোত্তীর্ণ পুরুষের অন্ধ আবেগভরা ভালোবাসায় তার প্রতিদান দিতে লাগলেন। দুজনার কাজের ধরন এমনি যে ওরা দুজনে বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারে না। কোনো কোনো

দিন অধ্যাপক সকালে বাড়ি থাকেন, কিন্তু ভোরে উঠেই লোলিয়া চলে যায় তার কাজে। একটি সন্ধ্যে বা একটি ঘণ্টাও যদি কখনো দুজনে এক সঙ্গে কাটাতে পারে সে যেন এক অমূল্য সম্পদ—দুজনার অন্তরই আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালে অধ্যাপক হাইনস মস্কো সফরে আসেন। তিনি চাইলেন শেবারশিনের সঙ্গে দেখা করতে। আগের বছর ওঁদের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল হোস্টেলে। দুজনে বন্ধুভাবে আলোচনা করলেন। কিন্তু কেউ-ই কাউকে বুঝলেন না। যদিও শেবারশিন কথা বলেছিলেন ইংরেজীতে।

অধ্যাপক হাইনস বিশুদ্ধ পণ্ডিত। তেমনি সাধু, তেমনি আত্মভোলা মানুষ। নিজের পড়াশুনার চৌহদ্দির বাইরের সব কিছুতেই তাঁর দারুণ ভয়—যেমন নাকি প্রায়ই দেখা যায় বই-পত্তরে। আর বাস্তব ক্ষেত্রে যাদের অসহায়তা পাঠক-অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। আমেরিকায় থাকা-কালে এ-ধরনের অনেক পণ্ডিত লোকের সংস্পর্শে আসেন শেবারশিন। জীববিদেরা বংশগতি, গণ ইত্যাদি নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন ওঁর সঙ্গে। ওঁর বইয়ের সুখ্যাতি করেন। বলেন, বইটা অপূর্ব। যদিও তার বহু অংশই বিতর্কমূলক। কিন্তু জীববিদ্যার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে শেবারশিন যখন তাঁদের মতামত জানবার চেষ্টা করলেন, তাঁরা জবাব দিলেন যে ওটা তাঁদের বিষয়ের বাইরের ব্যাপার। যে-সব সমস্যা সম্পর্কে শেবারশিনের আগ্রহ বেশি, সে-সব নিয়ে হাতে-কলমে তারাই কাজ করে থাকেন যাদের জ্ঞান সে-সম্পর্কে খুবই সীমাবদ্ধ। তাদের ভিতরের এক-জনকে যখন শেবারশিন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে প্রজাতিভুক্ত সদস্য আর যোগ্য-তমের উদ্বর্তন এ দুয়ের ভিতরে প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত মতবাদ বিষয়ে কি তাঁরা ভাবেন। শুনে ভদ্রলোক হাঁ হয়ে গেলেন। পরে শেবারশিন তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন:

চমৎকার ওদের বিশ্ববিদ্যালয়। তেমনি সুসজ্জিত লেবোরেটারি—এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানীরা নিজেদের পড়ার ঘরের ভিতরেই আবদ্ধ রাখেন। আর যাঁরা হাতে-কলমে কাজ করেন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমস্যার কিছুই বোঝেন না।

হাইনস বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ। বাধ্য হয়ে শেবারশিনকেও আলোচনা করতে হলো বংশানুক্রম নিয়ে। এই একটিমাত্র বিষয় সম্পর্কেই আমেরিকানরা আগ্রহশীল বেশি। আশ্চর্য হয়ে গেলেন হাইনস নৃতত্ত্ব সম্পর্কে সোবিয়েত কৃষি-জীব-বিজ্ঞানীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে। তাছাড়া চারু-শিল্প ও অর্থনীতি সম্পর্কেও তাঁর দখল রয়েছে দেখে। আমন্ত্রিত হয়ে যখন তিনি শেবারশিনের ফ্ল্যাটে এলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

এখানে বসে আপনি কাজ করেন কেমন করে?

অভ্যেস হয়ে গেছে—একটু হেসে বললেন শেবারশিন। সে সময়ে থাকতেন তিনি মস্কোর গর্কি স্ট্রীটে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি যেন বিরাট জন-সমুদ্র কাঁপিয়ে গর্জে কোলাহল তুলে বয়ে চলে তার জানালার তলা দিয়ে। নানা রকমের সুখাদ্য আর সুগন্ধী আবখাজিয়ান মদ দিয়ে এক চমৎকার ভোজ দিলেন শেবারশিন হাইনসকে। খেতে খেতে বারবার বাধা পড়ছিল। কখনো আসছিল টেলিফোনের

ডাক, কখনো পার্শেল নিয়ে এসে হাজির হচ্ছিল কেউ। তিনি অতিথিকে বুঝিয়ে বললেন যে বৈজ্ঞানিক দিক ছাড়াও আরো অনেক কাজই করতে হয় তাঁকে। কারণ তিনি একজন ডেপুটি, স্তালিন-পুরস্কার কমিটির একজন সভ্য। শেবারশিন হাইনসকে বললেন বলসই থিয়েটারে গিয়ে দেখে আসতে। সেখানে উলানোভাকে নিয়ে ওরা মঞ্চস্থ করছে 'গিছেলি'। আবার অবাক হয়ে গেলেন হাইনস: শেবারশিন কিনা দারুণ ভালোবাসেন ব্যালে দেখতে।

আমিও যেতাম আপনার সঙ্গে,—বললেন শেবারশিন,—কিন্তু পারছি না, আজ রাত্রেই আমাকে লেনিনগ্রাদ যেতে হবে।

এমনি ঘনঘনই ওকে বাইরে যেতে হয় কিনা,—হাইনসের এই প্রশ্নের জবাবে শেবারশিন বললেন:

দাঁড়ান দেখছি। এ বছরের মধ্যে দুবার গেছি লেনিনগ্রাদ, তারপর গেছি রুমানিয়ায়, তারপর ওদেশা, সারতভ, ওমস্ক, আস্ত্রাখান—বাস এই পর্যন্তই।

শুনেছি আপনি একখানা নতুন বই লিখছেন,—বললেন হাইনস,—লেখার সময় পান কখন?

হাসলেন শেবারশিন।

হাতের কাছে যখনই একটা টেবিল পাই আর কয়েক ঘণ্টা অবকাশ মিলে যায় তখনই। যদিও ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে টেবিল ছাড়াও মানুষের চলে। গত গ্রীষ্মে আমি ওমস্ক গিয়েছিলাম, প্লেনে বসেই খানিকটা লিখে ফেললাম।

হাইনস যখন আদমস-এর কাছে রুশিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা বলেছিলেন. তিনি উল্লেখ করেছিলেন শেবারশিনের নাম:

কৃষি-জীববিদ্যা সম্পর্কে মতামত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজের বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হয়তো এক ধাপ অগ্রগতি। কিংবা এ-ও হতে পারে যে এটা ওদের প্রচারের একটা নতুন কায়দা। যা-ই হোক না কেন ওদের ভিতরে বেশ কিছু প্রতিভাবান লোক রয়েছে। তাছাড়া কর্মক্ষেত্রও বিরাট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে ওখানে কাজ করতে চাই না।

কিন্তু দুনিয়ায় এমন কিছুই নেই যা দিয়ে শেবারশিনকে প্রলুব্ধ করা যায় তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের পরিবর্তে অধ্যাপক হাইনস-এর শান্তিপূর্ণ পড়াশুনার বিনিময় করতে। তিনি দেখেছেন সমস্ত মানুষ এই অরণ্যবলয় গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করছে—বিজ্ঞানী, যৌথখামারের কৃষাণ, কৃষি-বিজ্ঞানী, মন্ত্রী, ট্রাকটর-চালক সবাই। শেবারশিনের বৈজ্ঞানিক কাজের সঙ্গে বন-বপনের কাজের রয়েছে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর পূর্বসূরীরা—দকুচায়েভ, কস্তিয়াশেচভ, তিমিরিয়াজেভ, উইলিয়ামস—তা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠছে। এমন একটা রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে যে-নাকি আজ প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তাকে আক্রমণ করতে সক্ষম। প্রজাতি-ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে উদবর্তনের সংগ্রামের মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সোবিয়েত জীব-বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছে গুচ্ছ-বপনের কাজে। রাতের পর রাত-জাগা ডেস্ক থেকে, পাণ্ডুলিপির পাতা থেকে, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষামূলক গবেষণা ও চিন্তা থেকে রোদে-পোড়া মরুভূমির উড়িয়ে-আনা তপ্ত বালু-হাওয়া সীমাহীন স্তেপ-ভূমির বুকের উপর দিয়ে গড়ে

উঠেছে কোমল ঘাসে-ছাওয়া পথ। আগামী দিনে ঐ স্তেপভূমির কিনারায় গড়ে উঠবে শুকনো বাতাসকে অবরোধ করে সবুজের প্রাচীর। আর ঐ স্তেপভূমি রূপান্তরিত হয়ে উঠবে বিশ্বের শস্যভাণ্ডারে।

এক অবিস্মরণীয় দিনে ওঁর ডাক এলো ক্রেমলিন থেকে। রিপোর্ট লেখার সময়ে কেমন যেন একটু জড়ো-সড়ো হয়ে পড়লেন। কারণ খুবই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করতে হবে তাঁকে। সেই দিনই এক তার-বার্তায় পড়লেন সামরিক জোট সম্পর্কে আমেরিকান পরিকল্পনার কথা। ট্রুম্যান প্রস্তাব করেছে পশ্চিমী দেশগুলোকে অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত করার জন্যে। আর গ্রীস ও তুরস্কে অস্ত্র পাঠাবার জন্যে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা। আর বলেছে, যে-সব দেশ আমেরিকান জীবনযাত্রার ধরণ গ্রহণ করবে না সে-সব দেশ সভ্যতার শত্রু। যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার বীজবোনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে তাঁদের সময় নষ্ট করার অধিকার আছে নাকি কোনো লোকের?—আপন মনেই প্রশ্ন করলে শেবারশিন। আর দারুণ উত্তেজনায় তিনি অসংলগ্নভাবে বলতে শুরু করলেন। স্তালিন বলেছিলেন:

তাড়াতাড়ি করবেন না কমরেড শেবারশিন। এটা খুবই একটা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। আপনার বইটা পড়েছি আমি। গুচ্ছ-প্রণালীতেই ওকের বীজ বোনা উচিত এ-সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

সুতরাং শেবারশিন বলতে লাগলেন ওকের প্রয়োজনীয়তার কথা. কাছাকাছির কয়েক ধরনের গাছ ও ঝোপের উপকারিতার কথা. বালুকাময় জমিতে এক বিশেষ ধরনের পাইন গাছের কথা, বলতে বলতে মাঝে মাঝে প্রশ্নের দ্বারা বাধা পাচ্ছিলেন! শেবারশিন চাইছিলেন স্তালিনকে ভালো করে দেখাতে কিন্তু ব্যাখ্যা করে বলতে গিয়ে সম্পূর্ণই ডুবে গেলেন তার ভিতরে। তারপর স্তালিন মানচিত্রের উপরের আটটা চওড়া দাগের দিকে নির্দেশ করলেন। তাঁর হাতখানা কাম্যাশিন থেকে স্তালিনগ্রাদ, স্তালিনগ্রাদ থেকে চেরকেশক-এ সঞ্চালিত হতে লাগল। শেবারশিনের দৃষ্টি ঐ হাতখানার উপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও অপসারিত হয়নি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঐ কথাটা ওঁর মনের ভিতরে চমক দিয়ে এল যে এটাই হচ্ছে প্রতিরোধের মোর্চা। তারপর স্তালিন বললেন:

যদি উৎসাহের সঙ্গে কাজটা করে যাওয়া যায় তবে পনেরো বছর তো ঢের সময়।

কী শক্তি, কী স্থৈর্য—মনে মনে ভাবলেন শেবারশিন।

এখন তাড়াতাড়ি সভার দিকে যেতে যেতে সে দিনের সেই সন্ধ্যের কথা ভাবছিলেন মনে মনে। শীতকালীন প্রস্তুতির ফলাফলের হিসেবনিকেশ তৈরি করতে হয়েছে তাঁকে। এখানে সেখানে বীজবোনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু একটা বিপদের সম্ভাবনাও আছে এদিক থেকে যে অনেকগুলো এলাকার হয়তো বোনা শুরু হবে খুবই দেরিতে। হাওয়া-বিজ্ঞানীরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলেছেন, এবার বসন্তকাল শুকনো থাকবে। বৃষ্টি হবে সেই জুন মাসে। ঠিক সঠিক মুহূর্তটি যদি না ধরা যায় তবে কচি চারাগুলো শুকিয়ে যেতে পারে।

এখনো নিঝুম হয়নি মস্কো নগরী। প্রথম বসন্তের ছোঁয়ায় পথঘাট চঞ্চল

হয়ে উঠেছে। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর জানালায় জানালায় জ্বলছে আলো। মানুষ কতো বিচিত্র—মনে মনে ভাবলেন শেবারশিন। ঘুমোচ্ছে না। কেউ পড়ছে, কেউ তর্ক করছে, আবার কেউ হাসছে, গাইছে। বৈচিত্র্যময়, জটিলতাময় এই নগরীর বিরাটত্ব অনুভব করলেন শেবারশিন। আর ঐ দূরে শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ মাঠ. বন আর স্তেপভূমি। পাঁচ হাজার তিনশো কিলোমিটার জুড়ে ঐ সবুজ অরণ্যবলয়—এখান থেকে লণ্ডনের চাইতেও বেশি। যে কেউ-ই বিমানে ইর্কুতস্ক বা আশখন্দে উড়ে গেলেই বুঝতে পারে দেশটা কতো বিরাট চোখে দেখে শেষ করা যায় না। এমন একটা দেশে ভুল হতে পারে, দোষত্রুটি হতে পারে কিন্তু নীচতা—অসম্ভব। এ দেশের সমাজব্যবস্থাও মহান। একটা জীবন মোটেই পর্যাপ্ত নয়। কাল কুকসা জিজ্ঞেস করেছিল:

বাবা, তুমিও কি আরো বড়ো হচ্ছো, না তোমার বড়ো হওয়া শেষ হয়ে গেছে?

বিশ বছরের মধ্যে কুকসা চলবে রেড-স্কোয়ারের উপর দিয়ে। তখনো আজকের মতোই থাকবে ঐসব গম্বুজ, সেণ্ট বেসিলস. থাকবে তারা। কিন্তু বন আরো লম্বা আরো উঁচু হয়ে উঠবে।

পনেরো মিনিট পরে তিনি বলছিলেন:

একশো পাঁচ হেকটর জমির বীজ বোনা প্রায় শেষ করে এনেছে ওডেসা ইনস্টিটিউট। রোস্তভকে আরো তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে। সবগুলো এম. টি. এস. বিভাগ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয়।* পেন্জ এলাকা থেকে ওরা ফোন করে জানিয়েছে যে এখনো তারা লইসেঙ্কোর নির্দেশ পায়নি।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, তখনো খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। এখনো ঘুমোয়নি কেন লেলিয়া? রাত দুটো বেজে গেছে।

ঘুম আসছিল না,—বলল লেলিয়া,—পড়ছিলাম। একটু চা গরম করে দেবো তোমাকে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। একান্ত ইচ্ছে হচ্ছে, খানিকটা সময় লেলিয়ার সঙ্গে কাটায়। অপলক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। থেকে থেকে লেলিয়ার চোখেমুখে কখনো ফুটে উঠছে ভ্রূকুটি, কখনো মৃদু হাসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে পারেন শেবারশিন। কিন্তু যেইমাত্র একা হলেন, কিছুতেই আর ওর চেহারা মনে আনতে পারেন না। ওর মুখের ভাব এতো দ্রুত রূপান্তরিত হতে থাকে যে শেবারশিনের মনে হয় যেন ওর অনেকগুলি মুখ। এরই জন্যে বোধহয় কেউ ওর ফটো দেখে চিনতে পারে না। আর তাই কেউ ওকে মনে করে সুন্দরী, কেউ বা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে:

সৌন্দর্যটা কোথায় ওর ভিতরে?

অন্য সবার চাইতে ঢের বেশি দেখেছেন ওকে শেবারশিন। কিন্তু তাঁরও মনে হল তিনি ওকে চেনেন না আর চিনতেও পারবেন না কোনোদিন।

একটা ক্ষীণ হালকা ছায়া ভেসে ওঠে লেলিয়ার মুখের উপরে। শেবারশিনের

---

* মেশিন-ট্রাকটর স্টেশন।

মনে হলো কিসে যেন ওর অন্তর বিচলিত করে তুলেছে।

কেমন আছে কুকসা?

নার্সারির দোরটা আধখানা খুলে দিল লেলিয়া। চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে কুকসা। মাথাটা বালিশের কিনারা থেকে একটু ঝুলে পড়েছে। একখানা পা বেরিয়ে পড়েছে কম্বলের ঢাকার ভিতর থেকে। মুখখানা ওর মায়ের মতো। নীরবে একটু হাসলেন শেবারশিন। লেলিয়ার মুখের আর একখানা প্রতিচ্ছবি।

সত্যি কথাই বললো ওঁকে লেলিয়া: ঘুম আসছিল না ওর। আর ভেবেছিল আলেশার বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হবে না তাই তার ফিরে আসার অপেক্ষায় জেগে বসেছিল। "নভয়ে মির" কাগজটা নিয়ে দুটো গল্প পড়ে ফেলল। কিন্তু ভুলে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর বসল কাজ নিয়ে—সঙ্করজাতীয় উদ্ভিদের তথ্য নকল করতে শুরু করে দিল। কিন্তু হঠাৎ নজর পড়লো প্রাভদা কাগজখানার উপর। গত কালের কাগজ। কাগজখানা ভাঁজ করে তুলে রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল সেনেটর লো-য়ের বক্তৃতার উধৃতির উপরে:

শান্তির প্রতি আমাদের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও এটা খুবই সম্ভব যে সোবিয়েতের বিশাল ভূ-খণ্ডের উপরে আমরা কিছু এ্যাটম বোমা ফেলতে বাধ্য হবো—

কাগজটা রেখে দিয়ে আবার গিয়ে বসল লেলিয়া কাজ নিয়ে। কিন্তু দেখল মন বসানো শক্ত হয়ে উঠেছে। কেন ওরা বলে এমন কথা? এটা বোঝে কি ওরা যে যদি যুদ্ধ শুরু করে তবে সেটা তাদের নিজেদের উপরেই গিয়ে পড়বে? লেলিয়ার মনে পড়ে গেল সে দিনের কথা, উনিশশো বিয়াল্লিশের বসন্তকালে যখন বাধ্য হয়ে ওকে চলে আসতে হয় লেনিনগ্রাদ পরিত্যাগ করে। অধ্যাপক লোবভের কাছে যখন বিদায় নিতে গেল, তাঁর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে টেবিলের কাগজপত্রের সঙ্গে দেখতে পেল ছোট্ট একটুকরো ভিজে রুটি—তাঁর খাদ্যের বরাদ্দ। তার স্ত্রী মারা যান দুমাস আগে। ডেস্কের উপরে রাখা রয়েছে তাঁর ফটোগ্রাফ। অধ্যাপক কিছুতেই রাজী হলেন না স্থান ত্যাগ করতে। বললেন তরুণদেরই রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া কাউকে তো থাকতেই হবে। উনি খুব ভালোভাবেই পারবেন সব কিছুই সহ্য করে থাকতে। তিনি জানতেন যে বেশিদিন আর বাঁচবেন না। তবুও তিনি তাঁর কাজ করে চললেন। এ ধরনের দুঃখ দুর্দশা. দুর্ভোগ, এমন মনোবল এ কখনো কল্পনাও করতে পারে কি লো? যুদ্ধের দিনের স্মৃতি ফিরে এল ওর মনে—সেই উত্তাপবিহীন ঠাণ্ডা ঘর. ক্ষুধার্ত শিশুর দল. সেই "নাগরিকেরা, বেজে উঠেছে বিমান আক্রমনের সতর্ক ধ্বনি!" স্থানত্যাগ ডাকের জন্যে সেই চিন্তাকুল উদগ্রীব অপেক্ষা, কোনোরকমে জোড়াতালি দেয়া সেই পাঁশুটে রঙের খাম—কমাণ্ডিং অফিসারের চিঠি: লেলিয়ার কের্চ-এর যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে।

উবে গেল ওর মনের প্রশান্তি। বাচ্চার ঘরে গিয়ে ঢুকল লেলিয়া। বহুক্ষণ ধরে কুকসার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আলোয় ঘুম ভেঙে গেল কুকসার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো। জোর করে গিয়ে বসলো কাজ নিয়ে যতক্ষণ না ফিরে আসে আলেশা।

ওর অন্তরে জেগে-ওঠা দুর্ভাবনার এতটুকু আভাসও দিল না তাঁর কাছে। শেবারশিন বলতে লাগলেন ওর কাছে সভার কথা। বললেন, বোধহয় তাঁকে রোস্তভ যেতে হতে পারে। বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মুখ-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল:

জানো লেলিয়া, পথে আসতে আসতে কল্পনায় দেখছিলাম কুড়ি বছরের কুকসাকে। আমার কাজ আমার গবেষণার কথা শুনে কেমন অবাক হয়ে যাবে। ও বইতে পড়বে উত্তপ্ত অনুর্বর ভূমির কথা যেমন আমরা পড়েছি প্লেগের কথা।

লেলিয়ার মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল:

হাঁ তাছাড়া আমরা যেমন শুনেছি ছোরা আর পিস্তল হাতে ডাকাতের গল্প ওরাও তেমনি শুনবে এ্যাটমবোমা আর জীবাণু-যুদ্ধের কাহিনী। সময় সময় ভাবি বিজ্ঞান কল্যাণ অকল্যাণ দুই-ই এনেছে মানুষের জীবনে। কিন্তু বর্তমান কালে যেন অকল্যাণের দিকটাই বেশি ভারী।

ওটা বিজ্ঞানের অপরাধ নয়। যে কোনো আবিষ্কারই বদলোকের হাতে গিয়ে পড়তে পারে। গুটেনবার্গ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি গোয়েবেলস্-এর কথা। প্রমিথিউসের কিংবদন্তি খুব ভালো লাগে আমার। ঈশ্বরের কাছ থেকে আগুন চুরি করে এনে দিয়েছিল মর্তের মানুষদের হাতে। শাস্তি হিসেবে তাকে একটা পাহাড়ের গায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল। আর একটা ঈগল ওর পেট ফেড়ে যকৃত ছিঁড়ে ফেলল। ঈগলের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েও প্রমিথিউসই কি ভাবতে পেরেছিল যে হয়তো পাগল এরাটোস্ট্রাটাস ডায়নার মন্দিরে আগুন দেবে, না জেরক্স পুড়িয়ে দেবে এথেন্স নগরী? আমাদের বিজ্ঞানীরা যারা পরমাণু ভাঙার ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরাও মনে করেন ঠিক তেমনি-ই।

আচ্ছা, আলেশা তোমার মনে হয় কি ওরা সাহস করবে?

আমি মনে করি আমেরিকানরা মানুষ ভালো। খুবই পছন্দ করি আমি ওদের। কিন্তু ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রায়ই আমার হাসি পায়। অনেক দিক থেকে ওরা এতো ছেলেমানুষ! ঠিক কুকসার মতো। অবশ্য প্রচুর পচাগলা কুৎসিত জিনিস আছে আমেরিকায়। যেমন ধরো, নিগ্রোদের উপরে ওদের ব্যবহার। কিন্তু সাধারণ মানুষ সৎ, সরল। শিশুদের মতোই ওদের ঠকানো সহজ। আর ওরা ঠকেও থাকে। আমার মনে হয় এটা হচ্ছে বয়সের প্রশ্ন। ওরা আস্তে আস্তে বেড়ে ওঠেনি। সুখ শান্তির আশায় পালিয়ে এসেছে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন দেখতে পেল যে ওরা একটা বিরাট শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। গড়ে তুলেছে ওরা আকাশচুম্বী বাড়ি, উঁচুদরের কৃৎকৌশল, আরামের ব্যবস্থা, যা নাকি ইউরোপ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তৈরি করেছে হিরোশিমা-বোমা কিন্তু একবারও ওদের মনে এ সন্দেহের ছায়াপাতও হয় না যে সংস্কৃতি শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রণ বা আরামকক্ষযুক্ত উড়ো জাহাজ থেকে আলাদা জিনিস। ওখানকার ফল দেখেছি ইউরোপের ফলের চাইতে আকারে অনেক বড়ো, আর দেখতে খুবই লোভনীয়। কিন্তু তার না আছে স্বাদ না আছে গন্ধ।

ও-গুলো পাকে খুবই তাড়াতাড়ি। ওখানকার মানুষের বেলায়ও তাই—বড্ডো তাড়াতাড়ি ওরা পেকে উঠেছে।

তা যদি হয় তবে তো অতি সহজেই ওদেরকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করা সম্ভব।

স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয় তা হবে না। ওদেশে অনেক বুদ্ধিমান সৎ লোকের সঙ্গেও দেখা হয়েছে আমার। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না। যদি তাই হয়, কোন লোক তবে যুদ্ধ চায়? আর তাছাড়া—যুদ্ধ করার চেয়ে যুদ্ধের হুমকি দেয়াটা ঢের সহজ।

এতে তোমার কাজের ক্ষতি হয় না আলেশা?

মানচিত্রের উপরে সঞ্চরণশীল সেই হাতখানার কথা মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা:

গত বছর শরতকালে ক্রেমলিনে যখন আমাদের ডাক পড়েছিল, তখন ফিরে এসে তোমাকে যা যা বলেছিলাম মনে আছে? সেটা ছিল সেই দিন, যেদিন পশ্চিমের প্রত্যেকটি মানুষ বেতার বার্তায় শুনছিল ট্রুম্যানের নিজের মুখে তাঁর নীতির ব্যাখ্যা। ট্রুম্যান বলছিল সামরিক ঘাঁটির কথা, অস্ত্রসজ্জার কথা, বলছিল যুদ্ধের আশঙ্কার কথা। আর আমরা তখন আলোচনা করছিলাম কোন বিশেষ এলাকায় কোন ধরনের গাছ পুঁতলে ঠিক হবে।

তুমি বাইরে চলে যাবার পরে আমি ভাবছিলাম অধ্যাপক লোবভের কথা। তোমার কথায় আবার আমার মনে পড়ল তাঁর কথা। তিনি বলতেন:

পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রতিকূল, কিন্তু তবুও আমি আমার কাজ করে চলেছি। যুদ্ধ একদিন শেষ হয়ে যাবে, আর তখন অরণ্যবলয় গড়ে তোলার প্রশ্নটাই বড়ো হয়ে উঠবে আমাদের সামনে।

ঠিক তাই। ধরে নেয়া যাক যে গোটা ইউরোপ ওদের বাধা দিতে পারলো না, কিংবা পারলো না ওদের নিজের দেশের বুদ্ধিমান মানুষেরা, বা আমাদের শক্তি। আচ্ছা ধরে নেয়া গেল যে ওরা যুদ্ধ বাধালো। কিন্তু আমাদেরই তখন সেটা শেষ করে ফেলতে হবে। আর ঠিক সেই কারণেই কুকসাদের জন্যে আমাদের গড়ে তুলতে হবে অরণ্যবলয়। তুমি বলছিলে লোবভের কথা। তিনি ছিলেন আগের কালের লোক। আমার চাইতে ন'বছরের বড়ো। কিন্তু তরুণ যারা তারাও কি ঠিক তেমনিই নয়? আমার একজন সহকারী ছিল, ঠিক তোমার বয়সী একটি মেয়ে। শরৎকালে আমাদের দরকার পড়লো অরণ্য এলাকার সব চাইতে বিশ্রী একটা জায়গায় লোক পাঠাবার জন্যে। বহু দূরে, পিছনের দিকে, রেল স্টেশন থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে। লোকজনের বসতি খুবই কম। অরণ্য-কেন্দ্রের প্রধান অধিকর্তা একটি আস্তো ভল্লুক বিশেষ। ভেবে দেখো একবার অমন জায়গায় বাস করাটা কেমন ব্যাপার। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার এক দিন এক জলসায়। তুমি তখন কি একটা কাজে বাইরে চলে গেছো। ওরা বাজাচ্ছিল শোস্তাকোভিচের সপ্তম সিনফোনি—মর্মান্তিক একটি ব্যাপার—যুদ্ধ। বিরতির সময়ে আলাপ-আলোচনা হলো আমাদের। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম মেয়েটি উচ্চশিক্ষিতা—গান, কবিতা ভালোবাসে খুবই। তবুও সে শুধু যে যেতেই

রাজী হলো তাই নয়, আমার প্রস্তাব শুনে দারুণভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এখন শোনা যাচ্ছে যে অদ্ভুত কাজ করছে সে সেখানে। একটা বিরাট এলাকা তৈরি করে ফেলেছে। পাশের যৌথ-খামারকেও টেনে এনেছে এ কাজে। এমন সব লোক যদি আমরা না পেতাম তবে এতো বড়ো কাজ আমরা শুরু করতাম কেমন করে? গাছ জন্মানো, বড়ো করে তোলা কঠিন আমি জানি, কিন্তু তার চাইতেও কঠিন মানুষ গড়ে তোলা।

বহুক্ষণ ধরে শেবারশিন বলে চললেন তাঁর বন্ধুদের কথা, যে সব শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কথা। বলতে বলতে হঠাৎ এক সময়ে দেখলেন লেলিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন ওর মুখখানা দেখাচ্ছে যেন কচি শিশুর মতো. ঠিক যেন কুকসার মুখ। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ওর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে। ভয় হচ্ছে পাছে না ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেন। দু'চোখ ভরে দেখতে পাবেন এই আনন্দে অন্তর কানায় কানায় ভরে উঠল। মুহূর্তের জন্যে ও'র অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠল—মনে পড়ল ও'র বয়েস এখন বাহান্ন বছর আর ভুগছেন হৃদরোগে। লেলিয়া জানে না এ কথা। এই হৃদ-রোগের আক্রমণ হয়েছিল ওডেসায়। আর সে সম্পর্কে কোনো কথাই বলেন নি তিনি লেলিয়ার কাছে। দীর্ঘস্থায়ী হলো না ও'র অন্তরে জেগে ওঠা এই ব্যথা। কারণ, বয়েস বা রোগ এ দুটোর কোনোটাকেই তেমন আমল দেন না শেবারশিন। তরুণ বালকের মতোই লেলিয়ার প্রতি তাঁর প্রেম। তাছাড়া তাঁর সঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডারও অফুরন্ত। এখনো দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। খুব ভালোই হয়েছে বসন্তকালীন প্রস্তুতি। কিন্তু তাঁকে যেতে হবে রোস্তভে,—বিমানে। হায়রে অভাগী প্রিয়া, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষুনি আবার উঠে যেতে হবে লেবোরেটারিতে। হাঁটু গেড়ে বসলেন শেবারশিন। বিরাট অবিন্যস্ত ধূসর চুলে ভরা মাথাটা নুইয়ে লেলিয়ার ছোট্ট শীর্ণ হাতের উপরে এতো আস্তে চুমু খেতে লাগলেন যে ও চোখ মেলে তাকালো না. বা চমকেও উঠল না। শুধু ঘুমের ভিতরে ওর ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল একটু ক্ষীণ নীরব হাসি।

চৌত্রিশ

কাউকেই লেখেনি নাতাশা ভাসেঙকার অসুখের কথা, না বাবাকে না ওর স্বামীকে। ভাসেঙকার উপরে অবহেলা হয়েছে বলে নিজেকে ধিক্কার দিল মনে মনে। আলাদা আলাদাভাবে এলাকা ভাগ ভাগ করে দেয়া. যন্ত্রপাতির তদারক করা, বীজ ফুটে চারা গজালো কি না তার খোঁজখবর করা ইত্যাদি কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ওকে। ওদের আস্তানার তিন কিলোমিটার দূরে ছিল একটা পুকুর। গরমের দিনে জল শুকিয়ে যায়। একটা ভাঙা পিপে পড়ে ছিল পুকুরের পারে। অনেক দিন থেকেই এটার উপরে ভাসেঙকার লোভ। এক দিন ডজন খানেক স্কুলের ছেলে জুটিয়ে এসে হাজির হল পুকুর পাড়ে। ওদের বলে এনেছে যে ঘরে তৈরি জাহাজে চড়ে ও পুকুরটা পাড়ি দেবে।

মুহূর্তে দেখল, বরফের মতো ঠান্ডা জলে ওর থুতনি পর্যন্ত ডুবে গেছে। কাঁদলো না, চেঁচামেচি করল না। শুধু পরম নির্বিকারভাবে বলে উঠল:

জাহাজ ডুবি!

বাড়ি ছিল না নাতাশা। মারফা ইগনাতিয়েভনা ওকে পরিয়ে দিল শুকনো জামা-কাপড়। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়ল ভাসেংকা। নাতাশা বকুনি দিতেই বলল:

এমনিই তো হয়ে থাকে সমুদ্রে। রাগ ক'রো না। আমি তো আর ডুবে মরে যাইনি!

ওর সর্বাঙ্গে চর্বি মাখিয়ে মালিশ করে দিল নাতাশা। ওষুধের বড়ি খাওয়ালো। তারপর ঢেকে দিল গরম কাপড়ে। কিন্তু পরদিন দেখেশুনে ডাক্তার জানালো নিউমোনিয়া। হাসপাতালে নিয়ে গেল ভাসেংকাকে।

সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল নাতাশার। তবুও সাহসে বুক বাঁধলো। কারণ, শুরু হয়ে গেছে ওকের বীজ বোনা। তাছাড়া ওর কাজের ভার নেয়ার মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। গোটা শীতকাল ধরে বলে আসছে নিকিতিন: গুচ্ছ-বপন পদ্ধতি হচ্ছে একটা নিছক বাজে ব্যাপার। ওসব কাগজেকলমেই ভালো। একটা চারা আরেকটাকে চেপে মেরে ফেলে দেবে, সেই জন্যেই লাগাতে হবে চারা গাছ।

যা কিছু শিখেছে তার সমস্ত কিছুর নজির টেনে ওকে বুঝাবার চেষ্টা করেছে নাতাশা। কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ওকে উড়িয়ে দিয়েছে নিকিতিন। এমন কি একদিন তো রেগে উঠেই বলে দিল:

বন-গড়া নয়, ফুলের চাষ করুনগে নাতালিয়া দিমিত্রিয়েভনা।

অধ্যাপক শেবারশিনের লেখা স্মরণ রেখে নাতাশা জোর দিয়ে বললো:

খুবই শক্ত হবে। বিভিন্ন রকমের গাছ আলাদা আলাদাভাবে পুঁততেই মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু সায় দেবেন না তাতে।

ওকে সমর্থন করলেন গোরলেঙ্কো—জেলা পার্টি কমিটির সম্পাদক। দু পক্ষের কথা শুনে গজগজ করে উঠলেন। বললেন:

জটিল ব্যাপার।—এ ছাড়া আর একটি কথাও বেরুলো না তাঁর মুখ থেকে।

এক সপ্তাহ বাদে তিনি আবার অরণ্য-কেন্দ্রে এলেন। সমস্ত কর্মীদের জড়ো করে বললেন:

গুচ্ছ-পদ্ধতিতেই বীজ বুনতে হবে সাফ কথা। এককভাবে এখানে গাছ বাঁচবে না।

এতোদিনে তার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। আগের দিন নিকিতিন এসে বললো:

শৃঙ্খলার খাতিরে আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এতে কোনো সুফল লাভ হবে না।

নাতাশা জানে. ও'র উপরে ভরসা করতে পারবে না। ওকে নিজেকেই বীজ-বোনার তদারক করতে হবে। এই ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল নাতাশা যে হাসপাতালে খুব যত্নেই থাকবে ভাসেংকা। কিন্তু তবুও ওর

অন্তর দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। রাত পর্যন্ত কাজ করল। তারপর একটা লরিতে করে পৌঁছাল গিয়ে হাসপাতালে। ভাস্যা কেমন আছে এ কথাটা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করার সাহসটুকু পর্যন্ত নেই ওর। ডাক্তারও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ, তারপর গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বলল:

ওর অবস্থা সংকটজনক। কিন্তু ভয় পাবেন না।

নাতাশার সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। ভালো করে গা-হাত পা ধুয়ে একটা ওভারঅল পরে নিয়ে ঢুকল গিয়ে ওয়ার্ডে। ভাস্যাকে দেখে মনে হল হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন নয় তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। থেকে থেকে চোখ মেলছে, কিন্তু মাকে চিনতে পারছে না। শুধু চাইছে জল খেতে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ওকে নিয়ে রইল নাতাশা। শেষ পর্যন্ত এক মগ দুধ খেয়ে নিয়ে বাড়ি না ফিরেই ছুটে গেল বেজ্যিসিয়েংকায়। যেখানে ওদের কাজ এগিয়ে চলেছিল দ্রুত তালে।

এমনিভাবে কাটলো চার দিন। দিনভর ওকের বীজ বোনে আর রাত জেগে বসে থাকে ভাস্যার পাশে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যেয় যখন এলো, মনে হলো ওকে দেখে খুবই খুশী হয়েছে ভাস্যা। খুবই উৎসাহের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। বলল, ওর দোষ নেই এতটুকুও। পিপেটায় একটা ছেঁদা ছিল আর ঝড়ও উঠেছিল। স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বার বার ডাকলো: 'মামণি'। তারপর আবার প্রলাপ বকতে শুরু করে দিল।

রাষ্ট্রীয় খামার থেকে ত্রিশজন কর্মী দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু পারলো না শেষ পর্যন্ত। দলের নেতা শুরা, যার উপরে বিশেষ করে ভরসা করেছিল নাতাশা, তারও হাত জখম হলো। নিকিতিন বলে, যতোখানি জায়গা নেয়া হয়েছে পরিমাণে তা ঢের বেশি। আশি হেকটার জমি হয়তো আবাদ করা যেতে পারতো, কিন্তু নিয়েছে দুশো আশি হেকটার। এ কাজ শুধু কাগজে-কলমেই সম্ভব। নাতাশা ভরসা দেয় কর্মীদের, তাদের মনে আশা জাগায়, উৎসাহিত করে তোলে। কিন্তু সারাক্ষণের জন্যে নিজের অন্তর শিসের মতো কালো হয়ে থাকে। বহুদিন আগে যখন ওর ধারণা হয়েছিল যে ভাস্যা মারা গেছে যুদ্ধে আর খুদে ভাস্যার সঙ্গে কথা বলতো খুবই কম, তখনও ভাবতে পারেনি ভাস্যার প্রতি ওর স্নেহ এতো গভীর হয়ে উঠবে। ক্রমে ও-ই হয়ে ওঠে ওর জীবনের আশা আনন্দ, বেঁচে থাকার তাৎপর্য। কিন্তু এখন মানুষ হয়ে উঠেছে ভাস্যা। ভাস্যা, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ—আবেগভরা বিশেষ কোমল মুহূর্তে ডাকে ওকে নাতাশা। মানুষ হয়ে উঠেছে ওরই চরিত্র, ওরই ভাবধারা নিয়ে। বড়ো হয়ে উঠেছে মজার গল্প, বা মর্মস্পর্শী গল্পের ভাণ্ডার নিয়ে। ওর বলার ভাবভঙ্গি দেখে কখনো ভারি মজা লাগে নাতাশার, আবার কখনো বা চমকে ওঠে। কী দুর্ভাগ্য! কী ভীষণ দুর্ভাগ্য—যখনই একটু অবসর পায় তখনই মনে মনে ভাবে নাতাশা, এক্ষুনি তো আবার কাজে যেতে হবে।

দেখেছ কোথায় দাগ দিয়েছে? আরে সাতটার কম যেন একটা গর্তে পুঁতো না।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যে নাগাত শেষ হয়ে গেল বীজ বোনার কাজ। সেদিন শনিবার। গোটা রবিবারটা নাতাশা কাটালো হাসপাতালে। ওর মনে হল, গভীর

ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ভাস্যা। বারবার করে ডাক্তারকে ডেকে আনলো ওকে দেখাতে। আর আশাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

একটু ভালো মনে হচ্ছে না এখন ওকে? এমন শান্ত হয়ে ঘুমোয়নি কিন্তু এর আগে। গেল রাত খুবই ছটফট করেছে। ঐ যে, চোখ মেলেছে......

উতলা হবেন না,—প্রত্যুত্তরে গম্ভীর মুখে বলল ডাক্তার,—কাল কিংবা পরশু নাগাত বোঝা যাবে।

রাত্রে চেয়ারের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ল নাতাশা। চোখ মেলতেই দেখল ভাস্যা তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। মৃদু হেসে বলল:

বিছানায় শুয়ে ঘুমোওনি কেন? ঐ দেখো ওখানে একটা খালি বিছানা পড়ে আছে। শুয়ে পড়ো গে যাও।

ডাক্তার স্বভাবতই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর রোগীদের বলে:

ও কিছু না, একটা জোলাপ নিলেই ভালো হয়ে যাবে।—নয় তো ঠিকই জানে যে রোগীর আর আশা নেই। কিন্তু এখন বলল:

আপনি বাড়ি যান, গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে একটু ঘুমোন গে। আপনার ভাসেংকা ভালো হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ নাতাশা ধপ করে টুলের উপরে বসে পড়ল। ওর দু চোখ ছেপে নেমে এল জলের ধারা। ডাক্তার ভ্রূ কোঁচকালো:

শুনুন, আমি বলে দিচ্ছি এক সপ্তাহের ভিতরেই ও আবার ছুটোছুটি করতে শুরু করে দেবে—আবার গিয়ে পড়বে জলে।......শুধু একটু ধৈর্য ধরুন. ব্যস। কিছু একটা স্টিমুলেণ্ট খান।

এক হপ্তা পরে ভাস্যাকে বাড়ি নিয়ে এল নাতাশা।

অধীর উৎকণ্ঠায় দিন গুনতে লাগল ওকের চারা মেলার অপেক্ষায়। ভাস্যা ভালো হয়ে ওঠার পরে ওর এক মাত্র দুশ্চিন্তা এখন ওকের চারা মেলবে কি মেলবে না। নির্কিতিন জোর দিয়ে বলে আসছে যে ওকের বীজগুলো নিরেস জাতের। যদিও ভালো করেই জানে নাতাশা যে তা না, কিন্তু তবুও দুশ্চিন্তা কাটছে না। বীজ বোনা শেষ হয়ে গেছে একুশে এপ্রিল। আর প্রথম চারা ফুটলো নয়ই মে। ভাস্যা ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলে:

মা, একটা ছোট্ট চারা বেরিয়েছে ওকের! কবে ওটা আমার মতো বড়ো হয়ে উঠবে?

খুব শিগগিরই,—হেসে উঠল নাতাশা,—একদিন দেখিস ওটা তোকে ছাড়িয়ে গেছে।

কেন রাগের মাথায় নির্কিতিন একদিন ওকে বলেছিল যে বন তৈরির কাজ না করে ওর উচিত ফুলের চাষ করা? কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে আদৌ পিছপা নয় ও। আগের বছর গোটা গরমকালটা কেটেছে ওর কাঁকরভরা স্তেপভূমিতে হাতে-কলমে কাজ করে। তারপর শরৎকালে ওর স্বামী ভাস্যা এলো মিনস্ক থেকে মস্কো, ওকে দেখে চমকে উঠে বলেছিল ঃ

তুমি পুরোপুরি একটি নিগ্রো মেয়ে হয়ে উঠেছ দেখছি!

কথাটা খুদে ভাস্যার খুবই মনে ধরল। এর পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত

ভাস্যা ওর মাকে ডাকতো নিগ্রো মেয়ে বলে। গোটা শীতকাল ছিল ওর সেই রোদেপোড়া কালচে মূর্তি। এমন কোনো কাজ করেনি নাতাশা যাতে ও নিকিতার বিদ্রূপের পাত্রী হতে পারে। নিকিতারই বরং কতোগুলো বাঁধাধরা ধারণা আছে। ও মনে করে যেমন, মেয়েমানুষের পক্ষে মাঠে কাজ করাটা ঠিক কিন্তু তারা কখনো বন-বিভাগের কর্মী হয়ে উঠতে পারে না।

কুমারী মেয়েরা ভাবে শুধু বিয়ের কথা. কিন্তু—প্রায়ই বলতো নিকিতা—বিবাহিত মেয়েরা তাদের চাইতেও খারাপ। তাদের ভাবনা ছেলেপুলে, ঘরকরনা, এটা ওটা সাত সতেরো নিয়ে। গোড়া থেকেই নাতাশাকে দেখে ওর মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেছে:

মস্কোর মেয়ে ও, ভগবানই জানেন কেন ও পড়তে গেছে আকাদেমিতে, আর তাছাড়া স্বামী রয়েছে ঘরে, বেশ সুখে শান্তিতেই ঘরকন্না করতে পারতো। কিন্তু তা নয়, উনি এলেন কি-না এই পান্ডববর্জিত দেশে! নিকিতিন তার কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল. ভালোও বাসে তার কাজ, কিন্তু তবুও এই অরণ্যকেন্দ্রকে গালাগাল দেয়, অভিসম্পাত করে, আর এ জায়গাটাকে বলে পান্ডববর্জিত দেশ। কিন্তু নতুন কোনো পরিবর্তন অপছন্দ করে।

এ সব কাগজে কলমেই শোভা পায়,—গজগজ করে নিকিতিন,—বয়েস আমার ছেচল্লিশ। অনেক কথাই মনে আছে আমার। দশবার করে বিয়ে করতো না ওরা? করতো. এমন কি গর্বও করতো তা নিয়ে। বলতো বুর্জোয়া নীতিবাদকে ওরা শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু আজ একবার বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করে দেখুক দেখি! টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হবে তোমার, সময় নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে শুনবে উপযুক্ত কারণ নেই। খরগোস প্রজননের কথা বলেছিল না ওরা? আমি নিজেই ভিড়ে পড়েছিলাম ওতে। আর যতোদিনে না হতভাগ্য জীবগুলো সব মরে নিঃশেষ হয়ে গেল ততদিন পর্যন্ত ছিলামও লেগে। কিন্তু আজ খরগোসের কথা নিয়ে কে আবার মাথা ঘামায়? খরগোসের কথা হচ্ছে এখন আলাদা। হাতে বন্দুক নাও, পাতে পড়বে রোস্ট। এখন আবার ওরা আবিষ্কার করেছে, গুচ্ছ-বপন। কিন্তু গাছ তো আর মানুষ না। একটার ঘাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আর একটা বাঁচতে পারে না। ভ্যাখোভার মাথায় ঢুকে বসে আছে এই ধারণা। আর কাঠঠোকরার মতো লেগে পড়ে আছে এই নিয়ে। কিচ্ছু করবার নেই এ সম্পর্কে। এটা হচ্ছে তোমার গে ফ্যা-শা-ন।—চওড়া রক্ত-শূন্য ফ্যাকাশে মুখের উপরে হাত বুলাতে বুলাতে নতুন পরিবর্তনের ফ্যাশানের উপরে অবজ্ঞা প্রকাশের জন্যে জোর দিয়ে টেনে টেনে বলল কথাটা। জানুয়ারি মাসে অরণ্যকেন্দ্রের পাশের যৌথ-চাষীদের নিয়ে এক বক্তৃতা-সভার আয়োজন করল নাতাশা। এতেও নিকিতিনের সংশয়:

বৃথা সময় নষ্ট করছেন নাতালিয়া দিমিত্রোভনা। কিছুই শেখাতে পারবেন না ওদের। কাজের ভার দেয়া হয়েছে আমাদের দলের উপরে। যৌথ-চাষীরা যদি তাদের শস্য দেয় তবেই ওদের পক্ষে যথেষ্ট।

একদিন নিকিতিন এলো নাতাশার ঘরে। অনেকক্ষণ ধরে ওরা ওকের বীজের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করলো। আলোচনা করল 'মাইকোরিজেজ' দিয়ে

মাটি চালাচালির ব্যবস্থা নিয়ে। চলে যাবার সময়ে হঠাৎ নির্কিতিন বলে বসল:

অনেক বই আছে তো আপনার। সবগুলো পড়ার সময় তো পান না। গাড়ি বোঝাই করে এগুলো টেনে আনার দরকার কি ছিল?

কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে আমি তো পালিয়ে যেতে চাই না। তাছাড়া সব রকমের বই-ই আছে—শিল্প-বিজ্ঞানের বইও আছে আবার সাহিত্যও আছে। চান তো নিতে পারেন দু'চারখানা।

টেবিল থেকে নির্কিতিন একখানা বই তুলে নিয়ে খুলল তারপর গলা ছেড়ে পড়তে শুরু করল :

ধূসর আলোক নামে
মরে যায় মৃদু হাওয়া
দেওদার-শাখে কাক
ঘুম-ভাঙানিয়া গাওয়া।

কী এটা?—জিজ্ঞেস করে নিকিতিন।

আলেকজান্দার ব্লকের একটা কবিতা।

নাম শুনি নি কোনো দিন। পড়েছি পুশকিন, নেক্রোসভ, মায়াকোভস্কি, লারমন্তভ—এঁদের কবিতা। কিন্তু ব্লক—নামগন্ধও শুনি নি কোনো দিন। এ সব ভালো লাগে আপনার?

খুব ভালো লাগে।

নীরবে নির্কিতিন শুধু তাঁর মুখের উপরে হাত বুলাতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যেয় বিক্ষুব্ধ নির্কিতিন প্রায় কৃষি-বিজ্ঞানী গরলেঙ্কোর ধৈর্য-চ্যুতি ঘটাবার উপক্রম করে তুলেছিল। একই বাড়িতে থাকতো ওরা দুজনে :

ও কাজ করে ভালোই, এ কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু এ কাজ মেয়ে-ছেলের কাজ নয়—আজ এখানে কাল ওখানে। বলতে পারেন কেন ও ঐ সব আজেবাজে জিনিস পড়ে? এর কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না আমি। শুধুই কতগুলো এলোমেলো কথার তালগোল পাকানো।

আমি তো এতে অন্যায় কিছু দেখতে পাইনে।—প্রত্যুত্তরে বলল গরলেঙ্কো.—ওর স্বামী থাকেন অনেক দূরে। তাছাড়া আপনি নিজেই জানেন এখানকার জীবন কী ধরনের। স্বভাবতই ওরা বিশ্রী লাগে।

এর সঙ্গে স্বামীর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর দিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখুন। ওর কাজকর্ম নিখুঁত—যেখানে যেমনটি হওয়া দরকার তেমনিই কাজ করে যায়। কিন্তু ওর দৃষ্টি......কেমন যেন পরিষ্কার নয়—

নিজেই জানে না নির্কিতিন নাতাশার ভিতরের কোন বস্তুটা ওকে এমন বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ওর প্রতিটি কথার ভিতর দিয়ে যে শান্ত, অনির্বচনীয় গভীর আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে হয়তো সেটাই। নাতাশা বিশ্বাস করে সবাইকে আর ওর ঐ বিশ্বাস সবার অন্তরে জাগিয়ে তোলে ওর প্রতি একটা আপন ভাব। আর নিকিতিন, নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে কেটেছে ওর জীবন। যৌবনে দারিদ্র্যের সঙ্গেও ঘটেছিল পরিচয়। যে মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি যে লোক খারাপ ছিলেন তা নয়, কিন্তু ছিলেন একটু মুখরা, একটু ঝগড়াটে।

ওদের ছেলেটি মারা যায় মেনিনজাইটিসে। গোলমাল হৈচৈ লেগেই থাকতো ওদের বাড়িতে। এতটুকুও শান্তি ছিল না। নিকিতিন সবাইকে অবিশ্বাস করতো। বিশেষ করে মেয়েদের। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন তাদের 'বাচাল', 'ফুলঝুড়ি', 'পুতুল', 'গায়ে-পড়া'। কিন্তু নাতাশা এর কোনো দলেই পড়ে না, তাই সে ওর জন্যে নতুন একটা শ্রেণীর উদ্ভাবন করল : 'দার্শনিকা'। হয়তো ও সঙ্গে করে অতোগুলো বই এনেছে বলেই বা ছেলেবেলা থেকেই ওর অভ্যেস কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করার সময়ে ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে তারই জন্যে, কিংবা এও হতে পারে যে গুচ্ছ-বপনকে নিকিতিন একটা উন্নাসিক আবিষ্কার বলে মনে করে বলেই।

নিকিতিন ভালোবাসে ভাস্যাকে। ওর সম্পর্কে বলে :

দুর্দান্ত দুঃসাহসী, কিন্তু খুবই ভালো ছেলে। এ ধরনের ছেলেদের দু-রকমের পরিণতি হয়ে থাকে : হয় খুবই নামকরা লোক হয়ে ওঠে, নয় তো জেলে যায়।

ভাস্যার অসুখের সময়ে গরলেঙ্কো বলেছিল নিকিতিনের কাছে :

দেখছেন কী খাটুনিটাই না খাটে নাতাশা! তবুও তো সারা রাত জেগে কাটায় হাসপাতালে। মারফা ইগনাতিয়েভনা বলেছে আমার কাছে।

এই প্রথম নিকিতিন একটু সদয় হয়ে উঠল নাতাশার উপরে। ওর ইচ্ছে হল নাতাশাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে ভাস্যা কেমন আছে। কিন্তু তা করতে পারল না। সেদিন সন্ধ্যেয় সে গেল মারফা ইগনাতিয়েভনার কাছে:

কী দুর্ভাবনা! ওর জ্বর কেমন? এই ধরো একটা নেবু। একজন লোক এনেছে মস্কো থেকে—একটু শুকনো। নাতাশা দিমিত্রিয়েভনাকে বলো না যে আমি দিয়েছি। বলো, তুমি এনেছ অন্য কারুর কাছ থেকে।

যদিও নিকিতিন গজগজ করতো যে এই বীজ-বোনায় কোনোই লাভ হবে না, তবুও রোজ ভোরে উঠেই ছুটে যেত বেজিমিয়েংকায় চারা গজিয়েছে কি না দেখতে। নিদারুণ আশা আশংকায় দিন গুনতো। আর একান্ত সঙ্গোপনে কামনা করতো যাতে ভ্যাখোভার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত নিকিতিন খুঁজে বের করল নাতাশাকে:

ওকের চারার জন্যে ততটা উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত ছিল আমার। চারা-গুলো দেখুন! অবশ্য আমি এখনো আমার প্রতিবাদ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি না। দেখতে হবে যে চারাগুলো একটা আর একটাকে না পিষে মারে। কিন্তু গজিয়েছে চমৎকার। এইমাত্র আমি সিনিৎসিনার দিকটা পরীক্ষা করে দেখে এলাম। শত-কড়া ছেআশি ভাগ। সুতরাং এখন আমরা আমাদের অভিনন্দিত করতে পারি নাতালিয়া দিমিত্রিয়েভনা।

'আমাদের' না বলে ও বলতে চেয়েছিল 'আপনাকে' কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না।

একান্ত আন্তরিকভাবে নাতাশা ওর করমর্দন করল।

আলেজান্দার ঈগোরোভিচ, আমি জানি এই ওকের চারা সম্পর্কে কী উদ্বেগেই না দিন কেটেছে আপনার। সত্যি চারাগুলো গজিয়েছে চমৎকার! এখন অন্তত

দিন দুই আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। বড্ডো ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।

হাত দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ল নির্কিতিন:

ভাগ্যিস নেবুর কথা কিছু বলেনি!

মানুষকে বুঝে ওঠা কেন এতো কঠিন?—অবাক হয়ে ভাবতে লাগল নাতাশা। কতোবারই না নির্কিতি ওকে প্রায় হতাশার কিনারায় এনে পেঁছে দিয়েছিল! এই তো ভাস্যার অসুখের মাত্র দিন কয়েক আগে সবার সামনে ওকে আর একটু হলে প্রায় কাঁদিয়েই ফেলেছিল এই বলে যে:

ওকের এই বীজগুলো খুবই হালকা। বোধহয় পাকার আগেই এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। শরৎকালের বোনার জন্যে ওদের বীজ সংগ্রহ করা উচিত ছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। কিন্তু এখন ওগুলোতে চারা মেলবে না। নাতাশা দিমিত্রিয়েভনার ঘুমন্ত তন্ত্রীতে যদি দাঁড়কাকের মতো ঠুকরে দিয়ে থাকি তো মাপ করবেন।—শুধু নাতাশাই বুঝতে পারল ওর শেষ কথাটার মানে। নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসংযম করে প্রমাণ করতে লেগে গেল যে ওকের বীজগুলো স্বাভাবিক অবস্থায়ই আছে আর শীত সহ্য করার মতো উপযুক্ত সময়েই আহরণ করা হয়েছে।

কেন উনি আমাকে ঘৃণা করেন?—সেদিন রাত্রে নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করে নাতাশা।—কী করেছি আমি ওঁর? আর আজ কি না উনি এলেন আমাকে অভিনন্দন জানাতে। বাবা বলতেন, আপন পড়শীকে চেনার চাইতে আমেরিকা আবিষ্কার করা ঢের সহজ।

মনে পড়ে নাতাশার, ওকে ঘিরে কতোই না অবিশ্বাস অনুভব করতো সে মনে মনে। লোকে বলতো, সমস্ত পরিকল্পনাটাই বাজে। বন-গড়ন খুবই দরকার। কিন্তু সেটা এখানে নয়। কারণ ফরমান বা হুকুমনামা কোনো কিছু দিয়েই মাটির উর্বরা শক্তির পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এখানে গাছ জন্মাবে এটা আশা করা যায় কি করে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওকে বোঝাতে হয়েছে ব্যাখ্যা করে। মনে মনে অনুভব করেছে যে ওরা শুনছে বিদ্রূপের মনোভাব নিয়ে। আর আজ কি না সেই সব লোকই গরমের দিনে চারাগুলো বাঁচবে কি বাঁচবে না, সেই চিন্তায় উদ্‌বিগ্ন। পরম স্নেহে দরদের সঙ্গে বলছে—'আমাদের কচি ওক চারা'।

"লাল আলো" যৌথ-খামারের লোকজনের ঘোরতর আপত্তি ছিল গ্রীষ্মকালীন গমের সঙ্গে ওকের বীজ বোনার। ওরা বলেছিল:

যেখানে গাছ থাকে সেখানে গমের ফলন হয় না। এমন কি আলুর বীজ পর্যন্ত চেপে মেরে দেবে।

বহুবার নাতাশা গিয়ে দেখে এসেছে খামারটা। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পাথুরে স্তেপ-ভূমিতে অরণ্যবলয়ের সঙ্গে এক করে বোনা গমের চাষের আলোক-চিত্র। যৌথ-খামারের চেয়ারম্যান একজন ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট। মিটমিটে ধূর্ত চোখে তাকিয়ে থাকত ওর মুখের দিকে, কোনো প্রতিবাদ করত না ওর কথায় বরং ওর কথার ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠত: "বটেই তো"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বলে আলোচনায় ছেদ টেনে দিত:

চেষ্টা করে দেখুন গে আপনার নিজের এলাকায় নাতালিয়া দিমিত্রিয়েভনা। জনসাধারণ তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবে। আমি তো খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি, কিন্তু ওরা সবাই যে এর বিপক্ষে—

হাল ছেড়ে দিতে রাজী নয় নাতাশা। একটা গোটা বছর কি করে বৃথা নষ্ট হতে দেয়া যায়? তখন গরবাশেভকে বলল একটা সাধারণ সভা ডাকতে। সভায় দারুণ আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা করল নাতাশা। খানিকটা অসংলগ্ন কথাও বলল। ওর বক্তৃতা শেষ হতেই আনিসেমোভা নামে কড়া রাশভারি এক মহিলা উঠলেন বক্তৃতা করতে। সারাতভের এক সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারকে ডেকে বলল:

আমার স্বামীর পাশে আমার ফটো নিন। লোকে দেখুক আমার বুকে আঁটা আছে সম্মানের প্রতীক চিহ্ন কিন্তু ঐ অপদার্থটার নেই।

নাতাশার মনটা দমে গেল। ও যদি বিরোধিতা করে তবে সমস্ত আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যাবে।

মেয়েটি বলছে ভালো হবে,—বলল আনিসেমোভা,—একবার চেষ্টা করে দেখি না কেন আমরা? গেল বছর সব কিছু তো জ্বলেপুড়ে গেল। তার চাইতে তো আর বেশি খারাপ কিছু হবে না। মেয়েটি বলছে সে নিজের চোখে দেখেছে। শুধু মুখের কথার উপদেশের চাইতে সেটা একটু আলাদা।

এটা ঘটেছিল শীতকালে। কিন্তু এখন নাতাশার আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। এ কথা সত্যি যে কচি চারাগাছের বিপদ অনেক—যেমন স্তেপের ঘাসের জড়িয়ে ধরা শিকড়, রোগ, গ্রীষ্মের শুকনো খড়খড়ে ভয়ঙ্কর উত্তাপ। কিন্তু অনুভব করছে নাতাশা যে সব চাইতে প্রবল বাধাই অপসারিত হয়েছে। খুশী মনে ভাবল:

কাজ শুরু করার দিক থেকে মানুষের অনিচ্ছার তুলনায় 'সার্সলিক' বা ময়দার মতো শিশিরের বাধা আর কতটুকু?

মনের আনন্দে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল নাতাশা। আকাশের বুক বেয়ে ভেসে চলা ছোট্ট একখানি মেঘের গতিশীলতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বা ঘাসের প্রথম মেলা পাতার দিকে তাকিয়ে এই বন্ধ্যা স্তেপ-ভূমিকেও ওর মনে হয় অপূর্ব। অদ্ভুত সুন্দর এখানকার বসন্ত। ঠিক এই সময়টিতেই ভাস্যা আসতে পারল না। হায় রে। লিখেছে শীতের পরে নির্মাণ কাজ চলেছে জোর কদমে।

ভাসেঙ্কার বয়েস আট বছর। কিন্তু এখনো নাতাশা আর ভাস্যা যেন প্রেমিক-প্রেমিকা। তেমনি অফুরন্ত কথা বলা, তেমনি অফুরন্ত চুমু খাওয়া—কিছুতেই যেন আর ওদের আশ মেটে না। একদিন নাতাশা হিসেব করে দেখল কতো দিন ওরা এক সঙ্গে থেকেছে। ভাস্যার যুদ্ধোত্তর কালের ছুটি, মিনস্কে যাবার আগে মস্কোতে, সাতচল্লিশ সালে নাতাশার মিনস্কে যাওয়া, আর গেল বছর শরৎকালে—সব মিলিয়ে মোট সাড়ে পাঁচ মাস। এখনও সময় পেয়ে ওঠে নি নাতাশা স্বামীর দিক থেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে ওঠার। তবুও নাতাশা ওকে ভালোবাসে নিবিড়ভাবে, উষ্ণ হৃদয়ের সবটুকু প্রেম ঢেলে দিয়ে। যদিও সে ভালোবাসা একটু লাজুক একটু সংস্কার-ভীরু, পাছে হঠাৎ একদিন ভাস্যা

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ওর জীবন থেকে। রাত্রে নাতাশা কথা বলে ওর ছায়ার সঙ্গে, আর দিনের বেলা অর্থহীন কথার মালা গেঁথে লেখে ছোট্ট চিঠি। শেষবার যখন ওদের দেখা হল, অবাক হয়ে গেল নাতাশা ভাস্যার ভিতরের পরিবর্তন দেখে। স্বভাবতই যে মানুষটা ছিল শান্ত, ধীর, চালচলনে সে হয়ে উঠেছে চঞ্চল চটপটে। ভাস্যার মা নিনা গেওর্গিয়েভনাও লক্ষ্য করলেন ওর এই পরিবর্তন।

ভাস্যার বয়েস এখন সাঁইত্রিশ বছর—বললেন মা নাতাশার কাছে,—স্বভাবতই এ বয়সে মানুষের ভিতরে কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু এক এক সময়ে আমি যেন ওকে চিনতে পারি না। জানো, ধীরে ধীরে ও ঠিক সের্গেইর মতো হয়ে উঠছে।

কী ভাব এসেছে ভাস্যার মনে তা বুঝে উঠতে না উঠতেই সেই পনেরোটা দিন যেন ডানা মেলে উড়ে চলে গেল। শুধু এইটুকু বুঝতে পারল নাতাশা যে ভাস্যা ওকে আরো নিবিড় আরো গভীরভাবে ভালোবাসছে। তাই ট্রেনের ভিতরে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়ে গেল যে ছেলেমানুষের মতো নাতাশা করিডোরের জানালার ঘোলাটে কাচের উপরে আনমনে লিখে চলেছে,—"ভাস্যা, ভাস্যা"। যেন আবার সে ছুটে চলছে তার প্রিয়-মিলনে।

মে মাসের এক গরম দিনে বক্তা নেদোর্কানিভ এলেন অরণ্যকেন্দ্রে। বহুবার গরলেঙ্কো সারাতভে খবর পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর উপরে বলার জন্যে একজন বক্তা পাঠাতে। তাই নেদোর্কানিভের আসাটা একটা বিশেষ ঘটনা। সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হল সবাই। এমন কি ভাস্যা পর্যন্ত শান্ত। সবাই মিলে চা খেল নাতাশার ঘরে। সামোভার আর টেবিলে-রাখা কেকটার দিকে তাকিয়ে গজগজ করে উঠল নিকিতিন:

ভদকা কৈ ?

ধন্যবাদ—বিনীত হাসি হাসলেন বক্তা,—আমি পান করি না। হয়তো বক্তৃতার পরে—

মারফা ইগনাতিয়েভনা তো দারুণ অভিভূত হয়ে পড়ল যখন শুনল যে বক্তা হচ্ছেন "রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের নিখিল ইউনিয়ান সমিতি"র সভ্য। নাতাশার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো মারফা:

দূর থেকে এসেছেন, বোধহয় ওঁর একটু বিশ্রামের দরকার। আমি বিছানা করছি ওঁর জন্যে।

আমরা যে কি খুশীই না হয়েছি তা ভাবতেও পারবেন না।—অতিথিকে বলল নাতাশা,—শুধু খবরেরকাগজে চোখ বুলানো ছাড়া আর কোনো কিছুই তো আমাদের জানবার উপায় নেই। এমন কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে এতো দিন যে সব কিছু থেকেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। দুনিয়ার কোথায় কি যে ঘটছে না ঘটছে, কিছুই জানি না। পরে শুনবো সব আপনার কাছ থেকে। ঠিকই বলেছে মারফা, বক্তৃতার আগে একটু বিশ্রাম করে নিন।

কুশলী বক্তা হিসেবে সুনাম আছে নেদোর্কানিভের। তিনি কখনো কথার তোড়ে ভেসে যান না, বা কল্পনার অবাধ প্রশ্রয়ও দেন না। কখনো বা দীর্ঘ কথায় কখনো বা ভাবব্যাঞ্জক বিরতির ভিতর দিয়ে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি

করেন যে যতটা তিনি বলেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি তিনি জানেন; না-বলাটা তাঁর সংযমেরই পরিচায়ক।

ষাট এমন কি আশী কিলোমিটার দূর দূর থেকে যৌথ খামারের চাষীরা এসে সমবেত হলো। তাছাড়া অরণ্যকেন্দ্রের কর্মীদের তো কথাই নেই। মা যখন বললেন যে ভাস্যা যাবে না, বাড়িতেই থাকবে, সে তো ক্ষেপেই উঠল। কিন্তু একটু পরেই ঠাণ্ডা হলো। মেতে উঠল জাহাজের ছবি আঁকা নিয়ে—অবশ্য প্রবল ঝড়ের ভিতরে জাহাজের ছবি।

নেদোকনিভ বললেন বৈদেশিক মন্ত্রীদের পারী-সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গির উপরে, আটল্যাণ্টিক চুক্তির সংশোধনের জন্য ফরাসী জনগণের সংগ্রামের কথা, বললেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনের কী দারুণ প্রভাব পড়েছে দেশে দেশে তারই সম্পর্কে:

অবশ্য, কড়া নজর রাখতে হবে আমাদের। আমেরিকার যুদ্ধবাজেরা এখনো পরাজিত হয় নি। ওরা আর একটা বীভৎস যুদ্ধের মতলব ভাঁজছে নতুন করে। নিউইয়র্কের একটা নামকরা কাগজ লিখেছে যে আমেরিকার ব্যবসায়ী মহল শান্তি আন্দোলনকে ভয় পায়। অন্যান্য কাগজও এই একই সুরে ধুয়ো তুলেছে। যেমন ফিলাডেলফিয়ার এক কাগজে লিখেছে:

কোনো কোনো অবস্থায় দেখা যায় যে যুদ্ধই হচ্ছে একমাত্র পথ।

সোবিয়েত ইউনিয়ানের শান্তির আকাঙ্ক্ষা আর তারই উপরে দুনিয়ার মেহনতী মানুষের আকুল কামনার কথার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর শুরু হল প্রশ্নের পালা, প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলল ওকে:

আমেরিকায় কি অনেক শান্তি-সৈনিক আছে? চীনে কী হচ্ছে? গ্রীসের বর্তমান অবস্থা কী? পল রোবসন এখন কোথায়? ফরাসী শ্রমিকদের জীবন-যাত্রা কী ধরনের? পুঙখানুপুঙখ জবাব দিলেন নেদোকনিভ। কিন্তু থেকে থেকে বারবার তাকাচ্ছিলেন ঘড়ির দিকে। দেখা গেল রাত্রের খাওয়ার সময় নেই। অবশেষে সভাপতি পরলেঙ্কো বললেন:

বক্তাকে আমরা আর কষ্ট দিতে চাই না। আমি প্রস্তাব করছি, কমরেড নেদোকনিভকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।

দারুণ সোরগোল ও করতালির ভিতর দিয়ে সমবেত জনতা প্রস্তাবটি সমর্থন করল।

কিন্তু এখন,—বলল নিকিতিন—আমি আপনাকে একবারটি আমাদের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

দুঃখিত, পারবো না—বলল নেদোকনিভ—এক্ষুনি আমাকে রওনা দিতে হবে, নইলে ট্রেন ধরতে পারবো না।

আর অনুরোধ উপরোধ করে লাভ নেই। নিকিতিন চায়ের গ্লাশে খানিকটা ভদকা ঢেলে গরলেঙ্কোকে বলল:

খুবই দুঃখের কথা যে উনি থাকতে পারলেন না। নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছুই জানেন যা প্রকাশ্য সভায় বলা যায় না। বিবেক-বিবেচনা............আচ্ছা স্তেপান আলেক্‌সিয়েভিচ, আসুন আমরা শান্তির কামনায় একটু পান করি।

ঢের যুদ্ধ করেছি আমরা। আমেরিকানদের যদি সখ হয়ে থাকে তবে ওরা

নিজেরা নিজেরাই লড়ুক। হৈচৈ করবার মতো খোরাক তা থেকেই তাদের মিলবে অথচ অন্যরাও থাকতে পারবে শান্তিতে।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল না নাতাশা। চুপ করে পড়ে থেকে ভাবতে লাগল যুদ্ধের কথা। সত্যই কি আবার যুদ্ধ বাধবে? ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল জ্বলন্ত মিনস্ক শহরের ছবি, রাস্তায় রাস্তায় পলায়মান নরনারীর ভিড়, শহর পরিত্যাগ, হাসপাতাল। আবার অমনি অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটানো অসম্ভব। "যুদ্ধ—সবচাইতে ভালো উপায়!" নিশ্চয়ই আমেরিকার ওরা সব পাগল হয়ে গেছে। আমাদের পরাজিত করা অসম্ভব। সবাই জানে এ-কথা। সব চাইতে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে মানুষ আবার নিদারুণ দুর্ভোগে যন্ত্রণায় ভুগবে। শান্তি—আঃ কী সুখের! ওকের বীজ লাগানো......। স্বামীর কথা মনে পড়ল ওর। তিন তিনটা বছর ধরে জানতেই পারেনি যে সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। গরিলা-জীবনের দিনগুলোর কথা বিশেষ কিছু বলে না ভাস্যা। কিন্তু নাতাশা জানে সে-দিনগুলো ছিল খুবই ভয়ংকর। ভাস্যা বলেছিল ওকে যে ওদের দলে একটি মেয়ে ছিল তার নামও নাতাশা। সে ভালোবাসতো আভানেসিয়ানকে। ওরা দুজনই মারা যায়। ছোট্ট ভাস্যাকেও আবার ঐ রকমের দুর্দিনের মুখ দেখতে হবে তা-ও কি সম্ভব?

নাতাশা উঠে পড়ল। তারপর ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরম প্রশান্তিতে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট ভাস্যা। ঠোঁট দুটো একটু মেলা। তাতে মুখের উপরে ফুটে উঠেছে একটু রাগ-রাগ ভাব। ঠিক ওর দাদামশাইয়ের মতো—মৃদু হেসে ভাবল নাতাশা। আবার ফিরে এল নিজের বিছানায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পরে হাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল নাতাশার। দীর্ঘ আট মাস কাল আছে ও এখানে, কিন্তু এর মধ্যে এমন হাওয়া উঠতে দেখেনি কোনো দিনও। মনে হচ্ছে বুঝি বা ঘরদোর সব উপড়ে ফেলে দেবে। নাতাশার বুকের ভিতরে ধুকপুক করতে শুরু করে দিল। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে, কিন্তু কেন, তা জানে না। বক্তার কথাগুলো স্মরণ করে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিল নাতাশা:

লজ্জা করে না তোমার, নিজের সম্পর্কে এমনিভাবে হাল ছেড়ে দিতে?

ঘুম ভাঙল ভাস্যার। ওকে খাবার খাওয়ালো। তারপর ঠিক করল অন্য দিনের চাইতে একটু আগে আগেই যাবে বাগানে। দোর খুলল নাতাশা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভেজিয়ে দিল। হাওয়ার ঝাপটায় ওর সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে গেল। ওকে পরে নিতে হলো মস্কো থেকে-আনা বড়ো গগলসটা। ভাস্যা চেঁচিয়ে উঠল:

মা ঐ চশমাটা পরে তোমাকে ঠিক দাদামশাইয়ের মতো দেখাচ্ছে!

হাওয়ার বেগ কমলো না। মনে হচ্ছে যেন জমির উপরের সবটুকু মাটি উপরে ফেলে দিয়ে ভিতরের কঠিন ঊষর রূপটাকে অনাবৃত করে ফেলতে চেষ্টা করছে। বেজিমিয়ানস্কার পথে যেতে দেখা হয়ে গেল চোরিভাতিখের সঙ্গে। লোকটির মুখে কথা নেই। গম্ভীর বিষাদভরা মুখ। আর সারা মুখময় হলদে-ছাটের ধূসর লোমে ভরা। ওকে দেখে মনে হয় বুঝি বা বনেরই অধিবাসী।

অবশ্য বহু বছর পর্যন্ত ও করে এসেছে বন-রক্ষকের কাজ। যুদ্ধের পর জামাইয়ের অনুরোধে এসেছে এখানে। লোকটি গাছ সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ। তাই নাতাশা প্রায়ই যেত ওর কাছে পরামর্শ নিতে।

শুনুন, চারাগুলো থাকবে তো টিকে?—জিজ্ঞেস করল নাতাশা।

ওর জন্যে আমার এতটুকুও চিন্তা নেই। অঙ্কুর গজাবার পরেই ওগুলো বোনা হয়েছে। সুতরাং শিকড় শক্ত হয়েছে। ঠিকই টিকে থাকবে।.........কিন্তু কী বিশ্রী হাওয়া!

এমন শান্ত গম্ভীর সুরে বলল চেরিভাতিখ যে সংগে সংগেই নাতাশার বুক-খানা হালকা হয়ে গেল। দুজনে মিলে চারাগুলোর তদারক করে ফিরতে লাগল।

ঠাকুর্দা,—জিজ্ঞেস করল নাতাশা.—আপনার বয়েস কতো?—এখানে সবাই চেরিভাতিখকে ডাকে ঠাকুর্দা বলে।

আটষট্টি বছর।—মৃদু হেসে জবাব দিল চেরিভাতিখ।—আমি তো অবসর নিতে যাচ্ছিলাম। তখন শুনলাম বন গড়া হচ্ছে। মনে মনে ভাবলাম তা-ই যদি হয় তবে আর একটা বছর করাই যাক কাজ, যদ্দিনে ওকের চারাগুলো না বেড়ে ওঠে। চমৎকার গাছ! বিশ বছর পরে যখন তুমি এখানে আসবে, চিনতেই পারবে না জায়গাটা। ওক গাছ প্রথমটায় খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে না। শক্তি সঞ্চয় করে নেয়। তারপর দারুণভাবে বাড়তে থাকে।

ওর হাসি-হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল নাতাশা এই ভেবে যে কেমন করে সে নিজে এতোটা ঘাবড়ে গিয়েছিল? এটা ভীরুতা। ঐ বৃদ্ধ লোকটি বললেন, বিশ বছর পরে—। তার মানে, উনি বেঁচে থাকবেন কি না থাকবেন তাতে কিছু এসে যায় না ওঁর। থাকবে জমি, থাকবে বন, আর থাকবে মানুষ। যে কেউ-ই যদি একটু গভীরভাবে ভাবে তো দেখবে যে মৃত্যু নেই——অন্যেরা বেঁচে রয়েছে। যে-কাজ তুমি শুরু করেছিলে সে-কাজ তারা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটাই কি আনন্দ নয়?

সেই রাত্রে ভাস্যাকে লিখল নাতাশা:

প্রিয় আমার,

আমার সব খবরই ভালো। ভাস্কা ঠিক তেমনিই দুষ্টুমিতে ভরপুর। ওকের চারাগুলো বাড়ছে। বইতে শুরু করেছে শুকনো ঝ'ড়ো বাতাস। স্থানীয় লোকেরা বলছে, এবার হাওয়া বইতে শুরু করেছে একটু দেরিতেই। কাল এখানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর একটা বক্তৃতা হলো। আচ্ছা ভাস্যা, বল তো কেন ওরা বোঝে না যে মানুষকে ধ্বংস করা যায় না? কিন্তু, নিশ্চয়ই হয় তো ওখানে এমন অনেক বুদ্ধিমান মানুষ আছেন যাঁরা ওদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারবেন। আমি সব সময়েই ভাবি তোমার কথা। কোনো রকমেই আমি তোমাকে আমার সব কিছু কথা বলতে পারিনি। বলবো এক দিন, আর যদি না পারি তবুও তুমি জানতে পারবে সব কিছুই। এখন শুতে যাচ্ছি। ঝ'ড়ো হাওয়ার উৎপাতে কাল ভালো ঘুমোতে পারিনি।

আজ আসি প্রিয়তম।

পঁয়ত্রিশ

চলে যাবে যাবে এমন সময়ে মিনাইয়েভ যে বারোয়ারি বাড়িটায় তার বৌ ওলেয়া আর মা মিখাইলোভনাকে নিয়ে থাকে সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। অবশ্য এ-রকমের দুর্ঘটনা হামেসাই ঘটে থাকে এখানে: রান্নাঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। মারিয়া মিখাইলোভনা দায়ী করল বাড়ির ম্যানেজারকে:

ওর দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারবে মিতেংকা যে লোকটা একটা পাজি।

সাধারণত বাড়ির ম্যানেজারেরা মোটেই তাকিয়ে দেখার মতো হয় না,—মাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বলল মিনাইয়েভ,—বরং তার চাইতে আকাশের তারা বা ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকা ঢের ভালো। রাগ করো কেন? যুদ্ধের আগে এ-বাড়ির ম্যানেজার ছিল অন্য একজন। কিন্তু এমনি-ই জল পড়তো ছাদ থেকে। তখন আমি বলতাম এটা বাড়ি নয়, নোয়ার নৌকো। একবার ভেবে দেখো মামুল্যা, ইতিমধ্যে ঘটে গেল কতো কি—জার্মানরা এসে হানা দিল ভলগায়, এল্‌ব্‌ পর্যন্ত পেছু হটে গেলাম আমরা, মিতিয়া মিনাইয়েভ বিয়ে করার সময় পেল, আইন নিয়ে পড়াশোনা করল. কিন্তু ছাদ থেকে যেমন জল পড়তো, আজও ঠিক তেমনিই পড়ছে। এর জন্যে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। আমাদের নৌকোটা অনন্ত আয়ুর দাবি রাখে।

পঁচিশ বছরের ওপর এই ফ্লাটটায় আছেন মারিয়া মিখেইলোভনা। প্রথম যখন এলেন এ বাড়িতে, মিতেংকা তখন এতটুকুন; টেবিলের তলায় পড়ে থাকে ওর মাথাটা। প্রায়ই ভাবতেন মারিয়া এই ফ্লাটের বাসিন্দাদের পরিণতির কথা। শুনেছেন, বিপ্লবের আগে এই ঘরে থাকতো একটি নিঃসন্তান পরিবার—আইনজীবী লাদিজিন আর তার স্ত্রী। উনিশশো উনিশ সালে তাদের সঙ্গে এসে বাস করতে লাগল পিক্রসোভ ভাড়াটে হিসেবে। বেশ ফিটফাট জমকালো পড়ার ঘরটায় ওরা বসিয়ে নিল একটা লোহার উনুন। তাতে ভাজতো আলুর পিঠে। নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতো লাদিজিন। দু বছর পরে লিথুনিয়ার নাগরিকত্ব নিয়ে বৌকে নিয়ে চলে গেল পারীতে। এলো মিনাইয়েভ আর কাৎজমানস্‌ পরিবারেরা। পিক্রসোভ মারা গেল আর তার পরিবার-পরিজনেরা চলে গেল তাদের নিজের দেশে—সেবাস্তোপোলে। তারপরে এলো কোভালেংকভ পরিবার—নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের। আর এলো পার্শিন। এসেই বিয়ে করলো। ছেলেপুলেও হলো। কোভালেংকভেরও ছিল দুটি বাচ্চা। মারা গেলেন মিনাইয়েভের বাবা। তারপর মরলো কোভালেংকভ। কোভালেংকভের স্ত্রী আইরিনা পেত্রোভনার কাছ থেকে একটা ঘর নিয়ে দেয়া হলো শুরোচ্‌কাকে। সেও বিয়ে করলো তারপরে। যুদ্ধ বাধার মুখে পাঁচটি পরিবারের চৌদ্দটি প্রাণী বাস করতো এই ফ্লাটে।

উনিশশো বিয়াল্লিশের বসন্তকালে সুখিনিচিতে যুদ্ধে মারা যায় গ্রিশা কাৎজমান। যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুদিন আগে প্রাগের কাছাকাছি মারা যায় পার্শিন। বুড়ো কাৎজমান মারা যায় গত বসন্তে। ওর মরার ক'দিন আগে বলেছিল মারিয়া মিখাইলোভনার কাছে:

কেন ওরা গ্রিশাকে মেরে ফেলল? আমাকে মারলেই তো পারতো। আমার দিন তো ফুরিয়েই গেছে। আর গ্রিশার কতোই না আকাঙ্খা ছিল বেঁচে থাকার! ও প্রেমে পড়েছিল যুদ্ধের আগে। মরার পরে আমি মেয়েটির চিঠিখানা দেখলাম। কাঁচা বয়সের ছেলেদের কেন মারে? বুড়োদের পক্ষে সে যে কী মর্মান্তিক কঠিন!

তখন অসুখে ভুগছিল বুড়ো কাৎজমান। আর বেশি দিন বাঁচবে না জেনে মারিয়া মিখেইলোভনাকে ডেকে বললো, ওর স্ত্রীকে যেন একটু দেখা-শোনা করে; দুনিয়ায় বেচারীর কেউ নেই, একা। একটা বোন ছিল কিয়েভে, সে-ও মরে গেছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর এলেনা আলেকজান্দ্রোভনা পার্শিনা এমন রোগা হয়ে গেল, এমন বুড়িয়ে গেল যে, তাকে আর চেনার জো নেই। কাজ করতে লাগলো রাসায়নিক গবেষণাগারে আর সেখান থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরত দেরিতে—সন্ধ্যের পরে। ওর আট বছরের ছেলে সাশাকে খেতে দিতো মারিয়া মিখেইলোভনা। পার্শিনার বড়ো মেয়ে লেলিয়া জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ইনস্টিটিউটের ছাত্রী। একদিন রাত্রে একটা ঢ্যাঙা বিশ্রী চেহারার ছোকরাকে বাড়ি নিয়ে এল সঙ্গে করে। আর এসে মাকে বলল:

মিখেইল কনস্তানতিনোভিচ দোলগভের সঙ্গে আলাপ করো। আমি ওকে বিয়ে করছি।

পার্শিনা কেঁদে ফেলল। তারপর মেয়েকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ছোকরা কী করে, ওর বয়েস কতো। কেননা ওকে দেখে বছর আঠারোর বেশি মনে হয় না। লেলিয়া বললো যে ও সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্রের ছাত্র। দারুণ প্রতিভাবান ছেলে। কালে কালে "সিমনভকে পর্যন্ত ম্লান করে দেবে" দেখো। ওর বয়েস এখন তেইশ বছর।

চোখের জল মুছে পার্শিনা লাদিজিনের খাওয়ার ঘরে পর্দা খাটাতে লেগে গেল। কারণ, লেলিয়া বলেছে যে ওদের ইচ্ছে মায়ের সঙ্গেই থাকে। শিগগিরই কাতিয়াও প্রেমে পড়বে। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মনে মনে গুমরে ফিরতে লাগলো পার্শিনা। ক্লাশ নাইনে পড়ে কাতিয়া।

যুদ্ধের গ্রাস থেকে রক্ষা পেল কোভালেঙ্কোর পরিবার। নাবিকের কাজ করে ভাস্যা। যুদ্ধে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে আসে অক্ষত দেহে। কিন্তু বাড়িতে বেশি দিন থাকলো না। সমুদ্র ডাক দিল ওকে হাতছানি দিয়ে। ও ফিরে গেল তালিন-এ। যুদ্ধের সময়ে বিয়ে করেছিল নাতাশা। সে চলে গেল ক্রাসনোদারে তার স্বামীর কাছে। ছেচল্লিশ সালে হঠাৎ একদিন সে ফিরে এল একটি বাচ্চা কোলে নিয়ে। আর কোভালেঙ্কোভের ঘর থেকে ভেসে এলো শিশুর কান্নার সঙ্গে মিশে নারীর বুক-ফাটা কান্নার করুণ ধ্বনি। মারিয়া মিখেই-লোভনাকে বলেছে নাতাশা যে, সে গিয়ে দেখল যে তার স্বামীর আর একটা সংসার রয়েছে। লোকটিকে মনে হয় যেন খেপাটে। কি করবে না করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তার স্নায়ু-বিকৃতি ঘটল। তাই নাতাশা ঠিক করেছে যে সে ফিরে যাবে মস্কো। ভালো নকসা আঁকে নাতাশা। স্বামীর

কাছ থেকে যদি ভরণ-পোষণের খরচ না-ও পায় তবুও সে তার বাচ্চাকে মানুষ করে তুলতে পারবে।

যুদ্ধের পর প্রথম বছর শুরোচকা ভলকোভা প্রায়ই কারখানা থেকে ফিরে আসতো চোখের-জলের শুকনো দাগ মুখে নিয়ে। যুদ্ধের সময়ে ওর স্বামীর একখানা পা কেটে ফেলতে হয়। তাই সে বলতো, তার বেঁচে থাকার আর কোনো সার্থকতা নেই:

আমি আর এখন মানুষ নই, একটা কাক-তাড়ুয়া।

কিন্তু শুরোচকার ভালোবাসায় ও ফিরে পেল জীবন। ও ছিল একজন কারিগর, তাই পেয়ে গেল কাজ। দুজনে মিলে খুব ভালোই রোজগার করে। নতুন আসবাবপত্র কিনে ফেলল ওরা। এমনকি এতো বড়ো একটা রেডিও পর্যন্ত কিনে ফেললো যে ফাঁপরেই পড়ে গেল আইরিণা পেত্রোভনা। একটি মেয়ে হল ওদের।

একদিন কিরসানভ থেকে কোভালেঙ্কোর এক মাসী এসে হাজির। এসে বললো, সে এসেছে হপ্তাখানেক এখানে থাকবে বলে। কিন্তু দেখা গেল যে ও শিকড় গেড়ে বসেছে। নড়ার নামটি নেই। আর ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করছে এখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকার হুকুমনামা সংগ্রহ করার। আইরিণা পেত্রোভনা প্রথমটায় তো দারুণ রেগে গেল। কিন্তু দুদিন পরেই সেভাব কেটে গেল: যাই হোক, বড়োই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবন যাপন করে মাসী কিরসানভে। ঘরটাও বড়ো আছে। বাচ্চাটার দেখাশুনা করলে নাতাশারও খানিকটা আসান হবে।

মাঝে মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। শুরোচকাকে গাল পাড়ে পার্শিনাঃ

একটু বন্ধ করে দাও তো বাপু! এগারোটা বাজে। আর সেই পায়াৎনিৎস্কির দলের গান আবার! মানুষকে পাগল করে ছাড়বে! ঘুমের ওষুধ খেয়েছি আমি। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হচ্ছে না।

কিংবা হয়তো রান্না ঘরে আইরিণা পেত্রোভনা দু চারটে কড়া মন্তব্য করল নাতাশাকে লক্ষ্য করে। নাতাশাও জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে। মারিয়া মিখেইলোভনা ঝগড়া করে না কারুর সঙ্গে বা কাউকে কখনো আঘাত দিয়েও কথা বলে না। সবাই আসে ওর কাছে গল্প করতে। বলে ওদের ভালোবাসার গোপন কথা কিংবা চায় পরামর্শ। মিনাইয়েভ ঠাট্টা করে মাকে বলে নৌকোর সারেং।

নাতি নাতনী নেই বলে হয় তো বা কোনো কোনো সময়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারিয়া মিখেইলোভনা, কিন্তু ভুলেও কখনো সে কথা সে তার ছেলে বা ওলেয়ার সামনে বলে না। নাতাশার ছোট্ট ছেলে আর আইরিণা পেত্রোভনার মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করে মারিয়া। আর স্নেহ করে লেলিয়াকে। শিগগিরই ওর নিজেরও ছেলেপুলে হবে নিশ্চয়ই।

নোয়ার নৌকোর লোকসংখ্যা একই রয়ে গেল। পাঁচটা ঘরে চৌদ্দটি প্রাণী। বাসিন্দাদের মধ্যে কাজ করে না শুধু বাচ্চারা আর মারিয়া মিখেইলোভনা। মারিয়া মিখেইলোভনার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। ডাক্তারেরা বারণ করেছে ওকে সেলাই করতে। চারমাস পরে ওর বয়েস হবে সত্তর বছর। সবাই ভোরে উঠে যায় কারখানায়। কেউ যায় স্কুলে। আবার কেউ যায় অন্যত্র উচ্চ শিক্ষার

জন্যে। রাত্রে আনা বোরিসোভনা কাৎজমান কাঁদে তার হাসিখুশি গ্রিশার শোকে। তখন মারিয়াকে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত থাকতে হয় তার পাশে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি সঙ্গীহীনা সহায়হীনা নারীর মূর্তি। সকালে বোরিসোভনা যায় তার স্কুলে। ঋজু লম্বা চেহারা। ধূসর রঙের লম্বা চুলগুলি খোঁপা করে মাথার উপরে বাঁধা। স্কুলের সবাই ওর হাশিখুশি মেজাজ, ধৈর্য, সহৃদয়তায় বিস্মিত হয়ে যায়। ভুলে গেছে নাতাশা অনেক-তলা বাড়ির পরিকল্পনা সম্পর্কে তার ভাবপ্রবণ মনোবেদনার কথা। এই তো ক'দিন আগের কারখানার সভায় ভোলকভ বলেছে যে সে খুবই সুখী। কথাটা আদৌ কথার কথা নয়। কেন না যদিও ওর একটা পা গেছে, কিন্তু ওর পাশে রয়েছে শুরোচকা আর রয়েছে ওর কাজ। দুয়ে মিলে ওকে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখে যে রাত্রেও সে তার স্ত্রীর কাছে গল্প করতে শুরু করে দেয় কেমন করে সে একটা যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেছে।

যুদ্ধের বিভীষিকা ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে কালের গহ্বরে। নতুন আশা নতুন আশঙ্কায় ভরে উঠছে সবার বুক। স্কুলের কাছে নতুন তৈরি বাড়িটার একটা ফ্লাটের ছাড়পত্র পেয়েছে পার্শিনা। খুশী মনে ভাবছে, যাক সন্ধ্যেটা এখন থেকে বেশ শান্তিতে পড়াশুনা করে কাটাতে পারবে। শেষ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে লোলিয়া। ও বলে যে ওর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কাঁপছে ভয়ে। গোটা সপ্তাহ ধরে মিশা জাঁক করে ফিরছে। কারণ ওর একটা কবিতা ছাপা হয়েছে 'সিমনা' মাসিক পত্রে। মার্চ মাসে আইরিণা পেত্রোভনা দরখাস্ত করল কেমেরির বিরাম-আবাসে যাবার জন্যে। নাতাশার বাচ্চা ছেলেটির হল আমাশা। তিন দিন ধরে দারুণ দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেল গোটা বাড়িটার উপর দিয়ে। যখন ডাক্তার ঘোষণা করলেন যে আর ভয় নেই তখন যেন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। জ্বলজ্বলে মুখে ভোলকভ মারিয়া মিখেই-লোভনার কাছে এসে বলল:

বতভিন্নিক আমাদের ক্লাবে এক সঙ্গে অনেকের সঙ্গে খেলেছে। ষোলোটা খেলায় জিতেছে, ড্র করেছে দুটোয়। আর বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন দুটো ড্রর ভিতরে একটা হয়েছে আমার সঙ্গে। শুরোচকার মেয়ের দাঁত উঠছে। ওর চিৎকার শুনে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল মারিয়া মিখেইলোভনার মুখে:

নোয়ার নৌকা জেগে উঠেছে।

মিতিয়া যখন এসে তার মায়ের কাছে বলল যে ওকে আমেরিকায় পাঠাচ্ছে, শুনে দুঃখ হল মার মনে। অত দূর দেশে—। পরে ভেবে দেখে ঠিক করল যে অমন একটা অস্থির দেশে যদি ওরা ওকে পাঠানোই ঠিক করে থাকে তার মানে ওর সম্পর্কে উচ্চ ধারণাই রাখে সবাই। নাতাশা. ভোলকভ, আর নোয়ার নৌকোর অন্যান্য সব বাসিন্দাদের কাছে জাঁক করে বলে বেড়ালো মারিয়া:

আমার মিতিয়াকে পাঠাচ্ছে ঐ গুন্ডাদের দেশে। ওদের মুখের মতো জবাব দিয়ে আসতে পারবে ও। জানো তো কেমন ছেলে! অন্যেরা যখন অনেক আগে থেকেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয় ও তখন শুধু একটু মুচকি হাসে, ব্যস!

যাত্রার সময়ে মারিয়া বলল মিতিয়াকে:

এক মিনিট বোস এখানে, মিতিয়া। অনেক দূরের পথ। তাছাড়া ও দেশের লোকজনদের বুঝে ওঠাও কষ্ট। যুদ্ধের সময়ে ফ্রন্ট থেকে যেমন চিঠি লিখতিস আমার কাছে তেমনিই চিঠি দিবি। জানি তোর মাথায় থাকবে অন্য জিনিস্। তবুও খেয়াল রাখিস, ভুলিসনে যে তোর মা তোর চিঠির প্রতীক্ষায় হা-পিত্যেশ করে থাকবে।

স্বামীর চলে যাবার ব্যাপারটা খুব শান্তভাবেই গ্রহণ করল ওলেয়া। যেন গর্কি বা ভরোনেঝে যাচ্ছে এমনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অস্বস্তি অনুভব করছে। তখনো ওলেয়া জার্মানিতে, বহুবার লক্ষ্য করে দেখেছে কী দারুণ ঘৃণার চোখেই না আমেরিকানরা দেখে রুশদের। এমনকি তখনো ওদের আলোচনা করতে শুনেছে নতুন করে আর একটা যুদ্ধের কথা। ও বোঝে বিদেশে মিনাইয়েভের অবস্থা তেমন সহজ হবে না। ওকে ঘিরে থাকবে সন্দেহ, ভয়, অনিষ্ট করার প্রচেষ্টা। ওর সঙ্গে যেতে পারছে না ওলেয়া, কারণ তার এবার পরীক্ষার শেষ বছর। তাছাড়া যে কাজটা শিখছে সেটার উপরে মমতাও গভীর। যখন মারিয়া মিখেইলোভনা ওলেয়াকে জিজ্ঞেস করল:

তোমাকে যদি অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেয় তখন কি বলবে?

কেন, মস্কোর মতো সেখানেও নিশ্চয়ই স্কুল থাকবে।

প্রতিদিন দেখে দেখে বুঝতে পারে না মিনাইয়েভ যে কতোটা পরিবর্তন হয়েছে ওলেয়ার। ওর মনে হয় চেরনিগভে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই যেমন-ভাবে চমকে উঠেছিল আজও তেমনি লাজুক তেমনি যৌবনোচ্ছল মেয়েটিই রয়ে গেছে। আজও ওলেয়ার চলাফেরা তেমনি মনোরম, লালিত্য-মাখা। প্রিয়জনের সঙ্গে কথাবার্তায় তেমনি লাজুক, তেমনি আধা ভয় আধা বিস্ময়ভরা সুমধুর ভঙ্গি ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে—যা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল মিনাইয়েভ। কিন্তু সে-দিনের অস্ফুট তরুণী আজ বিকশিত হয়ে উঠেছে আবেগময়ী, গাম্ভীর্যময়ী, সবলা নারী হিসেবে। ফ্রন্টে থাকার সময়ে অনেক মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে ওলেয়া, পরিচয় পেয়েছে অনেক নীচতার। আর তারই ভিতর দিয়ে শিখেছে মানুষকে বিচার করতে। এ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে ওর অনেক পরে যখন ফ্রন্টের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত গিয়ে পৌঁছেছে স্মৃতির মণিকোঠায়। স্কুলে পড়ার সময়ে যে সব বই পড়েছিল সেগুলো ওলেয়া আবার পড়ল। নতুন আলোয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখল সে সব বইয়ের চরিত্র-গুলোকে—তাঁদের সুখদুঃখ, ভুলভ্রান্তি, কার্যকলাপ, তাদের জটিলতাভরা জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতগুলোকে। স্বামীর কাছে বলেছে ওলেয়া যে এতোদিনে সে বুঝতে পেরেছে তলস্তয়ের "সমর ও শান্তি"। যখন ও ভবিষ্যতের কথা ভাবে ওর মনে হয় যেন ওকে শিখতে হবে, জানতে হবে, কি করে ওর হৃদয়াবেগ, মানব-প্রেম, শিল্প-প্রীতি ওর ছাত্রদের ভিতরে সঞ্চারিত করতে পারে। ওলেয়া প্রায়ই বলতো তার স্বামীর কাছে যে নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য আর যে সব লোক 'অতি দরদী' তাদের ও ঘৃণা করে—তারা হচ্ছে ওর দু চোখের বিষ। ভার্য্যা যে নাকি যক্ষায় ভুগছে তাকে স্বাস্থ্যনিবাসে যাবার ছাড়-পত্র দিতে অস্বীকার করেছে চাপিজিন। আর কিনা ফ্যাকালটির ডিনের ভাগ্নীকে তার পরের দিনই

খুশী মনে দু'দুখানা অমনি ছাড়পত্রই শুধু দেয়নি সঙ্গে আরো কিছু জিনিস-পত্র দিয়েছে। তাকে এ ধরণের কাজ করতে দেয়া হয় কেমন করে? কোরিয়েকো হচ্ছে একটি উচ্চ-পদলোভী লোক। ইভজেনি বোরিসোভিচের বক্তৃতার ভিতর থেকে খুশি মতো বাদছাদ দিয়ে খানিকটা অংশ-বিশেষ তুলে তুলে পার্টি মিটিং-এ তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু একটা লোকও তার প্রতিবাদ করল না। পড়া শেষ হওয়ার পরে ভেলেপনেভাকে নির্দেশ দেয়া হল চেলিয়াবিনস্ক-এ চলে যেতে। কিন্তু সে সোজা চলে গেল তার মামার কাছে। মামা উচ্চশিক্ষা সংসদের একজন সদস্য। তিনি ওকে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে রেখে দিলেন মস্কোতে। যদিও সবাই-ই জানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এতটুকু যোগ্যতাও ওর নেই।

অবশ্য ও ধরনের লোক ফ্রণ্টেও ছিল।—বলল ওলেয়া।—যখন সবাই দারুণ সংকটের ভিতর দিয়ে চলেছে—চলেছে যুদ্ধ ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে, তখন ওরা দিব্যি ভিড়ের ভিতরে মিশে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন সে সব লোক সরে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় না যে আমাদের এখনো গা ঢিলা দেয়া উচিত। আজকের অবস্থাও সেই যুদ্ধকালীন অবস্থারই মতো। আমরা সবাই যদি নিজের নিজের বুঝ বুঝতে শুরু করে দি তবে কমিউনিজমের গতি কি হবে?

ওর মতামতের এই তীব্রতার জন্যে ওকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে মিনাইয়েভ। কিন্তু মনে মনে বেশ একটু গর্বও বোধ করে।

যাবার আগের শেষ সন্ধ্যেটা দুজনে কাটালো এটা ওটা সেটা নিয়ে গল্প করে। দুজনারই ভয় পাছে না ভেঙে পড়ে।

তাহলে এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে,—হঠাৎ বলে উঠল মিনাইয়েভ।—আমার মনে হচ্ছে যেন মাত্র কাল আমাদের পরিচয় হয়েছে। অথচ দুদিন পরেই আমরা আমাদের বিয়ের রজত-জয়ন্তী পালন করবো।

নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরে ওলেয়া:

সেখানেও আমি থাকবো তোমার সঙ্গে। ভুলো না মিতিয়া!

চিঠিতে প্রায়ই লেখে মিনাইয়েভ আমেরিকা সম্পর্কে তার ধারণার কথা। আর ওলেয়া হেসে বলে, ও যেন খবরের কাগজের রিপোর্ট লিখেছে। যেমন আছে তেমনিই ছাপিয়ে দেয়া যায়। ওলেয়ার চিঠির শেষে ও লেখে:

'ভুলি নাই' বা 'স্তালিনগ্রাদের মতোই রয়েছি তোমার সঙ্গে'।—কিন্তু একাকীত্বের দরুণ আদৌ অভিযোগ করে না।

আমেরিকার পুলিস কর্তৃক মিতিয়ার গ্রেপ্তারের সংবাদের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না মারিয়া মিখেইলোভনা। কেননা সে দিন মাত্র ওর চিঠি এসেছে। লিখেছে একজন সেনেটরের ঘরে ওর খাবার নিমন্ত্রণের কথা। কেমন করে ওরা সিদ্ধ ফলের সঙ্গে দিয়েছে মুর্গীর মাংস আর শুয়োরের মাংসের সঙ্গে মিষ্টি চাটনী। দারুণ হাসি পেয়েছে মারিয়ার। খাওয়া ভালো নয় ওখানকার কিন্তু মিতিয়া ঠিকই হজম করতে পারবে। এটা ভালো যে একজন সেনেটরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। হয়তো বলেওছে তাকে যে এখন আমেরিকানদের অন্তত মাথা ঠান্ডা করা উচিত। আর না যেন ওরা বোমার ভয় দেখায় মানুষকে।

আইরিণা পেত্রোভনার দুয়ারে গিয়ে কড়া নাড়ল মারিয়া মিখেইলোভনা। ঘরে রয়েছে শুধু ওর বুড়ী মাসী। তাকে মনের কথা খুলে বলার যোগ্য লোক বিবেচনা করল না মারিয়া। আনা বোরিসোভনা বা পার্শিনা দুজনার একজনও ঘরে নেই। পরক্ষণেই ওর মনে পড়ে গেল যে শুরোচকা তো বলে গেছে যে ওর স্বামী সর্দি হয়ে পড়ে রয়েছে বিছানায়। খবরের কাগজটা হাতে করে চলল তার কাছে।

পড়ে দেখো।

জানা কথা,—শেষ পাতার ছোট্ট খবরটা মন দিয়ে পড়ে মন্তব্য করল ভোলকভ।

জানা কথা মানে?—হাত পা ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া,—কি সাহসে ওরা এমন কাজ করল? নেহাৎ হেজিপেজি লোক নয় মিতেংকা। মস্কো পাঠিয়েছে ওকে। ও হচ্ছে তোমার গিয়ে একজন আইন উপদেষ্টা। কাল আমি ওর চিঠি পেয়েছি। একজন সেনেটরের সঙ্গে আলাপ করছিল।

জানা কথা বলেছি এই জন্যেই যে কার কাজ এটা সে তো জানা কথাই। দেখুন মারিয়া মিখেইলোভনা খবরের কাগজে একেই লেখে:

নতুন সোবিয়েত-বিরোধী উস্কানী।—সবাই জানে যে, কোনো অধিকার নেই ওদের......ভাববেন না, আমাদের দেশ রয়েছে ওকে দেখার জন্যে।

ঘরে ফিরে এল মারিয়া মিখেইলোভনা। তারপর চোখে চশমা এঁটে উল নিয়ে বসে বুনতে চেষ্টা করতে লাগল মিতিয়ার জন্যে একটা সোয়েটার। মন শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো মারিয়া। কিন্তু কাঁটাগুলো বার বারই ওর হাত থেকে খসে খসে পড়তে লাগল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দু চোখ ছাপিয়ে নেমে এলো জলের ধারা। জেলে রয়েছে মিতেংকা! আস্ত শয়তান ওরা! ওলেয়ার কাছে শুনি নি ওরা কী ভীষণ অত্যাচার করে নিগ্রোদের উপরে? ঠিক জার্মানরা যেমন করেছে এখানে। ওকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করার আগেই হয়তো ওরা মেরে ফেলতে পারে ওকে।

ওলেয়া এসে দেখল কাঁদছে মারিয়া। আগেই শুনতে পেয়েছে ওলেয়া তার স্বামীর খবর। তাই মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে চলে এসেছে।

ওসব ঠিক হয়ে যাবে। দেশ কিছু আর মিতিয়াকে ওদের হাতে ছেড়ে দেবে না। দু এক দিনের ভিতরেই ও ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। আর দেখবেন এর জন্যে মাপ চাইতে হবে আমেরিকানদের। তাছাড়া সাজাও দিতে হবে অপরাধীকে। অন্তত বাইরের ঠাট বজায় রাখতেও এটা করতে হবে ওদের।

এমন নিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছিল ওলেয়া যে খানিকটা শান্ত হল মারিয়া মিখেইলোভনা। তারপর উঠে চলে গেল রাত্রের রান্নাবান্না করার জন্যে। আর মনে মনে আশা করতে লাগলো যে এক্ষুনি হয়তো দোরের কড়া নড়ে উঠবে আর টেলিগ্রাম আসবে যে মিতিয়া রওনা হয়েছে বাড়ির পথে।

আর ওলেয়া। পার্টিশনের ওপাশে নিজের বিছানার উপরে বসে বহুক্ষণ ধরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মিতিয়ার ফটোটার দিকে। যাবার আগেই ফটোটা তুলিয়েছিল মিতিয়া। তোলার আগে ফটোগ্রাফার নির্দেশ দিচ্ছিল:

চুলটা ঠিক করে নিন। মাথাটা একটু ডান দিকে ঘোরান।—আর মিতিয়ার

ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছিল মৃদু হাসি—খুব স্বস্তি অনুভব না করলে পরে যেমন হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে। নিদারুণ দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে ওলেয়া। ইচ্ছে হচ্ছে কোথাও ছুটে গিয়ে দেখে আসে যদি কোনো খবর থাকে। ওর সঙ্গে না যাওয়ার জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিল মনে মনে। তাহলে তো ওরা দুজনে থাকতে পারতো যেমনটি ছিল স্তালিনগ্রাদে রক্ষী হিসেবে। এক এক সময়ে অবস্থা খুবই সাংঘাতিক হয়ে উঠতো। কিন্তু মনে মনে প্রবোধ দিতো নিজেকে এই বলে যে সত্যিকারের বীর তারাই যারা শত্রুর ঘাঁটির পিছনে থাকে। যখন আশপাশে নিজেদের লোকজনদের ভিতরে থাকা যায় তখন নিজেকে ঠিক রাখা সহজ। কিন্তু আজ মিতিয়া একা। সৌহার্দভরা একটু চাউনিও নেই কারুর চোখে। নেই এমন একটি লোক যে মাতৃভাষায় কথা বলবে ওর সঙ্গে। কী ভীষণ!

মারিয়া মিখেইলোভনা এসে ঢুকতেই চমকে উঠল ওলেয়া। যেন কি একটা অপকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাড়াতাড়ি হাসি টেনে আনলো ঠোঁটের কোণে।

খান-কয়েক কাটলেট গরম করে রেখেছি তোমার জন্যে। বসবে এসো। আমি তো কিছুতেই মনকে বুঝ দিতে পারছি না—

দেখবেন, খুব শিগগিরই ফিরে আসবে মিতিয়া।

না. ঠিক তার জন্যে নয়। আমি বুঝি যে ওরা বাধ্য হবে ওকে ছেড়ে দিতে। ওর পাসপোর্ট ঠিকই আছে। কিন্তু ওরা যখন এ কাজ করতে সাহস পাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই তো ওরা যুদ্ধের মতলব ভাঁজছে। ঠিক হিটলারেরই মতো। ওরা কি মায়ের পেট থেকে জন্মায় নি? মানুষ মারা সহজ। এক—দুই—ব্যাস খতম। কিন্তু একটা মানুষকে দুনিয়ায় আনা, তাকে পেলেপুষে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করে দেখ! কী বর্বর!

আনা বোরিসোভনা এসে বলল:

এর জন্যে প্রচুর মূল্য দিতে হবে ওদের! নিশ্চয়ই আমেরিকার মানুষ এর প্রতিবাদ করবে দেখে নিও।

দারুণ খেপে গেল আইরিণা পেত্রোভনা:

কী অন্যায় অত্যাচার! কালই ওলগা গ্রিগোরিয়েভনা চলে যাক মন্ত্রীদপ্তরে। এখানে যদি তারা কতগুলো আমেরিকানকে ধরে জেলে পোরে তবেই বাছাধনদের টনক নড়বে।

চিৎকার করে উঠল শুরোচকা:

সবে আমরা নতুন করে ঘরসংসার পাততে শুরু করেছি আর ওদের একমাত্র চিন্তা কি না কি করে খিমচে টাকা করবে তাই। জাহান্নামে যাক ওরা!

দুবার উঁকি মেরে দেখে পালিয়ে গেল কাতিয়া। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে যেন পরীক্ষা দিচ্ছে এমনি করে গম্ভীরভাবে এসে বলল:

মারিয়া মিখেইলোভনা আপনার ছেলেটি সত্যিকারের বীর।

রাতভোর ওলেয়া ভাবলো মিনাইয়েভের কথা। পাশ ফিরতে বা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়তেও ওর ভয়। জানে যে মারিয়া মিখেইলোভনাও জেগে আছে, শুনছে।

শাশুড়ীর কাছে মনের কথা বলা বা তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদা, এটা ওর স্বভাব নয়। ওর চিন্তা ওকে নিয়ে গেল অতীতে সেই পিছু হঠার দিনগুলোতে, স্তালিনগ্রাদে, আর সেই সুদূর বার্লিন অভিযানের পথে। ও দেখল, বসে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে টেলিফোনের সামনে আর বলে চলেছে:

আমি দভিনা। সোয়ালো দাও আমাকে......

মাইন ফাটছে, ফাটছে গোলাগুলি আর চিৎকার করে বলছে মিনাইয়েভ:

আলপারকে বলো দখল করে আছি আমরা!

সত্যি, দখল করেছিল ওরা। ওরা পৌঁছেছিল বার্লিনে।

দিনের আলো ফুটে উঠল। উঠে তৈরি হল ওলেয়া। তারপর চা করল।

মুখখানা খুবই শুকনো লাগছে,—সন্ধানী দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মারিয়া মিখেইলোভনা,—ঘুমোওনি রাত্রে?

ঘুমোবো না কেন? দেখবেন আর যুদ্ধ হবে না।

তুমি কি মনে করো আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে নিবৃত্ত করা যাবে ওদের?

তা জানি না। হয়তো আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওদের, কিন্তু তবুও যুদ্ধ হবে না। কাল সারারাত ভেবেছি আমি—আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরে রয়েছে অসীম শক্তি! কক্ষণো সাহস হবে না ওদের!

ছত্রিশ

উনিশ'শো আটচল্লিশ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মিনাইয়েভের ঘটনা নিয়ে কাগজে কাগজে যে তুমুল হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল তা ভুলে গেছে সবাই। যারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তারা অবশ্য আট মাস ধরে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় কাল কাটিয়েছে—মিনাইয়েভ নিজে, তার মা, ওলেয়া, দূতাবাসের কাউন্সিলর দানলেভস্কি, কর্নেল রবার্টস, স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্নসন আর এটর্নি জেনারেল মারে।

ডাক্তার আমাকে কম খেতে আর ব্যায়াম করতে নির্দেশ দিয়েছিল,—বললো এটর্নি জেনারেল মারে,—কিন্তু এই রুশ বদমায়েশটা এল কিনা চালাকি খেলতে। এগারো পাউণ্ড ওজন কমে গেছে আমার গত শীতকালে।

নির্দেশনামার লেখককে অজ্ঞ ভেবে ভুল করেছে মিনাইয়েভ। দলিল-পত্র কেমন করে জাল করতে হয় তা ভালো করেই জানে রবার্টস। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো চেষ্টা করেনি। মামলা মোকর্দমার কথা মাথায় ছিল না। শুধু দিন কয়েকের জন্যে বড়ো রকমের একটা কুৎসা প্রচার হোক এই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই একবার বসেই লিখে ফেলল টেনিসি কারখানা উড়িয়ে দেবার ঐ নির্দেশ-নামাটা। কিন্তু যথেষ্ট ভীতি উৎপাদন করে আমেরিকার জনমত আহত করার মতো যৌক্তিকতা ওতে আছে কি না সে সম্পর্কে তেমন মাথা ঘামায় নি। রোমালেঙ্কো নামে কে একজন "আমেরিকা", পত্রিকায় কাজ করত। তাকে দিয়ে ওটা অনুবাদ করানো হয়েছিল। কিন্তু ত্রিশ বছর আগে কিয়েভ থেকে চলে আসায় সে তার নিজের রুশভাষা গিয়েছে ভুলে। রবার্টস জানতো যে

মিনাইয়েভের ব্যাপারটা পররাষ্ট্র বিভাগকে বেশ একটু বিশ্রী অবস্থার ভিতরে এনে ফেলবে আর তাতেই ও খুশী। ওর বিশ্বাস খুঁতখুঁতে কূটনীতিকরা আমেরিকার ভূমিকা ছোট করে দেখে। তাই যথেষ্ট উঁচু ধরণের বাজিমাত করার খেলা খেলে না।

মিনাইয়েভকে গ্রেপ্তার করার সময়ে সোবিয়েত রাষ্ট্রদূত ছিলেন বাইরে। দূতাবাসের কাউন্সিলর দানিলেভস্কি তদবির করছিলেন ওর জন্যে। দানিলেভস্কির লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধ, বয়েস বছর পঞ্চাশেক। মাথার পাকা চুলগুলি মুড়িয়ে ছাঁটা। আর মুখে সব সময়ের জন্যেই একটি অনবদ্য হাসি লেগেই আছে। এই হাসির আড়ালে লুকানো থাকে ওঁর মনোভাব। বলতে গেলে ঐ হাসিটা ওঁর কূটনৈতিক পোশাকেরই একটা অঙ্গ বিশেষ। যখন একা থাকেন তখন আর সে হাসিটির চিহ্নমাত্রও থাকে না। নেহাৎ বাচ্চা বয়সেই দানিলেভস্কি লড়েছেন আর্চএঞ্জেলে বিদেশী হামলাদারদের বিরুদ্ধে। পড়াশুনা করেছেন, কাজ করেছেন পার্টিতে। তারপর একটা বড়ো নির্মাণ কাজের ভার দিয়ে পাঠালো ওঁকে সাই-বেরিয়ায়। সে সময়ে উচ্চ কণ্ঠে দরাজ হাসি হাসতেন দানিলেভস্কি। তাছাড়া ওঁর হাসিটাও ছিল সংক্রামক। কাজ করতেন প্রাণপাত পরিশ্রম করে। আর যখনই ছুটি পেতেন চলে যেতেন তাইগা অঞ্চলে। কড়া শিকারী ছিলেন দানি-লেভস্কি। কালে কালে তিনি যে একজন কূটনীতিক হয়ে উঠবেন তা কেউ কখনো ভাবেনি। একটি সাধারণ টাইপিস্ট মেয়ের অসহায়তা আর সরলতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন। একটি মেয়ে হল ওদের—নাম মারুশা। যুদ্ধের আগে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ওঁকে পাঠিয়ে দেয়া হল লণ্ডনে। মারুশার বয়েস তখন ন'বছর, স্কুলে পড়ে। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে রেখে যেতে হল বোর্ডিং-এ। খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজী শিখে ফেললেন দানিলেভস্কি। আর রাষ্ট্র-দূত দেখলেন যে তিনি তাঁর নতুন কাজ বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করে নিয়েছেন। উনিশশো বিয়াল্লিশের বসন্তকালে ফিরে এলেন মস্কোয়। এলেন ঘোরা পথে ডাকার, কায়রো আর বাগদাদের ভিতর দিয়ে। দানিলেভস্কি আশা করেছিলেন তাঁকে পাঠানো হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ ওঁকে এক বছর বসিয়ে রাখলো মস্কোয়। তারপরে পাঠিয়ে দিল কানাডায়।

অটোয়ায় কাটিয়েছেন তিনি চার বছর। আর এখানে থাকতে থাকতেই শিখলেন অমনি কাষ্ঠ হাসি হাসতে। কানাডাবাসীরা বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই গ্রহণ করলো ওঁকে। তারা বলতো, রুশেরা বীর, স্তালিনগ্রাদ গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবুও একমাত্র আমেরিকানরাই পারবে হিটলারকে শায়েস্তা করতে। এ সময়ে প্রচুর সহানুভূতিভরা চিঠি পেতেন দানিলেভস্কি। কখনো কখনো চিঠির সঙ্গে পেতেন চেক। কানাডাবাসী অনেকেই তখন সোবিয়েত হাসপাতাল আর অনাথ-আশ্রমের জন্যে স্বেচ্ছায় সাহায্য পাঠাতো। যখন সোবিয়েত বাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমানায় এসে পৌঁছালো, তাদের এই মনোভাবের ঘটল পরিবর্তন। লোকেরা দানিলেভস্কিকে জানায় অভি-নন্দন, বলে দুই দেশের ভিতরে বন্ধুত্ব আর এই সম্মিলিত জয়ের ফলাফলের কথা। কিন্তু তাদের কথার আড়ালে কেমন যেন লুকানো থাকে একটা ভয়ের আভাস।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পেতে লাগল ওদের শত্রুমনোভাব। দূতাবাসের সাঙ্কেতিক লিখনের কেরানির প্রমাণের ভিত্তিতে অনেকগুলো মামলার সাক্ষী হতে হয়েছে ওকে বাধ্য হয়ে। কাগজে কাগজে সোবিয়েত দূতাবাসকে "গুপ্তচরের আড্ডা" বলে প্রচার করতে লাগল। দানি-লেভস্কিকে আসতে দেখে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকে চলে গেলেন। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্থ কয়েকটি মহিলা এক-দিন গোটা সন্ধ্যে দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল ঃ "গুপ্তচর! গুপ্তচর!"

ঐ বছরই এক নিষ্ঠুর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল দানিলেভস্কির। ওঁর স্ত্রীর হল ক্যানসার আর দুমাস অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেলেন। আশা করেছিলেন এবার ওঁকে মস্কোয় ফিরিয়ে নিয়ে এসে যাতে মেয়েটির সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা করবে। মেয়ে-অন্ত প্রাণ দানিলেভস্কির। মারুশাকে দেখতে অনেকটা তার মায়ের মতো। তাই ভেবেছিলেন তাঁর হারানো সুখ-শান্তি খানিকটা অন্তত ফিরে পাবেন। কিন্তু তা হওয়ার নয়। তাঁকে বদলী করা হলো ওয়াশিংটনে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখার যখন অবকাশ হল, দেখলেন ওয়াশিংটনের আমলা-তান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে অটোয়ার জীবনের কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। সেই একই মফস্বলী চালচলন, সেই আরাম আর অজ্ঞতার সংমিশ্রণ, সেই একই ধরনের কপটতা। দিনের পর দিন খবরের কাগজে পড়েছেন দানিলেভস্কি যে রুশ ট্যাঙ্ক তেহরাণের উপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। সোবিয়েত ডুবো জাহাজ দেখা গেছে ভেনিজুয়েলার উপকূলে। রহস্যজনক "উড়ন্ত চাকাগুলি" যুক্তরাষ্ট্রের চারদিক ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে। লণ্ডন আর পারী অবরোধের পরিকল্পনা তৈয়ার হচ্ছে কমিনফর্মের সভায়। আর শৃঙ্খলিত বন্দীরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে সোবিয়েত দূতাবাসের অন্ধ কুঠরীতে। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে শত্রুতা। যেখানেই যান দানিলেভস্কি, গুপ্তচরেরা ফেরে পিছেপিছে। তারা বসে থাকে দূতাবাসের উলটো দিকে বাড়ির জানলায়। দুঃসাহসে ভর করে কেউ যদি "লাল"দের দেখতে আসে, তাদের ফটো তুলে নেয়। মাঝে মাঝে বের করে শোভাযাত্রা। এণ্ডার্সের ছোট ছোট ছেলের দল দূতাবাসের চারদিক ঘিরে চিৎকার করে। একবার ওরা ঢিল ছুঁড়ে দূতাবাসের কতগুলো জানালার কাচ ভেঙে দেয়। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুলিস উচ্ছৃঙ্খল জনতার ভিড় হটিয়ে দেয়। আর কাগজে কাগজে প্রচার চালায় "জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ"। যখনই দানিলেভস্কি বেড়াতে গেছেন নিউইয়র্কে, দেখেছেন যে অনেক আমেরিকানই কাগজের ঐ প্রচারে বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন স্তরের লোক আসে ওঁর কাছে, ওর সঙ্গে করমর্দন করে—তারা কেউ বা ডাক্তার কেউ শ্রমিক, কেউ বা অভিনেতা আবার কেউ ব্যবসায়ী। বলে, তারা ভোলে নাই স্তালিনগ্রাদের কথা। তাই চায় না আবার আর একটা যুদ্ধ। গম্ভীর। আমলাতান্ত্রিক ওয়াশিংটনেও এই ধরনের লোক পাওয়া যায়। কিন্তু পুলিস প্রাণপণে চেষ্টা করে যাতে দানিলেভস্কি বা অন্য কোনো রুশবাসীর সঙ্গে ওদের দেখা সাক্ষাৎ না হয়। রুশ দূতাবাস যেন একটা অবরুদ্ধ দুর্গ বিশেষ।

ছোট্ট সোবিয়েত উপনিবেশটি যেন সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন একটি মেরু-স্টেশন। কখনো কখনো ওরা সন্ধ্যেয় একত্রিত হয়ে দেখে কোনো সোবিয়েত ফিল্ম, কিংবা সমবেত হয় বক্তৃতা বা বিতর্কে। যখনই একটু অবকাশ পান রেডিও খুলে বসেন দানিলেভস্কি। ধরেন মস্কো প্রোগ্রাম। আর যা-ই কিছু থাকুক না কেন তাই শোনেন একান্ত মনে। তা সে অনুরোধের আসরই হোক, কি অম্বলের অসুখ নিবারণের উপায় সম্পর্কে বক্তৃতাই হোক কিংবা সর্বশেষ সংবাদ বা নাটকই হোক। তিনি ভাবেন মারুশাও হয়তো এই একই সময়ে, একই জিনিস শুনেছে। আর তাই অনুভব করেন, তিনি রয়েছেন ওরই কাছে। ফলে ওঁর গৃহগত মনের ভার খানিকটা হালকা হয়ে আসে।

আমরা যেন অবরোধের ভিতরে আছি—নিজের মনেই বললেন দানিলেভস্কি. —তাই আমাদেরও এই অবরোধ ভেঙে প্রতি-আক্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজনীতিক, সাংবাদিক, কূটনৈতিক বিভাগের লোকজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যান দানিলেভস্কি। ভালো করেই জানেন তিনি পর্দার আড়ালে বিভিন্ন দলের লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত, প্রেসিডেণ্ট ও সেনাবাহিনীর ভিতরের মতানৈক্যের কথা। জানেন সামরিক গুপ্তচর বিভাগ পেণ্টাগনের সঙ্গে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের সম্প্রীতির অভাব আর কর্নেল রবার্টসের প্রভাব বিস্তারের কথা। তিনি এ-ও জানেন যে আমেরিকানদের পিঠ চাপড়ানো ব্যবহারে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ক্ষুব্ধ। ফরাসী দূতা-বাসের কাউন্সিলর, একজন বড়ো ব্যবসায়ীর ভাইপো। তিনি মনে প্রাণে অনুভব করেন যে একমাত্র নিরপেক্ষতার ভিতরেই নিহিত রয়েছে ফরাসী দেশের মুক্তির পথ। আর এ কথাও জানেন যে মেক্সিকো-বাসীরা মার্শালের কথায় নিদারুণ ক্রুদ্ধ। তিনি চেষ্টা করলেন কংগ্রেসীদের বিভিন্ন দলের ভিতরের শত্রুতা. রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটদের ভিতরের লড়াই. আর বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভিতরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করে এই অবরোধ ভাঙার। অনেক সময়ে সফলও হয়েছেন কোনো না কোনো কাগজে যখন প্রচলিত কুৎসা প্রচার করা হয়েছে তাদের দিয়েই তার প্রতিবাদ ছাপাতে। আর যুগিয়েছেন তাদের সোবিয়েতের প্রকৃত মনোভাবের তথ্য ও সংবাদ। যতদূর সম্ভব সাধ্যমতো তিনি লড়াই করে চলে-ছেন। খবরের কাগজে ওর নাম দেয়া হয়েছে "সদাহাসি লোকটি"। কিন্তু কেউ ভাবতেও পারে না যে রাত্রে এই মানুষটিই যখন মারুশাকে চিঠি লেখেন কিংবা স্ত্রীর ছবির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকেন তখন তাঁর মুখে নেহাৎ সাধারণ মানবিক ব্যথা-বেদনার ভাবই ফুটে ওঠে।

মিনাইয়েভের গ্রেপ্তার খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় ওঁর কাছে। অনেক দিন থেকেই বুঝতে পারছিলেন যে কী একটা যেন নতুন উস্কানীর ঘোঁট পেকে উঠছে। রাষ্ট্রদূত তখন ছুটিতে, বাইরে চলে গেছেন। দানিলেভস্কি ঠিক করলেন, তৎক্ষণাৎ এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একখানা প্রতিবাদপত্র লিখে ফেললেন আর তাতে দাবি করলেন যে অবিলম্বে বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের আইন উপদেষ্টাকে মুক্তি দেয়া হোক। শুধু মাত্র তাই-ই নয় এ-ব্যাপারের জন্যে যারা দায়ী কঠোর সাজা দেয়া হোক তাদের। একজন সহকারী স্টেট সেক্রেটারি, বয়েড দেখা করল ওঁর সঙ্গে। মিঃ বয়েডের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন দানিলেভস্কি।

আর মিঃ বয়েডের পাল্টা প্রশ্নের জবাবে জানালেন যে তিনিও খুবই ভালো আছেন। যদিও উত্তুরে মানুষ বলে এতোটা গরম আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নন। তারপর তিনি চিঠিটা দিলেন মিঃ বয়েডের হাতে আর মুখে বলে দিলেন চিঠিটার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম। মেজাজ গরম হয়ে গেল বয়েডের। দারুণ চটে গেল গুপ্তচর বিভাগের উপরে মিনাইয়েভের ব্যাপারে আগে থেকে ওর সঙ্গে আলোচনা করেনি বলে। ওর মনে হল 'নির্দেশনামা'টা নেহাতই দুর্বল বা "ঢিলেঢালা"। বলেছিল পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলার সময়ে। তাছাড়া এ-নিয়ে যে ভবিষ্যতে একটা দারুণ অশান্তির ব্যাপার হয়ে উঠবে তা স্পষ্টই বুঝতে পারল বয়েড। অবশ্য. দানিলেভস্কিকে মুখে বলল বয়েড যে মিঃ মিনাইয়েভ কূটনৈতিক অধিকারের সুযোগ পেতে পারে না। কারণ সে গ্রেপ্তার হয়েছে রাস্তায় একটি মহিলার শ্লীলতাহানি করার অপরাধে। তাছাড়া মিঃ মিনাইয়েভের কাছে দারুণ আপত্তিকর দলিলপত্র পাওয়া গেছে। তাই তার অপরাধের ব্যাপার এখন আদালতের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবাদ করলেন দানিলেভস্কি। বললেন, মিনাইয়েভ কূটনৈতিক অধিকারের সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। কোনো মহিলার শ্লীলতা-হানি করার গল্পের ভিতরে একবিন্দুও সত্যতা নেই। তাছাড়া এ-কথাটা শোনা গেল এই প্রথম। খবরের কাগজের রিপোর্টেও প্রকাশ যে মিনায়েভকে গ্রেপ্তার করার আগে দীর্ঘদিন ধরে তার উপরে নজর রাখা হয়েছে। আর যে 'নির্দেশনামা' ওর কাছে পাওয়া গেছে সেটা এতো কাঁচা যে মিঃ বয়েড যদি একবার চোখ বুলিয়েও দেখেন তবে না হেসে থাকতে পারবেন না। তারপর দানিলেভস্কি ওকে অনুরোধ করলেন মিনাইয়েভের সঙ্গে একবার দেখা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে। প্রত্যুত্তরে বয়েড জানালো যে সেটা নির্ভর করছে এটর্নি জেনারেলের উপরে।

আমি এটুকুই মাত্র আশা করতে পারি—তেমনি হাসি হাসি মুখেই বললেন দানিলেভস্কি—যে, চিঠিটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের পরে দেখবেন কয়েক দিনের ভিতরেই আপনাদের মত বদলাবে। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, মাপ করবেন। হপ্তা শেষের ছুটির দিনটা কোথায় কাটাচ্ছেন ?

সমুদ্রতীরে আমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। আশা করি এর ভিতরে একদিন আমাদের ওখানে যাবেন, ভারি খুশী হবো গেলে মিঃ দানিলেভস্কি।

খুশী আমিই হবো। শুভেচ্ছা রইল।

এই সাক্ষাতের পরে বয়েড গেল পররাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে দেখা করতে।

চার্জ-ডি-এ্যাফেয়ার একটা নোট দিয়ে গেছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি পেন্টাগন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 'নির্দেশনামা'টা খুবই একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি করেছে। আপনার কি মনে হয়, বদমায়েশটাকে ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিলে ভালো হয় না ?

পররাষ্ট্র-সচিব প্রতিশ্রুতি দিলেন বিষয়টা আবার ভালো করে ভেবে দেখবেন, আলোচনা করবেন আর আইনের পরামর্শও নেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা গড়িয়েই চলল। ঘটনাটা নিয়ে কাগজে কলমে এতো বেশি হৈ চৈ হয়েছে যে আচমকা ওটাকে ধামাচাপা দেয়াও কঠিন। বয়েডের এখনো মত, মিনাইয়েভকে মুক্তি দেয়া দরকার।

কিন্তু তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে ,সেটা অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের মান-সম্মানের প্রশ্ন বিপন্ন। "নির্দেশনামা" ভালোভাবে লেখা হয়েছে কি মন্দভাবে লেখা হয়েছে সে-প্রশ্ন এখন অবান্তর। আপাতত ব্যাপার হয়েছে মিনাইয়েভ যে দোষী সেটা প্রমাণ করা।

বার্নসনকে ডেকে পাঠালো বয়েড।

সত্যি বলতে কি সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দারুণ অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি চেষ্টা করেছিলাম মিটিয়ে ফেলতে কিন্তু বডডো দেরি হয়ে গেল। খবরের কাগজগুলো প্রচুর হৈ চৈ করেছে ব্যাপারটা নিয়ে। যারা এর জন্যে দায়ী তাদের শাস্তি দেয়ার জন্যে দাবি করেছে মস্কো। এখন যদি আমরা মিনাইয়েভকে ছেড়ে দি তবে লোকে এটাকে 'লাল'দের জয় হিসেবেই ধরে নেবে। তোমার তো অনেক সাকরেদ আছে 'লাল'দের সম্পর্কে যারা পেন্টাগনের চাইতে ঢের বেশি ওয়াকিবহাল। মামলাটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোমার হাতে। এটর্নি জেনারেল মারের সঙ্গে একবার পরামর্শ করো আর এ সব ব্যাপারে যে-সব রুশদের তুমি ব্যবহার করে থাকো তাদের কাছ থেকে নির্দেশ নিও। একটু ভালো করে ভেবে চিন্তে দেখো। গাড়ি যখন কাদায় আটকে যায় আগে দরকার সেটাকে কাদা থেকে টেনে তোলা।

বার্নসনের চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠল। লোকটা উচ্চাভিলাষী। মনে মনে ঠিক করে নিল মিনাইয়েভের মামলাটাই হবে তার অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান। যুদ্ধের আগে ওকে তৈরি করা হয়েছিল গুপ্তচর বিভাগের কাজের জন্যে। শিখলো রুশ আর পোল ভাষা। উনিশশো বিয়াল্লিশে ওকে পাঠানো হল কুইবিশেভে। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করতে সমর্থ হল। যুদ্ধের পরে ফিরে এলো আমেরিকায় সাধারণ সিভিল সার্জেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্যে। এসে কাজ করতে আরম্ভ করল সরকারী বিভাগে। এখানে সবাই ওকে রুশিয়া সম্পর্কে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবেই মানে। বিরক্তিজনক কাজ। ওকে সমস্ত রুশ সংবাদপত্র পড়ে তার সারাংশ লিখতে হয়। এতে উন্নতির কোনো সুযোগ নেই। অথচ মনে মনে অনুভব করে বার্নসন যে সে দুনিয়ায় এসেছে খুব বড়ো কিছু একটা করার জন্যে। ওর বয়েস ছত্রিশ। বেঁটে-খাটো চেহারা। সরকার বা খাজাঞ্চীর মতো দেখতে। বড়ো কালো রিমের চশমা পরে। আর যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন তোতলাতে থাকে।

ওগো বন্ধু হুঁসিয়ার! তোমার কল্পনার দৌড়টা বডডো বেশি,—ওর দীর্ঘাঙ্গী পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা সুন্দরী স্ত্রী প্রায়ই বলতো ওকে।

গোলাপ তুলতে হলে আর কাঁটার খোঁচার ভয় করলে চলে না,—প্রত্যুত্তরে বলতো বার্নসন.—তোমাকে পাবার জন্যে যদি না উঠে পড়ে লাগতাম তবে কোনো দিনই তুমি আমার বৌ হতে না। এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ।

বয়েডের যা-কিছু কথা তা শোনার পরে মনে মনে ঠিক করলো বার্নসন, যা থাকে কপালে, ব্যাপারটাকে কিনারায় টেনে তুলতেই হবে। মার্শাল দেখুক, কে এবার আমেরিকার মুখ রক্ষা করল।

দু মাস চলে গেল। মিনাইয়েভের সঙ্গে দেখা করে জানালো দানিলেভস্কি

যে ওর মা আর ওলেয়া ভালো আছে। আর আশা করছেন তাঁরা যে শিগ্‌গিরই দেখা হবে ওর সঙ্গে। বন্দিত্বের দরুণ দেহমনের দিক থেকে তেমন কিছু খারাপ হয়নি মিনাইয়েভের।

সোচির মতো নয় অবশ্য.—দানিলেভস্কিকে বলল মিনাইয়েভ,—কিন্তু বিশ্রাম করার সুযোগ মেলে এখানে।

মিনাইয়েভের নাম পর্যন্ত শোনাটাও আর সহ্য করতে পারছে না মারে। ঐ ধরনের লোক একটা গোটা শহর উড়িয়ে দিতে পারে। আর সমস্ত জাতটাকে পর্যন্ত পারে ধ্বংস করে দিতে। লোকটা দানব বিশেষ। কিন্তু আইনের দিক থেকে প্রমাণ খুবই কম। শুধু ঐ "নির্দেশনামা"। এমন কি তার ভিতরেও আবার এমন সব ভাসা ভাসা জিনিস আছে যা নিয়ে প্রতিবাদী পক্ষ বিরাট খেল দেখাবে। এ-সব বুদ্ধিমানেরা পাখি উড়িয়ে দিয়েছে ভয় পাইয়ে। ধরার জন্যে একটু সবুর করা উচিত ছিল। এখন অবস্থাটা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বার্নসনের কাছে এ-সব কথা বলল এটর্নি জেনারেল। খবরের কাগজে মিনাইয়েভের নাম উল্লেখ করা ছেড়ে দিল। আর তাই দানিলেভস্কি ভেবে নিলেন যে এটর্নি জেনারেল হয়তো মিনাইয়েভকে অভিযুক্ত করার প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু নভেম্বর মাসে মিনাইয়েভের ব্যাপার নিয়ে কাগজে কাগজে আবার নতুন করে সোরগোল পড়ে গেল। খলপচেঙ্কো নামে একজন লোক আগে ছিল সোবিয়েত নাগরিক। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে বাস্তুহারা হিসেবে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এখন সে কাজ করে টেনিসির বড়ো একটা কারখানায় অগ্নি-নির্বাপক দলে প্রহরী হিসেবে। সে পুলিসের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে বললো যে তাকে নিজেকেও ঐ অননুষ্ঠিত অপরাধের একজন অংশীদার হতে হতো। ঘটনাটা বিবৃত করে খলপচেঙ্কো বললো যে সে সোবিয়েত আমলকে ঘৃণা করে. কিন্তু তার পঙ্গু মা এখনো বাস করছেন ঝিতোমিরে। তাঁকে অসহায়ভাবে ছেড়ে চলে আসার জন্যে একটা নিদারুণ আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে ঠিক করেছিল দেশে ফিরে যাবে। গত আগস্টে সে গিয়েছিল নিউইয়র্কে আর সোবিয়েত দূতাবাসের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে উঠল বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের আফিসে। সেখানে একজন রুশ ভদ্রলোক দেখা করল ওর সঙ্গে। তার নামটা ভুলে গেছে খলপচেঙ্কো। তারপর ওর বক্তব্য শুনে ওকে পরিচয় করিয়ে দিল মিনাইয়েভের সঙ্গে। দীর্ঘ তিন্ ঘণ্টা ধরে মিনাইয়েভের সঙ্গে ওর আলাপ-আলোচনা হয়। খলপচেঙ্কো সরলভাবেই মিনাইয়েভকে বলে যে ও চায় ঝিতোমিরে ফিরে যেতে। কিন্তু পাছে গ্রেপ্তার হয়ে যায় এই ভয়। মিনাইয়েভ ওকে কথা দিলে যে দু দিনের ভিতরেই সব কিছু গোলমাল ফয়সলা করে দেবে। কিন্তু আবার যেদিন খলপচেঙ্কো এলো জবাবের জন্যে, মিনাইয়েভের প্রস্তাব শুনে সে তো আকাশ থেকে পড়ল। ওকে বলল, যে-কারখানায় কাজ করে সেখানে ও. এম. শপে একটা টাইম বোমা রেখে দেয়ার জন্যে। বলল, এতে ওর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। কারণ বোমাটা আকারে ছোট আর বয়ে নেয়াও সহজ। তারপর খেলপচেঙ্কোকে আবার ফিরে আসতে হবে

নিউইয়র্কে। সেখান থেকে মিনাইয়েভ ওকে পাঠিয়ে দেবে দেশে। পুরস্কার-স্বরূপ ও দল ত্যাগ করে জার্মানপক্ষে চলে যাওয়ার জন্যে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। উপরন্তু ওর ইচ্ছেমতো খরচ করার জন্যে ওকে দেয়া হবে দু হাজার ডলার আর ওর কেনা জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে দেবে রুশিয়ায়। ঠিক হল খলপচেঙ্কো পরদিন মিনাইয়েভের সঙ্গে ১২৬নং রাস্তায় জনসন বার-এ দেখা করবে। সেখানে ওর হাতে বোমা আর অগ্রিম হিসেবে চারশো ডলার দেবে। খলপচেঙ্কো বলল, যদিও সে মিনাইয়েভের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই ঠিক করল যে বারে যাবে না আর দেশে ফিরে যাবারও মত বদলে ফেলল। জেরার সময়ে বোমাটা কিরকম, কেমন করে ফাটে সব বলল। তার বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে 'নির্দেশনামা'র সেই অপ্রকাশিত অংশ সম্পূর্ণ মিলে গেল। জজের প্রশ্নের জবাবে বারের মালিক বললো যে সে চেনে মিনাইয়েভকে।

আর একটি লোকের সঙ্গে করে কখনো কখনো সে আসতো বার-এ। সঙ্গের লোকটির গালে একটা কাটা দাগ আছে। আমার মনে আছে গ্রীষ্ম কালের শেষের দিকের এক গরম সন্ধ্যেয় সে এসেছিল একা। বড়ো দু গ্লাশ হুইস্কি-সোডা খেল। ভীষণ অস্থির মনে হচ্ছিল ওকে। বার বার দোরের দিকে তাকাচ্ছিল, স্পষ্টই মনে হচ্ছিল কারুর আসার অপেক্ষা করছে। তখন বার-এ আর জনপ্রাণীও ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আমি ওকে দেখছিলাম তাকিয়ে তাকিয়ে। ঘণ্টা-খানেকের বেশি বসে রইল, তারপর উঠে চলে গেল।

কাগজ পড়তে পড়তে খাবি খাচ্ছিল রবার্টস:

কে এই খলপচেঙ্কো লোকটাকে আবিষ্কার করল ?

কয়েক দিন ধরে খুঁজে খুঁজে ফিরল ডাববেল্ট। শেষ পর্যন্ত ফিরে এল ভাসা ভাসা জবাব নিয়ে:

যেটুকু সঠিক করে জানতে পেরেছি তা হল এই যে জার্মানী থেকে আসার পরে খলপচেঙ্কো দুদিন ছিল ওয়াশিংটনে, ওখানেই বার্নসনের সঙ্গে ওর দেখা।

খলপচেঙ্কোকে গ্রেপ্তার করার হুকুম জারী করল এটর্নি জেনারেল। কিন্তু দু দিন পরেই তাকে জামিনে খালাস দেয়া হল। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো যে প্রস্তাবিত অপরাধের কথা জানতে পেরেও পুলিসে সংবাদ দেয়নি। অবশ্য সংবাদপত্রে জোর দিয়ে প্রচার করতে লাগল যে সোবিয়েত গুপ্তচরের লোকেরা ওকে ভয় দেখিয়েছিল। তাছাড়া ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। সুতরাং আদৌ শাস্তি পাবার উপযুক্ত নয়।

দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠল মারে। এতোদিনে মিনাইয়েভের বিরুদ্ধে বেশ একটা প্রমাণের মতো প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে. আসামীর ব্যবহার ওকে খানিকটা হতাশও করে দিয়েছে। আশা করেছিল মারে যে দেশের লোককে সামনে এনে হাজির করায় এবার স্বীকারোক্তি দেবে মিনাইয়েভ। অবশ্য, নির্বিকারভাবে মিনাইয়েভ শুনে গেল খলপচেঙ্কোর কথা। ওর একটি চুলও কাঁপল না।

জীবনে প্রথম আমি এই ভদ্রলোকটিকে দেখছি।—পরে বলল মিনাইয়েভ।—

কিন্তু সেই বিরাট অভিযানের সময়ে ওর জাতের অনেক লোককে দেখেছি। আমার মনে হয় ওকে কোনো একটা জায়গার মেয়র করে দিয়েছিল, তাই না?

যখন বার-এর মালিক জনসন সাক্ষ্য দিতে উঠল, হোহো করে হেসে উঠল মিনাইয়েভ:

ঐ বিশেষ শুঁড়ীখানাটিতে আমি যাইনি কোনোদিন। কারণ, আমার দুর্ভাগ্য যে নিউইয়র্কের কোনো শুঁড়ীখানায়ই আমি কোনো দিন ঢুকিনি। আর হুইস্কি আর সোডা—ও থেকে আমি ওষুধের দোকানের গন্ধ পাই। তার চেয়ে ভদকা বা ব্রান্ডিটাই আমার পছন্দ। এফ. বি. আই-এর ভিতরে যে দর্জী আছে তা বুঝেছি। কারণ তাদেরই কেউ ঐ নির্দেশনামাটা আমার জামার ভিতরে সেলাই করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার দেখছি যে তাদের সংগঠনের ভিতরে শুঁড়ীও আছে।

আমি বলছি, ভুলে যাবেন না এটা যে বিচার-বিভাগীয় তদন্ত।—মিনাইয়েভকে বাধা দিয়ে বলে উঠল বিচারক।

তাহলে, বেশ। হাসি-ঠাট্টা যদি আপনাদের পছন্দ নাই হয়, গম্ভীর ভাবেই বলছি। এ-সমস্তটাই হচ্ছে একটা জঘন্য উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা। আপনাদের পুলিসের গুপ্তচর বিভাগ আমেরিকার সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে সোবিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে। প্রতারণা করছেন আপনারা আপনাদের দেশবাসীকে। কিন্তু লিংকন নিজেই বলে গেছেন যে সমস্ত মানুষকে কিছু সময়ের জন্যে বোকা বানানো সম্ভব, কিছু মানুষকে চিরকালের জন্যে ধোঁকা দিয়েও রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত মানুষকে কখনো চিরকালের জন্যে বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। আমি একজন সাধারণ সোবিয়েত নাগরিক আর তাই আমি বলছি—

চুপ, একেবারে চুপ!—ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন বিচারক—এটা জনসভা নয়। এই মুহূর্তে আদালতকক্ষ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছি আমি।

এটর্নি-জেনারেল বলল, মামলা মুলতুবী রাখা গেল। খলপচেংকোর সাক্ষ্যের প্রমাণে আরো সাক্ষী-সাবুদ রয়েছে।

কাগজে কাগজে অভিযুক্ত লাল লোকটার দুঃসাহসের কথা নিয়ে লেখালিখি চলল। যে দর্জী মিনাইয়েভের জামার মাপ নিয়েছিল এই প্রথম তার কথা উল্লেখ করল 'ডেইলী ওয়ার্কার' পত্রিকা।

মস্কোয় জানালেন দানিলেভস্কি যে আমেরিকানরা মিথ্যা সাক্ষী হাজির করেছে আর চেষ্টা করছে অভিযোগ প্রতিপন্ন করতে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংগে এর যোগাযোগ সুস্পষ্ট। নির্বাচন অদূরবর্তী। তাই নতুন প্রোগ্রেসিভ পার্টি সরকারের খানিকটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে শান্তির স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন আহূত হয়েছে। শ্রমিকদের ভিতরে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ট্রুম্যানের ফতোয়ার সমর্থকেরা আঁকড়ে ধরেছে মিনাইয়েভের ঘটনাটাকে। কারণ ওরা চায় আমেরিকাবাসীদের বিশ্বাস করাতে যে রুশিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে।

অনেক দিন কেটে গেল। সংবাদপত্রের পাঠকেরা ইতিমধ্যে অনেকেই ভুলে গেছে খলপচেংকোর অস্তিত্ব। এমন সময়ে ডেট্রয়েট-এ এমন একটা ঘটনা ঘটল

যে এটনী-জেনারেলের অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। আর বার্নসনের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে দেখা দিল এক সংকটজনক পরিণতির সম্ভাবনা। ঠিকমতো বলতে গেলে খলপচেঙ্কো যে এক ঘণ্টার ভিতরে এক বোতল জিন ঢক ঢক করে গিলে নিয়েছিল সেটা তেমন কোনো ঘটনাই নয়। লোকটা মদ খেতে ভালোবাসে। আর সাধারণত তার মাত্রাজ্ঞানও থাকে। কিন্তু এবারে অবশ্য সে একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গিয়েছিল। চেষ্টা করেছিল মদের তলায় দুঃখটাকে ডুবিয়ে দিতে। আবার ওকে ঠকিয়েছে বার্নসন। খলপচেঙ্কোকে যখন যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার জন্যে বলা হয়েছিল ও নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল যে একটা ভালো চাকুরি মিলবে। হয়তো বেতার প্রচারক বা প্রবন্ধ লেখার কাজ। অনেকের চাইতেই ঢের ভালো লিখতে পারে। যাই হোক না কেন ও তো উচ্চ শিক্ষা নিতে শুরু করেছিল, তাছাড়া কাজও করেছে আর্ট কমিটিতে। কিন্তু তার বদলে ওকে ফুসলে-ফাসলে বার্নসন কাজে লাগাবার মতো অনেক খবর ওর পেট থেকে বের করে নিয়ে মাত্র দু'শ ডলার ঠেকিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। আর বলেছেঃ

তুমি একটি চৌকস ছেলে। কেন কোনো-না-কোনো একটা অফিসে বসে বসে পচে মরতে যাবে? তোমাকে একটা কারখানার আগুন-নেভানো দলের প্রহরী করে দিচ্ছি! ওটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক কাজ। ইচ্ছে করো যদি সময়ে লালদের বিরুদ্ধে তোমার হোজ পাইপটা ঘুরিয়েও ধরার সুযোগ পাবে। বেশ আরামেই থাকবে ওখানে!

দ্বিতীয় বার জোচ্চুরি করলো ওর সঙ্গে বার্নসন যখন দরকার হল ওকে দিয়ে সাক্ষ্য দেয়াবার। প্রথমটায় ওকে কথা দিল যে সংবাদপত্র 'আমেরিকায়' ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবে। কিন্তু পরে মাত্র পাঁচটা ডলার ওর হাতে দিয়ে বললো ওকে ডেট্রয়টে চলে যেতে।

ওখানে অনেক ইউক্রেনিয়ান আর রুশিয়ান আছে, বেশ আরামে থাকবে সেখানে। ওদের উপরে একটু দৃষ্টি রাখাও দরকার। সব ঠিক করে দিয়েছি আমি—স্টুডিবেকার কারখানায় তোমাকে আগুন-নেভানো দলের প্রধান রক্ষী হিসেবে নিয়ে নেবে......

তিন মাস ঐ কাজে বহাল থাকলো খলপেচেঙ্কো। কিন্তু চতুর্থ মাসে আব সহ্য করতে পারলো না। যে জায়গাটা ও বেছে নিয়েছিল সেটা দমবৌস্কি নামে এক ভূতপূর্ব পোলের শুঁড়ীখানা।

সবগুলো বেজম্মা—চিৎকার করে বলতে শুরু করল খলপচেঙ্কো,—ঐ লাল-গুলো, জার্মান, আমেরিকান সব! আমি চাই বাঁচতে, কিন্তু ওরা লেবুর মতো সবটুকু রস নিঙড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নোংরার গাদায়। জিতোমির-এ রূপ-মণ্ড রিপোর্টার দলে কাজ করতাম বলশেভিকদের সঙ্গে। একটা গোটা নাটক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধরে দিলাম আমি নিজের মতে, গুলি মার ব্যাটাদের। আর আমাকে কি না বরখাস্ত করল আটত্রিশ সালে। আর বুড়ী মেয়েমানুষের মতো বসে থাকতে হতো খবরের কাগজের দোকানে। যখন জার্মানরা এলো, তারা বললো "হের খলপচেঙ্কো"কে তারা কাজে লাগাবে। একটা খবরের কাগজের সম্পাদক করে দিল আমাকে। যখন তারা চলে গেল আমাকে কি না ফেলে রেখে

গেল। মন্দের ভালো যে একটি ড্রাইভারের দেখা পেলাম—আমার সোনার ঘড়িটার বদলে সে আমাকে বের করে নিয়ে এল। ভাবছো ইয়াঙ্কিরা ভালো এদের চাইতে? চার চারবার আমি মিউনিক রেডিও থেকে বক্তৃতা করেছি। চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছি একটা। আর ওরা কিনা আমাকে বানিয়ে দিল আগুন-নেভানো দলের রক্ষী। ঐ ঘৃণ্য বার্নসনটার চাইতে ঢের বেশি ভালোভাবে আমি রুশদের ব্যাপার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

পাশের টেবিল থেকে বুড়ো মোশেনস্টেন বলে উঠলঃ

তোমার এতটা উত্তেজিত হওয়ার কারণটা তো বুঝতে পারলাম না। আমি রুশিয়া ছেড়ে এসেছি বিয়াল্লিশ বছর আগে। আমেরিকায় থেকে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে আমার। এ-দেশটাও অন্য যে-কোনো দেশেরই মতো। কিন্তু তুমি এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠোনি। তার কারণ মাত্র দু বছর আছো তুমি এদেশে। এখন থেকে চল্লিশ-বছরের ভিতরে সম্পূর্ণ ধাতস্থ হয়ে যাবে। বোধহয় ঢের টাকা-কড়িই রোজগার করবে। আর কি চাই তোমার? কিন্তু যদি তুমি মনস্থই করে থাকো যে রুশিয়ায় ফিরে যাবে তাহলেই বা কে ঠেকাচ্ছে তোমাকে। ইতিমধ্যে একবার তো গিয়েছিলে নিউইয়র্কে 'লাল'দের সঙ্গে দেখা করতে। যাও আবার গিয়ে দেখা করো। ওরা বাধ্য তোমাকে দেশে ফিরে যেতে দিতে। তারপর ফিরে গিয়ে আবার ওদের নাটক সংশোধন করে দাও গে, যাও।

রাগে ফেটে পড়লো খলপচেঙ্কো। এক্ষুণি হয়তো বুড়োটার মুণ্ডুপাত করতে পারতো। কিন্তু ও তখন মাতাল, কি বলছে না বলছে কিছুই খেয়াল নেই।

সত্যি সত্যি ভাবো না কি যে আমি গিয়েছিলাম ঐ লাল ব্যাটাদের কাছে? মাথা খারাপ হয়নি আমার! তোমরা রুশিয়া ছেড়ে এসেছিলে জারের আমলে। এসব ব্যাপারের কী জানো তোমরা? বার্নসন জোর হাত করে অনুনয় করেছিল আমার কাছে ইয়াঙ্কিদের সাহায্য করার জন্যে—তাদের উদ্ধার করার জন্যে। বেশ বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিল ওরা। আমাকে আদালতে হাজির করার আগে জীবনে কোনো দিনই মিনাইয়েভকে চোখে দেখিনি। ওর দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজনও হয়নি আমার কোনো দিনও। ওকে যদি বাইরে বের করে দেয়া হয় তবে দেয়া হবে এই জন্যেই যে ও এম. জি. বি-র চর। তোমরা এদেশে এসেছিলে ডলারের লোভে, কিন্তু আমার নিজস্ব আদর্শ আছে......। ওদের হয়ে আমি যা করেছি তার জন্যে বার্নসন আমাকে কথা দিয়েছিল একটা কাগজের সম্পাদক করে দেবে। কিন্তু না. লোকটা আদৌ কূটনীতিক নয়, একটা আস্তো পাজী।

আরো মিনিট পনেরো ধরে চেঁচামেচি করার পরে খলপচেঙ্কো বাড়ি চলে গেল। আর মোশেনস্তান তার সমসাময়িক দেশের মানুষ লেভিনের সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। মোশেনস্তোন বলল, সব দেশেই খারাপ আছে কিন্তু আমেরিকার ব্যাপার-স্যাপার ঢের বেশি খারাপ।

ভাবো, আমি জানি না যে ওরা আমাকে দিয়ে দুপয়সা করে নিচ্ছে? কচি-ছেলে নই আমি। জানি আমি ঠিকই। তুমি বলবে ওরা শোষক—বেশ তো কি এলো গেল তাতে? যারা শোষকহীন বব্রুইস্কে বাস করছে তাদের তুলনায় এই ডেট্রয়েটে তোমার যে ঐ শোষকদের ভিতরে ঢের বেশি সুখে স্বচ্ছন্দে আছি আমি।

ভালো চাকুরি-পাওয়া একটা দালালের মতো কথা বলছো তুমি। আমিও কিছু আর কচিছেলে নই। আমি একজন মজুর। বরং দারিদ্র্যের মধ্যে থাকবো সে-ও ভালো, তবু ঐসব নোংরামির মধ্যে থাকবো না। শুনলে তো ঐ বদমায়েশটা কী বলে গেল? ঘুস দিয়েছে ওকে। এ তো সাফ কথা। রুশদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে আক্রমণের কাজে লাগাতে ওরা যে-কোনো ঘৃণ্য অপরাধ করতেও পিছ পা নয়।

দুজনে ঝগড়া করেই চলল যতক্ষণ না দমবৌস্কি বলল যে দোকান বন্ধ হবার সময় হয়েছে।

দুদিন পরে "মিঃ বার্নসনের কাজ কি"? শিরোনামা দিয়ে একটি ছোট্ট হুল-ফুটানো প্রবন্ধ বেরুল "ডেইলি ওয়ার্কার"-এ। প্রবন্ধটি লিখেছে পুরনো সংবাদ-দাতা জো লেভিন। লিখেছেঃ

মিনাইয়েভের ব্যাপার সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে রয়েছে। তাই আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে সরকার পক্ষের একমাত্র সাক্ষী মিঃ খলপচেঙ্কো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে যে তার সোবিয়েত বাণিজ্য-প্রতিনিধি-কেন্দ্রে যাওয়ার কথা বা মিনাইয়েভের সঙ্গে আলোচনা হওয়ার কথা মোটেই সত্য নয়। মিঃ খলপচেঙ্কো এ-কথা আদৌ গোপন করেনি যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বার্নসনের পরামর্শ অনুসারেই সে সাক্ষী দিয়েছে। অবশ্য একথা আমরা সবাই জানি যে সরকারের বর্তমান সোবিয়েত-বিরোধী নীতির পিছনে যারা রয়েছে বার্নসন তাদের অন্যতম। কিন্তু আমরা এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে এফ. বি. আই ও পেন্টাগনের অন্যান্য শাখার সাজানো মিথ্যায় প্রলুব্ধ হয়ে উঠে এটা আমরা আশা করিনি। এ-প্রশ্ন করার অধিকার আছে আমাদের যে "মিঃ বার্নসনের সত্যিকারের কাজটা কী"?

প্রবন্ধটা পড়ে কর্নেল রবার্ট হাসলো। থোতা মুখ ভোঁতা হয়েছে বার্নসনের। অ-পেশাদার হলে যা হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টে কি পরিমাণ সোরগোল যে পড়ে যাবে সেটা আন্দাজ করতে পারছে রবার্টস। ওদের বেশ শিক্ষা হবে। উচিত ছিল এসে ওর সঙ্গে পরামর্শ করা। তার পর চিন্তা করল রবার্টসঃ কূটনীতিকেরা তো ডিগবাজি খেল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে ঐ লালগুলোর জয় হোক। আজ হোক কাল হোক মিনাইয়েভকে দেশ ছাড়া হতেই হবে। কিন্তু খলপচেঙ্কোর মতো মানুষ সত্যিই ভয়ের কারণ—কুৎসা প্রচারের ভয় দেখিয়ে ঠক বাজি করার চেষ্টা করতে পারে ব্যাটা......

ডুব্‌বেল্টের কাছে একটা জরুরি সংবাদ পাঠালো রবার্টস।

ব্যাপারটা নিয়ে ওরা কোথায় আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাতে চাইছে?—রাগে কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল এটর্ণি জেনারেল।—একটা কুৎসিত অপমান জনক অবস্থার ভিতরে এনে ফেলে দিয়েছে আমাকে। বার্ণসন বলেছিল,—খলপচেঙ্কো ভদ্রলোক। হুবহু এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সব রুশ গুলোই বদমায়েশ। আর বার্ণসন হচ্ছে আমেরিকার সেরা গাধা। আটান্ন বছর বয়েস আমার, এ বয়সে কাঁচা ছেলের মতো হাস্যাস্পদ হতে চাই না আমি।

শোনো, উত্তেজিত হয়ো না,—অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলল ওর স্ত্রী।—জানো তো, তোমার উত্তেজিত হয়ে ওঠা বারণ। এ মামলাটা আর চালাবে না বলে দাও। ব্যস, ইতি করে দাও এখানেই। আমি ঠিক বলতে পারি এই ব্যাপারটাতেই তোমার রক্তের চাপ এতোটা বেড়ে গেছে।

দফা রফা হয়ে গেল বার্নসনের। বুঝতে পারল যে ওর হাতের কারসাজিটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই ও সাক্ষী হাজির করেছিল। খলপচেঙ্কোকে বিশ্বাস করাটা বোকামি হয়ে গেছে। যে লোক এতো সহজেই তার নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সে যে অন্য দেশের প্রতি আরো সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে তো জানা কথা। কিন্তু বার্নসন রেহাই পাবে না কিছুতেই। সবাই তো হাত ধুয়ে বসেছে, বলছে —"কে এক বার্নসনই দায়ী এর জন্যে"। কোনো একটা অফিসে চালান তৈরির চাকুরি খুঁজে নিতে হবে ওকে। বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বার্নসন। যখন একজন সেক্রেটারি এসে বললো যে "মস্কো লিটারারি গেজেটে" কোনো প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ আছে কি না। যদি বেরিয়ে থাকে তবে বয়েড সেটার অনুবাদ চাইছেন।

শূন্য দৃষ্টি মেলে বার্নসন তাকালো ওর মুখের দিকে।

বে-বে-বেরিয়ে যাও!—প্রত্যুত্তরে অতিকষ্টে তোতলাতে তোতলাতে শুধু বলতে পারলো বার্নসন।

দু দিন পরে ডেট্রয়েটের এক সংবাদপত্রে চোখা "কমিউনিস্ট কাগজের নির্লজ্জ ইঙ্গিত" শিরোনামা দিয়ে খলপচেঙ্কোর এক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ-পত্র ছাপা হল। তাতে হলপ করে এ কথা বলা হল যে ও আদালতে যে সব কথা বলেছে তার প্রতিটি বর্ণ সত্য। অবাক হয়ে গেল বার্নসন। সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল ওর মনোবল। স্ত্রীর কাছে বলল ঃ

মামলাটা শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে উঠছে।

ওগো মশাই, একটু সাবধান.—প্রত্যুত্তরে বলল ওর স্ত্রী,—একটা বাড়তি একরারনামার জন্যে এটর্নি জেনারেল খলপচেঙ্কোকে আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে অবশ্য হাজির হয় নি। কাগজে খবর বেরিয়েছে যে চৌঠা এপ্রিল রাত্রে দমবোস্কির শুঁড়ীখানা থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বন্দুকধারী আততায়ী গুলি করেছে খলপচেঙ্কোকে। অবশ্য পুলিস এখনো লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। খবরে আরো বলেছে যে লাল-দের দ্বারাই এই অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরা চাইছিল সব চাইতে বিপজ্জনক সাক্ষীটিকে সরিয়ে দিতে। "ডেইলি ওয়ার্কারে" জো লেভিনের আর একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাতে জোর দিয়ে বলেছে যে খলপচেঙ্কো ছ'জন সাক্ষীর সামনে তার স্বীকারোক্তি করেছিল। তাছাড়া কোনো কাগজের সম্পাদকের কাছে চিঠি লেখার মতো অবস্থাই ছিল না ওর। কারণ গোটা সপ্তাহই সারাক্ষণ মদে চুর হয়ে ছিল খলপচেঙ্কো। খলপচেঙ্কোর খুনের সূত্র খোঁজা হচ্ছে ভুল জায়গায়। সমস্ত সূত্র ঐ একই লোক বার্নসনের দিকেই প্রসারিত।

আ-আ-আ খু-খু-খুন করে ফেলবো মিথ্যুকটাকে!—গর্জে উঠল বার্নসন। আর অত্যধিক উত্তেজনায় বিছানা নিলো এর্টার্নি জেনারেল মারে।

৮ই এপ্রিল এক সম্বর্ধনা সভায় পত্রিকাজগতের শাহান্‌শাহ্‌ ডুলিট্‌ল্‌-এর সঙ্গে দেখা করলেন দানিলেভস্কি। দুজনে লউঞ্জে হেলান দিয়ে বসে শেরি খাচ্ছিলেন। দানিলেভস্কি জানতেন সে যে রাষ্ট্রীয় দপ্তরকে ঘৃণা করে ডুলিট্‌ল্‌। এক হপ্তা আগে ওর কাগজে লিখেছিলঃ

আমরা যখন বার্লিনের কয়েকটি জেলা উদ্ধার করতে ব্যস্ত ওদিকে তখন চীনা কমিউনিস্টরা অর্ধেক চীন দখল করে নানকিঙ-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। যখন আমরা দারুণভাবে লুক্সেমবুর্গের জন্যে এক দল সৈন্য সুসজ্জিত করতে উঠে পড়ে লেগে গেছি, ও দিকে তখন চীনা কমিউনিস্টেরা চিয়াং-কাই-শেকের বাহিনীর কাছ থেকে আমেরিকার সব চাইতে সেরা সেরা সব অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের কূটনীতিকেরা ভুলে গেছে যে এশিয়া ইয়োরোপের চাইতে কম মূল্যবান নয়।

ডুলিট্‌ল্‌-এর ব্যক্তিগত কারণও ছিল এই ঘৃণার। ওর ভাই—চোদ্দ বছর ধরে যে কূটনীতিক বিভাগে কাজ করে আসছে—তাকে স্থানচ্যুত করে কিনা একজন তরুণ ডেমোক্রাটকে ঢুকিয়ে নিয়েছে রয়েড।

প্রথমে ওঁরা দুজনে এ কথা সে কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা করলো। ডুলিট্‌ল্‌ জিজ্ঞেস করল রুশরা কি খায়—সিগারেট, চুরুট না পাইপ? দানিলেভস্কি যখন বুঝিয়ে বললেন রুশ পাপিরোসিটা কি, হো হো করে হেসে উঠল ডুলিট্‌ল্‌ঃ

যাই বলুন ও জিনিস আমার চলবে না কোনো ক্রমেই। আমি কাগজ চিবুই—

দানিলেভস্কি হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেনঃ

সোবিয়েত আইনজীবীর মামলা নিয়ে বর্তমানে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি এ সম্পর্কে কি মনে হয় আপনার মিঃ ডুলিট্‌ল্‌?

সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে গেল ডুলিট্‌ল্‌। নিজের মতামত প্রকাশ করার চাইতে দানিলেভস্কির বক্তব্যটা কি তাই শোনার দিকেই ওর আগ্রহ বেশিঃ

ঐ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নই আমি। ও ব্যাপারটা সম্পর্কে বলবেন কি আমাকে?

সংক্ষেপে মূল বক্তব্যটা বলে গেলেন দানিলেভস্কি। নির্দেশনামাটার অসম্ভাব্যতার উপরে মন্তব্য করলেন। বললেন খলপচেঙ্কোর জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগের অতীত ইতিহাসের কথা। আর তার খুনকে কেন্দ্র করে যে রহস্যজাল গড়ে উঠেছে তার কথা।

বার্লিনের বশংবদদের পক্ষে আর কোনো পথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই এই ধরণের করুণ-প্রহসনের অবতারণা ঘটেই থাকে।—বলতে লাগলেন দানিলেভস্কি।—আপনারা বলে থাকেন "মুক্তদ্বার" নীতির কথা, বলে থাকেন আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা। কিন্তু প্রতিনিয়তই আন্তর্জাতিক আইনের বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে। আমরাও যদি আপনাদেরই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করি তখন কি বলবেন?

হেসে উঠল ডুলিট্‌ল ঃ

একশ বার আমি যে কথা বলেছি, আবারও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। বৈদেশিক নীতি কি করে পরিচালনা করতে হয় তা আমরা জানি না। আপনি জানেন যে আপনাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। এক অদ্ভুত অসম্ভব রাষ্ট্রব্যবস্থা আপনাদের—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার কথা? একেবারে অসম্ভব। যা নাকি বিশেষ করে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে সেটা হল এশিয়ার ঘটনাবলী। একদিন না একদিন তাও খুব সুদূর ভবিষ্যতের কথা নয়, হয় তো খুবই সম্ভব যে আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে নামতে হবে। কিন্তু যতো দিন সে যুদ্ধ না হচ্ছে ততদিন নিশ্চয়ই আমাদের শান্তি সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু না-যুদ্ধ. না-শান্তি এই যে একটা অবস্থা আমাদের কূটনীতিকেরা আবিষ্কার করেছেন এটাই হল সব চাইতে খারাপ জিনিস। এই আলাপ-আলোচনার জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ মিঃ দানিলেভস্কি। আমি কিন্তু কোনো দিনই রুশ সিগারেট খেতে পারবো না, তা জেনে রাখুন।

আলাপ আলোচনায় সন্তুষ্ট হলেন দানিলেভস্কি। বস্তুত দুদিন বাদেই ডুলিট্‌ল্‌-এর কাগজ টেনেসী ঘটনার একটি একটি করে সমস্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল রাষ্ট্রীয় দপ্তরকে।

বার্নসনকে ডেকে পাঠালো বয়েড।

সব কিছু জগাখিচুড়ি পাকিয়ে বসে আছো। কে বলেছিল তোমাকে এ ধরণের চমক মারার চালাকী করতে? কোত্থেকে এই খলপচেংকোটাকে যোগাড় করেছিলে তা জানতে চাই না আমি, কিন্তু কী করলে তাকে?

আপনি যা জানেন তার চাইতে বেশি কিছু আমি জানি না। ওকে আমি সাক্ষী দেয়ার জন্যে হাজির করেছিলাম, এ কথা ঠিক। আপনি নিজেই বলেছিলেন যে মিনাইয়েভের অপরাধ প্রমাণ করতে হবে আমাদের।

আমি বলেছিলাম তোমাকে যে আমাদের পক্ষের যে সব রুশ আছে তাদের সংগে পরামর্শ করে এটর্নি জেনারেলকে মামলা চালাবার মতো মাল-মশলার যোগান দিতে। কিন্তু কি করলে তুমি? খুন? পড়ে দেখো ডুলিট্‌ল্‌-এর কাগজে কি লিখেছে। তোমার ভাগ্য ভালো যে তোমাকে আমি এক্ষুনি এখানে গুলি করে মেরে ফেলতে পারছি না। কারণ তা করলে লালগুলোর চ্যাঁচামেচি করার মতো খোরাক জুটে যাবে। তোমাকে ছুটি নিতে হবে। কিন্তু এখানে আর ফিরে আসছো না।

মিনাইয়েভকে যখন বলা হল যে ওকে আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল মিনাইয়েভ ঃ

এটা অবিশ্যি যথার্থ কথা। মানুষের আতিথ্যের অপচয় করতে নেই। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে এটর্ণি জেনারেলের জন্যে। ভয় হচ্ছে হয়তো আমাদের বিচ্ছেদ ব্যথাটা সহ্য করতে পারবেন না!

মিনাইয়েভকে বিদায় দিতে গিয়ে হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে গেল দানিলেভস্কির ঃ

বাণিজ্য-প্রতিনিধি দলের ঠিকানায় তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে। একটি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এসেছে চিঠিটা। আমার মনে হচ্ছে একটি ঝাড়ুদারণী। স্ত্রীলোকটি তোমাকে জানাতে চাইছে যে সব আমেরিকানরাই বদমায়েশ নয়। আর জানিয়েছে তোমার নিরাপদ যাত্রাপথে তার শুভেচ্ছা। চিঠিটা সত্যিই অন্তর স্পর্শ করে। কাগজে লিখেছিল তোমার কাছে কতগুলো হাতে লেখা খসড়া কাগজ পেয়েছিল। তুমি কি লেখার মনস্থ করেছিলে না কি?

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল মিনাইয়েভ।

ও কিছু নয়। যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা—

বেশ, এবার তো প্রচুর নতুন ধারণা পেলে। একটা আস্তো উপন্যাস লিখে ফেলতে পারবে। শিগগিরই তুমি মস্কো পৌঁছাচ্ছ আর পৌঁছাচ্ছ গিয়ে তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে। তোমার কাছে একটা বড়োগোছের অনুগ্রহ চাইছি আমি। আমার মেয়েটির কাছে একবারটি ফোন করো। নম্বরটা লিখে নাওঃ ভি, কিরভস্কায়া, ১-৪৯-০০। মারুশাকে ডাকবে। তাকে বলো এই গ্রীষ্মে আমাকে বাড়ি আসতে দেবে বলে আশা করছি। তাছাড়া আমার স্নেহালিঙ্গন জানিও ওকে। যাই হোক, নিজেই জানো তুমি.........

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে দানিলেভস্কি রেডিও খুলে দিলেন। এখন মস্কোয় ঠিক দুপুর রাত। শুনতে পেলেন ক্রেমলিনের ঘণ্টাধ্বনি. যানবাহনের ঘর্ঘর শব্দ। তার পরেই সব চুপ। আর তিন সপ্তাহ পরে মারুশা তার আঠারো বছরে পা দেবার জন্মদিন পালন করবে। দশম শ্রেণীতে পড়ছে এখন। শিগগিরই পরীক্ষা শুরু হবে। হয়তো এখন একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই বোধহয় প্রেমে পড়েছে। আর এখানে সে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানে না দানিলেভস্কি। ডুলিটল্-এর মতো লোকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চলেছি। অবশ্য, খুবই দরকারী এসব। কিন্তু মারুশাকে একবারটি দেখার জন্যে কী তীব্র আকাঙ্খাই না জন্মেছে ওর অন্তরে! হয়তো মারুশা থিয়েটারে গিয়েছিল। আর এখন ফিরে চলেছে বাড়ি,—ইয়াকিমানকায়। এটা বসন্তকাল। হয়তো বরফ গলে গেছে। আকাশের বুকে জেগে উঠেছে ঠাণ্ডা নীল চাঁদ। তারপর আসবে পুল আর রাস্তার আলোগুলো। দোরের পথে হয়তো কেউ হেসে উঠবে.........

মে-দিবসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে মস্কো। পথে পথে উড়ছে পতাকা, ঝুলছে প্রতিকৃতি। ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে বসন্তকালীন ঝাড়ামোছার পালা। পালিশ পড়ছে জানালায়। মেঝেতে মেঝেতে মোমঘষা। রান্নাঘরে বসে মারিয়া মিখেই-লোভনা নেচি কাটছিল। হঠাৎ শুনতে পেল হলঘরে ওর ছেলের গলা। প্রথম-টায় বিশ্বাস করতে পারে নি। হয়তো বা ওর মনের ভ্রম—ভেবেছিল মনে মনে। আর এটা এই প্রথমই নয়। কিন্তু মিতিয়া ঢুকে এলো ঘরের ভিতরে। দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে। হাতে তখনো ময়দার নেচি মাখা। মিতিয়ার কণ্ঠলগ্ন হয়ে রইল—খুবই ছোট, খুবই শীর্ণ লাগছিল।

মিতিয়া, বাবা. কি করেছিল ওরা তোকে?

এক ব্যাটা বদমায়েশ একটা বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল আজীবন থাকবে। কিন্তু এক হপ্তা যেতে না যেতেই ছিঁড়ে গেল—

তারপর এলো ওলেয়া। ঘন আলিঙ্গনে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে বেড়ার আড়ালে চলে গেল। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলো না মিতিয়া মুখ ফুটে। ওলেয়াও নিশ্চুপ। অবশেষে বহুক্ষণ পরে সমস্ত ঘটনাটা বলতে শুরু করল মিনাইয়েভ ঃ

দেখলে তো এই সংকটের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াটা কি ভীষণ কঠিনই না হয়ে পড়েছিল ওদের পক্ষে? ভালো দর্জী আছে ওদের। কিন্তু যখন আইন ঘটিত ব্যাপার ঘটে তখন তার মূল্য বিশেষ কিছু থাকে না...এখন আমি জানি...

দাঁড়াও,—অস্ফুট কণ্ঠে ফিস ফিস করে বলে উঠল ওলেয়া। ওর ভয় হল বুঝিবা মিতিয়া ওকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বলেই চলল মিনাইয়েভ ঃ

এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে কিছুই জানতাম না আমি। তুমি যে আমার জীবনে কতোখানি তা জানতাম না এর আগে। জানতাম না আমাদের দেশের মানুষ যে কি। মুখে বলতাম সব সময়েই কিন্তু উপলব্ধি ছিল না, বুঝতাম না।

এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল মিনাইয়েভ যে সেটা ওর নিজের পক্ষে অস্বাভাবিক। ওলেয়া আর চোখের জল চেপে রাখতে পারল না।

সাঁইত্রিশ

ডাক আসে সাধারণত সন্ধ্যেয়। কিন্তু সেই দিন বেলা থাকতেই স্থানীয় খবরের কাগজটা বিলি হয়ে গেল। আর কারখানার ক্যানটিনে বসে ক্রান্ত্‌স পড়তে লাগল কাগজটা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করল। সাধারণত এই পাতাটায়ই কাজের নতুন পদ্ধতি, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের হিসেবনিকেশ ইত্যাদি সম্পর্কে আকর্ষণীয় প্রবন্ধ থাকে। কোনো দিন হয়তো বা ও যেখানে কাজ করে সেই কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা সম্পর্কে কিছু ভালো বা মন্দ মন্তব্য থাকে। ঘড়ির কারখানার বিশৃঙ্খলার উপরে লেখা একটি প্রবন্ধ মন দিয়ে পড়লো ক্রান্ত্‌স্। তারপর শীতকালীন ফসল বোনার উপরে লেখা রিপোর্টের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চলে গেল চারের পাতায়। গ্রীসের গ্রামোস পর্বতশ্রেণীর কাছে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করছে। আমেরিকায় বারো জন কমিউনিস্ট পার্টি নেতার বিরুদ্ধে মামলা চলেছে। ফ্রান্সে খনি-মজুরেরা করেছে ধর্মঘট। কাগজটা রেখে দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আমেরিকার শাসন-যন্ত্রের আর একটা জবরদস্তি কাজের উপরে ছোট্ট একটা সংবাদ ওর নজরে পড়ল; নিউইয়র্কে সোবিয়েত বাণিজ্য-প্রতিনিধি দলের আইন-উপদেষ্টা গ্রেপ্তার হয়েছেন।

বটে!—উচ্চ কণ্ঠেই বলে উঠল ক্রান্ত্‌স্। যদিও কাছেপিঠে কেউ ছিল না। কোনো কিছুতে অবাক হয়ে গেলে যেমন হয়ে থাকে ওর, তেমনি ভ্রূ দুটো

কপালে উঠে গেল। সেই মিনাইয়েভই কিনা. অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো ক্রান্ত্স্।

ওর স্মৃতি উদ্ভাসিত করে জেগে উঠল এক অসহনীয় তপ্ত দিনের কথা, স্তেপভূমি আর সেই ফোস্কা-পড়ানো উড়ন্ত ধুলো-কাদার কথা। সকাল থেকেই বোমার আক্রমণ চলেছে ওদের উপরে। আক্রমণের পর আক্রমণ। হেড কোয়ার্টারে ডাক পড়ল ওর। এক জন বন্দীকে ধরে আনা হয়েছে তাই একটি দোভাষীর দরকার। ক্যাপটেন মিনাইয়েভই জবানবন্দি নিচ্ছিলেন। চিনতো তাকে ক্রান্ত্স্। একবার একটা গোটা সন্ধ্যে দুজনে কাটিয়েছিল হাইনৎস্-এর কবিতা আলোচনা করে। ক্যাপটেনের ভারি মজার একটা ছোট্ট কুকুর ছিল। পাগুলো ছোট ছোট আর সব সময়েই ডাকতো ঘেউঘেউ করে। কুকুরটাকে ডাকা হতো গোয়েবেলস বলে। জবানবন্দী নেয়ার সময়ে কুকুরটাও হাজির ছিল সেখানে।

শোনো। তোমরা ভলগা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছ আর এখন বসে বসে পায়-তারা করছ। ব্যাপার কি? এ সম্পর্কে কী বুঝিয়েছে তোমাদের অফিসার?

বন্দী খানিক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিলঃ

অফিসারেরা বলে, রুশদের এখানে সম্পূর্ণ পাগল নিয়ে গড়া একটা বিশেষ ধরণের বাহিনী আছে।

হাসি চেপে রাখতে পারলো না ক্রান্ত্স্ কিছুতেই। কিন্তু পরম গাম্ভীর্যের সংগে বললো মিনাইয়েভঃ

তাকে বলগে তাদের হিসেব মতো আমাদের দেশের সর্বত্রই পাগল আছে। আঠারো কোটি মোট। আর আমরা যখন বার্লিনে গিয়ে পেঁছাবো তখন তার সংখ্যা হবে দ্বিগুণ।

এই কি সেই মিনাইয়েভ? বলতো, সে একজন আইনজীবী। অসম্ভব! কূটনীতিক জাতের লোকই নয় সে। ওর মতো লোককে নিশ্চয়ই পাঠাবে না। ঢেরঢের মিনাইয়েভ আছে। একজন কবি আছে না ঐ নামে? চিন্তাটা ঘুরে ফিরে আসতে লাগল ওর মনে। অবশেষে মনে হল এই মিনাইয়েভই সেই মিনাইয়েভ হবে নিশ্চয়ই যাকে ও জানতো ক্যাপটেন হিসেবে। যুদ্ধের দিনের স্মৃতির ভিতরে ডুবে গিয়ে বসে রইল ক্রান্ত্স্। এমন সময়ে ডাক এলো ডিরেক্টরের কাছ থেকে। চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এল।

ডিরেক্টর জানালো যে ওকে যেতে হবে ৮১৬ নম্বর রাষ্ট্রীয় খামারে। সেখান থেকে খবর পাঠিয়েছে যে শস্য-মাড়াই কলটা চলছে না ঠিক মতো।

ওদের মগজই চলছে না ঠিক মতো.—মুচকি হেসে বলে উঠল ক্রান্ত্স্।—ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি এক্ষুনি।

বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পেল মজুরেরা রাস্তা মেরামত করছে। কেউ কাজ করছে, কেউ শরতের তপ্ত রোদে বসে বসে তামাক খাচ্ছে।

তেমন গা লাগিয়ে খাটছো না, তাই না?—পাত্রিকেইয়েভের দিকে তাকিয়ে বললো ক্রান্ত্স্।

একটু তামাক খাওয়ার জন্যে এইমাত্র একটুখানি বসেছি, আলেকজান্দার ইলিচ।

রাস্তাটা উঁচু করতে হবে আর তোমরা—আচ্ছা কি করছো তোমরা বলো তো? বসন্তকালে আবার সব নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। আমাদের কারখানাটা হচ্ছে একটা বিশেষ দরকারী কারখানা। কিন্তু শীতকালে একটা তিন টন্ লরিও যেতে পারেনি এ রাস্তা দিয়ে। লজ্জার কথা।

সর্ববিদ্যা-বিশারদ যা বলে গেল কথাটা খুবই ঠিক।—ক্রান্ত্স্ চলে যাওয়ার পরে বললো পাত্রিকেইয়েভ,—যদি আমরা এটা উঁচু করে না বাঁধি তো আবার এটা ভেসে যাবে। সেটা সত্যিই একটা কেলেঙ্কারি কান্ড হবে।

ক্রান্ত্স্ কারখানায় এসেছে আগের বছরে। কারখানার পরিচালককে খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে। চাঁছাছোলা মুখ মস্কোর কেতায় পোশাক পরিচ্ছদ পরা তরুণ যুবকটিকে দেখে নিনা কাস্তিলেভনা ভাবলো যে লোকটি নিশ্চয় একজন শিল্পী, এসেছে পেঞ্জা থেকে। কারণ সেদিন ক্লাবে গান-বাজনা হওয়ার কথা ছিল। সঙ্গীত-অনুরাগী নিনা সোৎসাহে বলে উঠল:

নিশ্চয়ই আপনি একজন সঙ্গীত পরিচালক, তাই না?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি হচ্ছি একজন ইঞ্জিনিয়ার। এসেছি কাজে বহাল হতে।—হেসে জবাব দিল আগন্তুক। কারখানার পরিচালককে খুঁজে ফিরছি। আমার নাম আলেকজান্দার ইলিচ ক্রান্ত্স্। তবে শুনে যদি খুশী হন তো বলি যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই আমার জানা—যাকে বলে একজন সর্ব-বিদ্যা বিশারদ।

অফিসের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আর সেই থেকেই ক্রান্ত্সের নাম হয়ে গেল সর্ববিদ্যাবিশারদ।

দু দিন পরেই সবাই বুঝতে পারল যে পরিহাস ছলে ক্রান্ত্স্ যে তার বিদ্যার ফিরিস্তি দিয়েছিল সেটা তেমন কিছু অতিরঞ্জিত ব্যাপার নয়। সবাই বলতো ওর 'সোনার হাত'। সব কাজই করতো সুন্দর করে। রান্নাঘর থেকে কারখানার ক্যানটিন পর্যন্ত একটা লিফট তৈরি করে দিল ক্রান্তস্ যাতে খাবার ঘরের পরি-চারিকাদের সিঁড়ি ভেঙে বার বার উপর নীচ করতে না হয় আর খাবারগুলো গরম থাকে সব সময়ে। একটা বিরাট বাগান তৈরি করে ফেলল ও। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, শুধু যে রকমারি ফুলের নামই জানে তাই নয়, কি করে বাগানের পরিচর্যা করতে হয় তাও জানে। মাটি কোপানো, গাছনিড়ানো, সার দেয়া জানে সব কিছুই। তারপর পয়লা মে যখন কারখানার ক্লাবে বিচিত্র অনুষ্ঠান হল, দেখা গেল সর্ববিদ্যাবিশারদ অপূর্ব সুন্দর বাজালো—শুধু বাঁশীই নয়, পিয়ানো পর্যন্ত।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ভাষাতত্ত্ববিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে এসেছে ক্রান্ত্স্। সাহিত্যে ওর প্রবল অনুরাগ। শিখল জার্মাণ। আর গোপনে গোপনে কবিতা লিখে এক বন্ধুর লেখা বলে মেয়েদের পড়ে শোনাতো। মা-র ইচ্ছে ছিল ও পড়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে। এদিক থেকে ওকে ভাবতো সবাই সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন। অতি সহজেই ওর মনে উৎসাহের সঞ্চার হল। সব কিছুই ওকে আকর্ষণ করত, মুগ্ধ করত। একদিন এক অতিথি যখন ওর মায়ের কাছে বলছিল মস্কো পুনর্গঠনের পরিকল্পনার কথা, শুনে মনে মনে ঠিক করলো ক্রান্ত্স্ যে ও নিজেও

একজন স্থপতি হবে। অতিথি ভদ্রলোক ছিলেন একজন স্থপতি। এটা ঘটেছিল শীতকালে। কিন্তু এপ্রিল মাসে একদিন একটা গোটা দিন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এক বন্ধুর কাছে কাটিয়ে দারুণ উৎসাহিত হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। মায়ের কাছে এসে বললোঃ

আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হচ্ছি আমি। প্রথমত আজকের দিনে এটাই হচ্ছে সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস। তাছাড়া দারুণ মজার। ওরা ওখানে সব কিছুই তৈরি করতে শেখায়।

এই নির্বাচনের জন্যে ওকে পস্তাতে হয়নি কোনো দিন। জীবন ওর কাছে রঙে রসে আনন্দে ভরপুর হয়ে দেখা দিল। যে দিকেই তাকিয়েছে সে দিকেই অনুভব করেছে আকর্ষণ।

যখন যুদ্ধ শুরু হল, ওর বয়েস তখন বাইশ বছর। বিয়াল্লিশের বসন্ত-কালে এক প্লেটুন স্যাপারের অধিনায়ক করে ওকে পাঠালো যুদ্ধক্ষেত্রে। তীব্র যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল খারকভ থেকে স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত। লেপটে-ন্যাণ্ট ক্রান্ত্‌স্‌ জার্মান ভাষা জানে এ কথা শুনে ওর কর্ণেল ইগনাতভ প্রায়ই ওকে ডেকে পাঠাতো বন্দীদের জবানবন্দি নেয়ার সময়ে বা যে সব দলিলপত্র ধরা পড়তো তার তর্জমা করাবার জন্যে। পরে ওকে বদলি করা হল সপ্তম বিভাগে। সেখানে ও লাউড স্পিকারে জার্মানদের আত্মসমর্পণ করার জন্যে আহ্বান জানাতো। ঝিতোমিরের কাছাকাছি গোলার টুকরায় আহত হল ক্রান্ত্‌স্‌। ডাক্তারের দারুণ সন্দেহ ছিল ওর দেহে অস্ত্রোপচার করা সম্পর্কে—হয়ে এসেছে লোকটা। কিন্তু বেঁচে উঠল ক্রান্ত্‌স্‌। আর যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুমাস আগে ফিরে এসে যোগ দিল তার বাহিনীতে।

সেনা বাহিনী ভেঙে দেবার পরে ইনস্টিটিউটে ফিরে গেল ক্রান্ত্‌স্‌। যে সব তরুণ ছেলে মেয়ে যুদ্ধের কিছুই দেখেনি তাদের ভিতরে পড়ে হাঁপিয়ে উঠল ক্রান্ত্‌স্‌ কেমন যেন একটু মনমরা হয়ে গেল। টাটকা তাজা স্মৃতি ওর মনে। কিন্তু দুদিনেই সামলে উঠে পড়াশোনার ভিতরে ডুবে গেল। স্ফূর্তিবাজ বা বাচাল নয় ক্রান্ত্‌স্‌, কিন্তু মিশুক। প্রায়ই ও একনাগাড়ে বহুক্ষণ ধরে শুনতো অন্যের কথা। একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে থাকতো ওর ঠোঁটের কোণে। কিন্তু সে হাসির অর্থ যে কি তা বলা শক্ত—যা শুনতো তাতে খুশী হয়ে হাসতো, না নিছক নিজের চিন্তার দরুণই হাসি ফুটে উঠতো তার মুখে তা বুঝে ওঠা অসম্ভব। সুন্দর আকর্ষণীয় চেহারা ক্রান্ত্‌স্‌-এর। ব্রোঞ্জের মতো গায়ের রঙ। আর অস্বাভাবিক কালো দীপ্তিময় দুটো চোখ। ওকে দেখে মস্কোর অরদিনকা অঞ্চলের লোকের বদলে মনে হবে আরব দেশের কোনো মরূদ্যানের অধিবাসী। মেয়েরা ওকে পছন্দ করতো আর মেয়েদেরও পছন্দ করতো ও খুবই। কিন্তু গভীরভাবে কখনো প্রেমে পড়েনি কারুর সঙ্গে। হতে পারে ও এখনো এমন কারুর দেখা পায় নি যাকে সত্যি সত্যিই ভালো বাসতে পারে। কিংবা বই, বন্ধু আর কাজ নিয়ে এমনভাবে ডুবে থাকে যে ওদিকে নজর দেবার ফুরসুত নেই মোটেই।

যে কারখানায় ওকে বহাল করা হল সেটা বহু দূরের এক গাঁয়ের অঞ্চলে

অবস্থিত। এখনো সেখানে দেখা যায় চকচকে হাতে তৈরি "সাবাফান", চাষীর চিমনিহীন কুঁড়েঘর আর সেই সব বুড়ো লোক যারা যাদুমন্ত্রের জোরে দাঁতের ব্যথা সারিয়ে দেয়। অঞ্চলটা দেখতে ছবির মতো আর লোকজনও গুণী। পরিকল্পনা ছাড়া কোনও কিছুর পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব এ কথা কোনো দিনই স্বীকার করেনি ক্রান্ত্স্। কিন্তু এখানে এসে ওকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হল জড়তার বিরুদ্ধে। যুদ্ধের শুরুতেই কারখানাটা সরিয়ে আনা হয়েছে ঝাপোরোঝ্যাই থেকে আর এই মরু-অঞ্চলেই উঠেছে বেড়ে। শ্রমিকদের ভিতরে কেউ কেউ আছে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ কেউ সাময়িক মজুর, যাদের কাজ হচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ভালো শ্রমিক যারা যন্ত্রের খুঁটিনাটি জানে ভালো করে তারা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তারাও নিজেদের উদ্ভাবিত উন্নতধরণ সম্পর্কে পরস্পর ঈর্ষান্বিত। তাছাড়া নতুন লোকদের শেখানো সম্পর্কে ওদের রাজী করানো দারুণ শক্ত। ক্রান্ত্স্ তরুণ, ধৈর্য কম। মাঝে মাঝে ও হতাশ হয়ে পড়ে যখন ভাবে এক দিকে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমগ্র দেশ, অন্য দিকে দ্রাঝিনদের কর্মবিমুখ অলসতা এ দুয়ের ভিতরে গড়ে ওঠা দুরপনেয় ব্যবধানের কথা। ধূর্ত হাসিতে দন্তবিকাশ করে বলতো দ্রাঝিন:

দেখো না চাকা বসে গেছে। কিন্তু আমার কি করার আছে এতে?

কিন্তু ওর মনোবল ফিরে আসে যখন দেখে হারলামভ লেদ-এর এমন একটা নক্সা এঁকে নিয়ে এসেছে যাতে সেটাকে নানান কাজে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, ফলে অনেক খরচও বাঁচানো যায়। কিংবা যখন দেখে বেলকিন কারখানায় আসে সবার আগে আর যায় সবার শেষে আর তার মেশিনটাকে যত্ন করে ঠিক প্রেমিকের মতো। অথবা যখন বুড়ো ইয়াসিনস্কিকে বলতে শোনে:

বলতে গেলে, সারা দুনিয়া তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে আর তোরা কি পরিকল্পনাটাকে ধ্বংস করার জন্যে লেগে গেছিস?

এ যেন বিভিন্ন ধরণের অসমান এক মানব-বন। কেউ দ্রুত বেড়ে উঠছে, কেউ পড়ছে পিছিয়ে আবার কেউ কেউ বুঝি বা শুকিয়ে ঢলে পড়ছে। পারছে না মাটিতে শিকড় মেলে দিতে। কিন্তু তবুও প্রতিদিনই বনটা বেড়েই চলেছে। কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জয় করা জীবনের মতোই ক্রান্ত্স্ ভালোবাসে তার কারখানাটাকে। তাই এটা ওর কাছে দ্বিগুণ প্রিয়।

৮১৬ নম্বর রাষ্ট্রীয় খামারে পৌঁছে এক নজরেই দেখতে পেল ক্রান্ত্স্ যে ওর কথাই ঠিক। যন্ত্রটা ঠিকই আছে কিন্তু যারা চালায় তারাই জানে না কি করে চালাতে হয় ওটা। সন্ধ্যেবেলা খেতে খেতে কৃষিবিদ প্লাঝকভের সঙ্গে ফসল তোলা আর বন-গড়ার পরিকল্পনার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল:

বিরাট ব্যাপার।—বলল প্লাঝকভ। এখানকার সব কিছুই শুকিয়ে যায়। কিন্তু তবুও আমরা অনেকের চাইতেই ভালো আছি। নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে জলও আনতে পারি। যৌথখামারের চাষীদের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। খুবই খারাপ অবস্থায় আছে ওরা। খড় নেই। কেউ কেউ তাদের নিজেদের

গরুগুলোকে পর্যন্ত জবাই করছে। একবার যদি আমরা অরণ্যবলয় গড়ে তুলতে পারি তা হলেই এই ভাগ্যের শেষ হয়ে যাবে। কাল দেখবেন আমরা নতুন করে বীজ বুনছি। সুযোগ এসেছে বোনার।

আলোচনা বিশ্বের ঘটনাবলীর দিকে মোড় ঘুরল। প্লাঝকভ বললঃ

অদ্ভুত ব্যাপার! ভাবতাম আমেরিকানরা শান্তিপ্রিয় জাতি। ওদের প্রচুর জমি আছে—ভালো জমি, কামড়াচ্ছে কিসে ওদের? আজকের কাগজের খবর দেখেছেন? ওরা আমাদের এক সোবিয়েত আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে। এটা সত্যিই একটা অবৈধ অত্যাচার! সত্যি সত্যিই যুদ্ধ বাধবে না কি আবার?

ভ্রু তুলে তাকালো ক্রান্ত্স্:

মনে হচ্ছে আমি মিনাইয়েভকে চিনি। এক সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। আপনি বললেন 'আমেরিকানরা'. কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ওখানকার সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায়। এটা হচ্ছে মুষ্টিমেয় বদমায়েশের কাজ। সম্ভবত ওরা মাড়াই-কল তৈরি করার চাইতে মাইন ছোঁড়ার কাজে বেশি পয়সা দেয়। তাছাড়া যুদ্ধ—ওরা সাহস-ই করবে না কখনো। কে আর হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়?

বীজ বোনা দেখার জন্যে সকালটা থেকে গেল ক্রান্ত্স্। বীজ বোনা হচ্ছিল হাতে। উপযুক্ত সংখ্যক লোক নেই। তাছাড়া সবাই হল্লা করছে, গালিগালাজ করছে। প্লাঝকভের অবস্থা এমন যে যখন ক্রান্ত্স্ বিদায় নিতে এল খেঁকিয়ে উঠল প্লাঝকভঃ

কী বাপের পিণ্ডি চটকাচ্ছো এখানে?—পরক্ষণেই ক্রান্ত্সকে চিনতে পেরে দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়লঃ

মাপ করুন, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। মাত্র পাঁচ দিনে বোনা শেষ করতে হবে, কিন্তু দেখুন লোক নেই যথেষ্ট।

কারখানায় ফিরে আসার পথে ওর মাথার ভিতরে শুধু খেলতে লাগল কি করে এ অবস্থার উন্নতি করা যায়। আমরা প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে চলেছি কিন্তু লোকেরা আজও সেই একশ বছর আগের পদ্ধতিতে বীজ বুনে চলেছে। রাত্রে রাত্রে কাজ করতে শুরু করে দিল ক্রান্ত্স্ এই সমস্যা সমাধান করার জন্যে। তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে এক-পংক্তি বীজ বোনার হাত-কলের একটা নমুনা তৈরি করে কারখানার পরিচালককে দেখাতে নিয়ে এল।

নিকোলাই স্তেপনোভিচ কোশারেভ বুদ্ধিমান, সৎ, পরিশ্রমী লোক। তার কারখানা কখনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাধা করতে অকৃতকার্য হয়নি। কিন্তু তাঁর স্বভাবে একটা দুর্বলতা আছেঃ চালু অবস্থা থেকে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে তিনি ভয় পান। ব্যক্তিগত জীবনেও এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার দরুণ অনেক দুর্ভোগ বরণ করতে হয়েছে তাকে। এমন কি বিয়ে পর্যন্ত করে বসলেন ভুল করে অন্য মেয়েকে। কারণ গোটা দু' বছর ধরে তিনি যখন ইতঃস্তত করছিলেন তাঁর নির্বাচিত মেয়ের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করতে, মেয়েটি চলে গেল লেনিনগ্রাদ আর সেখানে গিয়ে বিয়ে করে বসল। তারই একটি বন্ধু, যদিও দেখতে তেমন সুন্দরী নয়, তবে উদ্যমশীলা,

মনস্থ করল বিয়ে করবে কোশারেভকে। শেষ পর্যন্ত তাই ওকে একটা সিদ্ধান্তে আসার ঝামেলার হাত থেকে মুক্তি দিল। কারুর সঙ্গে নতুন পরিচয় করতে *হলে ও ঘাবড়ে যেত। কিংবা কোথাও যাবার কথা উঠলে, এমন কি জেলার* সদর শহরে যাবার কথা হলেও ঘাবড়ে যেত। আর ওর চোখের ঘুমটুকু পর্যন্ত যেত উবে। ওর স্ত্রী যদি কখনো আসবাবপত্র এধার ওধার করতো বা ওর পুরানো তেলচিটে টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতো ওকে আর একটা নতুন টুপি কিনে নিয়ে আসতে তাতেও দারুণ অস্বস্তি বোধ করতো কোশারেভ। ছেচল্লিশ সালে একবার ইঞ্জিনিয়ার কসতিৎস্কিকে নিয়ে এক দারুণ ফ্যাসাদে পড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। এক নতুন ধরণের মাড়াই-কল কারখানায় তৈরি করানোর জন্যে ওকে পেড়াপিড়ি করে কসতিৎস্কি। প্রথম চালান মাল খালাস দিতেই চতুর্দিক থেকে অভিযোগ আসতে শুরু করল। কোশারেভকে ডেকে পাঠালো মস্কোতে। ফিরে আসার পরে চারদিন কোশারেভ শয্যাশায়ী হয়ে রইল। মস্কোতে কি ঘটেছে না ঘটেছে সে সম্পর্কে কাউকেই কিছু বললো না। শুধু স্ত্রীর কাছে স্বীকার করলো ব্যাপারটা ঃ

তিনি বললেন, তুমি তো আর খোকা নও। একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল তোমার। ব্যাপারটা কত দূর মর্মান্তিক বুঝতে পারছো? কসতিৎস্কি পরোয়া করে না। সভার্দলভস্কে অন্য একটা কাজ নিয়ে কেটে পড়েছে সে। আর শুধু আমাকেই কি না ওরা কয়লার আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মারল।

তখন থেকেই কোশারেভ আরো বেশি সাবধান হতে মনস্থ করল।

দারুণ উৎসাহে ক্রান্ত্‌স্‌ তার মডেলের সুবিধার কথা বুঝিয়ে বলতে লাগল:-,

ঘণ্টায় দু হাজার মিটার। তার মানে বর্তমান পদ্ধতি থেকে দশগুণ সাশ্রয়।

মাথা নাড়লো কোশারেভ ঃ

খুব চমৎকার। অদ্ভুত চমৎকার......আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। তুমি যদি স্তালিন-পুরস্কারও পেয়ে যাও তাতেও আমি অবাক হবো না।

ক্রান্ত্‌স্‌কে বলতে লাগলো কোশারেভ যে এ ধরণের বীজ বোনার কল বন-ছাউনির নিজের খরচায়ই তৈরি করানো উচিত। তার পর দশ মিনিট বাদে. একটু আগে কি বলেছে না বলেছে ভুলে গিয়ে বলল, বড়ো বড়ো কারখানার উচিত এ-ধরণের কাজের ভার নেয়া। শেষে ঘামে ভেজা মুখখানা রুমালে মুছতে মুছতে বলল ঃ

ক্রান্ত্‌স্‌ চলে যেতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো কোশারেভ:

তোমার এ পরিকল্পনাটা মস্কোয় পাঠিয়ে দাও। এটা আমাদের কারখানার ব্যাপার নয়।

ক্রান্ত্‌স্‌ চলে যেতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো কেশারেভ ঃ

খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ার ক্রান্ত্‌স্‌। মানুষটাও খুব চমৎকার। কিন্তু অন্যের পক্ষে যেটা দশ বছরের কাজ সেটা যদি ও এক বছরে করে ফেলতে চায় তবে ওর পতন অবশ্যম্ভাবী।

মার্চ মাসে আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সম্পাদক গুসেভ এলেন কারখানা পরিদর্শন করতে। মাথাভরা টাক, গোলগাল চেহারা, বয়েস বছর চল্লিশেক। দুটি

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মনোযোগী, তিন ঘণ্টা ধরে ধাতালেন পার্টি সংগঠনের সম্পাদককেঃ

কোথায় আপনার রাজনৈতিক কাজ?

তারপর কোশারেভকে এক নিদারুণ মর্মাঘাত করে বসলেন। বললেন যে তার কারখানার ক্লাব ঘরটাকে দেখাচ্ছে আস্তাবলের মতো। বহুক্ষণ ধরে তিনি কারখানার শপে শপে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আর মন্তব্য করলেন যে তরুণ শ্রমিকদের প্রবীণ দক্ষ শ্রমিকদের পাশে পাশে রেখে কাজ করানো দরকার যাতে করে তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা তারা তরুণদের গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে পারে। বুড়ো ইয়াসিনিস্কিকে জানালেন অভিনন্দন। দেখে শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়লো যে সে ঠিক করল গুসেভকে দেখাবে তার বীজ বোনার কলটা।

পরিকল্পনাটা খুবই নিখুঁত।—দু ঘণ্টা ধরে ওর মডেলটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে আর ক্লান্ত্‌স্‌-এর ব্যাখ্যা শুনে মন্তব্য করলেন গুসেভ।—কিন্তু আমি যেটা ভাবছি সেটা হল এই যে ফলার পাশের নাট এমন হওয়া দরকার যাতে ইচ্ছে মতো বাড়ানো কমানো চলে। তবেই বিভিন্ন গভীরতায় বীজ-বোনা সম্ভব হবে। পাইন গাছ আর লাইম গাছ এক নয়। আবার লাইম গাছ আর ঝাউ গাছও এক নয়। প্রত্যেক গাছের একটা নিজস্ব ধরণ-ধারণ আছে।

অবাক হয়ে গেল ক্লান্ত্‌স্‌। আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকের শুধু যে বন আবাদ সম্পর্কে জ্ঞান আছে তা-ই নয়, কল-কব্জা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। এক্ষুনি তো উনি লাঙলের ফলার বিঁধ কেমন করে বাড়ানো কমানো যায় সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

আপনি জানলেন কেমন করে এ সব? পড়াশুনো করেছেন না কি?

গুসেভ হাসলেন।

এলাকাটা মস্ত বড়ো। রোজই পড়ি আমি।

বীজ-বোনার নলটা নিখুঁত করে গড়ল ক্লান্ত্‌স্‌। তারপর বিস্তৃত বিবরণ শুদ্ধু পাঠিয়ে দিল মস্কো। আর গুসেভের নির্দেশ মতো ঠিক করল বসন্ত-কালীন আবাদের সময়ে নার্সারীতে পরীক্ষা করে দেখবে। ক্লান্ত্‌স্‌-এর সাফল্য কামনা করার পরে মনে মনে বললো কোশারেভঃ

ভালোই হল যে টোপে মুখ দিতে যাইনি। গুসেভই যখন এক নজরে ভুল ধরতে পারলো তখন মস্কোর বিশেষজ্ঞেরা কি-ই না বলবে ভাবো একবার! তারা আমাদের ঐ সর্বকর্মবিশারদের মগজে পোরার মতো দেবেখন বেশ কিছুটা।

গরম আর টিপ্‌টিপ বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে এলো মে-মাস। দুটি ঘটনা ঘটল ক্লান্ত্‌স্‌-এর জীবনে। প্রথমটি হল এই যার জন্যে এতদিন ধৈর্যহীন আকুলতায় দিন গুনে এসেছে ক্লান্ত্‌স্‌ঃ ৮১৬ নম্বর সরকারী খামার ওর যন্ত্রের সাহায্যে চোদ্দ হেকটর বনভূমির অঙ্কুর ক্ষেত্রে বীজ বুনেছে।

অঙ্কুর-মেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের—বলল প্লঝকভ,—কিন্তু মাটির গভীরতা ঠিকই হয়েছে—চার থেকে পাঁচ সেণ্টিমিটার। তাছাড়া বীজের পরিমাণও হিসেব করে দেখা হয়েছে—ঠিক মতোই পড়েছে।

অন্য ঘটনাটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। গাড়ি করে পেস্ত্রুস্কিনো গাঁয়ে গিয়ে-

ছিল ক্রান্ত্স্। সরকারী খামারের কাছাকাছি গ্রাম। বন-আবাদ সম্পর্কে দারুণ ঔৎসুক্য জেগেছে ক্রান্তসের। কিন্তু সরকারী খামারে ও সম্পর্কে কোনো বইপত্র নেই। প্লঝকভ বলল স্কুলে এ বিষয়ের উপরে অনেকগুলি ভালো ভালো প্রবন্ধের সংগ্রহ আছে। সন্ধ্যে নাগাত ও পৌঁছাল গিয়ে স্কুলের দোতালা পাকা বাড়ির সামনে। চাষীদের কাঠের কুঁড়ে ঘরের ভিতরে ওটাকে অনায়াসেই চিনতে পারা যায়। কড়া নাড়লো, চিৎকার করে ডাকলো ক্রান্ত্স্ কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না। অবাক হয়ে দেখলো দোর খোলা। স্কুল-ঘরগুলি খুঁজে পেতে দেখে দোতালায় উঠে গেল। একটা খালি ঘরে গিয়ে দেখল একটি তরুণী জানালার চৌকাঠের উপরে বসে আছে। রোদে পোড়া তামাটে মুখখানা ঘিরে চুলের গোছা প্রায় পাকা চুলের মতো চকচক করছে। তরুণী তাকিয়ে রয়েছে দূরের হালকা-সবুজ মাঠের দিকে। এক সুগভীর তন্ময়তার ভাব ফুটে উঠেছে মুখখানি ঘিরে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই ক্রান্ত্স্কে দেখে একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠেই ছুটে পালিয়ে গেল।

খানিক পরে ফিরে এসে স্কুলের সামনের বাগানে ক্রান্ত্সের নাগাল ধরলো:

মাপ করুন—বলল তরুণী,—খুবই নির্বোধের মতো ব্যবহার করে ফেলেছি। কিন্তু আমি একটা গভীর চিন্তার ভিতরে ডুবে ছিলাম। আপনি আচমকা চমকে দিয়েছেন আমাকে। বোধহয় আপনি ডিরেক্টর কিংবা প্রধান শিক্ষিকাকে খুঁজছেন?

সাহসভরা চোখের দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকালো ক্রান্ত্স্। আবেগাকুল অন্তরের বিহ্বলতা থেকে যে দৃষ্টি উৎসারিত হয়ে ওঠে কোনো কোনো সময়ে। তারপর বলল:

না, খুঁজছি আপনাকে।

আমাকে?—অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল তরুণী,—কী চাই আপনার?

তা জানি না.—ওর ভ্রূ দুটো কপালে উঠে গেল।

অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চলে গেল তরুণী। বহুক্ষণ ধরে ক্রান্ত্স্ ছোট্ট বাগানটির ভিতরে পায়চারী করে ফিরল। মনে মনে আশা, তরুণী আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার বদলে এলেন গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্তা প্রধানা অঙ্কের শিক্ষিকা। বই নিলো ক্রান্ত্স্। তারপর সসঙ্কোচে যতদূর সম্ভব সংযত-ভাবে তরুণীর বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করল উনি কে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল স্কুলে ঢুকে।

ওঃ, ও আমাদের ভেরা নিকোলাইয়েভনা ত্রুবনিকোভা। এই এক বছর আছে ও আমাদের সঙ্গে। সাহিত্য পড়ায়। ও যেখানে থাকে সে-জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। তাই ডাইরেক্টর ওকে অনুমতি দিয়েছেন স্কুলে এসে ওর নিজের কাজকর্ম করতে।

বাড়ি ফেরার মুখে গোটা পথটাই ভেরার কথা চিন্তা করতে করতে এল ক্রান্ত্স্। কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না ওর মুখখানা. ওই দুটি চোখের দীপ্তি, ওর ঔদ্ধত্য আর চাঞ্চল্য।

ক্ষুদে জঙ্গলীটা!—আপন মনেই বলে উঠল ক্রান্ত্স্। কথাটা কেমন যেন একটু আত্ম-স্বীকৃতির মতোই শোনাল নিজের কানেই। বাড়িতে ফিরে এসে ও

কাজ করল, তর্ক করল ডিরেক্টরের সঙ্গে. কথা বলল ইয়াসিনস্কির সঙ্গে, পড়াশুনো করল বন-আবাদ সম্পর্কে। কিন্তু যাই-ই কিছু করুক না কেন ওর চিন্তা ভেরাকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে ফিরতে লাগল। অঙ্কুরোদ্গমের অপেক্ষায় রয়েছে ক্রান্ত্স্—অঙ্কুর গজালেই বোঝা যাবে বীজ কেমন ছিল। দিন দশেকের ভিতরেই আবার যাবে সরকারী খামারে। আর বইগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে স্বভাবতই যাবে পেস্ত্রুস্কিনো-এ। আশা করে না ক্রান্ত্স্ যে দেখা হবে ভেরার সঙ্গে। তবুও সেটাই ওর অন্তরের একমাত্র কামনা।

আটত্রিশ

ওর ছেলে ভাস্যা তার ভাই সের্গেইর মতো হয়ে উঠছে এ-কথা কেন মনে হল নিনা গোর্গিয়েভনার? এই চিন্তার ভিতর দিয়ে চাইছে কি তার সেই নিদারুণ অপূরণীয় ক্ষতির সান্ত্বনা খুঁজে ফিরতে? কিংবা সের্গিইর মৃত্যুর পরে তার ছোট ছেলেটিকে আরো নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে দেখছে আর যে-সব লক্ষণ তখনো চোখে পড়েনি সেগুলো আজ ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে? নাতাশাও ভাবছে, অনেকখানি বদলে গেছে ভাস্যা। আর অবাক হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে কি হল ওর। প্রথম যখন পরিচয় হল ওর সঙ্গে ভাস্যার শান্ত সমাহিত ভাব গভীর রেখাপাত করেছিল নাতাশার মনে। ওর মুখের সেই আনন্দভরা সরল হাসি দেখে কৌতুক করে বলতো নাতাশা: "হাসো, খুশিমনে, হাসো তো একটু।" এখন প্রায়ই রেগে ওঠে ভাস্যা। কথা বলে তাড়াতাড়ি। যেন ওর মনে ভয়. পাছে যা কিছু বলার আছে ওর না বলে ফেলতে পারে। তারপর হঠাৎ এক সময়ে চুপ করে যায়। এক সময় ছিল যখন ভাস্যা তার মা বা নাতাশার কাছে স্বীকার করতো যে অনেক কিছু মিলেই ওকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। সে সময়ে ওর মুখে ফুটে উঠতো একটু ক্ষীণ বিরক্তির হাসি। আর আভাস পাওয়া যেত সেই সুপ্ত আবেগের যা নিনা সের্গিয়েভনাকে মনে করিয়ে দিত সের্গেইর কথা।

বন-আবাদের কর্মকেন্দ্রে চলে যাবার আগে যে পনেরো দিন ভাস্যা কাটালো নাতাশার সঙ্গে, অবাক হয়ে গেল নাতাশা ওর অন্তরের উত্তাপভরা আবেগের প্রকাশ দেখে, যা সে আগে আর কখনো দেখতে পায়নি ওর ভিতরে। এই প্রথম ওর মুখ থেকে শুনতে পেল অকুণ্ঠ-স্বরে ভালোবাসার কথা। কখনো কখনো ভাস্যা কথা বলে দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আবার কখনো বা দারুণ তিক্ততার সঙ্গে বলতে থাকে তার কাজ-কর্মের কথা। বলতে বলতে ঘুলিয়ে ফেলে—মিনস্কের পথ আর জীবনের পথ একাকার হয়ে ওঠে। যুদ্ধের দিনের স্মৃতির সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন যায় মিশে। নতুন শহরের উজ্জ্বল আলোর কথার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যায় মানুষের অন্তরের পরিবর্তনের কথা, কঙ্করভূমিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আর অন্তর্জ্ঞানে গভীরতম স্তরের কথা যায় মিশে। কখনো কখনো নাতাশা ওর কণ্ঠস্বরে খুঁজে পায় নিদারুণ দুশ্চিন্তার আভাস—দুশ্চিন্তা ওর মিনস্কের ঘরবাড়ি সম্পর্কে, ভাস্কেঙ্কার ঘুম বা ওর জীবন সম্পর্কে। আর সেটা এক এক

সময়ে দারুণ তীব্র আবার এক এক সময়ে ক্ষীণ হয়ে ওঠে।

আ! যদি অঢেল সময় থাকতো!—একটু চকিত হাসি হেসে বলে উঠতো ভাস্যা।

কিসের সময় —হয়তো জিজ্ঞেস করতো নাতাশা। সঙ্গে সঙ্গেই হাসিখুশি হয়ে উঠতো যেন ভরসা পেয়ে গেছে মনে মনে তারপর বলতো:

সবকিছুর জন্যে। ভাসকাকে মানুষ করে তোলার। বন আবাদ করার। মিনস্কের ইমারত গড়ে তোলার। না, মানে—কমিউনিজম গড়ে তোলার।

এক দিন নাতাশা হাতের খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ওকে:

আচ্ছা ভাস্যা, কী মতলব ভাঁজছে ওরা?

দিব্যদৃষ্টি তো নেই আমার, তাছাড়া জানিও না কী আছে ট্রুম্যানের মনে।—হাসতে হাসতে জবাব দিল ভাস্যা।—যদি আদৌ কিছু থেকেই থাকে ওর মনে—হয়তো সেটা তেমন মনোরম কিছু নয়। মনে আছে তোমার নাতাশা, যে দিন আমাদের প্রথম দেখা হয় আমি বলেছিলাম তোমার কাছে একজন সম্মোহকের কথা, যার ঘড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিল সার্কাস থেকে? শুনে হেসেছিলে তুমি। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম কী চমৎকার তুমি।......কিন্তু আজ সে সূত্র আমি হারিয়ে ফেলেছি......। জিজ্ঞেস করছ, কী মতলব ভাঁজছে ওরা? সেটা তো পরিষ্কার—আমাদের ধ্বংস করার। কিন্তু এ-মতলব ভাঁজছে ওরা বহুদিন থেকে—ত্রিশ বছরেরও আগে থেকে। কিন্তু সেটা হাসিল হয়নি। আমরা ওদের নাগাল থেকে একটু দূরে। যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সেটা অন্য জিনিস। কতো কী-ই না এখনো আমাদের করার বাকি! মাঝে মাঝে এটাই আমার অস্বস্তি লাগে, যে দিনের ভিতরে মাত্র চব্বিশটি ঘণ্টা। মানুষ আজকের যেভাবে জীবন যাপন করছে আর কোনো দিনই তেমনভাবে করেনি। শত শত বছরেও যা করতে পারেনি তা করছে দশ বছরে। কিন্তু গত্যন্তর নেই। যদি আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে না পারি তো সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। একবার ভেবে দেখো কী-ই না করা যায় পরমাণবিক শক্তি দিয়ে আর তারপর ভেবে দেখো এই শক্তি নিয়ে কী করছে অন্য লোকেরা। যদি এটা আমাদের জন্যে না হতো, তবে ওরা নিজেরা নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দিতো। আর সব কিছুই ফেলতো ধ্বংস করে। একমাত্র আমাদেরই দায়িত্ব হচ্ছে জীবনকে রক্ষা করা—তার বেশিও কিছু নয়, কমও কিছু নয়। তাই আমাদের দ্রুত এগিয়ে চলতে হবে—

বলতে বলতে থেমে গিয়ে বহুক্ষণ গভীর চিন্তার ভিতরে ডুবে চুপ করে বসে রইল। নেমে এলো রাত্রির গাঢ় ছায়া। হঠাৎ ও উঠে গিয়ে নাতাশাকে চুমু খেতে শুরু করে দিল।

নাতশেঙ্কা কোনো দিনও আমরা দুজনে সত্যি সত্যি এক সঙ্গে থাকিনি। সেই ক্ষণস্থায়ী রাতটির কথা মনে পড়ে তোমার? জীবনও তেমনি ক্ষণস্থায়ী—ভালোবাসার পক্ষে খুবই ক্ষুদ্র।

আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছো না তো কিছু?

এক মুহূর্ত ভেবে নিলো ভাস্যা।

তেমন তো মনে হচ্ছে না কিছু। এ-কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়—মা-র কথাই ঠিক। কেমন যেন বদলে গেছ তুমি।

মৃদু হাসলো ভাস্যা।

সেটা কি জানো নাতাশা? বড়ো হয়ে গেছি আমি। অবশ্য হয়েছি একটু দেরিতে।...... যুদ্ধের আগে আমরা ছিলাম নেহাত নাবালক। যদিও তখনও ভাবতাম যে সাবালক হয়ে উঠেছি। আমার বয়েস ছিল তখন সাতাশ। কিন্তু আসলে বয়সের আন্দাজে ছিলাম পেছিয়ে। সব কিছুই এমন সরল সহজ মনে হতো যেন ইনস্টিটিউটে নকসা আঁকছি। যুদ্ধের ভিতর দিয়ে দেখলাম প্রচুর। কিন্তু সে-সব নিয়ে ভাববার সময় ছিল না। মা বলেন. আমি ছিলাম শান্তশিষ্ট। সে-সব দিনে আমি চিনতাম না মানুষ, এমন কি চিনতাম না নিজেকেও। সেটা এমন একটা তালগোল পাকানো অবস্থা......। যদিও বলতাম সব কিছু, করতামও কিন্তু তা সবই ছিল নির্বোধ, নিরর্থক। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নাকি ভাবপ্রবণতা কমে আসে, কিন্তু এই ছত্রিশ বছর বয়সে এখনো আমি খোকার মতোই চলেছি।

না, ভাসেঙ্কা, খোকার মতো নয়। ঠিক তার বিপরীত। খুব ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি আমি সেটা। যৌবন চলে গেছে আমাদের। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তা-ই। বসন্ত বিদায় নিয়েছে, আমাদের জীবনে এখন খর-নিদাঘ।

কিছুই লুকোয় নি ভাস্যা নাতাশার কাছে। ওর কাজটা যে কতোখানি মনোরম আবার কতোখানি কঠিন সে কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছিল ভাস্যা ওর কাছে গত শরৎকালে। নক্সা এঁকে এঁকে রাত ভোর হয়ে যায়। দিন কাটে নির্মাণকাণ্ডের জায়গায়। নকসা হল এক জিনিস আর মানুষ হল আরেক। একটা দারুণ উত্তেজনার ভিতরে থাকতে হয় সব সময়। ঝুয়েভের সঙ্গে করো কথা-কাটাকাটি, ছুটে যাও ওদিনৎসভের সঙ্গে দেখা করতে। সাভিলিয়েভ করছে ভুল, ইয়াশভ জিজ্ঞেস করে পাঠাচ্ছে কখন বাড়ি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওদিকে প্লাস্টারের চালান এখনো এসে পৌঁছায়নি, রেডিয়েটারগুলো লাগছে না ঠিক মতো, দোতলা বাড়ি তৈরির প্লান এখনো আটকে রেখেছে। এই হচ্ছে ওর জীবন।

মে মাসের এক সন্ধ্যেয় কাজকর্মের শেষে মিনস্ক শহরের দিকে তাকিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়েছিল বহুক্ষণ। প্রত্যেকটি বাড়ি ওর চেনা, প্রত্যেক খণ্ড পতিত জমি ওর পরিচিত। কিন্তু ঐ অসমাপ্ত স্কোয়ার. প্লাবিত নদীর মতো ঐ বিরাট চওড়া 'সোবিয়েত সড়ক', ছোট ছোট আঁকাবাঁকা কুঁড়ে ঘরের ভিতরে ভিতরে বিরাট বিরাট ইমারতের সারি দূরে নদীতীরের জেলাগুলি কেমন যেন ওর চোখে অদ্ভুত, অভিনব বলে মনে হতে লাগল। যুদ্ধের আগে শহরটাকে নতুন করে গড়ে তোলার পরিকল্পনার উপরে কাজ করেছে। কথা ছিল ওখানে তিনটা বড়ো বড়ো ঘেরা রাস্তা তৈরি হবার। ভাস্যা দেখলো সে বাড়িগুলোর আর চিহ্নমাত্রও নেই। সেগুলোর উপরে বোমা ফেলেছে, উড়িয়ে দিয়েছে. দিয়েছে পুড়িয়ে। ওখানে ছিল কতগুলো বাড়ি। মলোতভের বক্তৃতা শোনার মাত্র এক ঘণ্টা আগে সেগুলো দেখিয়েছিল নাতাশাকে। যখন স্বেচ্ছাবাহিনী এসে ঢুকলো মিনস্কে, ভাস্যা দেখতে পেল শুধু এক ধ্বংসস্তূপ।

শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ। ওরা আবার কাজ করছে। আলোচনা করছে নক্সা নিয়ে—একটা নতুন পরিকল্পনা জন্ম নিয়েছে। সবেমাত্র শহরের একটা সাধারণ কাঠামো গড়ে উঠে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। সম্পূর্ণ হতে এখনো ঢের দেরি। কিন্তু এখন আর এটা নমুনা নয়, সত্যিকারের রাস্তা যার উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

যুদ্ধের আগে ভাস্যা যখন এটা গড়ে তোলার কথা ভেবেছে, সে ভাবনাটা ছিল সাধারণ ভাবনা, উদ্যমশীল ছাত্র বা স্বপ্নদর্শীর ভাবনা। এমন কি তখনো অবশ্য এ কথা ভালো করে জানতো যে অবস্থাগুলো ভালো করে হিসেব করে দেখা দরকার। আর বুঝিয়ে বলেছিল নাতাশাকে যে যখন উপযুক্ত জিনিসপত্রের অভাব তখন বাহ্যিক নীতির কড়াকড়ি সম্পর্কে জবরদস্তি করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা হিসেবে আনেনি যে ফোমিন মাত্র বারো স্কোয়ার মিটার জায়গায় তার স্ত্রী, তিনটি বাচ্চা, আর শবাশুড়ীকে নিয়ে বাস করে, বা গলোভকোর ব্যাপারটা আরো করুণ—বিয়ে করবে অথচ ঘর নেই। এক কথায় মানুষ চায় বাস করতে, চায় এক্ষুনি. আজই। ভেঙে যায়নি ওর স্বপ্ন বরং প্রায়ই কল্পনার চোখে দেখতে পায় আলোয় সবুজে ঝলমল শহরের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ও জানে ভালো করেই যে জীবনটা রঙিন নকসা নয়। অবশ্য এ কথা ঠিক যে ওকে লড়তে হবে সেই সব উপরওয়ালাদের সঙ্গে যারা যেখানে খুশি যেমনতেমন করে কেবল গড়ে তুলতে চায়, শুধু তাড়াতাড়ি হলেই হল। এক দিকে ছোটো ছোটো কামরায় বা ব্যারাকে ঠাসাঠাসি করে থাকা মানুষের প্রতি দরদ অন্য দিকে মিনস্ক—এ দুয়ের ভিতরে পড়ে ওর অন্তর পিষ্ট হয়ে চলেছে। "মিনস্ক" কথাটা উচ্চারণ করে ভাস্যা এক বিশেষ দরদভরা ভঙ্গিতে। কারণ এখানেই প্রথম ও শুরু করে কাজ, নাতাশার সঙ্গে পরিচয়, পূর্বরাগ যা কিছু সব-ই ঘটেছে এখানে। এখানেই দেখেছে যুদ্ধজয়ের উৎসব যখন স্বেচ্ছাবাহিনীর নেতা হিসেবে মেজর শিলতের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ও এসে ঢুকল শহরে। সব সময়ে সব কিছুতেই সায় দিতে প্রস্তুত সফোনভ:

কেন ঐ সব কুঁড়েঘরের ঘরামিদের সঙ্গে তর্ক করতে যাও বলে? ওদের নিজস্ব যুক্তি আছে। তাছাড়া তুমি তো জানো না অন্যান্য উপরওয়ালারা ওদের কতদূর কি মঞ্জুর করেছে না করেছে। একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টিও হতে পারে। কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ালো ভাস্যা। শহরটার ভাগ্যের প্রশ্ন এখানে জড়িত তাই সে পরিকল্পনার স্বপক্ষে লড়াই করতে লাগল। এ-কথা সত্যি যে পরিকল্পনাটার কোনো দিকে খানিকটা বাড়ানো আবার কোনো দিকে খানিকটা কমানো দরকার। পুরানো কুঁড়েঘর, একশ বছর আগের বাঁকাচোরা গলিঘুঁচি আর পাকা বাড়ি যেগুলো এলোমেলো ভাবে বেজায়গায় গজিয়ে উঠেছে সে সব কিছুই ভেঙেচুরে নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে। একটা এখানে, একটা ওখানে আবার আর একটা অন্যখানে। কে একজন যখন ওকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কেন ও পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে মত দিল। কাষ্ঠ হাসি হাসলো ভাস্যা:

মানুষ বাস করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এটা শহর, প্রদর্শনী নয়।

স্থির দৃষ্টি মেলে মিনস্ক শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকে ভাস্যা। কিন্তু ওর ভাবনা এখন আর স্থ্যপত্য নিয়ে নয়, জীবন নিয়ে—জটিল জটপাকানো জীবন সম্পর্কে। স্বভাবতই ওর কাজ হিসেবের সঙ্গে বাঁধা। অনুপ্রেরণাকে যাচাই করতে হয় কম্পাস দিয়ে। পৌরসভার পুনর্গঠনের পরিকল্পনার সঙ্গে ওর স্বপ্নকে নিতে হয় মানিয়ে-গুছিয়ে। অভিযোগ করে না। বরং উলটো, প্রকৃত কাজ হয় তখনই যখন মানুষ কেবল ছক নিয়ে কাজ করে না, কাজ করে মানুষ নিয়ে—তাদের শক্তি, তাদের দুর্বলতা, বিচিত্র রুচি, আর তাদের অবিসংবাদী জীবনের অধিকার মেনে নিয়ে। ওর মনে পড়ে গেল কেমন করে জন্ম হয়েছিল ওর স্বেচ্ছা-বাহিনীর। যারা মাত্র আগের দিন পর্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হয়ে লুকিয়ে বসেছিল ঘরের কোণে, মনে হতো যারা ভেঙে পড়েছে, তারা তাদের মেরুদণ্ড খাড়া করে উঠে দাঁড়িয়েছে। হয়ে উঠেছে বীর। এটা ভুল, ওটা ঠিক নয় এ বলে অভিযোগ করেছে কিন্তু তারপর বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুর মুখে পড়েছে ঝাঁপিয়ে।

অতীতেও ছিল মহান ভাবধারা। কিন্তু তা গ্রন্থাগারের তাকে বা মিউজিয়মে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেগুলোকে মনে করা হতো দার্শনিক বা কবি-দের সঞ্চয় হিসেবে। আর সব কিছু ঘিরে বয়ে চলতো জীবন—তমসাচ্ছন্ন অবসাদময় উদ্দেশ্যহীন। ভাস্যা ভাবতে লাগল স্তালিনের কথাঃ কতো গভীর-ভাবেই না বুঝতেন তিনি মানুষকে—মানুষের অন্তরের অন্তরতম বস্তুকে—তাদের বিভিন্ন ভাবনার সেই বিচিত্র আবেগকে! এরই জন্যে এতো বড়ো একটা বিরাট রাষ্ট্রকে তিনি পেরেছেন গড়ে তুলতে। তাঁর সামনে কারুর এতটুকুও ভয় ছিল না। আর এটাই হচ্ছে মূল কথা। যেন তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অন্তর দেখতে পেতেন। তাই যখন তিনি বক্তৃতা দিতেন জনগণ অবাক হয়ে ভাবতোঃ আমি যা বলতে চাই উনি ঠিক সেই কথাটাই বলছেন! হয়তো পিকিং-এর মানুষ, প্যারীর মানুষও ঠিক এমনিভাবেই ভাবতো। একা তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে একাকীত্বের নিঃসঙ্গ উচ্চতায় উঠে যাননি। না। তিনি ছিলেন সবার মধ্যে। চেতভেরিকভের সঙ্গে এঁকেছেন নকসা, ইয়াকুশকোর সঙ্গে গেঁথেছেন ইট। এখন এই মুহূর্তেও তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখানে আর ভাবছেন জীবনের কথা। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিনিয়তই ভাবতেন জীবনের কথা। আর তাঁর শক্তির উৎস সেখানেই।

সব কিছু পুনর্গঠনের পরে কী চমৎকারই না হবে মিনস্ক শহরটাকে দেখতে! এখন পর্যন্ত এতো কম কাজ হয়েছে, আরো তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। সের্গেই কেন মরে গেল আর বেঁচে রইল ভাস্যা? অন্যায়। ঢের ভালো ছিল সের্গেই ওর চাইতে। কতো মানুষই না ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কি না এমনি সব চমৎকার চমৎকার লোক! আভানেসিয়ান, নাতাশা গোলোভিনস্কায়া, শুমভ, ওভসিয়েস্কো, আইভান......। সেদিন সফোনভ বলেছিল, যারা মরে গেছে তাদের কথা ভেবে আর কোনো লাভ নেই। এতে মানুষকে পরাজয়বাদী করে তোলে। কথাটা সত্যি নয়। এঁদের সমাধি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা দেয়, উদ্দীপনা যোগায়। আজ ওকে কাজ করতে হচ্ছে শুধু ওর নিজের জন্যেই নয় তাদের জন্যেও। মুহূর্তের জন্যেও যদি আমরা ভুলে যাই, নরম হয়ে পড়ি,

শত্রুরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপরে। আর যে কাজের জন্যে প্রাণ দিয়েছে আভানেসিয়ান কী অধিকার আছে ওর সেখানে নতি স্বীকার করার? তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল ভাস্যা এক সময়ে। এখন শান্তির সময়, কিন্তু শপথ শপথই রয়ে গেছে।

ওখানে এখনো রয়েছে সেই বাড়িটা, যেখানে ও থাকতো যখন নাতাশা প্রথম এলো ওর জীবনে। তারই কাছে গড়ে উঠছে ছোট ছোট কচি লাইমের চারায় ভরা একটি বাগান। চারাগুলি শীতের কোমল সজীবতা নিয়ে উঠছে বেড়ে আর ঝরিয়ে দিচ্ছে পাতা। বহু দূরে রয়েছে নাতাশা। হয়তো তা নয়, রয়েছে ওর পাশে-ই। ভালোবাসার পাখা আছে, কথাটা ঠিক। অদৃষ্ট চিরদিনই রাখছে ওদের আলাদা করে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। বলেছিল নাতাশা বসন্ত চলে গেছে ওদের জীবন থেকে। হয়তো এ-কথা সত্যি। কিন্তু কী প্রচণ্ড বাত্যাক্ষুব্ধ নিদাঘই না এসেছে ওদের জীবনে! কী অপূর্ব আনন্দই না এমনি করে জীবন কাটাতে—অসমাপ্ত শহর, অসমাপ্ত পৃথিবী, শেষ হয়ে আসেনি জীবন, পাতা হয়নি ঘর-সংসার, শুধুই গড়ে তোলা আর গড়ে চলা! জীবনের অর্ধেক দিন কেটে গেছে: যুদ্ধ, দুঃখ, বিজয়লাভ। হয়তো চূড়া ছাড়িয়ে গেছে। কী রয়েছে সামনে? ও জানে না তা। শুধু এইটুকু মাত্র জানে যে এটাই জীবন।

ওর চিন্তায় বাধা পড়ল সোবচেঙ্কোর কথায়:

ভাসিলি পেত্রোভিচ তোমাকে ওদিনৎসভের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। প্লাস্টার নিয়ে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা মতো কাজ শেষ করা অসম্ভব হয়ে উঠছে আমাদের পক্ষে—

পরের দিন সকালে ঝড়ের মতো গিয়ে আক্রমণ করল ওদিনৎসভকে তার আফিসে। থেকে থেকে ওদিনৎসভ বলছে:

দেখছি আমি, দেখছি!

মোটা মানুষ ওদিনৎসভ, কিন্তু ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন।

দেখছি আমি, দেখছি!—ভাস্যার কথা শেষ হতে বললো ওদিনৎসভ।

আমরা ওদের নিয়ে পড়ছি। কিন্তু আপনাকেও হাত লাগাতে হবে।

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল ওদিনৎসভ। বার বার বলতে লাগল:

ঠিক আছে!—তারপর ভাস্যার দিকে ফিরে বলল:

শোনো, একজন বিদেশী সাংবাদিক আসছে। ভদ্রলোক বোধহয় ফরাসী, আমেরিকার কোনো একটা সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। মনে হচ্ছে ঝানু গোছের লোক। লোকটা তোমার খোঁজ করছিল। জানি তোমার অনেক কিছুই আছে ভাবনার চিন্তার। দ্বিতীয় চালান খালাস দিতে হবে। তাছাড়া ইয়শিভ বলছিল মস্কো ওকে ডেকেছে একবার ঘুরে আসার জন্যে, এই সব আর কি। তাই বলছিলাম কি, ওর সঙ্গে একটু কথা বলো। একটু বন্ধুভাবেই আলোচনা করো বুঝলে তো। আলোচনার কতগুলো বিষয় ঠিক করেছে ইয়শিভ। হাঁ, সেগুলো হচ্ছে এই ধরনের—

মোটেই আমি কূটনীতিক নই,—অবজ্ঞা-ভরা শুকনো হাসি হেসে বললো ভাস্যা,

—জার্মানীতে একজন ইংরেজের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল—ওরা যাকে বলে প্রাণ-খোলা কথা। তাতে ভদ্রলোক এমন মুষড়ে পড়েছিলেন যে তার খিধে পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।......ঠিক আছে। ইয়শিভ যখন পীড়াপিড়ি করছেন, বলবো আমি ওর সঙ্গে কথা।

ক্রিলভের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সাবলঁ। উদ্দেশ্য-হীনভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যদিও আর একটা যৌথখামার, আর একটা কাপড়ের কল পরিদর্শন করে এসেছে, জিজ্ঞাসাবাদও করেছে. কিন্তু যেন করতে হয় তাই করেছে। সত্যিকারের কোনো আগ্রহ নেই। তাছাড়া নোটও নেয়নি আর। মিছেই ওকে টেলিফোনে ডেকে নিমন্ত্রণ করেছিল দ্য শ'ম দূতা-বাসে। কিন্তু কোনো অজুহাত দেখাবার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার না করেই সমস্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে দিল সাবলঁ। এড়িয়ে চলতে লাগল অন্য সব সাংবাদিকের সঙ্গ। আর একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ছোট ছোট রেস্তোরাঁ বা পানশালায় গিয়ে বসে। তারপর উদার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে লোকজনদের দিকে —তাও মনে হয় যেন তাকিয়ে আছে বহু দূর থেকে। কখনো বা আধ লিটার ভদকা নিয়ে নীরবে একা একা পান করে চলে যতক্ষণ না ওর মন এক মধুর আচ্ছন্নতার কোলে ঢলে পড়ে আর ভুলে যায় যে ও স্ত্রীর সঙ্গে তাদের সেই ব্রেত'র ছোট্ট বাড়িতে আছে, না আছে মস্কোয় বা সাংহাইতে। তার করে জানতে চেয়েছে নিভেল কতোদিনের ভিতরে সংবাদ-প্রতিষ্ঠান ওর কাছ থেকে প্রথম প্রবন্ধ আশা করতে পারে। প্রত্যুত্তরে সাবলঁ লিখল: দশ দিনের ভিতরে ফিরে আসছি। পরক্ষণেই কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিল। ঠিক করলো কোনো জবাবই দেবে না। ফিরে যাওয়াটা বন্ধ করার জন্যেই ও গেল মিনস্ক-এ। কেননা ওর মনে হল যে মুহূর্তে ও প্লেনে গিয়ে বসবে, সব কিছুই ওকে তখন ভেবে নিতে হবে আর ওর ধারণার অনেক কিছু সম্পর্কে আবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল সদা-হাসিমুখ মহিলা দো-ভাষীটির কাছে বলল যে মিনস্ক শহর কেমন করে পুনর্গঠিত হচ্ছে সেটা ও দেখতে চায়। বার বার করে নিজের মনকে বুঝালো যে এটা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর গোটা একটা সপ্তাহ অনুমতি-পত্রের জন্যে উদ্‌বেগাকুল অন্তরে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু যে-মুহূর্তে মিনস্ক-এর বিমান ঘাঁটি নজরে এলো ওর মনটা দমে গেল। ভাবতে লাগল: "কিসের জন্যে এসেছি এখানে?" দো-ভাষীকে সঙ্গে নিয়ে দিনভর শহরময় ঘুরে বেড়ালো সাবলঁ। আড়ালে ওর নাম দিয়েছে "বিদ্যাধরী"। দেখল সর্বত্রই গৃহ-নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাগানে বসে মেয়েরা পড়ছে পড়ার বই, তেমনি ফুটে আছে ফুল যেমন ফোটে ফ্রান্সে। রাস্তায় পথিকের ভিড়, আর রেস্তোরাঁয় তেমনি আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় কাটলেট আনার হুকুম দিয়ে। আর একটা শহর......

ওর নোট-বুকে লেখা রয়েছে:

স্থপতি ভ্ল্যাখভ. সেই চমৎকার ডাক্তারের জামাই।

ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, কি করতে চান এখন, অপেরায় যাবেন, বাইলো-রুশিয়ান লেখকদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, না যে-বাড়িগুলো শেষ হয়ে গেছে সেগুলো দেখে আসবেন। মাথা নাড়লো সাবলঁ। বলল ও যাবে স্থপতি ভ্যাখভের সঙ্গে দেখা করতে।

শালীনতার খাতিরে ভাস্যা অতিথিকে পর্যবেক্ষণ করা থেকে নিবৃত্ত রইল। এমন কি মিনিট পনেরো ধরে ফরাসী ভদ্রলোকের কাছে যখন পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছিল ও চোখ তুলে পর্যন্ত দেখল না যে কার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। অর্ধেকটা শুনলো অর্ধেকটা শুনলো না সাবলঁ। কারণ শহর-গঠনের পরিকল্পনার দিকে ওর আদৌ আগ্রহ নেই। সারাক্ষণ ধরে সে এই রুশ ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। বলতে বলতে কেমন ও কথার তোড়ে ভেসে যাচ্ছিল দেখে ভারি মজা লাগছিল সাবলঁর। ওর মনে হল লোকটি বেশ চমৎকার।

বোধহয় এখানেই জন্মেছেন আপনি? মনে হচ্ছে এই শহরটাই আপনার নিজের শহর।

না,—হেসে বলল ভাস্যা—আমি জন্মেছি পারীতে। বিপ্লবের আগে আমার বাবা-মা থাকতেন ওখানে। অবশ্য ফরাসীদেশ সম্পর্কে কিছুই মনে নেই আমার। যখন মস্কোয় ফিরে আসি তখন আমার বয়েস চার বছর। মায়ের কাছেই আমার ফরাসী ভাষা শেখা। এখনো তিনি ফরাসী শেখান। কিন্তু একথা ঠিক যে আমি মিনস্ককে ভালোবাসি।

আবার ভাস্যা গঠন সংক্রান্ত কাজের কথায় ফিরে গেল:

আর পাঁচ বছরের ভিতরে মিনস্ক শহরটাকে দেখবেন চেনা যাবে না......কিন্তু ওকে বাধা দিয়ে বলল সাবলঁ:

যুদ্ধের সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো—ফ্রন্টে না পিছনে?

পিছনে......জার্মানদের পিছনে। গোড়ার দিকেই অবরোধের ভিতরে আটকা পড়ে যাই। মিনস্ক থেকে বেশি দূরে নয়। আমি ছিলাম স্বেচ্ছা-বাহিনীতে।

তবে তো আমরা দুজনে প্রায় কমরেড—আমি ছিলাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে। আমাদের দল একটা গোপন খবরের কাগজ চালাতো। দুটো পুল উড়িয়ে দিয়ে-ছিলাম আমরা। তখন আমি ধরা পড়ে গেলাম। অশ্চুইৎঝে ছিলাম আমি।

সাবলঁর দিকে তাকাল ভাস্যা। দেখল একটি মোটা তাগড়া লোক, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে-ভরা মাথা, আর বুদ্ধি-দীপ্ত বিষণ্ণ দুটো চোখ। ওর চেহারা দেখে মায়ের ঘরে টাঙানো বালজাকের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দিল।

ফরাসী স্বেচ্ছাবাহিনীর সংগ্রাম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করল ভাস্যা। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়ে চলল সাবলঁ। তারপর হঠাৎ এক সময়ে ওর মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, চুপ করে গেল সাবলঁ।

কাগজে পড়েছি প্রতিরোধ আন্দোলনের সৈনিকরা এখন আর জনপ্রিয় নয় আপনাদের দেশে,—বলল ভাস্যা।—একমাত্র পেত্যাঁকেই জাতীয় বীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ওটা একটু বাড়িয়ে বলা।—ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সাবলঁ।—আচ্ছা বলুন তো

আপনার বাহিনীর অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্ক কি রকমের? দেখাসাক্ষাৎ হয়?

অনেকে মারা পড়েছে। কারুর কারুর সঙ্গে দেখা হয়। আমাদের ভিতরে একজন কৃষি-বিজ্ঞানী ছিলেন। নাম ছিল তাঁর চেলিশেভ। কোনো একটা কারণে ওঁকে ডাকা হতো "বুনো মিশা" বলে। যদিও তিনি ছিলেন সব চাইতে বেশি হৃদয়বান। কিছু দিন আগে এসেছিলেন মিনস্কে। বললেন আমাকে যে তিনি কাজ করেন গাঁয়ে। খুব চমৎকার কাজ হচ্ছে সেখানে। নতুনভাবে চাষ করে চারাগুলোকে ঋতু-সহ করা হচ্ছে। আর একজন ছিল লেয়াহ্ কোগান—এই মিনস্কেরই একটি মেয়ে। গত বছর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক হয়েছে। এখন সে শিক্ষিকার কাজ করছে। আইভান শিলেগারমের সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হয়। সে করে এখন গৃহ নির্মানের কাজ। ও আমার বন্ধু। অদ্ভুত মেয়ে। যদি চান তো যাবোখন আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে। এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে সে। আগে ইট গাঁথতো দুজন বা তিন জনে মিলে। ও বলছে যে পাঁচ জনের একটা দল মিলে গাঁথলে ঢের বেশি সুবিধে হবে। ঘণ্টায় দু হাজার ইট গাঁথতে পারবে।

দারুণ বিরক্ত হয়ে উল সাবলঁ:

ইটের কথা জিজ্ঞেস করছি না আমি আপনাকে। রাজনীতি সম্পর্কে বিতর্ক করে থাকেন কি ওদের সঙ্গে?

না। যাইহোক আমরা লড়েছি এক সঙ্গে। এখন কাজ করছি এক সঙ্গে।

আপনি কি এ-কথা বলতে চান যে রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের কোনো আগ্রহ নেই?

তা কেমন করে হয়? মিনস্ককে নতুন করে গড়ে তোলাও তো রাজনীতি। শুধু রাজনীতি নয়, উচ্চাঙ্গের রাজনীতি রয়েছে ওতে।

জানি না, আপনাদের হিংসে করা উচিত কি না আমার পক্ষে। হয়তো আপনারা আমাদের চাইতে এগিয়ে গেছেন, নয়তো আমরা এগিয়ে গেছি আপনাদের চাইতে, উভয় ক্ষেত্রেই এ-কথা ঠিক যে আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিরোধ আন্দোলনে আমার একজন কমরেড ছিলেন, সে কমিউনিস্ট। আমরা দুজনে মিলে গোপন সংবাদপত্র পরিচালনা করতাম। কিন্তু এই সেদিন আমাদের ভিতরে ঝগড়া হয়ে গেল। আমি ফ্রান্সকে ভালোবাসি। কিন্তু আমার মতে সে মোটেই ফরাসী নয়। ওর একমাত্র ভাবনা আপনাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা নিয়ে।

আমাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চললে কি তার ফরাসী হতে বাধা আছে কিছু?

সাবলঁর ইচ্ছে ছিল না তর্কের ভিতরে যাওয়ার। কিন্তু হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল রুশিয়ায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ভেবেছিল রুশদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে গেলে কি চমৎকারই না হবে। তাহলে বুঝতে পারবে "লৌহ যবনিকার" অন্তরালে কি বস্তু লুকানো আছে। ডাক্তার পুরনো দিনের মানুষ। কিন্তু এই স্থপতিটি বড়ো হয়েছে সোবিয়েত আমলে। তাছাড়া ও কথা বলে ফরাসী ভাষায়। দো-ভাষীর দরকার হয় না। প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিল

সাবল'। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রুশ ভদ্রলোকটির মুখ খোলানো। মিনস্কের গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলানো নয়, সব চাইতে যেটা জরুরি বিষয় সেই সম্পর্কে—ওরা যুদ্ধ চায় কি না। বার্নালিয়ের যুক্তি আর খবরের কাগজের অভি-যোগের পুনরাবৃত্তি করলে সাবল':

আজ নতুন আসিনি আমি রুশিয়ায়। প্রচুর দেখার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা দাম্ভিক। সমস্ত কিছুতেই আপনাদের এক জবাব: হেনো আবিষ্কার করেছে রুশিয়া, তেনো আবিষ্কার করেছে। আপনি নিজে একজন স্থপতি। যদি জিজ্ঞেস করি কে তৈরি করেছে স্টিফিল টাওয়ার, সন্দেহ হয়, আপনি বলে দেবেন ওটা তৈরি করেছে আইভানভ।

না স্টিফিল নয়,—প্রত্যুত্তরে হেসে বলল ভাস্যা.—এটা সত্যিই বাস্তব ব্যাপার যে রুশিয়া প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছে।

আপনাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে সবচাইতে উন্নত এ-সম্পর্কে সত্যি-ই কি আপনারা নিশ্চিত?

স্বাভাবিক।

আর সর্বত্রই এই ব্যবস্থা কায়েম হোক এটা আপনারা দেখতে চান?

হ্যাঁ।

তবে তো আমেরিকানদের কথাই ঠিক: আপনারা চান গায়ের জোরে গোটা দুনিয়াটাকে আপনাদের জীবনযাত্রার ধরণ গ্রহণ করাতে।

না। আমরা যেটা ভাবি তা হচ্ছে এই যে সবাই আমাদের উদাহরণ অনুসরণ করুক। উদ্বুদ্ধ করে তোলা এক কথা আর গায়ের জোরে জয় করা অন্য কথা। কে সে যে সমগ্র দুনিয়াকে এটম-বোমা নিয়ে ভয় দেখাচ্ছে?

শুধু এটম-বোমার কথাই বা বলছেন কেন? দুনিয়ার ভিতরে সব চাইতে শক্তিশালী সেনাবাহিনী রয়েছে আপনাদের। ইচ্ছে করলে পনেরো দিনের ভিতরে পারী দখল করে নিতে পারেন। এটম-বমের ভিতরে আমরা ফরাসীরা আমাদের স্বাধীনতার রক্ষা-কবচই দেখতে পাই।

ভুলে গেল ভাস্যা ইয়র্শভের অনুরোধ, ভুলে গেল ওর নিজের প্রতিজ্ঞা যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অবাঞ্ছিত অতিথিকে বিদায় করে দেবে।

এইমাত্র আপনি বলেছেন যে আপনি ঝগড়া করেছিলেন আপনার ভূতপূর্ব প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথীর সঙ্গে কেননা সে একজন কমিউনিস্ট, তাছাড়া সে বিশ্বাস করতো না এটম-বোমার গুণাবলীর উপরে। এতেই প্রমাণ হয় যে বহু রকমের ফরাসী আছে। 'লুমানিতে'রও বোধ হয় নিজস্ব সংবাদদাতা আছে। কিন্তু যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, আপনি বোধহয় কোনো এক আমেরিকান সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে থাকেন।

আমি যখন স্বেচ্ছাবাহিনীতে ছিলাম দরিও বাহিনীর অনেক অনেক ফরাসীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ওদের পরনে ছিল জার্মান ইউনিফর্ম ফরাসী তকমা-আঁটা। তারা চাষীর ঘর লুট করতো—ফরাসী বলে তারাও দাবি করতো নিজেদের। আপনারাই বলেন দক্ষিণ ফ্রান্সে আপনাদের পিছনে শুধু জার্মানরাই তেড়ে আসতো না ডালকুত্তার মতো, আসতো পেত্যাঁর দলের লোকেরাও। আর এখন

দেখা যাচ্ছে যেন তোরের চাইতে পেত্যাঁই আপনাদের আপন। এক দলের সঙ্গে যখন ঝগড়া করেন তখন সমঝওতা করেন অন্য দলের সঙ্গে। তাই নয় কি? আমার সেনাদলে কারনে নামে পারীর একজন ফরাসী ছিলেন। যুদ্ধের আগে তিনি কাজ করতেন নোম-এ-রোন কারখানায়। জার্মানরা তাঁকে বেগার খাটাবার জন্য ধরে এনেছিল। কিন্তু সে পালিয়ে আসে। আমি অবাক হয়ে যাব না আজ যদি আপনাদের ফরাসীদেশে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। আমি জোর করে বলতে পারি তার মতো লোক ট্রুম্যানের একান্ত বশংবদ প্রজা হবার জন্যে নিশ্চয়ই লড়েনি ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে।

ভারি ও রক্তিম চোখ দুটো নিচু করলো সাবল'। এখন আর শুনছে না সে রুশ ভদ্রলোকটির কথা। কী যেন এক কুহকময় ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ছিল নেভিলের লম্বা পাণ্ডুর মুখে, তার বিদ্বেষ-ভরা কণ্ঠস্বরে, তার আঙটি-পরা শীর্ণ হাতে। এক নিদারুণ অস্বস্তি ওর গলা টিপে ধরল। হঠাৎ কিসের উত্তেজনায় সাবল' তার চামড়ার কেসটা টেনে বের করল, তারপর তার ভিতর থেকে টেনে বের করল টেনিস-র‍্যাকেট হাতে একটি মেয়ের ফটোগ্রাফ।

এটি আমার মেয়ে। ওর বয়েস চোদ্দ। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল এই যে আমি জানি না ওর ভাগ্যের ঘরে কী আছে। যার খুশি, সে ঝগড়া করতে পারে কিন্তু আদৌ উচিত নয় যুদ্ধে নামা।......বিয়ে করেছেন আপনি?

হাঁ, একটি ছেলে আছে আমার। তার বয়েস সাত বছর। দেখুন, আমি কিন্তু জানি কী আছে ওর ভাগ্যে। ও বাস করবে এই সোবিয়েত ভূমিতে।

রেগে উঠে সাবল' সিগারেটের টুকরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল:

আপনারা রুশিয়ানরা সব সময়েই সব কিছুই জেনে বসে আছেন। আপনার পরিবার আপনার সঙ্গেই আছে বোধহয়।

না। আমার স্ত্রী হচ্ছেন একজন পেশাদার কৃষি-বিজ্ঞানী। এখন তিনি সারাতভ অঞ্চলের এক বন-আবাদের কেন্দ্রে কাজ করছেন।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সাবল' রুশভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালো। তাহলে পারিবারিক জীবনও অন্যান্য সব কিছুর মতোই তেমন সহজ স্বাভাবিক নয়। দুজনার মধ্যে কে কাকে ছেড়ে গেল জানতে পারলে খুবই ভালো হতো।

খুবই অসুবিধাজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই,—বলে যাচ্ছিল ভাস্যা,—কিন্তু আমার পক্ষে মিনস্ক ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নিজের চোখেই তো দেখেছেন এখনো কতো কি করার বাকি রয়ে গেছে। তাছাড়া আমার স্ত্রীও একটা খুব ভালো কাজ পেয়ে গেছেন। বোধহয় অরণ্যবলয়ের কথা পড়ে থাকবেন কাগজে?

আবার তাকাল সাবল' তার সঙ্গীর মুখের দিকে:

কিম্ভুতকিমাকার লোক আপনারা। সত্যি ভারি কিম্ভুতকিমাকার—

কিন্তু, যুদ্ধ চাই না আমরা।

উঠে দাঁড়ালো সাবল':

জানি, এখন আপনি বলবেন যে আমেরিকানরা সর্বত্র সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছে, ভিসিনিস্কি অস্ত্রসজ্জা পরিত্যাগ করার প্রস্তাব এনেছে, পারীতে একটা জন-সম্মেলন হয়ে গেছে যারা ঠিক আপনাদের মতোই ভাবে। সবই সত্য কিন্তু

তবুও সত্যি নয়। এ সব নিয়ে তর্ক করা চলে কিন্তু কারুর যুদ্ধ করা উচিত নয়।

ফটোটা হাত থেকে সরিয়ে রেখে সাবলঁ তার বিরাট চওড়া হাতটা বাড়িয়ে দিল রুশ ভদ্রলোকের দিকে। ওর সর্বাঙ্গ এমন নিদারুণ হতাশায় ভেঙে পড়েছে, এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, যে ভাস্যার দুঃখ হল ওর জন্যে। আলোচনার তিক্ততা মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল ভাস্যা:

আপনার মেয়ের নাম কি?

মাদ্লীন—মাদো।

সুন্দর নামটি,—একটু আবছা হাসি হেসে বললো ভাস্যা।—কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন: আমরা যুদ্ধ চাই না। আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক। আর আপনার মেয়েকে এই সোবিয়েত স্থপতির অভিনন্দন জানাবেন।

পরের দিন মিনস্ক ত্যাগ করে চলে গেল সাবলঁ। ঘরের ভিতরে একা বসে রয়েছে আর চেষ্টা করছে কোনো কিছুই না ভাবতে। জোর করে একটা বাজে উপন্যাস পড়ার চেষ্টা করলো। তারপর 'লে মঁদে'-র একটা পুরানো সংখ্যা থেকে ক্রসওয়ার্ড নিয়ে বসলো। তারপর চা খেল আর রেল লাইনের পাশের পয়েণ্টস-ম্যানদের কেবিনগুলো গুনতে শুরু করে দিল। নেমে এল সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া। বনের প্রান্ত বেষ্টন করে ছুটে চলেছে ট্রেন। একটি দুটি করে ফুটে উঠছে আলো। সাইডিং-এ অপেক্ষমান গাড়ির দীর্ঘ সারি। একটা ঘরের আলোকিত জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে পেল সাবলঁ একটি স্ত্রীলোক একটি শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। আবার ওর মনে পড়ে গেল স্থপতির কথা। এক এক সময়ে মনে হয় ওরা ওর দেশবাসীর চাইতে মোটেই আলাদা ধরনের নয়। কিন্তু না, ওরা অন্য গ্রহের মানুষ। ফ্রন্সের পার্কে পার্কে মেয়েরা কি ঠিক অমনি করেই হাসে না? কিন্তু যখনই তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করবে সব কিছুই তখন দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। কেন এই রুশ ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ভলগার পারে যেতে দিল? ও যদি ফরাসী হতো যে কেউ-ই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিত যে ও চায় তাকে ত্যাগ করতে। কিন্তু এখানে কোনো কিছুই বোধগম্য হবার উপায় নেই। যেমন-ভাবে ইট গাঁথা সম্পর্কে কথা বললো, ঠিক তেমনিভাবেই বললো তার স্ত্রীর কথা। সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য! কতোই না দেশ আছে আর সবগুলোই বিভিন্ন—মিল নেই একের সঙ্গে আর একের! ও গেছে কঙ্গো, চীন, মেক্সিকো—সর্বত্রই দেখেছে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। কিন্তু এমন আর একটা দেশ দেখেনি যে দেশটাকে বুঝে ওঠা এতো কঠিন। তবুও কি না এখান থেকে পারী ওড়ো-পথে মাত্র ন'দশ ঘণ্টার পথ......। নিশ্চয়ই এই রকম বনের ভিতরে ঢোকার মতোই বেশ একটু ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বিশেষ করে রাত্রির অন্ধকারে। জার্মানরা ছিল এখানে...... এখন বুঝতে পারছে সাবলঁ, বিতাড়িত হওয়ার সময়ে কী অনুভূতি জেগেছিল তাদের মধ্যে। বিদেশীদের কোনো দরকার নেই এখানে। এটা সুইজারল্যান্ড নয়। শুধু ভিসা বা সীমান্তের ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির। ও যখন কথা বলছিল স্থপতির সঙ্গে ওদের দুজনার মাঝখানে সত্যিই ছিল এক লৌহ যবনিকা। একটা নয় হয়তো দুটো—রুশ ভদ্রলোকের ছিল নিজস্ব একটা

তার ভিতরে।......খুবই ভুল হয়ে গেছে নিভেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আসলে ও হচ্ছে একটা বিশ্বাসঘাতক। বার্নেলিয়েও ঘৃণা করতো কমিউনিস্টদের। কিন্তু তবুও সে ছিল প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতরে। অবশ্য মামুলীভাবেই, বাতকে-বাত বলেছিল বার্নেলিয়ে যে সে শ্রদ্ধা করে নিভেলকে। সেটাও তো আবার লিখে ফেলতে হবে! ভেবেছিল সাবলঁ লেখা যাবে এ সব কিছুই, কিন্তু ওর ইচ্ছে নেই লেখার। কী মূর্খের মতো সে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে এসেছে, লিখেছে আত্মহত্যা সম্পর্কে কিন্তু যেগুলো সবচাইতে দরকারী সে সম্পর্কে মোটেই কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। দুনিয়ায় এতো দেশ থাকতে কেন ও এলো রুশিয়ায়? না হয় প্রতিষ্ঠানটা জাহান্নামেই যেত। এই বলেছে এই করেছে—আদৌ লেখার কি বিষয় আছে এর মধ্যে? তার চাইতে ভালো নিজেকে কুইমপার্লেতেই কবর দেয়া। খবরের কাগজ পড়া নয়, ট্রুম্যান কাল কি বলেছে, আগামীকাল কোথায় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখার কথা ঘোষণা করা হবে, কোনো দরকার নেই এসব জানার। নিজের বাগানটাকে গড়ে তুলতে পারবে। অনেকদিন ধরেই ওর স্ত্রী চাইছে এটা করতে। আর কিছু না হোক অন্তত এটা একটা সৎ জীবিকা। গাজর কাউকে কামড়াতে পারে না আর মটরশুঁটি দিয়েও কাউকে খুন করা যায় না। মাদোলফেঁকে কি সত্যিই আবার পালিয়ে যেতে হবে প্যারী ছেড়ে? আর গিয়ে গোপন স্থানে নিতে হবে আশ্রয়? যাবে কমানডাতুরায় -... কী অঢেল বন-ই না আছে ওদের। আর মানুষ-ই বা কতো!—

নিদারুণ ক্লান্তিতে হাই তুলল সাবলঁ তারপর তাকালো ঘড়ির দিকে—এখনও রাত বেশি হয়নি। এখন যদি শুয়ে পড়ে তো ঘুমোতে পারবে না। একটা কিছু করার জন্যে অসহায়ভাবে চারদিকে তাকালো। তারপর উঠে চলে গেল পাশের ঘরে তার দোভাষীর কাছে।

তাস খেলতে জানেন? জানেন না? বেশ, তাহলে আমাকে একটু রুশ-ভাষা শেখান। বনকে কি বলেন আপনারা? আর দুর্ভাগ্যকে?

নাতাশার কাছে লেখা ভাস্যার চিঠি ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণে ভরা:

বরং একটু অদ্ভুত গোছের লোক। উনি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন মস্কোতে। দু ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল দুজনার ভিতরে, কিন্তু কি সম্পর্কে তা আমি জানি না। ভদ্রলোক কতগুলো নক্কারজনক কথা বললেন। কিন্তু তবুও মনে হল আমার, ওদিনৎসভ যতোটা ভেবেছে তার চাইতে কম ঝানু। ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের ফটো দেখালেন আমাকে। বললেন, তাঁর মেয়ের অদৃষ্টে কী যে রয়েছে তা তিনি জানেন না। তার জবাবে আমি বললাম......লিখতে লিখতে এখানে এসে কলমটা রেখে দিল ভাস্যা। একবার মুখ বাঁকালো তারপর কেটে দিল শেষের দুটো কথা।

দিন কয়েকের ভিতরেই আমরা দ্বিতীয় চালান পাঠাচ্ছি। স্কুল বাড়িটা শেষ করতে দেরি হবে। প্লাস্টার নেই। খুঁদে ভাস্কার কথা জানিও, আর জানিও তোমার ওকের চারাগুলো কেমন আছে। বড্ডো হারিয়ে হারিয়ে ফেলি তোমাকে। চাই দু-হাতের নিবিড় বন্ধনে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। প্রিয়তমা আমার—

যে গিয়েছিল হারিয়ে, পড়েছিল ধরা আবার চলে গেল উড়ে—চিরজীবনের আনন্দ আমার।

ঊনচল্লিশ

গত শরৎ কালে মস্কোয় ছুটি কাটিয়ে এল ওলগা। একনাগাড়ে দু-দুটো বছর এস্তোনিয়ার একটা ছোট শহরে থেকে থেকে ওর প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিল গর্কি স্ট্রীট দেখতে, থিয়েটারে যেতে, পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে আর নিজের জন্যে কিছু কাপড়চোপড় কিনতে। এক কথায়, ওরই ভাষায় বলতে গেলে, 'স্বাভাবিক জীবনে' ফিরে যেতে। তাছাড়া প্রত্যেক চিঠিতেই লিখছিলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা মিউশেঙকাকে নিয়ে একবার এসে দেখা করে যেতে। খুদে নাতনীটিকে দেখার জন্যে খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। একটা মাস যেন দেখতে না দেখতে কেটে গেল। ফিরে যাবার সময়ে খুঁতখুঁত করতে লাগল ওলগা, মাত্র একটিবার সে যেতে পেরেছে মস্কো, আর্ট থিয়েটারে, তাছাড়া যথেষ্ট সংখ্যক সেকেন্ড-হ্যান্ড দোকান খুঁজে বের করার সময়ও হয়ে ওঠেনি। এমনকি তার অনেক দিনের বিশ্বস্ত গুণগ্রাহী কাঝাকভের সঙ্গে পর্যন্ত পারেনি দেখা করে উঠতে। খুদে নাতনীটির মাথাটি তো একেবারে খেয়ে দিয়েছেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। পুতুল কিনে দিয়েছেন ওকে, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছেন চিড়িয়াখানা। শান্তশিষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে মিউশেঙকা। কিন্তু ওর দিদিমা ভাবেন ওকে 'অসহায় বেচারা'। তিনি বলেছেনও একথা ওলগার কাছে। কিন্তু শুনে মুখঝামটা দিয়ে উঠেছে ওলগা। বলেছে:

চার বছর বয়সে সবাই অমন 'অসহায়, বেচারা'-ই থাকে। মিউস্যা তো নিজে নিজে জামাকাপড় ছাড়তে পারে। আমি চাই ও আত্মনির্ভরশীলা হয়ে গড়ে উঠুক।

গত বছর কয়েকের ভিতরে খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। শীতকালে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল ডাক্তার বলেছিলেন:

এই রকম হার্টের অবস্থা নিয়ে কি করে যে কাজ করে যাচ্ছেন আমি বুঝেই উঠতে পারি না। আপনার উচিত দিনের অর্ধেকটা সময় বিশ্রাম করা।

যদিও এ সম্পর্কে নিনা গিওর্গিয়েভনা কিছুই বলেননি, তার মেয়ের কাছে, তবুও নিজেই লক্ষ্য করেছে ওলগা যে তার মায়ের খুবই কষ্ট হয় হাঁটাচলা করতে। বারবার বলেছে, অনুরোধ করেছে, জোর করেছে:

স্কুলের কাজ ছেড়ে দাও। তোমার পেনশান, আর ভাস্যা ও আমি যা পাঠাবো তাতে খুব সুখেস্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে তুমি।

মনে হতো নিনা গিওর্গিয়েভনা শুনেও শুনছেন না। শেষ পর্যন্ত এক দিন রেগে উঠলেন:

শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকতে চাই না আমি, ওলেচকা। আমি চাই বাঁচার মতো বাঁচতে। জানিস তো স্কুলটাই হচ্ছে আমার সব। অকর্মন্য

বানাতে চাসনে আমাকে। আমার বয়েস মাত্র তেষট্টি। আলেকজান্দ্রা পেত্রোভনার বয়েস সাতষট্টি। সে আমার চাইতে ঢের বেশি ঘণ্টা পড়ায়।

ওলগা জানতো যে ওকে অনুরোধ-উপরোধে রাজী করানো যাবে না। তাই মস্কো আসার সুযোগে মায়ের কষ্ট যাতে একটু লাঘব হয় তাই এক পড়শী গৃহপরিচারিকার সঙ্গে ব্যবস্থা করল, মায়ের ঘরসংসার রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করবে। আর তার বদলে ও একশ রুবল করে পাঠাবে তাকে। মাকে কিনে দিল ওলগা একটা গরম কম্বল, হাতে বোনা পশমের ওভারকোট, নতুন একটা কফি-পট। যেমন তার ছোট মেয়ের সঙ্গে করে তেমনি চেচাঁমেচি করল মায়ের সঙ্গে। এমন কি বকুনি পর্যন্ত দিল এক দিন:

কেন তুমি আবার একটা পুতুল কিনে দিলে ওকে? চার বছর বয়েস হয়ে গেছে মেয়ের। আর দেখো দেখি তোমার তোষকের কী দশা হয়ে গেছে? এর উপরে শুয়ে ঘুমোও কি করে? তারপর আবার এই বয়সেও—

ওলেচ্‌কা সুখী হয়েছে কি না জানার চেষ্টা করেছিলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা, কিন্তু বৃথা। উনিশশো ছেচল্লিশে সিন্যাকভ ছাড়া পায় সেনাবাহিনী থেকে। এক সপ্তাহ কাটায় মস্কোয়। তারপর ওলগা চাকরি পায় একটা বিশ্রামাগারে। এক বছরের মিউশেঙ্কাকে দিদিমার কাছে রেখে ওরা চলে যায় পিয়ারনায়। পরে সিন্যাকভ যখন কাজ পেল এস্তোনিয়ায়, ওলগা মস্কো ফিরে এসে তার জিনিস-পত্র আর বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেল স্বামীর কাছে। সিন্যাকভকে বেশ শিষ্ট সভ্য ছেলে বলেই মনে হয় নিনা গিওর্গিয়েভনার, কিন্তু ওর সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে তাই-ই ভেবে উঠতে পারে না। একমাত্র মৌমাছি পালনের আলোচনা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে না সিন্যাকভ। সিন্যাকভ ছিল রুমানিয়ায়, ছিল চেকোস্লোভাকিয়ায়। কিন্তু নিনা নিওর্গিয়েভনা যখন ওকে জিজ্ঞেস করলেন কি কি দেখেছে সে ঐসব দেশে। জবাবে সিন্যাকভ বলল যে রুমানিয়ানরা জানে না কি করে মৌচাকের পচন প্রতিরোধ করতে হয়। ফলে ডিমের বাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু চেক-এরা এদিক থেকে খুবই দক্ষ। তাদ্রা পাহাড়ে চমৎকার সব মাঠ আছে যেখান থেকে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। ওলগা খুবই স্বামীপরায়ণা স্ত্রী। সে-ও বলে যে লোকটি খুবই ভালো। কিন্তু নিনা গিওর্গিয়েভনা কখনো এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারেন নি যাতে বুঝতে পারেন যে ওলগা তার স্বামীকে ভালোবাসে কি না। জানেন তিনি যে ওলগার বাইরের গাম্ভীর্যের আড়ালে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আর আবেগপ্রবণতা লুকানো রয়েছে। তাই মনে মনে কামনা করেন যাতে প্রথম বিয়ের গোলমালের মতো আবার ঐ ধরনের কোনো কিছুর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তাহলে ব্যাপারটা আগের চাইতে ঢের বেশি জটিল হয়ে দাঁড়াবে মিউশেঙ্কাকে নিয়ে।

ওলগাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা, সে বললো সব কিছু, কিন্তু তার গোপনতম অন্তরের কোনো হদিসই দিল না।

ওলগা অভিযোগ করল একঘেয়ে জীবন সম্পর্কে। সুখ্যাতি করল তার ফ্লাটটার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেল এস্তোনিয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা, দরজা-জানালা ঠিক মতো বন্ধ করার বিষয় নিয়ে, বাজারের চমৎকার ব্যবস্থা

সম্পর্কে, দুধ মাখন ইত্যাদি কি পরিমাণ শস্তা তার কথা। ওকে বাধা দিয়ে নিনা গিওর্গিয়েভনা যখন জিজ্ঞেস করলেন যে এটা ওর ভালো লাগে কি না বা মস্কোর জীবন হারিয়ে কষ্ট হয় কি না। জবাবে ওলগা বলল:

তা অবিশ্যি বটে। পরিচিত লোক খুব কমই আছে, তাও বেশিরভাগই পছন্দ মতো লোক নয়। তবে করার মতো কাজ আছে প্রচুর তাছাড়া খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে আমাকে। অবশ্য ওখানে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুবই শক্ত ব্যাপার। গ্রিগোরির কাজটা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের কাজ। তার মানে ওকে থাকতে হয় ভিতরের দিকে। ওখানে না হলে অন্য কোথাও। গত গ্রীষ্মে ওর সঙ্গে আদৌ দেখাই হয়নি আমার, ভাবতে পারো? এ-গাঁ সে-গাঁ করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ কথা ঠিক যে, মস্কোতে মনের মতো কাজ একটা জুটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু ওর পক্ষে করার মতো কোনো কাজই তো শহরে নেই। তাছাড়া আলাদা আলাদা থাকার মানে হয় না কিছু। মিউশার পক্ষেও বাপের কাছে থাকাটা ঢের ভালো। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা খুবই খারাপ। কিন্তু ভেবো না তারজন্যে আমি কিছু অনুযোগ করছি। মোটামুটি কথা হল এই যে আমি খুবই সুখী। নাদিয়া কোরাবেলনিকোভা গিয়েছিল সাখালিনে। সে জায়গাটা আরো খারাপ। মাঝে মাঝে তালিন-এ যাই। ওখানে একটা রুশ থিয়েটার আছে। এস্তোনিয়ার ভাষায় কথা বলতে শিখে গেছে গ্রিগোরি। সে এক কসরত বটে! ওদের কতগুলো শব্দ আছে শুধুই স্বরবর্ণ দিয়ে। একটা ক্লাব আছে আমাদের ওখানে। ফিল্ম দেখানো হয় সেখানে। কখনো কখনো আমরা নাচিও। কিছু ভক্তও জুটেছে আমার—একজন ইঞ্জিনিয়র, আর একজন জেলার সরকারী উকিল। বেশ সংস্কৃতিবান লোক ওঁরা।

ওলগার মুখের দিকে তাকালেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। ওর চেহারাটা ঢের ভালো হয়ে উঠেছে, আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে দুটো চোখের দৃষ্টি। পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা সম্ভব বটে। কিন্তু তবুও ওলগা ভালোবাসে ওর স্বামীকে। যেটা সবচাইতে বেশি অবাক করে দিল নিনা গিওর্গিয়েভনাকে সেটা হচ্ছে এই যে ওলগা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যেতে পারে কাপড় সম্পর্কে—চীনা ক্রেপ, ঝকঝকে স্কার্ট, জর্জেট, ব্লাউজের কলার—

সাজসজ্জার উপরে দারুণ ঝোঁক আমার, বুঝলে মামনি,—হাসতে হাসতে স্বীকার করল ওলগা।—এটা কি খুবই খারাপ? জিজ্ঞেস করে দেখো আমার উপরওয়ালাকে, সে বলবে, কেমন করে কাজ করতে হয় তা আমি জানি। ছেচল্লিশ সালে পিস্কভ থেকে এক দল যৌথখামারের চাষী এল আর ব্যাখ্যামূলক অভিযান শুরু করার কথা হল তাদের নিয়ে। ভার দিল আমার উপরে। খুব ভালো-ভাবেই চালিয়ে গেলাম। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে একটি তরুণী মেয়ের তার নিজের চেহারার দিকে যত্ন নেওয়া উচিত?

নিশ্চয়ই নেওয়া উচিত, ওলেচ্,—প্রত্যুত্তরে বললেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করলেন নিজের কাছে যে কোনো দিনই তিনি ওকে বুঝে উঠতে পারবেন না। নিজের পেটের মেয়ে। কিন্তু তবুও ও যেন একটা ধাঁধাঁ। মানুষ

হিসেবে খুবই চমৎকার কিন্তু সম্পূর্ণ রহস্যময়ী হয়েই রইল ও'র কাছে।

ওলগার চলে যাওয়ার মুহূর্তে এসে পেঁাছাল ভাস্যা। সন্ধ্যায় একটা পারিবারিক ভোজের আয়োজন করলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। খুবই হাসিখুশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ওলগা। পরিহাসভরা কণ্ঠে ওর সহকর্মীদের কথা বলে যেতে লাগল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলন হয়েছে ভাস্যা আর নাতাশার। নতুন প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ওদের হাবভাব। তাই নিয়ে ভাইকে খেপাতে লাগল ওলগা:

কূজন-গুঞ্জন শিখে গেছ দেখছি—

সমস্ত সময়টা হাসি-মুখে রইলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। কিন্তু থেকে থেকে কান্না পেতে লাগল। গোটা সন্ধ্যেটা ঘুরেফিরে ও'র মনে পড়তে লাগল সের্গেইর কথা।

পরদিন ওলগাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে স্টেশন থেকে ফেরবার পথে ছেলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা:

কেমন দেখলি ওলগাকে?

সত্যিই ওর রূপ যেন ফেটে পড়ছে,—মুচকি হেসে বলল ভাস্যা,—তাছাড়া খুব কাজের মেয়ে। ওর মতো একজন সেক্রেটারী পেলে কাজ হতো।

আর ওর মতো বৌ পেলে?—হঠাৎ আবেগভরে জিজ্ঞেস করলেন নিনা গিওর্গিয়েভনা।

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল ভাস্যা। কোনো জবাব দিল না।

খুশিভরা দরাজ মন নিয়ে ঘরে ফিরে এল ওলগা। মস্কো ওকে উজ্জীবীত করে তুলেছে। জাগিয়ে তুলেছে ওর স্কুল-বেলার স্মৃতি—হাসি, কৌতুক, স্বপ্ন। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত ছোট্ট শহর, মৌমাছিদের শীতকালীন নিরাপত্তা নিয়ে ব্যস্ত স্বামী, খুঁতখুঁতে গোমড়া মুখ উপরওয়ালা-সব মিলে ওর মনটাকে দমিয়ে দিল। এমনভাবে বাস করা শক্ত, সে যাই হোক। অবশ্য মিউস্যা থাকায় বাঁচোয়া। ভালো মানুষ গ্রিগোরি। নিন্দা করার মতো কোনো কিছু নেই ওর ভিতরে। যে ক বছর ধরে ওরা বাস করছে এক সঙ্গে তার ভিতরে একটি দিনের জন্যেও ঝগড়া হয়নি দুজনার। তার নিজের কাজ সম্পর্কেও অভিযোগ করার মতো কিছুই নেই। উদ্যম দেখাবার সুযোগ রয়েছে। খুবই একটা প্রয়োজনীয় কাজ করছে বলে অনুভব করতে পারে। কিন্তু তবুও কেন জানি মনটা দমে আসে...। যাই হোক, অল্প সময়ের ভিতরে সামলে নিল ওলগা। তারপর স্বভাবসুলভ হাসিখুশিভাব নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিল। খুশি করে দিল স্বামীকে তার জন্যে আনা উপহার দিয়ে। আর সন্ধ্যেবেলা লেগে গেল ঘরে নতুন পর্দা টাঙাতে। তাতে করে ঘরখানা আরো সুন্দর, আরো মনোরম হয়ে উঠল। ওলগা সুগৃহিণী। কি করে সংসারটিকে আরামপ্রদ করে তোলা যায় সেদিকে বেশ দক্ষতা আছে ও'গার। যখনই সিন্যাকভ গ্রাম গ্রাম ঘুরেফিরে এসেছে ঘরে, এসে পেয়েছে ভালো নৈশভোজ। গরম জল, পরিষ্কার তোয়ালে মজুদ রয়েছে ওর জন্যে। গোপনে বলেছে ওর বন্ধুদের কাছে যে ও স্ত্রীটি পেয়েছে একটি রত্ন। আর ওলগাকেও বলেছে যে সে যেন একটি সুন্দরী পরী।

স্বভাবত চাপা মেয়ে ওলগা। কোনো দিনও সে তার মন খুলে কথা বলেনি

মায়ের কাছে। যে কথাটা জানার জন্যে মনে মনে এতোখানি উৎকণ্ঠা অনুভব করছেন নিনা গিওর্গিয়েভনা, ইচ্ছে থাকলেও সে কথার জবাব দিতে পারেনি ওলগা মুখ ফুটে। কারণ, নিজেই জানে না ও সিন্যাকভকে ভালোবাসে কি না। প্রথম যৌবনে অনেক বার প্রেমে পড়েছে ওলগা। সকলনিকি পার্ক বা অন্ধকার সিঁড়িতে বহুবার বহু ছেলের সঙ্গে হয়েছে ওর চুম্বন-বিনিময়। কিন্তু কিছুদিন পরে অবাক হয়ে দেখেছে ওলগা যে মিশা মানে সুভালভ কি করে যেন ওর মনকে আকর্ষণ করে বসে আছে। লাবাঝভের অনুরোধ-উপরোধে রাজী হয়ে গেল ওলগা। মনে মনে বুঝে দিল নিজেকে যে এখন আর ও কিশোরীটি নয়। যে বয়সে সবাই বিয়ে-সাদী করে থাকে সে বয়েস ওর হয়েছে। তাছাড়া স্বামী হিসেবে সেমিয়ন ভালোই হবে। প্রেম সম্পর্কে নিনা গিওর্গিয়েভনা যে কথা বলেন তা নেহাতই কাল্পনিক কাব্যকথা বলে মনে হয় ওর কাছে:

মা সব সময়েই আশমানে ঘুরে বেড়ান।

যখন দেখতে পেল লাবাঝভ নীচ প্রকৃতির অব্যবস্থচিত্ত-তাকে পরিত্যাগ করল ওলগা। কুইবিশেভে এক আহত লেফ্‌টেনেন্টের সঙ্গে হল পরিচয়। লোকটি লাজুক, সঙ্গীহীন। সে ওর প্রেমে পড়ল। প্রতিদিন ওর চোখে দেখেছে ওলগা অনুরোধভরা উৎসুক দৃষ্টির ব্যাকুলতা। লোকটির প্রতি মমতা জেগে উঠল ওর অন্তরে। আনন্দিত হয়ে উঠল একটি পুরুষের কোমল এতোখানি স্নেহশীলা হয়ে উঠতে পেরেছে দেখে। শেষ পর্যন্ত এমন একজন কাউকে পেয়েছে যাকে ও ভালোবাসতে পারে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল সিন্যাকভ। এমন কি তার চেহারা পর্যন্ত গেল বদলে। এখন আর কুঁজো হয়ে হাটে না। ওর চোখের দৃষ্টিতে ফিরে এসেছে জীবনের প্রাণ-চঞ্চলতা। যা ঘটে গেল মনে হল যেন ভোজবাজি। ওলগাকে নিয়ে যখন ও পথে চলে সবাই তাকায় ওলগার দিকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্যাকভ অভ্যস্ত হয়ে এল ঐ অপূর্ব ভোজবাজিতে। আর মনে মনে স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল যে ওলগা ওকে ভালোবাসে। এমন একটি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী পতিপ্রাণা স্ত্রী যে কি-না ওকে একটি কন্যা সন্তান পর্যন্ত উপহার দিয়েছে, তাকে পেয়ে নিজেকে মনে মনে ভাগ্যবান মনে করতে লাগল সিন্যাকভ। এবার ও সম্পূর্ণভাবে কাজের ভিতরে ডুবে যেতে পারবে। দারুণ ভালোবাসে ওর নিজের কাজকে। বিভিন্ন জাতের মৌমাছিদের চালচলন ওর জানা। এ সম্পর্কে যাবতীয় সাহিত্য ওর পড়া। তাছাড়া ওর গবেষণা কেন্দ্রটিকে এমন সুন্দরভাবে সংগঠিত করে তুলেছে যে সোবিয়েত দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকেও সেটা পরিদর্শন করতে লোক আসে। ওর জগৎটি নিজের কাজকর্মের দ্বারা এমনই সীমাবদ্ধ যে যখন ওলগা বলল যে মেপেল গাছ ওর সব চাইতে প্রিয়, অবাক হয়ে গেল সিন্যাকভ। ও জানে লাইম গাছই হচ্ছে সবচাইতে সেরা গাছ। সিন্যাকভের মুখখানা চওড়া, গালের হাড় দুটো উঁচু, চোখের চাউনি কোমল, কিছুটা ক্ষীণ। সব সময়েই ওর গায়ে থাকে একটা বুশ-সার্ট। বিশ্রামের সময়ে হয় কাগজ কেটে কেটে মৌমাছি বানায় মিউশেঙ্কার জন্যে, নয়তো পাকায় সিগারেট। কাগজের টুকরা আর তামাকের কুচি ছড়িয়ে পড়ে মেঝেময়। আর ওলগা যায় চটে।

সিন্যাকভের সাহচর্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ওলগা। স্বামী যেমনটি হওয়া উচিত, সিন্যাকভ ঠিক তেমনি-ই। কখনো কখনো অবশ্য উন্মত্ত অন্তরাবেগের বন্যায় ভেসে যাওয়ার এক অত্যুগ্র কামনা জেগে ওঠে ওলগার অন্তরে, যেমনটি দেখেছে রঙ্গমঞ্চের নায়কদের ভিতরে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নেয় সে ভাব। কারণ রঙ্গমঞ্চ হল এক, আর জীবন আর এক। গ্রিগোরি বিবেচক, সন্দিগ্ধচিত্ত নয় মোটেই, কিংবা প্রবঞ্চণাও করে না ওর সঙ্গে। তাই ওর তরফ থেকে একান্ত প্রয়োজন পতিপরায়ণা হওয়ার। দুটি লোক—ইঞ্জিনিয়ার তাম্ আর জেলার সরকারী উকিল ক্রিমভ, দুজনাই ওর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, দুজনাই ওর মনোরঞ্জন করে থাকে। তাম্ পড়েছে ওর প্রেমে। দীর্ঘাঙ্গী, পাকা ধানের মতো সোনালী চুল, সজল চোখ আর ঈষৎ অবগুণ্ঠিত ওলগা। ছোট্ট শহরটির হালকা রঙের চুল, হালকা রঙের চোখ যে সব মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে তাম্ তাদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ওলগাকে কেমন যেন রহস্যময়ী বলে মনে হয় তামের। কুমারী বয়সে ওর যে চোখ দুটি ছিল শান্ত ঢুলুঢুলু, তারই অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক তীব্র আবেগের বহ্নিশিখা ওকে এমন উদ্বুদ্ধ করে তুলল যে একদিন বলেই ফেলল তাম্:

তোমার চোখ দুটি যেন ঘূর্ণাবর্ত।

মনে মনে দারুণ খুশি হয়ে গেল ওলগা। সিন্যাকভ, লাবাঝভ বা মস্কোর অন্য সব ছেলেদের চাইতে ওর সঙ্গে তামের ব্যবহারের ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা।

ওকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনায় তাম্, ওর জন্যে নিয়ে আসে ফুল আর পরম সম্ভ্রমের সঙ্গে চুম্বন করে ওর হাতে। কোনো কোনো দিন স্বপ্ন দেখে ওকে ওলগা। দেখে যেন দুজনে বসে আছে সমুদ্রের পাড়ে আর খাচ্ছে চুমু। কিন্তু বাস্তব জীবনে শুধু গোপন দীর্ঘনিশ্বাসে ঘটে এর পরিসমাপ্তি।......অতীত জীবনের উন্মত্ত দিনগুলোর কথা গল্প করে ক্রিমভ ওলগার কাছে। বলেছে লেনিনগ্রাদের একটি বিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে একবার ও প্রেমে পড়ে। তাকে নিয়ে পালিয়ে যায় ক্রিমিয়ায়। সেখানে গিয়ে মেয়েটি চেষ্টা করে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে। কিন্তু ক্রিমভ বাঁচিয়ে দেয় তাকে। ওলগার মনে হয় ক্রিমভ বানিয়ে বানিয়ে বলে নিজের দাম বাড়ায়। কিন্তু তবুও ওর গল্প উপভোগ করে। ওর গল্প শোনার পরে মনের প্রশান্তি ফিরে পায়। যেন সেই মেয়েটি যাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল ক্রিমিয়ায়, সে কোনো কাল্পনিক লেনিনগ্রাদবাসীনী নয়, সে ও নিজে—ওলগা সিন্যাকোভা।

ক্রিমভ আর তামের সঙ্গে দেখা হয় ওর ঘনঘন। কারণ দিনের বেলা কাজ করে ওলগা জেলার কার্যকরী কামিটিতে। আর সন্ধ্যায় এসে দেখাশোনা করে মিউশ্যাকে। বাচ্চার জামা তৈরি করে, করে সংসারের কাজকর্ম। বাচ্চা মেয়েটিকে দারুণ ভালোবাসে ওলগা। যদিও সেটা নিনা গিওর্গিয়েভনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে প্রাণপণে। কোনো কোনো সময়ে ভাবে বসে মিউশ্যার ভবিষ্যতের কথা: মিউশ্যার বয়েসকালে থাকবে না আর যুদ্ধ, দেশ হয়ে উঠবে সম্পদশালীনী আর জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা। মনের মতো কাজ বেছে নিতে পারবে মিউশ্যা, আর বেছে নিতে পারবে গ্রিগোরির মতো সুন্দর ভদ্র স্বামী। হয়তো

বা ওর চাইতেও ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি উদার। হয়তো বা তামের মতো কেউ।

উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের জুন মাসে ওদের গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন অধ্যাপক রাউদসেপ্, বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। ওঁর সম্পর্কে সিন্যাকভ বলেছে:

এখানেই বল আর আমেরিকায়ই বল ওর সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

অধ্যাপক রাউদসেপ্ এস্তোনিয়া বাসী। কিন্তু যৌবন বয়েস থেকেই বাস করছেন মস্কোয়। প্রায়ই যান তিনি তাঁর দেশে এস্তোনিয়ায়। তাঁর দেশবাসী তাঁর মতো একজন বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত পেয়েছে বলে গৌরবান্বিত।

যুদ্ধের পরে তিনি সুপ্রিম সোবিয়েতের ডেপুটি নির্বাচিত হন। ওঁর লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছে ওলগা। যাতে তিনি যে সব বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বিদেশে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের আক্রমণ করেছেন তীব্রভাষায়। ওঁর আসার উপলক্ষ্যে ছোট্ট সহরটায় সাড়া পড়ে গেল। যখন শুনল যে এই গবেষণা কেন্দ্রে তিনি এক পক্ষকাল থাকবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, ওলগা ভূতপূর্ব জার্মান জমিদারের পরিত্যক্ত বিলিয়ার্ড খেলার ঘরটাকে একটা ছোট্ট সুসজ্জিত আবাস-স্থলে পরিণত করে তুলল। ঘরটা তখন থেকেই খালি পড়ে ছিল আর গত চার বছর ধরেই আলোচনা চলে আসছিল যে ওটাকে ল্যাবোরেটারী করা হবে, না স্থানীয় সোবিয়েতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। নিজের ঘরের কিছু কিছু আসবাবপত্র নিয়ে এল ওলগা আর নিয়ে এল স্থানীয় সোবিয়েতের দেওয়া নতুন একটা খাট। ফলে ঘরটা এমন সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে উঠল যে সিন্যাকভ দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বলেই ফেলল:

এমনি একটা ঘরেই আমাদের বাস করা উচিত।

অধ্যাপক রাউদসেপের বয়েস ষাট বছর। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, আর ঘন পাকা চুল-ভরা মাথা। দেখে মনে হয় যেন একজন লুথারীয় ধর্মযাজক। ওঁর চালচলন কাঠখোট্টা, কথা বলেন কম, আর দিনের বেলা খুব সকালে চলে যান মাঠে মধু পাওয়া যায় এমন সব গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে। সিন্যাকভ যখন ওকে দেখাল ওর তৈরি কারখানা যেখানে ওরা কৃত্রিম মৌ-চাক তৈরি করে, দেখে বললেন রাউদসেপ:

ওটা আমরাও করে থাকি......। কিন্তু আপনারা অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

কথাটা শুনে ফেলল হঠাৎ ওলগা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। যদিও সে আকাশকুসুমের কল্পনা করে না তবুও এক-এক সময়ে মনে মনে ভাবে হয়তো গ্রিগোরি ঐ মৌচাকের জন্যে স্তালিন পুরস্কার পাবে।

রাউদসেপের রুক্ষ গাম্ভীর্য সন্ত্রস্ত করে তুলেছে ওলগাকে। কিন্তু তবুও এ কথা না ভেবে পারে না যে যদিও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, যাঁর কাছে গ্রিগোরি নেহাতই একটি অজ্ঞ শিশুমাত্র তবুও বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে তাঁর আগ্রহ। এই তো সেদিন বললেন যে মস্কো আর্ট থিয়েটারে একটা নতুন নাটক দেখে এসেছেন। আর অভিনেতারা এমন সব বাজে বাজে সংলাপ বলছিল যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছিল শুনে। খনিজ শিলা নিয়ে আলোচনা করলেন তামের সঙ্গে। পরে তাম্ বলেছিল:

অদ্ভুত অপূর্ব। উৎপাদনের রীতি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান আছে রাউদসেপের। তাছাড়া রাজনীতিতে অধ্যাপকের জ্ঞান সত্যিকারের রাজনীতিজ্ঞেরই মতো। বেশ ভাবতে হয় ওর প্রবন্ধগুলোর সম্পর্কে।

"সোবিয়েত এস্তোনিয়ার" একজন সাংবাদিক এসে যখন ধরে পড়ল ওলগাকে অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে কারণ বাল্টিক দেশগুলি সম্পর্কে আমেরিকার চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁর উপরে ভার দেয়া হয়েছে একটি প্রবন্ধ লেখার. মনে মনে বেশ খানিকটা গর্ব অনুভব করল ওলগা এই ভেবে যে এমন একজন বিখ্যাত লোকের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়েছে যার কাজকর্ম প্রত্যেকের কাছেই একান্ত প্রয়োজনীয়।

গাঁয়ের ডাক পেয়ে চলে গেল সিন্যাকভ আর একা পড়ে গেল ওলগা। সকালে অধ্যাপকের জন্যে আনে জলখাবার। অন্যান্য সময়ের খাবার খান তিনি সহরে গিয়ে। সন্ধ্যায় স্বামীর জামাকাপড় রিপু করে। ট্রাউজার সেলাই করে রাখে. রিপু করে মোজা। থেকে থেকে তাকায় প্রফেসরের আবাসগৃহের দিকে। আলো দেখা যায় জানালার পথে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। ওলগার মনে হল তিগানিকে যেতে দেয়া উচিত হয়নি ওদের। কারণ কেউই আর নেই যে নাকি অধ্যাপককে ভোর বেলায় মাঠে নিয়ে যায়। ওর মনে হল যেন মাথা ধরে উঠছে। কিন্তু পরে বুঝল যে ওটা দীর্ঘ সময় একটানা খাটুনির দরুণ ক্লান্তি মাত্র। আজেবাজে চিন্তা এসে ভিড় করতে লাগল ওর মনে:

জ্বালানি ও ইলেকট্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেই হতো। বিষয়টা খুবই চমৎকার। কিংবা ভাস্যার মতো স্থপতি হলেও হতো। সিন্যাকভের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে তামের সঙ্গে যদি দেখা হতো.........। বাগানে বেরিয়ে এল ওলগা। দুটো বাজে। সবে মাত্র ভোর হতে শুরু করেছে। তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল একটা লোক গুঁড়িসুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে একই দিকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ওলগা, নিশ্চয়ই ছিঁচকে চোর হবে। দারুণ ভয় ওর চোর-ডাকাতে। যুদ্ধের আগে সকলনিকি পার্কে একদিন বলেছিল ওকে মিশা:

পাশের দিকে কোথাও যাই চল। পথের উপরে দাঁড়িয়ে তো আর চুমু খাওয়া যাবে না।

পাগল তুমি,—প্রত্যুত্তরে বলেছিল ওলগা,—পরণের কাপড় জামা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে।......দেখতে পেল, এতক্ষণে লোকটা উঠতে চেষ্টা করছে জানালা বেয়ে। মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওলগা লোকটার উপরে। লোকটা পড়ে গেল। আর আঘাত করল ওলগাকে পরপর দুবার। চিৎকার করে উঠল ওলগা। দুটি মেয়ে শ্রমিক, বুড়ো ডাইরেক্টর আর তিগানির ছোটো ছেলে ছুটে এল ঘটনাস্থলে। চোরটা ততক্ষণে পালিয়ে গেছে। অধ্যাপক রাউদসেপ ওলগাকে তাঁবুর ভিতরে শুইয়ে দিতে বলে সহরে লোক পাঠিয়ে দিলেন ডাক্তারের জন্যে। এক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান ফিরে এল ওলগার। ওর মাথার ভিতরে যন্ত্রণা হচ্ছে। তাতেই ওর ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। এটা কি টাইফয়েড জ্বর? না, সেই লোকটা যে চেষ্টা করেছিল জানালা বেয়ে ওঠার......পরক্ষণেই আবার ওলগা অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পরের দিন সীমান্তরক্ষীরা সন্দিগ্ধ চরিত্রের একটি লোককে গ্রেপ্তার করে এক জেলেদের গাঁয়ে। ওর কাছে কোনো ছাড়-পত্র ইত্যাদি কিছুই ছিল না। পকেটে পাওয়া গেল তিনশ চল্লিশ রুবল আর আটটা সুইডিশ ক্রাউন। নাম বলল আগাস্ট এরিকসন। তালিনের অধিবাসী। যুদ্ধের আগে গ্রামাঞ্চলের সরকারী ভূসম্পত্তির তত্বাবধায়কের কাজ করতো। তারপর কাজ করে এস. এস. বাহিনীতে। পরে পালিয়ে যায় সুইডেন। তিন সপ্তাহ আগে ওকে নিয়ে এসেছে সুইডেন থেকে মোটর-বোটে করে। যে লোকটা ওকে পাঠিয়েছে তার নাম জ্যাকব, ডাক নাম জিঞ্জার, যদিও তার চুলগুলো ঘন বাদামী রঙের। মনে হয় যুদ্ধের আগে জ্যাকব কাজ করতো বৈদেশিক অফিসে। এরিকসনের কাছে বলেছিল জ্যাকব যে কয়েকজন বিখ্যাত রুশকে খুন করা দরকার বা কোনো একজন এস্তোনিয়ানকে-যে না কি আত্মবিক্রয় করেছে রুশদের কাছে। কে কি সে বৃত্তান্তে প্রয়োজন নেই। আর ঠিকানা দিয়ে দিয়েছে সারাপ নামে কোনো একটি লোকের—ওদের দলভুক্ত। কোন রুশ ভদ্রলোককে খুন করতে হবে না হবে সে দিক থেকে সে ওকে সাহায্য করবে। তাছাড়া ব্যবস্থা করবে ওর সুইডেন ফিরে যাওয়ার। সারাপয়ের মতে তালিনে করার মতো কোনো কাজই ছিল না। তাই কোনো একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করাই ভালো। পনেরো দিন বসে রইল এরিকসন প্রতীক্ষায়। তারপর সারাপ ওকে নির্দেশ দিল গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে রাউদসেপকে সাফ করে দেয়ার জন্যে। দিনের বেলায় এসে পৌঁছেছে ও গবেষণা কেন্দ্রে। গল্পসল্প করেছে পাহারাদার তিগানির সঙ্গে। নিজের পরিচয় দিয়েছে একজন মালী বলে। আর বলেছে যে ও কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেল অধ্যাপক থাকেন ঐ তাঁবুতে। আর জানল যে পরের দিন রুশ লোকটা আর তিগানি দুজনেই বাইরে চলে যাবে। আরো একটা দিন ও জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে কাটিয়ে দিল। জ্যাকব ওকে দিয়েছিল একটা রিভলবার। খাপে মোড়া ছোরাটা দিয়েছে সারাপ। বলেছে সে যে ছোরাই ভালো। পালানোটা সহজ হয়। জ্যাকভের কার্যকলাপ সম্পর্কে ও কি জানে, জিজ্ঞেস করতে বলল, "ভ্রাতৃদল" নামে একটা সংগঠনের সে প্রেসিডেণ্ট। সময় সময় ওরা সবাই একত্র হয় উপাসনা করতে বা গানের জলসায়। আর শোনে এস্তোনিয়ার শহীদদের আত্মবলির কথা জেকভের মুখে। বিরাট একটা বাড়ি আছে ওদের স্টকহলমে সলৎজোবাদেন রাস্তার উপরে। এইটুকু মাত্রই ও জাগে।

হয়তো সত্যিসত্যিই আগাস্ট এরিকসন এর বেশি আর কিছুই জানে না। সারাপয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না—গা-ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কেন যে জ্যাকব ওরফে জিঞ্জার মানুষ খুন করাতে চায় সে সম্পর্কে সারাপেরও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। সারাপ বুঝেছে যে এতে পরিবর্তন কিছু আসবে না। শুধু শুধু আত্ম-গোপন করে থাকাটা মুস্কিল হয়ে উঠবে। এ কথা সত্যি যে কাগজপত্র যা ও যোগাড় করেছে তা খুবই ভালো। আর কেউ-ই সন্দেহ করতে পারবে না যে যুদ্ধের আগে ও ছিল তারতুতে পুলিশ ইনস্পেক্টর। কিন্তু যদি কেউ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই লোক খুন করতে আরম্ভ করে তাহলেই খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে আর কেউ না কেউ ধরাও পড়ে যেতে পারে। ওদের পক্ষে এ সব কৌশল

উদ্ভাবনের দিক থেকে সুইডেনেই ছিল ভালো। এই জ্যাকবটার উচিত ছিল এখানে আসা!

জ্যাকব নিজেও জানতো না কেন সে অনুগত লোকদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেবে। কারণ ও ভেবেছিল যে যুদ্ধের সময়ের জন্যেই ওদের রেখে দেয়া হয়েছে। আর যুদ্ধটা তো শুরু হল বলে। কিন্তু আমেরিকান দূতাবাসের এক কর্মচারী মিলস, যে কিনা নিতান্ত সাধারণ একটা গ্যারেজ ম্যানেজারের চাকরি করে, সে বলেছিল ওকে যে শরৎকালের আগে এস্তোনিয়ায় অন্তত তিনটা হত্যাকাণ্ড না করতে পারলে আর টাকা দেবে না ওদের। যেখানে এতো লোক রয়েছে সেখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার বা একজন কারখানার পরিচালককে খুন করার কী যে মানে হয় এ প্রশ্নটা মিলসয়ের নিজের কাছেও জেগে উঠেছে। কিন্তু ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত। তাই মনে মনে নিজেকেই বুঝ দিয়েছে এই বলে যে ওরা কি করছে না করছে সে সম্পর্কে ওয়াশিংটনের সবাই ওরা সব কিছুই জানে।

ওয়াশিংটনে কর্নেল বরার্টসয়ের এক সহকর্মী আছে মেজর ব্রাট নামে। তাকে খুবই তারিফ করে রবার্টস। বাল্টিক দেশগুলো মেজর ব্রাট-এর হেফাজতে। এ একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেছে সে রবার্ট্স্-এর কাছে যাকে ওরা নিজেদের ভিতরে বলে "মক্ষীদংশন অভিযান"। ব্রাটের মতে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের আচমকা খুনখরাবী ঘটতে থাকলে একটা উত্তেজনার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে উঠবে আর ব্যাহত হবে পুনর্গঠনের কাজ।

হত্যাকাণ্ডগুলোর পাত্র নির্বাচন যতোই আকিঞ্চিতকর হবে ততোই ভালো।—বলল ব্রাট,—ওরা আন্দাজে আন্দাজে হাতড়ে বেড়াক, অপরাধীদের খুঁজে বেড়াক সর্বত্র, তাতেই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

রবার্টস সাদরে এই "মক্ষীদংশন অভিযান" পরিকল্পনা সমর্থন করল আর প্রচুর টাকা বরাদ্দ করল এই দুঃসাহসিক কাজের জন্যে। ভারি খুশি ব্রাট: রিগায় দুজন মোটর ড্রাইভারকে খুন করা হল। আগুণ ধরিয়ে দিল লিথুনিয়ার একটা কারখানায়। এবার এস্তোনিয়ার পালা।

ওলগার আঘাত সামান্য। ছোরার আঘাতটা ছুঁয়ে গেছে। শুধু গালের খানিকটা গেছে কেটে। ঘাটা যদিও খুবই তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, তবুও একটা বিশ্রী দাগ থেকে যাবে ভেবে ওর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ওর প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার বললেন যে খুবই সামান্য একটু দাগ থেকে যাবে, কিন্তু পরে চামড়া কেটে জুড়ে দেয়া যেতে পারে। এতে আরো মন খারাপ হয়ে গেল ওলগার। কিন্তু দিন কয়েক এমনি মনঃকষ্টে কাটাবার পরে অদৃষ্টের সঙ্গে রফা করে ফেলল ওলগা। সবাই ওকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। এমন কি সহকারী মন্ত্রী পর্যন্ত ছুটে এলেন ওকে দেখতে।

দেখলেন তো কেমন একটি বৌ পেয়েছি আমি,—বলল সিন্যাকভ,—একটি খাঁটি বীরাঙ্গনা!

ঘটনার কথা লিখল ওলগা তার মায়ের কাছে। কিন্তু বিস্তারিত কিছুই ভেঙে লিখল না। নিনা গিওর্গিয়েভনা এতোটা উতলা হয়ে পড়বেন তা মোটেই আশা করেনি ওলগা। কিন্তু দেখা গেল যেইমাত্র স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে

অমনি ছুটে এসেছেন তিনি মেয়ের কাছে।

ওলগার প্রথম প্রশ্ন হল মায়ের কাছে:

কেমন দেখাচ্ছে? খুবই ভয়ানক দেখতে হয়েছে?

বোকা মেয়ে,—জোর দিয়ে বললেন গিওর্গিয়েভনা—মোটেই ভয়ানক কিছু না, এই সামান্য একটু দাগ মাত্র। ওকে বিশ্রী হওয়া বলা যায় না। তাছাড়া সবাই তো জানে কি করে হয়েছে।

এমন কিছু আহামরি কাজ করি নি আমি,—মুখ ঘুরিয়ে বলল ওলগা,—গ্রিগোরি ছিল না এখানে। অন্য কোনো পুরুষ মানুষও ছিল না। শুধু পরিচালক ছাড়া। তাতে তিনি আবার বুড়ো মানুষ, জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তাছাড়া আমি যদি চিৎকার করতাম তবে হয়তো ও গুলি করতো। ওর কাছে রিভলবার ছিল দেখা গেল। অন্যদিকে অধ্যাপক রাউদসেপের জীবন আমাদের কাছে কতোখানি মূল্যবান সেটা ভেবে দেখো একবার। একটা ভয়ংকর ক্ষতি হতো—। আমি যা করেছি যে কোনো লোকই তা করতো। এ নিয়ে অহংকার করার মতো কিছু নেই।

নিনা গিওর্গিয়েভনা দেখলেন ওলগা অভিনয় করছে না। তাই আবার ভাবলেন:

কী জটিল দুর্বোধ্য ওর স্বভাব! ওকে বুঝে উঠতে পারলাম না।

রাত্রে নিনা গিওর্গিয়েভনা ভাবতে লাগলেন যে খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন তিনি। সব কিছুই তেমনি রয়ে গেছে যেমনটি ছিল তাঁর বয়েসকালে। কিন্তু বদলে গেছে মানুষ। কতোবার ওলেংকার বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের কাছে। মনে হয়েছে ওলগার ভিতরের রোমাণ্টিক ভাবধারার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু যখন সময় এল, সত্যিকারের প্রমাণ দিল ওলগা যে কি ধাতুতে ও গড়ে উঠেছে। দুষ্কৃতিকারীকে বাধা দিয়েছে সেটা তেমন বড়ো কথা নয়, কিন্তু যেভাবে বলল—এতটুকুও আত্মশ্লাঘা না করে, যেন এটা একটা দৈনন্দিন ব্যাপার মাত্র। এটাই কি খুবই অসাধারণ নয়? অনেক সময়ে মনে হয়েছে নিনা গিওর্গিয়েভনার যে কতগুলো বাঁধা বুলি আছে যেগুলো নিছক শুকনো নীতিবাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়—যেমন, "নির্দিষ্ট মান পূর্ণ হয়ে ছাপিয়ে গেছে", "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চালান দেয়া হয়ে গেছে", "স্ট্যাখানোভাইট"। কিন্তু তবুও মনে হয় এই ধরনের প্রত্যেকটি বাঁধা বুলির পিছনে সত্যিই বীরত্ব রয়েছে। কাঠামো বদলে গেছে, কিন্তু হৃদয়ের মহত্ব যেটা সর্বকাল ধরে চলে এসেছে—সেটাকে চিনে নেয়া শুধু দরকার......

ওর চিন্তাধারা সের্গেইর দিকে মোড় ফিরল। সে ছিল ওঁরই কাছাকাছি। সেকেলে খানিকটা ভাব ছিল কি ওর মধ্যে? না, ও বড়ো হয়ে উঠেছে সোবিয়েত সমাজব্যবস্থার ভিতরে। ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল সবকিছুর সঙ্গে। সম্পূর্ণ আলাদা স্বভাবের......। কে যেন বলেছিল যে এটা খুবই দুঃখের কথা যে ও মারা গেছে যুগোস্লাভিয়ায়। কারণ ওখানকার লোকেদের নিজেদের মুক্ত করার যোগ্যতা ছিল না। কথাটা সত্যি নয়, মানুষ মানুষ—সে সর্বত্রই এক। তাছাড়া সেই সহরে এখনো অনেক লোক আছে যারা ভাবে যে রুশরাই ওদের মুক্তি এনে

দিয়েছে, বাঁচিয়েছে। ওরা স্মরণ করে থাকে সের্গেইয়ের কথা আর তাই ওরা বিশ্বাসঘাতক নয়—শুধু আজকের দিনে ও যদি বেঁচে থাকতো!—ভরোনভ চিঠিতে লিখেছে ও নাকি গভীরভাবে প্রেমে পড়েছিল একটি মেয়ের সঙ্গে ফ্রান্সে। সেই মেয়েটির সঙ্গে একটিবার দেখা করার জন্যে যে কোনো দামই দিতে পারেন নিনা গিওর্গিয়েভনা। এ সম্পর্কে ভালেয়া জানে না কিছুই। তাছাড়া তার জানারও তেমন কোনো আবশ্যক নেই—। ভালেয়া যেন একটি সমস্যা। প্রতিভা আছে মেয়েটার, অন্তঃকরণটাও বড়ো কিন্তু কিসের যেন অভাব আছে—হয়তো শক্তির। এদিক থেকে ওলেয়া খুবই শক্তিশালীনী। কিন্তু অদ্ভুত এক এক সময়ে মনে হয় যেন নেহাত খুকি—কী হৈচৈ-ই না করছে কাটা দাগ্‌টা নিয়ে! হয়তো সবাই-ই কোনো না কোনো দিক থেকে শিশুই থেকে যায়—। কিন্তু শক্ত মেয়ে ওলেয়া। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় হয় ওকে। হয়তো মুখঝামটা দিয়ে বলে উঠবে:

ও সব ছেলেমানুষী, মা।

পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে ওলগা। তাম্‌কে স্বপ্ন দেখছে। সে যেন বলছে:

আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে—একটি তারা ফুটে উঠেছে তোমার গালের উপরে! আমরা পালিয়ে যাব ক্রিমিয়ায়। তুমি ঝাঁপ দেবে সমুদ্রের জলে। কিন্তু আমি বাঁচাব তোমাকে……

গভীর ঘুমের ভিতরেও হাসি ফুঠে উঠল ওলেয়ার ঠোঁটের কোণে।

চল্লিশ

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের শরৎকালে মস্কো ছেড়ে চলে গেছে ভাল্যা। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আর দেখা হয়নি নিনা গিওর্গিয়েভনার তার সঙ্গে। গত গ্রীষ্মে লিখেছিলেন তিনি ওকে কিছুদিন এসে থেকে যেতে তাঁর কাছে। কিন্তু জবাবে লিখেছিল ভাল্যা যে সে যেতে পারবে না। কি নাটক হচ্ছে, নতুন কি অংশ অভিনয় করছে, ওর বন্ধুদের কথা ইত্যাদি সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে সুন্দর চিঠি লিখেছে ভাল্যা তাঁর কাছে। তাপর পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে:

আমার জন্যে চিন্তা করো না। নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছি আমি।

কিন্তু মন মানে না নিনা গিওর্গিয়েভনার। সন্দিগ্ধ মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

নিনা গিওর্গিয়েভনা যেখানে থাকেন তারই সামনে পথের পাশে লাইম গাছের চারা লাগিয়েছিল গত শরৎকালে। শুধু একটা ছাড়া আর সবগুলোই বেশ ভালো হয়ে উঠেছে। সেটা না যাচ্ছে শুকিয়ে, না পাতা ঝরাচ্ছে। ওটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব সময়েই মনে পড়ে নিনা গিওর্গিয়েভনার ভাল্যার কথা।

ভাল্যা লেখে সে তার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট—একবার বলেছিলেন তিনি ওলেয়ার কাছে—কিন্তু ওর চিঠির ভিতরে কেমন যেন একটা ব্যথার সুর বেজে ওঠে।

বিচিত্র নয়,—প্রত্যুত্তরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল ওলগা, সব সময়েই তো

নিজেকে ও নাটককে নাট্যকে করে রাখে। এমন কি যখন সবদিক থেকে ভালো অবস্থা চলে তখনো। মনেপ্রাণে ভাল্যা একটি অভিনেত্রী, ভুলে যেও না সে কথা।

মস্কোয় যখন ছিল সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ভাল্যা প্রায়ই তাকিয়ে থাকতো নিনা গিওর্গিয়েভনার মুখের দিকে। যদিও দেখে মনে হত ওকে বেশ হাসিখুশি, এটা ওটা-সেটা নিয়ে বকবক করে বেড়াচ্ছে, মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত কখন নিনা গিওর্গিয়েভনা শুরু করেন সের্গেইয়ের কথা। মা কিংবা বোনের কাছে নিজে থেকে আগে কখন ও উল্লেখ করত না তার কথা। অনেকের মনেই এই ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে সের্গেইকে হারানোর আঘাত ও কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সের্গেইয়ের বিষাদময় স্মৃতি, তার হাসি, তার কথা নিয়েই কাটছে ওর দিন। যখন এ কথা বুঝতে পারল নিদারুণ শঙ্কিত হয়ে উঠল মনে মনে। অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকা কি উচিত না কি? আশেপাশে ওকে ঘিরে রয়েছে জীবন্ত মানুষ, রঙ্গমঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে ও আশা-আকাঙ্ক্ষা-আবেগের মূর্ত রূপ—তাছাড়া আরো কত কি। যাতে কখনো কাঁদায়, কখনো হাসায়। আর ও নিজে কি না সব সময়েই সবাইকে প্রতারিত করে আসছে। সের্গেইকে ভুলতে পারে না। প্রয়োজনও নেই তাকে ভুলে যাওয়ার। কিন্তু তবুও তো বেঁচে থাকতে হবে ওকে।

অবশেষে ঠিক করল, মস্কো ছেড়ে চলে যাবে। একটা ছোট্ট আঞ্চলিক সহরে পাঠিয়ে দিল ওকে। ওখানকার থিয়েটারটা তেমন সুবিধের নয়। মন্দের ভালো, —ভাবল ভাল্যা। কেননা ও চেয়েছিল এমন একটা জীবন যাতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে অন্য দশজনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। স্তেশেঙ্কা আর ভাল-কোভার অতীত পরিচয় বিলীন করে দিতে মঞ্চের জন্য একটা নতুন নাম নিল। ওকে যখন জিজ্ঞেস করল যে বিজ্ঞাপনে কি নাম যাবে, ওর মাথায় যে নামটা এল প্রথম তাই-ই বলে দিল : দেমিদোভা। কারণ স্কুলে ও বসতো কালভা দেমিদোভার পাশে।

থিয়েটারটা সত্যিই তেমন সুবিধের নয়। দলের ভিতরে একজন সুন্দরী অভিনেত্রী আছে, কিন্তু তেমন প্রতিভা নেই তার। নাম তার পার্শিনা। পার্শিনার প্রতিদ্বন্দ্বী হল অভিনেত্রী পমেরানৎসেভা। পমেরানৎসেভার স্বামী পুরানো অভিনেতা বাঝেনভ প্রযোজক লেবেদকিনের এক গ্লাসের ইয়ার। বছর পাঁচিশেক আগে লেবেদকিন মস্কোর একটা থিয়েটারের সহকারী মঞ্চাধ্যক্ষ ছিল। ওটা প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার হিসেবেই গণ্য হত। আজকাল মদের মুখে প্রায়ই বাঝেনভের কাছে গোপনে ফিসফিস করে বলে:

আজকের দিনে আমার ক্ষমতা দেখাবার সুযোগ আর পাচ্ছি কেমন করে? লম্বাভাবে দৃশ্যপট সাজাবার পক্ষপাতী আমি......যাকগে, সে সব কথা ভুলে যাই, এসো আরেক পাত্র টানা যাক। যখন লুকিমভ দলের সেরা অভিনেতা হিসেবে যে নাকি পরিচিত—কিছুতেই জমছে না এমন কোনো একটা নাটককে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করে, রেগে-টং হয়ে যেত লেবেদকিন।

এমনভাবে কেন বল মনে হয় যেন কেউ তোমার গলা টিপে ধরেছে? ওটা নাটকের ভিতরে নেই। তুমি নিজে কেটে বেরিয়ে যাবে ঠিক। কিন্তু আমাকেই

জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে। নাটকটা রেলওয়ে নিয়ে, ওর ভিতরে সব রকমের উন্মত্ত আবেগ ঢোকাবার চেষ্টা কর কেন?

ছোট্ট একটা পার্ট দেয়া হল ভাল্যাকে। তাই দেমিদোভার নামটা স্বভাবতঃ বিজ্ঞাপনের তলার দিকে ছাপা হল। এক খিটখিটে বুড়ীর বাড়িতে থাকতো ভাল্যা। কিন্তু বুড়ীর মনটা ছিল ভালো। প্রচুর পরিমাণে কাবাব আর ফলের পুডিং খেতে দিত ওকে। খেতে দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে বিয়ে করা যে কত ভালো সে সম্পর্কে গল্প করতো। বলতো, অবিশ্যি আজকালকার দিনে তেমন ভালো বর জোটানোই মুস্কিল। তাছাড়া ভাল্যা এখন আর কিশোরীটি নয়। কিন্তু তবুও খুঁতখুত করাটা ঠিক নয়। কেননা ছশো রুবলে একজন বেশ ভালো-ভাবেই থাকতে পারে। এ সব কথায় রাগ করতো না ভাল্যা। জানতো যে নিতান্ত সাধারণ হলেও খুবই দরকারী কাজ করছে বুড়ী। তাছাড়া যে সব জিনিস ওর শক্তি-সামর্থের বাইরে সে সবের কল্পনা দূরে রাখাই ভালো।

গত বছর প্রযোজক লেবেদাকিন স্থানীয় সংবাদপত্রে থিয়েটারটার সম্পর্কে একটা তীব্র সমালোচনামূলক প্রবন্ধ পড়ল। অন্যান্য সমালোচনার ভিতরে সমালোচক এ-ও লিখেছে যে:

এতো দিনে কমরেড লেবেদাকিনের বোঝা উচিত যে আমাদের দর্শকেরা দেখতে চায় সোবিয়েত নাটক। মানে, তারা চায় মঞ্চে নিজেকেই দেখতে। অতীতের ছায়া নয়। সঙ্গে সঙ্গেই লেবেদাকিন তার নাট্য তালিকা থেকে যাবতীয় ঐতিহাসিক নাটক ছেঁটে বাদ দিয়ে দিল। কিন্তু লেবেদাকিন ঠান্ডা হতে না হতেই সেই একই সমালোচকের আর একটা প্রবন্ধ বের হল:

আমাদের থিয়েটার-দর্শকেরা প্রাচীন সাহিত্যের মহান ঐতিহ্যকে কি পরিমাণে পছন্দ করে থাকেন মনে হয় কমরেড লেবেদাকিন এ-সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। পুরো এক বছরের ভিতরে আমরা একটিবারের জন্যেও অস্ত্রোভস্কির নাম দেখতে পাইনি।

মদে চুর হয়ে বিলাপ করতে শুরু করে দিন লেবেদাকিন:

ওরা আমাকে ডুবিয়ে দেবার মনস্থ করেছে। আর কি করে যে করছে তার আদৌ কোনো তোয়াক্কা রাখে না।

কেউ তোমাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করছে না—প্রত্যুত্তরে ওকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে বলল বাঝেনভ।—বুঝলে বন্ধু ওটা হচ্ছে ডায়েলেকটিকস। অস্ত্রোভস্কির "ঝড়" নামাও দেখবে সবাই খুশি হয়ে যাবে।

বন্ধুর পরামর্শ মতো "ঝড়" বইটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিল লেবেদাকিন। কিন্তু প্রথম অভিনয়ের মাত্র দশ দিন আগে পমেরানৎসেভা অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর ডাক্তার নির্দেশ দিল তাকে, দু মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। হতাশ হয়ে পড়ল লেবেদাকিন:

ভাগ্য নেই আমার,—বলল বাঝেনভের কাছে,—ভূমিকাটা এখন দিতে হবে পেশিনাকে। আর ওর শিখতেই লাগবে এক মাস।

কক্ষনো অমন কাজটি করো না!—চিৎকার করে উঠল বাঝেনভ—তাতে শুধু যে কিছুটা খারাপ হবে তাই নয়, এমন সব অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করে দেবে যে

ভঙ্গিসর্বস্বতার দায়ে সবাই তোমাকে দায়ী করে বসবে। বরং অখ্যাতনামা কাউকেই নাও কাতেরিনার ভূমিকায়। দেমিদোভা হলে কেমন হয়? যখন হাসে মেয়েটাকে তখন সুন্দরই দেখায়। অবিশ্যি পমেরানৎসেভার চাইতে ঢের তফাত হবে এ-কথা ঠিক কিন্তু ভূমিকায় আমি থাকব, লিউবিমভ থাকবে। কোনো রকমে চালিয়ে যাব আমরা।

লেবেদাকিন বুঝল যে ওর বন্ধুর কথাই ঠিক।

তুমি কাতেরিনার ভূমিকা করবে।—ভাল্যাকে বলল লেবেদাকিন,—আমরা দেখতে চাই তোমার ভিতরে বস্তু আছে কি না।

প্রথম রাত্রেই ভাল্যা এত ভালো অভিনয় করল যে তারপর থেকে অনেক রাত অভিনয় করার সুযোগ পেল। মস্কো থেকে একজন স্থপতি এসেছিলেন শ্রমিকদের আবাস অঞ্চলের পরিকল্পনা তৈরি করার সাহায্য করতে, তিনি লেবেদকিনকে দারুণ প্রশংসা করলেন:

এমন একটা অভিনয় স্তালিন-পুরস্কারের জন্যে দাঁড়াবার যোগ্য। কাগজে "ঝড়" সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ বেরোল তাতে পুরো একটা প্যারা লিখল দেমিদোভা সম্পর্কে। চতুর্দিক থেকে ভাল্যার প্রশংসা হতে লাগল। আর পমেরানৎসেভা দারুণ গালাগাল দিল বাঝেনভকে যে সে ইচ্ছে করেই ওর সর্বনাশ করার জন্যে এটা করেছে। এক তরুণ লেখকের "সুখের পথ" নাটকে ভাল্যাকে দেয়া হল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভাল্যার বাড়িওয়ালী ওকে ক্রিম চিজ আর প্যানকেক এনে দিল আর বলতে লাগল:

অবিশ্যি পাশে যদি একটা স্বামী থাকতো তো ভয়ের কিছু থাকতো না। কেননা আজ ভালো আছ তো কাল খারাপ হতে কতক্ষণ? কিন্তু আজকালকার দিনে স্বামী মেলাও শক্ত সে কথা অবিশ্যি ঠিক। তোমার মাইনে বাড়তে বাধ্য। তাহলে ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্যেও দু পয়সা রাখতে পরবে।

সাফল্যের আনন্দে ভাল্যার মাথা ঘুরে গেল না। কারণ সাফল্য আর ব্যর্থতা দুটো ব্যাপারেই অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর এতদিনে। সিনেমাটোগ্রাফি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক বলেছিলেন ওর আদৌ প্রতিভা নেই। এক মঞ্চাধ্যক্ষ—যার মতামতের খুবেই গুরুত্ব দিতো ভাল্যা, তিনি সোজাসুজিই বলে দিয়েছিলেন যে ওর পক্ষে অন্য কোনো জীবিকা গ্রহণ করাই ভালো। দু বছর পরে মলোতভ শহরে অভিনেতা ওরলোভস্কি ওর একটা কবিতার আবৃত্তি শুনে বলেছিলেন:

সত্যিকারের প্রতিভা আছে তোমার। তোমার উচিত শিক্ষা নেয়া।

তার কিছুদিন পরে সের্গেই যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিল, একটা বাজে নাটকের একটা ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ভাল্যা। এত ভালো করেছিল অভিনয় যে স্থানীয় রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ ওকে চাকুরি দিতে চেয়েছিল। মস্কোয় ভাখতানভ স্টুডিওতে ওর সম্পর্কে মত ছিল দু রকমের। কারোর মতে ওর আদৌ প্রতিভা নেই, আবার কারোর কারোর মত সম্পূর্ণ উল্টো। তারা ওর অভিনয়ে তারিফ করতো। ওটা আসলে হচ্ছে ভাগ্যের খেলা—অতীতের কথা স্মরণ করে মনে মনে বলে ভাল্যা,—আমার সম্পর্কে অন্যে কি মনে করল না করল সেটা বড়ো কথা নয় আসল কথা হচ্ছে নিজের সম্পর্কে নিজেই স্থির নিশ্চিত হওয়া। এক রাত

ভালো হল, এক রাত ভালো হল না। এ সব কিছুই নির্ভর করে ভূমিকার উপরে, কার সঙ্গে অভিনয় করছি, মনের অবস্থা—এমনি আরো সব টুকিটাকির উপরে।

সব দেখে মনে হয় জীবনে কোনো দিনই আমি সত্যিকারের অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারব না।

"সুখের পথ" ভাল্যার অভিনয় এত খারাপ হল যে স্থানীয় কাগজে তীব্র সমালোচনা বেরোল। ওকে আর একটা ভূমিকা দেয়া হল। একজন অধ্যাপকের পশ্চিমের প্রতি দাস-সুলভ ভক্তির জন্য একটি কমসোমল—তরুণ কমিউনিস্ট তাকে ভর্ৎসনা করছে। কিন্তু এ-ভূমিকায়ও দারুণভাবে ব্যর্থ হল ভাল্যা। পমেরানৎসেভার মন শান্ত হল। সেরে উঠে সে দলে তার পূর্বস্থানে বহাল হল। 'বড্ডো বেশি মূল্য দেয়া হয়েছিল,' দেমিদোভার সম্পর্কে বলতে লাগল অনেকেই। ভাল্যা নিজেও এ সম্পর্কে একমত ওদের সঙ্গে। ভাবল ছোটখাটো ভূমিকা নিয়েই ওর থাকা উচিত। গোটা অভিনয়টা নষ্ট করার ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় ওর। বাইরে খুবই শান্ত রয়ে গেল ভাল্যা কিন্তু এক এক সময়ে ওর অন্তর দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল। যদিও প্রাণপণে চেষ্টা করছে কিন্তু সত্যিকারের প্রাণ-শক্তি নেই ওর ভিতরে—মনে মনে ভাবল ভাল্যা। যখন একটা কারখানায় কাজ করতো, জানতো যে ও একটা একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করছে। সেটা ছিল যুদ্ধের সময়। সবাই তখন এক ধরনের যাযাবর-জীবন যাপন করছে। বোধহয় ওর পক্ষে রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসা উচিত হয় নি। চৌত্রিশ বছর বয়সেও জীবনে স্থান খুঁজে না পাওয়াটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। নিনা গিওর্গিয়েভনা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই ওর। কিন্তু ওর দুঃখের কথা তাকেও লিখে জানাতে পারে না। কারণ নিনা গিওর্গিয়েভনাকে শান্তিতে থাকতে দেয়া দরকার।

একটি লোক যে ভাল্যার দুঃখ বুঝে তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল সে হচ্ছে অভিনেতা লিউবিমভ।

মনমরা হয়ে থেকো না,—ওকে বলল লিউবিমভ—যাদের প্রতিভা আছে তারাও কোনো একটা ভূমিকায় সফল না হতে পারে। দুবার এমনি হতে দেখেছি আমি লিওনিদভকে। প্রথম বার বসিয়ে দিল আমাকে কিন্তু পরের বারে নিজেই বসে পড়ল একেবারে। যদি সে বস্তু না থাকতো তোমার ভিতরে তবে কিছুতেই তুমি কাতেরিনার ভূমিকা অমনভাবে অভিনয় করতে পারতে না। সত্যিকারের অভিনেত্রী তুমি।

ওরা দুজনে যখন একা থাকে লিউবিমভ ওকে পড়ে শোনায় কবিতা, চেষ্টা করে ওকে খুশি করে তোলার, অন্য সব অভিনেতাদের অনুকরণ করে ব্যাঙ্গ করতো। ওর জন্যে নিয়ে আসতো ফুল আর ওর সঙ্গে করতো সস্নেহ ব্যবহার। কিন্তু এতটুকু দাবি করতো না। ভালো অভিনেতা লিউবিমভ। এমন কি ট্রাকটরে যান্ত্রিক উপায়ে তেল পোরার কথাগুলো পর্যন্ত প্রাণবন্ত করে তুলতে পারতো। একেই ভাল্যা সত্যিকারের আর্ট বলে মনে করতো। সে সত্যি সত্যিই ওর বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল যে যান্ত্রিক উপায়ে জ্বালানী তেল পোরাটাই হচ্ছে এক-মাত্র জিনিস যেটার মানে হয়।

জুলাই মাসের এক ভ্যাপসা গরমের রাতে থিয়েটারের পরে লিউবিমভ ভাল্যাকে

নিয়ে গেল গাগারিন পার্কে। শহরের ভিতরের সব চাইতে সুন্দর জায়গা। ওখানকার একটা উঁচু পাড়ের উপর থেকে দেখা যায় সুদূর-বিসারী কুয়াশা-ঘেরা দুধ-সবুজ মাঠ।

রঙ্গ-মঞ্চে আছি আজ চোদ্দ বছর,—দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠল লিউবিমভ,—মুখে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে এসেছি এতো দিন, কিন্তু আজ রাত্রে আমি একটিও কথা খুঁজে পাচ্ছি না। সবকিছুই খুলে ধরব তোমার কাছে যাতে বুঝতে পার—

ভাল্যার বুকের ভিতরটা কেমন যেন একটু ছমছম করে উঠল।

বোধহয় এখন ফিরে যাওয়াই ভালো, কি বলেন? বলল ভাল্যা,—রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে।

চলো মনুমেণ্টটার কাছ পর্যন্ত যাই। মনটা কেমন যেন খারাপ লাগছে।

আজকের আপনার অভিনয় খুব ভালো হয়েছে,—ওকে একটু খুশি করার উদ্দেশ্যে বলল ভাল্যা।

তুমি সত্যিই অভিনেত্রী,—একটু শীর্ণ হাসি হেসে বলল লিউবিমভ,—তুমি জান যে মঞ্চে কেমন অভিনয় হয়েছে না হয়েছে সেটা এখন বড়ো কথা নয়; কথা হচ্ছে কাল সকালে কেমন করে ঘুম ভাঙবে, কেমন করে কাটবে দিন। আমি যখন অভিনয় করি সেটা তুমি বিশ্বাস কর, কিন্তু যখন আমি সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলি, তুমি চাও না আমার কথা বুঝতে।

ওকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল লিউবিমভ। ওর ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা। না পারল ভাল্যা ওকে ফিরে চুম্বন করতে, না পারল ওকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে। ওর মনে হল এক্ষুনি বুঝি লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। লিউবিমভ ওর হাত ধরে ঘরে পেঁৗছে দিল।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ কেমন যেন আধ-ঘুমন্ত অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটল ভাল্যার। যখন লিউবিমভের সঙ্গে থাকে ওর মনে হয়, যেন ও সুখী হয়েছে। তার ভাবাবেগ সাড়া জাগায় ওর বুকে। কারণ ওর প্রেমে পড়েছে লিউবিমভ, ওকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে, বলে ও অনন্যা। জীবনে এই প্রথম এমন একটি মেয়ের দেখা পেয়েছে লিউবিমভ যে নাকি অদ্ভুত, আবেগময়ী আর অতৃপ্ত। যে নাকি অভিনয় করতে পারে অপূর্ব কিংবা খুবই খারাপ। ওকে দেখে আজ মনে হয় সুরূপা আবার কাল মনে হয় কুরূপা। পারে এক এক সময়ে কোমল আবার এক এক সময়ে কঠিন হয়ে উঠতে।

কিন্তু যখন একা থাকে প্রায়ই মনে হয় ভাল্যার যে একটা দারুণ গোলমালের ভিতরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। লোক ভালো হতে পারে লিউবিমভ, কিন্তু ও তাকে ভালোবাসে না। আর সত্যি সত্যি এখানেই বাঁধছে সবচাইতে বেশি। কিন্তু তক্ষুনি সে ধিক্কার দেয় নিজেকে। যে ভালোবাসা ছিল ওর সের্গেইয়ের উপরে, জীবনে দুবার করে তা ফিরে পেতে পারে না। আর যদি লিউবিমভ বলে যে ওকে পেয়ে সে সুখী হবে, তবে মিছামিছি নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? কিছু একটা তো হবে যাতে অন্তত একটা মানুষের জীবনেও আনন্দ এনে দিতে পারবে।

লিউবিমভকে চিনতে খুব বেশি সময়ের দরকার হল না ভাল্যার। মন্দ লোক নয় লিউবিমভ। সহজাত প্রতিভাসম্পন্না আর একটু অভিমানী। কিন্তু বড্ডো হালকা। পমেরানৎসেভ যে ওকে প্রজাপতি বলে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কোনো কিছুই গভীরভাবে গ্রহণ করে না। যখন ওকে বলে যে ওর অভিনয়ে দর্শকেরা খুবই অভিভূত হয়েছে, ও তখন ঠাট্টার সুরে ভাল্যার কাছে বলে:

তুমি আর আমি জানি এই ব্যবসাটার ভিতরের কৌশল।

ওর নিজের কোনো মতামতের বালাই নেই। একটা নাটক সম্পর্কে হয়তো গালাগাল দিল, কিন্তু যেই মাত্র লেবেদকিন ওটার প্রশংসা করল অমনি একমত হয়ে গেল তার সঙ্গে। এতে প্রথম প্রথম অবাক হয়ে যেত ভাল্যা:

যে কথা নিজে বিশ্বাস করেন না তা বলেন কেন?

কিন্তু নাটকটা সত্যিই খুব ভালো,—রেগে উঠে জবাব দিতো লিউবিমভ। এখন আর ও ভাল্যাকে কবিতা পড়ে শোনায় না, আলোচনা করে না আর্ট নিয়ে। এখন এসে হয় গালগল্প করে নয়তো অভিযোগ করে অসন্তুষ্ট মনে:

এ সব লেখকদের পক্ষেই ভালো। যেখানে খুশি সেখানে থেকেই ওরা লিখে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যারা অভিনেতা, আমাদের পক্ষে একবার রাজধানীর বাইরে গেলে তো ব্যস খতম।

ভাল্যার আগে বহু মেয়ের সঙ্গে ছিল ওর ভাব। কারণ ও প্রেমে পড়তো অতি সহজেই। আর প্রত্যেক বারেই সেটাকে জীবনের সর্বপ্রথম সত্যিকারের প্রেম বলে মনে করতো। তারপর আবার অতি সহজেই পড়তো কেটে। দারুণ আহত হল ভাল্যা যখন একদিন ও বলল:

সত্যি কথা বলতে কি, আমার হাতফেরতা হয়েই পমেরানৎসেভা গেছে বাঝেনভের হাতে। বুড়ো লোকটার পক্ষে এটা একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়ে উঠল। আর আমার দিক থেকে বলতে কি আমি ওকে আর একটুও সহ্য করতে পারছিলাম না। প্রত্যেক রাত্রেই এমন সব চেঁচামেচি জুড়ে দিতো যে ইচ্ছে হত ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

যেমন আকস্মিকভাবেই ওরা দুজন দুজনার সংস্পর্শে এসেছিল, বিচ্ছিন্নও হয়ে গেল তেমনি আকস্মিকভাবেই। মস্কো থেকে ছুটিতে বেড়াতে-আসা একটি মেয়ের প্রেমে পড়ল লিউবিমভ। একটা গোটা সপ্তাহ এল না ও ভাল্যার কাছে। পরে হঠাৎ নিজের ঔদাসীন্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলল ভাল্যাকে যখন ওদের দেখা হল থিয়েটারে:

হিংসা করো না, ওটা তেমন গুরুতর কিছু একটা ব্যাপার নয়। সাময়িক একটা খেয়াল মাত্র। তাছাড়া ও চলেই যাচ্ছে। আজ রাত্রে থিয়েটারের পরে যাব তোমার কাছে, কি বল?

কিন্তু নিজের জবাবে নিজেই অবাক হয়ে গেল ভাল্যা:

না। মনে করো না ঈর্ষা হয়েছে আমার। তবে সময় এসেছে আমাদের এ সব বাপারে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয়ার।

খুব আহত হয়েছে এমনি একটা বিষণ্ণ মুখভাব করার ভান করল লিউবিমভ,

কিন্তু অন্তরে অন্তরে ওর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল এই ভেবে যে, ঠিকই বলেছে ভাল্যা।

ভাল্যার বাড়িওয়ালীর নজরে যখন এল যে লিউবিমভের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে, ব্যাপারটাকে খুবই খারাপভাবে নিল:

অবশ্য, ইঞ্জিনিয়র বা শিক্ষক হলে ভয়ের তেমন কিছু থাকতো না। কিন্তু আজকালকার দিনে খুঁজেপেতে পছন্দ করা সম্ভব নয়। অবশ্য, যদি তেমন কাউকে পেয়ে যাও তো গোল চুকে যায়। কিন্তু, দু দিন সবুর কর, দেখো ও ফিরে আসবে.........

লিউবিমভের জন্যে বৃথা অনুশোচনা করে মন খারাপ করল না ভাল্যা। যা কিছু ঘটেছে, ওর মনে হল যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে মাত্র। কিন্তু ওর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব যেন আরো ভারী হয়ে উঠল। এক মাস কেটে গেল। খুবই পরিশ্রম করে যত্ন নিয়ে অভিনয় করে ভাল্যা, কিন্তু করে খুবই খারাপ। যখন মহড়া বা অভিনয় থাকে না ঘরে বসে প্রায়ই বেদনাভরা, হতাশাভরা দীর্ঘ চিঠি লেখে নিনা গিওর্গিয়েভনার কাছে। লেখে, লেখার পরেই ছিড়ে ফেলবে বলে। পরিবর্তে পাঠাবে অন্য চিঠি-যাতে থাকবে যে নিজের জীবনে ও সুখী, সন্তুষ্ট। এখন আর কোনো কিছুরই স্বপ্ন দেখে না ভাল্যা, কোনো কিছুই করে না কামনা। সবাই বেশ জীবন কাটিয়ে চলেছে আর ও কিনা প্রতিভা নেই তবুও রঙ্গ-মঞ্চে পড়ে থেকে করে চলেছে বোকামী। এর মানে হয় কিছু? সত্যি সত্যি যদি কেউ ভাবে তো জীবনে আর বেঁচে থাকার মূল্য থাকে না। ওর মতো মানুষের পক্ষে উচিত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া—আগাছার মতো।

যখন বাড়িওয়ালী এসে ওর দোরের কড়া নাড়ল তখন গভীর হতাশার ভিতরে ডুবে চুপ করে বসে ছিল ভাল্যা:

কে একজন দেখা করতে এসেছে গো তোমার সঙ্গে।

পাকা চুল, ক্লান্ত চোখ এক মহিলা এসে ঢুকলেন ঘরে। হকচকিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি মেলে তাকাল ভাল্যা তাঁর মুখের দিকে। পরক্ষণেই আচমকা চিৎকার করে উঠল:

গালোচ্‌কা? তুমি!

হেসে উঠলেন গালোচ্‌কা। মুহূর্তে যেন সেই আগের দিনের মতো মহিলা, হাসিখুশি তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠলেন যাকে চিনতো ভাল্যা তাঁর প্রথম যৌবনে।

ওঁর বর্তমান জীবন কেমন কাটছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল ভাল্যা। জবাব দিতে চেষ্টা করল গাল্যা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই কথার খেই হারিয়ে ফেলতে লাগল। কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওরা দূর অতীতে ফিরে ফিরে যেতে লাগল—সেই পিকউইক ক্লাব, দীর্ঘ-পক্ষ্ম চোখ সেই ছোট্ট র‍্যায়া, সেই ঝিনা, বরিস। ভাগ্যের কথা নিয়ে নয়, বীরত্বের কথা নিয়ে নয়, স্কুল-জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা, টুকরো টুকরো কথা নিয়ে চলেছে ওদের স্মৃতির পরিক্রমা। যেন সে সব ঘটনা ঘটেছে মাত্র গত সপ্তাহে।

মনে আছে স্‌ভ্যায়াতোশিনোর একটা বাড়িতে আমরা একবার রাত কাটিয়ে-

ছিলাম আর র‍্যায়া বলেছিল তার চোর ডাকাতের ভয় করছে। উরা একটা চেয়ারে দড়ি বেঁধে টেনেছিল আর র‍্যায়া জেগে উঠে চোর চোর বলে চিৎকার করে উঠেছিল! তারপর আমরা সবাই যখন ওকে ক্ষেপালাম, ও বলল:

অবশ্য, আমি ভীত, আর না-ই বা হবো কেন? সবারই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে।

এক্ষুনি মনে পড়ল আমার, জার্মান শেখার ক্লাশে ঝিনা বলেছিল আমাকে পিছন থেকে চুপি চুপি বলে দিতে। সামনের বেঞ্চে বসে বলে বলে দিচ্ছিলাম ওকে:

"কারাবিনার", "কারাবিনার"—কিন্তু ও শুনতে ভুল করে বলেছিল "কেভালিয়র"। আর দিদিমনি বলেছিলেন যে ও সর্বত্রই "কেভালিয়র" দেখছে। এমন ভেঙে পড়েছিল ঝিনা যে কেঁদেই আকুল। আর আমাদের কাজ হয়েছিল তখন ওকে সান্ত্বনা দেয়া।

আর তোমার মনে আছে ভালেচকা, বরিস তোমার এ্যালবামে কেমন একটা কবিতা লিখেছিল? সে তখন সবে কবিতা লিখতে শুরু করেছে। প্রথম দুটো লাইন এখনো আমার মনে আছে:

সুখ মোর যেন বরষার বারিধারা
অস্ফুট সুরে বাতায়ন 'পরে কথা কয়ে যায় তারা......

তুমি বলেছিলে:

বৃষ্টি কেন? অবশ্য আমিও হেসে উঠেছিলাম খিলখিল করে। আর দারুণ আঘাত পেয়েছিল ও।

অবশেষে ওরা দুজনে কথাহারা হয়ে চুপ করে দুজন দুজনকে দেখতে লাগল। গালোচকা ভাবল, তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি ভাল্যার। ওর হাসিটি ঠিক তেমনিই আছে আগের দিনে যেমন হাসতে গিয়ে কপাল কুঁচকে উঠতো ওর। অভিনেত্রী-সুলভ কোনো হাবভাবই নেই ওর ভিতরে। প্রথম দৃষ্টিতে ভাল্যার মনে হয়েছিল গালোচকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এখন, হয়তো বা ওর প্রথম ধারণা উবে যেতে বা গালোচকার বিগত-যৌবনের স্মৃতির কথা স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে বলেই ভাল্যার মনে হল ওর মুখখানা এখনো তারুণ্যে ভরা। তাছাড়া চুলে পাক ধরায় একটা বৈশিষ্ট্য এসেছে ওর চেহারায়।

গালোচকা বলল, গত বসন্তে ওসিপের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছে। সে এখনো জার্মানিতে আছে সেনাবাহিনীর সঙ্গে।

বিয়ে করেনি ও?—জিজ্ঞেস করল ভাল্যা।

না।......চিঠিতে লিখেছে যে যখন ও কিয়েভে ছিল 'বাবি এয়ার'-এ (যে গহ্বরের মধ্যে নাৎসীরা কিয়েভের হাজার হাজার ইহুদীকে মেরে ফেলে দিয়েছিল)

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এক নিদারুণ ব্যথায় অভিভূত হয়ে পড়ল ওরা। গালোচকা মুখ ফিরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল:

তোমার এখানকার দৃশ্যটা খুব চমৎকার.........

স্যামোভার আর খানিকটা জ্যাম নিয়ে এল বাড়িওয়ালী। দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠল ভাল্যা। কথা বন্ধ হবার সুযোগ পেয়ে খুশী হয়ে উঠল। হঠাৎ যেন

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত বিষাদ-বেদনা যেন উপরে ভেসে উঠেছে। গালোচকা যখন ওকে জিজ্ঞেস করল ও সুখী হয়েছে কি না, মিথ্যা বলতে ইচ্ছে করল না ওর। কিন্তু সত্যি কথাও বলতে পারল না।

বলা শক্ত গালোচকা। এক এক সময় আসে যখন মনে হয় আমি তৃপ্ত, কিন্তু তা খুবই বিরল। আমার কক্ষনো রঙ্গমঞ্চে আসা উচিত হয়নি, কিন্তু এখন বদলানোর পক্ষেও বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। প্রতিভা আছে আমার এক ফোঁটা কিন্তু অভিলাষ পাহাড়প্রমাণ। ও সব নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। জান তো চিরদিনই আমি একটু বোকা। জীবনের কাছে অসম্ভব অসম্ভব দাবি করে আসছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এভাবে কেউ জীবন কাটাতে পারে না। এতে কোনো কাজ করা যায় না কখনো। বরং এখন তোমার কথা শোনা যাক। আমি শুধু জানি এই পর্যন্ত যে তোমাকে জার্মানীতে চালান দিয়েছিল। আর কিয়েভের কে যেন একজন বলেছিল যে তুমি ফিরে এসেছো পঁয়তাল্লিশ সালে। একা একাই আছ ?

না, আছি স্বামীর সঙ্গে। বুঝতে পারছি না কোন জায়গা থেকে শুরু করবো। জার্মানির ব্যাপার কিছুই বলবো না তোমাকে। সে সব কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না আমার। প্রথম বছরটা ভারি কষ্ট হয়েছিল—কিছুতেই নতুন করে জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। হাঁটতাম চলতাম, কথা বলতাম, কাজ করতাম—তারপর শরৎকালে একটা চাকরি পেলাম। কিন্তু সব সময়েই মনে হত এ সব কিছুই যেন ছলনা—আমি যেন সাধারণ মানুষের মতো নই। সে সব দিনে আমি চেষ্টা করতাম 'লেবার ক্যাম্প' সম্পর্কে বলতে। মানুষ সহানুভূতি দেখাতো। কিন্তু মনে মনে অনুভব করতাম প্রকৃতপক্ষে কেউই শুনতে চায় না। অবশ্য সেটা যে কি তা বুঝে ওঠা কঠিন যদি না সে সম্পর্কে তোমার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে থাকে। আমার মা ছিলেন ধর্মভীরু আমি যখন খুবই ছোট্ট তখন তিনি বলতেন—ভুলে গেছি এখন সেটা কোনো সাধুর সম্পর্কে না কোনো ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। কিন্তু সে যাই হোক বলেছিলেন একটা মানুষ সম্পর্কে। লোকটা কফিনের ভিতরে শুয়ে থেকে আবার বেঁচে উঠে জনসমাজে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু সবাই ওকে ভয় করতে লাগল। যদিও তখন সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মানুষ। যখন কফিনের ভিতরে পড়ে ছিল তখন কেমন লাগতো সেটা অবশ্য সে বুঝিয়ে বলতে পারতো না। আমার বেলায় ও হয়েছিল ঠিক তাই। কিছুদিন পরে সে অবস্থা কাটিয়ে উঠলাম। ডুবে গেলাম কাজের ভিতরে। কাজটা খুবই মজার—পাঠ নিলাম আর এখন আমি একজন লাইব্রেরিয়ান। প্রচুর পড়তে হয় আমাকে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয় প্রচুর। কোনো একটা বই যখন খুব ভালো লাগে পাঠকের, সে সম্পর্কে আলোচনা করার তাগিদ অনুভব করে সে। এক এক সময়ে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেয় সে আলোচনায়। উনিশশো সাতচল্লিশ সালে কুলঝেঙ্কোর সঙ্গে দেখা হল আমার। ওটাই এখন আমার নামের পদবী—বলতে ভুলে গেছি তোমাকে।

হঠাৎ ও বিনা কারণেই ঠিক আগের দিনের মতো খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ভাল্যাও হেসে উঠে ওকে চুম্বন করল।

তুমি এসেছ বলে কি চমৎকারই না লাগছে। কত যে ভালো লাগছে তা তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না!

আমি এসেছি কাজে। কাজের ভার দেয়া হয়েছে আমাকে।—সে সব কথা পরে বলছি। আমার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। কুশিচনোর একটা বাড়ির অংশ তৈরির কারখানায় কাজ করে। জায়গাটা এখান থেকে আশি কিলোমিটার দূরে। কিন্তু ওর সংগে আমার দেখা হয়েছিল কিয়েভে। সেখানে ও কাজ করে এসেছে। গত শীতকালে বদলী হয়ে এসেছে ওখানে। ও আংশিকভাবে অক্ষম হয়ে গেছে যুদ্ধে আহত হয়ে। আঘাত পেয়েছিল পেটে। তার সংগে নানান রকমের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তার উপরের দিকে লেগেছে গোলার আঘাত। এক কথায় প্রকৃত পক্ষে একটি আতুর। কাজ করতে পারে, কিন্তু সব সময়ের জন্যেই পরিচর্যা দরকার। ওকে বিয়ে করার দরুণ এক মুহূর্তের জন্যেও আমি অনুশোচনা করিনি। দেখা হলে বুঝতে পারবে লোকটা কি ধরনের মানুষ। সত্যিকারের বন্ধু। ওর বয়েস পঁয়তাল্লিশ। আমার চাইতে এগারো বছরের বড়ো। নিজের কাজ সম্পর্কে ভয়ানক সচেতন। আর ওর উদ্দমশীলতা আমার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়েছে। ওর কাজটা সত্যিই খুবই চমৎকার। ওরা বাড়ি তৈরি করে দনবাসের লোকেদের জন্যে। সে যেন এক রূপকথার কাহিনীর ব্যাপার—প্রথম দেখলে কতগুলো গাছ। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলে একটা সম্পূর্ণ বাড়ি। ইচ্ছে করলে চায়ের টেবিলে বসতে পার। জান ভালেচকা, কেমন করে তোমাকে খুঁজে বের করেছি? কিয়েভের একটি লোক থাকে এখানে গিওর্গি তোকারেভ। হয়তো ওকে মনে নেই তোমার। যে গ্রীষ্মে আমরা স্কুলের পড়া শেষ করলাম, ও আমাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করেছিল। মাঝে মাঝে আমরা চিঠিপত্র লিখে থাকি। সে লিখেছিল আমাকে যে থিয়েটারে গিয়েছিল "ঝড়" বইটা দেখতে। তোমার অভিনয় নাকি ওকে অভিভূত করে ফেলেছিল। ওর চিঠিতেই জানলাম, তুমি তোমার নাম নিয়েছ দেমিদোভা। এখানে এসে যখন পৌঁছালাম, তোমার বাড়িওয়ালীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম দেমিদোভ লোকটি কে? কিন্তু সে হেসে উঠে বলল যে ওটা তোমার মঞ্চের নাম, স্বামী নেই তোমার। কেন ও নাম নিয়েছ বল তো?

কালভাকে মনে আছে তোমার?

সেই যে কটা চুলওয়ালা মেয়েটা? ছেলেরা যখন ওর বেণী ধরে টানতো তখন যে চিঁচিঁ করে চ্যাঁচাতো?

আবার ওর সেই প্রাণখোলা দরাজ হাসি হেসে উঠল গালোচকা।

একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়েছে আমাকে এখানে: পার্টি সেক্রেটারী বললেন—। ভেবে দেখ ব্যাপারখানা একবার, একটা বিরাট কর্মকান্ড চলেছে ওখানে, সত্যিকারের একটা সংগঠন আর তবু কিনা ওরা কাউকেই পাঠাচ্ছে না আমাদের ওখানে। সবাই বলল তোমার সংগে যদি ভালো জানাশুনা থেকে থাকে তবে তার মারফতে চেষ্টা করে দেখ ব্যবস্থা করতে পারো কি না—। আমরা চাই গোটা থিয়েটারের দলটাকে আমন্ত্রণ করতে। অন্ততঃ পক্ষে গোটা দুই নাটকের অভিনয়ও যদি হয় বিশেষ করে ঐ "ঝড়"টা—

এবার ভাল্যার পালা হেসে ওঠার।

তোমার কি ধারণা যে আমার এতটুকুও প্রতিপত্তি আছে? দলের ভিতরে আমি একজন নিতান্ত নগণ্য অভিনেত্রী। কাল আমি তোমাকে লেবেদাকিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। তারপর তোমাকে যেতে হবে জেলার কার্যকরী সমিতির কাছে।

আমাদের সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে তোমার আর হবে কুলঝেঙ্কোর সঙ্গে। ওকে যখন একা ফেলে আসি দারুণ অস্বস্তি ভোগ করি আমি। অবশ্য তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, কিন্তু ঐ যে বললাম, ওর একটু যত্নআত্তির দরকার—

ওর পারিবারিক জীবনের সবটুকু সত্য কথা বলেনি গালোচকা ভাল্যার কাছে। প্রথম যখন ওর দেখা হয় কুলঝেঙ্কোর সঙ্গে সে তখন এক নিদারুণ বীতশ্রদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছে। নিজেকে বলতো সে পঙ্গু। কেউ-ই চায় না ওকে আর এমন কিছুও নেই ওর যার জন্যে বেঁচে থাকা দরকার। যুদ্ধের আগে ও বিয়ে করেছিল। একটি মেয়েও ছিল ওর। যুদ্ধের গোড়ার দিকেই এক অবরোধে আটকা পড়ে গেল ব্রেস্ট-লিটভস্ক-এর কাছে। তারপর তিন বছর ছিল পার্টিজান দলের সঙ্গে। ওর রেজিমেন্টের একটি লোক মোর্চা পেরিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল, ঝুলঝেঙ্কোর স্ত্রীকে এসে বলল যে তার স্বামী নিহত হয়েছে। ওর স্ত্রী দু বছর পর্যন্ত শোক করল ওর জন্যে, তারপর উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে আবার বিয়ে করল। পঙ্গু অবস্থায় কুলঝেঙ্কো যখন কিয়েভে এসে পৌঁছাল, দেখল যে তার ঘর সংসার কিছুই নেই। যেমন করে শিশুর পরিচর্যা করে তেমনি করেই গালোচকা ওর পরিচর্যা করতে শুরু করল। একবার একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বলেছিল ওর কাছে:

দেখে আমার মনে হয় যেন তোমার ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক আমাদের দুজনার হয়েই কাজ করছে। লেবার ক্যাম্পের নারীরক্ষীটা যে গালোচকাকে ঘৃণা করতো তাতে অবাক হবার কিছুই ছিল না। কারণ ওর প্রাণশক্তি ছিল অনন্য-সাধারণ। আর তা দিয়ে সে অন্য সবাইকেও সংক্রামিত করে তুলতো। কুলঝেঙ্কোকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অসাধ্য সাধন করেছে গালোচকা। এখন সে সুখী। কাজ করে উদ্যমের সঙ্গে। আর ওর কমরেডরাও ওর ব্যক্তিগত জীবনের উপর দিয়ে যে দুর্ভাগ্যের ঝড় বয়ে গেছে তা নিয়ে কোনো ইঙ্গিত-ইশারা করে না। সময় সময় অবশ্য ও ঘামে নেয়ে ওঠে, একটু কালা হয়ে পড়ে, মাথা ধরায় কষ্ট পায় আর তখনই ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। গালোচকা সব সময়েই সচেতন থাকে। সে জানে কেমন করে ওকে সারিয়ে তুলতে হয়। ওর আত্মিক উচ্ছলতা যেন কঠিন সঙ্কটাপন্ন রোগীর অক্সিজেনের উপরে বেঁচে থাকার মতো।

গালোচকা রাতটা রইল ভাল্যার সঙ্গে। বহুবার ওরা ঠিক করল ঘুমোবে বলে, কিন্তু প্রত্যেক বারই আবার কথা বলতে আরম্ভ করল।

ঘুমচ্ছো নাকি, ভাল্যা? একটা কথা বলবো তোমাকে। ঘটনাটা ক্যাম্পের কিন্তু ক্যাম্প সম্পর্কিত নয়। একজন ফরাসী ভদ্রলোক ছিলেন ওখানে, নাম পিয়ের। অবশ্য সেই অবস্থায় ওসব কল্পনা করাও কঠিন, বুঝতে পারছো তো, কিন্তু ভালোবাসাটা ছিল খাঁটি। যদিও আমরা চুমু পর্যন্ত খাইনি কেউ কাউকে।

ক্যাম্পেই ও মারা গেল যক্ষায়। এখনো যেন ওর কথা আমার কানে বাজছে: গালিওশকা......মিলায়া......কিছুটা রুশ ভাষা শিখেছিল। কিন্তু কতগুলো অক্ষর ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারতো না। খুব গল্প করতাম আমরা। বলতাম না আমাদের সেই প্রেমের কথা তোমার কাছে, কিন্তু এখন সবই সমান। মরে গেছে পিয়ের। তুমি বলছিলে থিয়েটারটা তেমন ভালো নয়। আর কেন যে তুমি অভিনয় কর তা জানো না। যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম একটি বোকা মেয়ে। শুধু হাসতাম হিঃ হিঃ করে, আর কিছু নয়। অনেক কথা ছিল; বলতে পারিনি পিয়েরের কাছে—কিছুই জানতাম না। ও পড়তো, ভাবতো অনেক বেশি। একদিন আমি ওকে বলেছিলাম:

তুমি এত জানো.........

প্রত্যুত্তরে সে বলল:

ঢের বেশি বড়ো জিনিস জানো তুমি.........

ওর সে কথাটা ভুলি নি কোনোদিনও।

তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী আগ্রহ নিয়ে সে শুনতো যখন আমি বলতাম আমাদের দেশের কথা! ওখানে থেকেই বুঝতে পারলাম সবাই কেমন করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তুমি একজন অভিনেত্রী। তোকারেভ তার চিঠিতে লিখেছিল যে অপূর্ব অভিনয় কর তুমি। আমার কথাই ধর এখন। যুদ্ধের আগে আমি কাজ করতাম কেন্দ্রীয় তুলা বিভাগে। কিন্তু আজ আমি লাইব্রেরিয়ান। সত্যিই খবরের কাগজে যাকে বলা হয় "ছোট্ট এক টুকরো যন্ত্র"। কিন্তু এখন আমি জানি বাইরে থেকে কি দৃষ্টিতে দেখা হয় একে। আমরা ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করি। হয়তো আমেরিকায়ও করে এমনি। হয়তো তারা আরো ভালো করে করে থাকে। কিন্তু এখানে এই ছোট ছোট বাড়িতে থাকবে সত্যিকারের মানুষ। বুঝলে ব্যাপারটা? জার্মানীতে আমি দেখেছি শহর, বাড়ি, স্নানাগার সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক। কিন্তু মানুষের বেলা কি করেছে তারা? আমাদের বন্দীশিবির মুক্ত করেছিল আমেরিকানরা। একটি নিগ্রো ড্রাইভার ছুটে এসে আমাকে একটা চকলেটের খণ্ড দিল আর অমনি একজন অফিসার তাকে যা নয় তাই বলে গাল পাড়তে লাগল। বাঁচতে হবে আমাদের, কাজ করতে হবে, দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে হবে যাতে দুনিয়ার মানুষ নিশ্বাস নিতে পারে। পিয়েরের কথা মনে পড়লে আমার কান্না পায়। এমন ভালো মানুষ ছিল—

কেন যেন ভাল্যার হঠাৎ মনে পড়ে গেল সের্গেইর কথা। গালোচকার কাহিনী শোনার পরে কী যে করতো সের্গেই তা বুঝে উঠতে পারে না ভাল্যা। কিন্তু বেশি দিনের কথা নয়, তাকে এত প্রাণবন্ত এত আপনার মনে হতো, যেমন ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে।

গালোচকা!—আবার বলে উঠল ভাল্যা—তুমি এসেছো, কী ভালোই না লাগছে আমার!

এটা বোধহয় আমার পরম সৌভাগ্য।

তিন সপ্তাহ পরে থিয়েটারের দলটা গেল কারখানা অঞ্চলে। অভিনয়ের

আগে দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল ভাল্যা। ধরেই নিয়েছিল যে খুবই খারাপ অভিনয় হবে ওর। কিন্তু চমৎকার হল ওর অভিনয়। দর্শকের সমাবেশও হয়েছিল যেমন সুন্দর, পুরনো দিনের ব্যর্থ প্রেমের করুণ কাহিণী বিচলিত করে তুলেছিল তাদের দারুণভাবে।

পরের দিন সকালে ওকে সঙ্গে নিয়ে কারখানা ঘুরতে বেরোল গালোচকা। পরিচয় করিয়ে দিল ওর সহকর্মীদের সঙ্গে। তারা ওর অভিনয়ের জন্যে এমন-ভাবে ধন্যবাদ জানাতে লাগল, অভিনন্দিত করতে লাগল যে কিশোরী মেয়ের মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে লাগল ভাল্যা।

দেখ! কী চমৎকার বাড়িগুলো!—বারবার করে বলতে লাগল গালোচকা,—এই ছোটো ছোটো সিঁড়িগুলো ভারি ভালো লাগে আমার। যাবতীয় সব কিছুই ব্যবস্থা করে দেই আমরা, মায় সমস্ত খুটিনাটি শুদ্ধ, এমন কি উনুন পর্যন্ত।

এ বাড়িগুলোতে কারা থাকবে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করতে শুরু করল গালোচকা।

নিশ্চয়ই তরুণ দম্পতিরা। আর থাকবে তাদের সঙ্গে ঠাকুমা একটি বাচ্চা কোলে। বাচ্চা শুদ্ধু ঠাকুমার চাইতে আরামের আর কিছু আমি ভাবতে পারি না। তরুণ দম্পতিরা ঝগড়াঝাটি করতে পারে, কিন্তু ঠাকুমা আর বাচ্চায়—কক্ষনো তা হয় না।।

ভাল্যা মনে করেছিল কুলঝেঙকাকে দেখবে খুবই রোগা আর বয়স্ক লোক। কিন্তু দেখা গেল, তাকে দেখতে অনেক কম বয়েসী আর চেহারাও সুন্দর। গভীর আবেগের সঙ্গে সে ভাল্যার হাত চেপে ধরল:

আপনাদের আনন্দ দানের জন্যে ধন্যবাদ। অনেকদিন থিয়েটার দেখিনি আমি। দারুণ উপকার হল আমার। তাছাড়া আপনার অভিনয় চমৎকার।

গালোচকা আর তার স্বামী থাকে একটা ছোট্ট ঘরে। ভাল্যা এ কথা না ভেবে পারল না যে ওরা এত বাড়ি তৈরি করে কিন্তু ওদের নিজেদের একটা ফ্লাটও নেই। হয়তো এমনিই হওয়া দরকার—অন্যের জন্যে।

অভিনয় ভালো হওয়ার আনন্দের সঙ্গে আর একটা আনন্দ এসে মিশল ভাল্যার মনে: ইতিপূর্বে আর কোনো দিনই সাধারণ দর্শকদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়নি ওর—যারা ওদের দেখে মঞ্চের উপরে, অভিভূত হয়, হাততালি দেয়। আর আজ কিনা দু দিন ধরে কাটাচ্ছে ভাল্যা তাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় অভিনয়ের পরে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এসে দাঁড়াল মঞ্চের উপরে। কারখানার পরিচালক, আর শ্রমিক প্রতিনিধি বক্তৃতা করলেন, ওদের উপহার দিলেন ফুলের তোড়া। লেবেদকিন এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে সে শুধু নাক ঝাড়তে লাগল আর করমর্দন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল চতুর্দিকে। মঞ্চের উপর থেকে নেমে আসার সময়ে একজন বয়স্ক লোক ভাল্যার হাতে দিল একটা মুখ বন্ধ লেফাফা। তারপর বলল:

অবসর সময়ে পড়বেন।

মঞ্চ থেকে ওরা এল কারখানার ক্যানটিনে। নৈশভোজের আয়োজন হয়েছিল সেখানে। আবার বক্তৃতা হল, হল পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করে সুরাপান।

গালোচকা ভাল্যার মুখোমুখি বসে শুধু হেসেই চলেছে খিলখিল করে তার সেই সংক্রামক হাসি। অবশ্য ভাল্যা জানে না কেন, কি বিষয় নিয়ে হাসছে গালোচকা। যখন আসর ভাঙল তখন রাত একটা বেজে গেছে। জামাকাপড় ছেড়ে যখন শুয়ে পড়ল ভাল্যা তখন হঠাৎ ওর চিঠিটার কথা মনে পড়ল। খাম খুলে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করে দিল:

প্রিয় অভিনেত্রী,

আমি আপনার নাম জানি না, জানি না আপনার পদবী। তাই অমনিভাবে সম্ভাষণ করলাম। আপনি আমাকে চেনেন না আর আমিও আমার নাম গান করতে যাচ্ছি না আপনার কাছে, কারণ চিঠিটার জবাব দেবার দরকার হবে না। উৎসুক তরুণ নই আমি, তাছাড়া এটা ভালোবাসার অভিব্যক্তিও নয়। বয়েস আমার একান্ন বছর। পেশায় আমি একজন নকসাকার। দু চার কথায় আমার নিজের সম্পর্কে মোটামুটি খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। জীবনটা আমার খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। কারণ যুদ্ধের সময়ে আমি আমার স্ত্রী আর পুত্রকে হারাই লেনিনগ্রাদে। যুদ্ধ করেছি শেষদিন পর্যন্ত। কিন্তু আমার কোনো বিশেষ প্রতিভা নেই। এক কথায় আমি নিতান্তই একজন সাধারণ নাগরিক। এ কথাটা বলার জন্যেই আমি আপনাকে চিঠি লিখছি যে অজান্তেই আপনি দারুণ সাহায্য করেছেন আমাকে। থিয়েটার দেখে যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, স্থির করলাম তক্ষুনি ছুটে যাই আপনার কাছে, গিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি। কিন্তু পরে মন বদলে ফেললাম। ভাবলাম সেটা ধৃষ্টতা হবে। তাছাড়া তার চাইতে লিখে জানানো ভালো। প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে আমার জীবনের কিন্তু সে সব সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো। তারপর যখন দেখলাম আপনাকে মানুষের বেদনাকে রূপায়িত করে তুলতে, আমার বুকের উপর থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। যেন আপনি আমাকে এক জোড়া পাখা লাগিয়ে দিলেন। আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে দিন।

বারবার করে চিঠিটা পড়ল ভাল্যা। ওর অন্তর আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ঐ অপরিচিত লোকটির কথা মনে মনে ভাবতে লাগল। কেমন করে সে ওকে করল সাহায্য? তারপর হঠাৎ সের্গেইর স্মৃতি ভেসে উঠল ওর মানস পটে—সে বলতো সব সময়েই যে সে ভালোবাসে স্বপ্ন দেখতে। তাহলে স্বপ্ন দেখা সবার জন্যেই দরকার। এমন কি এই প্রবীণ নকসাকারের পক্ষেও.........তা হলে ওর নিজেরও ঠিক অন্যের মতোই হওয়া দরকার—সবার জীবনেই দুঃখ কষ্ট আসে, সবাই-ই স্বপ্ন দেখে......। তাহলে সম্ভবতঃ ওর নিজেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। ও নিজেও তৈরি করে চলেছে অন্য সবার জন্যে ছোট ছোট ঘর বাড়ি। ছোট ছোট সিঁড়ি ওয়ালা.........

চিঠিটা মুঠোর ভিতরে আঁকড়ে ধরেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। যেন একটা অমূল্য সম্পদ—জীবনের ছাড়পত্র।

একচল্লিশ

গ্লাঝকভ সানন্দে সংবর্ধনা জানাল ক্রান্তসকে:

আপনার ধর্মপুত্তুরেরা বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। আমাদের সরকারী খামারে ব্যবহার করার জন্যে কী করে আমরা আপনার ঐ বীজবোনা কলটা পেতে পারি বলুন তো? আমি হিসেব করে দেখেছি—প্রচুর খরচ বাঁচবে। আসুন আগে খেয়ে নেয়া যাক। গিন্নী বলেছিলেন ননী-পনিরের পিঠে আছে তাঁর ভান্ডারে।

ক্রান্তসের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন:

অসুস্থ মনে হচ্ছে আপনাকে। ঠান্ডা লাগেনি তো, কি বলেন? লেগেছে না কি? আবহাওয়ার উপরে আদৌ আস্থা রাখা যায় না। ভারি বিশ্রী। দিনে প্রচন্ড গরম, আর রাত্রে তেমনি আবার তুষার পড়ছে। এখন আপনার দরকার হচ্ছে একটু ভদকার। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আবছা একটু হাসল ক্রান্তস্। ও একমাত্র যা চায় এখন সেটা হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেসক্রুশকিনোয় গিয়ে পেঁছাতে। কিন্তু যেতে দেবে না গ্লাঝকভ। খাওয়াদাওয়ার পরে গ্লাঝকভ বলল পাম্পটা চলছে না ঠিক মতো। গা থেকে কোটটা খুলে ফেলল ক্রান্তজ, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল তারপর লেগে গেল মেরামতের কাজে।

ভালো কথা, আপনাদের মিস্তিরি কি কবিতা লেখে?

কি বলতে চান আপনি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল গ্লাঝকভ।

আমি বলতে চাই এই যে যদি ও কবিতা লেখে তবে হয়তো এর একটা কৈফিয়ত থাকতে পারে। মাড়াই কলটা মেরামত করতে পারেনি, এখন আবার পারছে না পাম্পটা মেরামত করতে। দেখুন একবারটি—যদি ভিতরে এমনভাবে ময়লা জমে থাকতে দেয়া হয় তবে কোনোকালেই এটা আর চলতে চাইবে না—খুবই স্বাভাবিক। আচ্ছা ঠিক করে দিচ্ছি।

ওর মাথায় ঘুরছে পেস্ক্রুশকিনো। কিন্তু যে কাজে একবার হাত দিয়েছে তা ফেলে রেখে যেতে পারে না। পাম্পটা বেশ কিছুটা বেগ দিল ওকে। ফলে, সন্ধ্যে ধরোধরো এমন সময়ে ও গিয়ে পেঁছাল গাঁয়ে।

মনে মনে ঠিক করল বইটা ওর হাতে ফিরিয়ে দেবে আর এই সুযোগে কথা বলার একটা ভালো ছুতো খুঁজে পাওয়া যাবে তাই ও জিজ্ঞেস করল ভেরা কোথায় থাকে। কিন্তু যে মেয়েছেলেটিকে দাঁড় করিয়ে ও জিজ্ঞেস করল ক্রবানিকোভা নামে কাউকেই সে চেনে না। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন একটি বৃদ্ধা। তিনিও ফ্যাল ফ্যাল করে ক্রান্তজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ক্রবানিকোভা? ও নামে কেউ নেই আমাদের এখানে।

শিক্ষয়িত্রী, ভেরা নিকোলাইভনা।

আগে বলনি কেন সেটা? ভেরা নিকোলাইভনা? চিনি তাকে। বেশি

দিন হল আসেনি এখানে। মাত্র গত শরৎকালে এসেছে। ঐ যে উইলো গাছ-গুলো দেখতে পাচ্ছো, ওখানে একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। বাড়িটা হচ্ছে প্লাইরা-শেভার, সেখানে ও থাকে।

ছুটে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চেঁচিয়ে বলে উঠল:

আরে, আপনি?—তারপর একটি হাসি উপহার দিল ওকে। ক্রান্তসের মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল।

এই বইটা আমি আপনাদেব লাইব্রেরী থেকে নিয়েছিলাম,—বইখানা ওর হাতে দিতে দিতে একটু আনাড়ির মতোই বলে উঠল।

তারপর আর যে কি বলবে তা আর ভেবে পেল না। এই মুহূর্তটির জন্যে মনে মনে পাঁয়তারা ভেঁজেছে গোটা এক সপ্তাহ ধরে। সযত্নে ছকে নিয়েছে প্লান।—গিয়ে বলবে স্কুলের সাহিত্যের অনুষ্ঠানে ওর দারুণ আগ্রহ জন্মেছে—এটাই সহজ ভূমিকা হবে ওর সঙ্গে আলোচনা চালাবার। কিন্তু এই মুহূর্তে সব কিছুই ভুলে গিয়ে বিব্রত মুখে ভেরার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তেমনি হাসতে লাগল ভেরা। অবশেষে বলল ক্রান্তস্:

পরদিনই আমি আসতে চেষ্টা করেছিলাম। এমন কি সেদিন সন্ধ্যেরই—

বলতে বলতে থেমে গেল। না এ কথা ওর বলা উচিত হয়নি। হয়তো এক্ষুনি ছুটে পালিয়ে যাবে সেদিনের মতো।

মানে, এই বলতে চেয়েছিলাম যে বইটা আমি বড্ডো বেশি দিন রেখে দিয়ে-ছিলাম। এটা খুবই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু কাউকে দিয়ে যে পাঠিয়ে দেবো তেমন লোক ছিল না। আজ আমাকে আসতে হয়েছিল সরকারী খামারে। তাই ভাবলাম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি বইটা।

মুখের হাসি নিভে গেল ভেরার। ওকে ঘরে ডেকে নিয়ে এল। দেখল একটা বড়ো আকারের জীর্ণ টেবিল। তার উপরে খাতাপত্র ছড়ানো রয়েছে এলোমেলোভাবে। ইচ্ছে হল তাক থেকে একটা বই পেড়ে নিয়ে দেখে যে কি ধরনের বই পড়ে ভেরা। কিন্তু মনে হল তা না করাই ভালো। ভাবল কিছু একটা বলা দরকার। এমন মুখবুজে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোকামো। যে বইটা এইমাত্র ফেরত দিল সে সম্পর্কে বলল দুচার কথা। তারপর বলল পাম্পটা কেমন করে মেরামত করেছে তারই কাহিনী। শেষে বলল অঙ্কের শিক্ষিকার সম্পর্কে। কেন যে এসব কথা ও বলছে তা জানে না ক্রান্তস্। শুধু ওর ভয় যে যে মুহূর্তে ওর কথা ফুরিয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই ওকে চলে যেতে হবে বিদায় নিয়ে। সংক্ষেপে জবাব দিতে লাগল ভেরা। একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে ওর মন চলে গেছে দূরে—বহুদূরে। ক্রান্তস্ চেষ্টা করতে লাগল ওর দিকে না তাকাবার কিন্তু তবুও তাকাতে লাগল। এক বিষাদভরা আবেগ কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর দু চোখের দৃষ্টি ছেয়ে। যেটাকে প্লাঝকভ মনে করেছিল ওর অসুস্থতার লক্ষণ হিসেবে। দৃষ্টি অন্য দিকে রেখে চেয়ারের কিনারা ছুঁয়ে বসে রয়েছে ভেরা। দেখে মনে হয় বুঝি বা যে কোনো মুহূর্তেই উড়ে পালিয়ে যাবে। বলতে বলতে হঠাৎ ক্রান্তস্ চুপ করে গেল: বাজে বকে যাচ্ছে ও, আর বিরক্ত হয়ে উঠছে ভেরা.........

যেতে হবে এখন, যাই।

একটু ক্ষীণ আশা জেগে উঠেছিল মনে যে হয়তো ভেরা ওকে বলবে আর একটু বসতে। কিন্তু একটি কথাও বলল না ভেরা। বিদায় নেয়ার সময়েও তাকাল না চোখ তুলে। ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল ক্রান্তস্। খানিক দূরে এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভেরা। তাকিয়ে রয়েছে ওর গমন পথের দিকে। থমকে দাঁড়াল ক্রান্তস্। যাবে ফিরে? কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে ভেরা।

মন কালো করে ফিরে এল বাড়ি। একটি আস্ত বোকার মতো ব্যবহার করে এসেছে ও। হল এই যে আর কোনো দিনও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। কিন্তু তা যেন হল. দেখা করবেই-বা কেন তার সঙ্গে? কেন রচনা করছে আকাশকুসুম? এ যেন সেই সেকেলে উপন্যাসের মতো: "ছেলেটি মেয়েটিকে দেখেছে দুবার. কিন্তু কিছুতেই তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছে না"—হাস্যকর ব্যাপার। নিশ্চয়ই এটা ওর কাছে খুব একটা কৌতুকের বিষয় মনে হবে। হয়তো বিরক্তিকরও মনে হতে পারে। ওর মুখের দিকে তাকাতেই সেটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল—মন ছিল অন্য দিকে। বন্ধুভাবে ওকে অভ্যর্থনা জানাতেই শিশুর মতো আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছিল ও। কিন্তু সে তখন চেষ্টা করছিল ওদের প্রথম দিনের সাক্ষাতের খারাপ ধারণাটাকে শুধরে নেয়ার। যে দিন ও ভয় পাইয়ে দিয়েছিল তাকে। নিশ্চয়ই এ সব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে ওকে মাথা থেকে।

কয়েক দিন পরে আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সম্পাদক গুসেভ ডেকে পাঠাল ওকে দেখা করার জন্যে। বলল গুসেভ যে. সে বীজ-বোনার কলের উপরে নজর রেখেছে। দেখেছে. খুবই ভালো ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া পরিকল্পনাটা বহুদিন ধরে মস্কোতে চাপা পড়ে ছিল। কিন্তু এবার ওদের টনক নড়েছে। অল্প কয়েক দিনের ভিতরেই জবাব আসবে আশা করা যেতে পারে। যে দু ঘণ্টা ক্রান্তস্ ছিল গুসেভের কাছে অনবরতই টেলিফোনের ডাক আসছিল, আসছিল লোকজন। জানতে পারল ক্রান্তস্ যে "অক্টোবরের বিংশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান"—যৌথখামারে একটা ভেড়ীর ওজন হয়েছে নব্বই কিলোগ্রাম আর এক বছরে পশম দিয়েছে চার কিলোগ্রাম; ঘড়ির কারখানার অনিয়ম সম্পর্কে একটা চিঠি ছাপেনি আঞ্চলিক সংবাদপত্রের সম্পাদক—তার মানে সমালোচনা চেপে দেয়া; সিমেণ্টের অভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিক-বসতি তৈরির কাজে দুদিন বৃথা নষ্ট হয়ে গেছে: গরবাশেভের দশম-বার্ষিক বিদ্যালয়ের পরিচালক একজন ফর্মালিস্ট। তিনি অন্যায়ভাবে দোষারোপ করেছেন ইতিহাসের শিক্ষকের বিরুদ্ধে; জুন মাসে ইস্পাত কারখানায় একটা নতুন বিভাগ চালু হবে। বয়ন-শিল্প শিক্ষালয়ে আরো আশিটা বিছানা পড়ে এমন একটা শোবার ঘর দরকার। কিরভ স্ট্রিটে তিনটা নতুন বাড়ি বাসের উপযুক্ত হয়ে গেছে। জেলা কমিটির সম্পাদক কোতভকে পার্টি-স্কুলে পাঠাবার মনস্থ করা হয়েছিল। কিন্তু ঝুরাভলেভ বলল যে ওকে ছাড়াই চালিয়ে নিতে পারবে সে—। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল ক্রান্তস্: গুসেভের মন সব কিছুই পারে গ্রহণ করতে; ওর জবাব সংক্ষিপ্ত,

বাহুল্যবর্জিত, বুদ্ধিমান-সুলভ।

ক্রান্তস্‌কে বলল গুসেভ যে ওদের কারখানায় যে ধরনের মাড়াই-কল তৈরি হচ্ছে তা সেকেলে। কস্তিৎস্কির মডেল মন্দ নয় কিন্তু তৈরি করা হয়েছে বিশ্রী করে। ক্রান্তস্‌ যদি এ দিকটায় একটু নজর দেয় তবে ভালো হয়। কাজের কথা শেষ হওয়ার পরে গুসেভ বলল:

আজ প্রাভদায় পারীর একটা বেশ মজার খবর বেরিয়েছে। অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে জনসাধারণ এর বিরোধী। প্রচুর সেনাপতি আছে ওদের কিন্তু সৈন্য বেশি আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হচ্ছে পারী কংগ্রেস বেশ একটা বড়ো রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া আমাদের আক্রমণ করাটা তেমন কিছু আর জল-ভাতের ব্যাপার নয়—আমরা শক্তিশালী।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল গুসেভ কিন্তু বাধা পড়ল কুইবিশেভ কারখানার ডিরেক্টরের আসায়। তারা কেক তৈরির নতুন ধরনের যাঁতাকল তৈরি করতে শুরু করেছে তাদের কারখানায়।

ধুলোভরা শহরের এবড়োখেবড়ো বাঁকাচোরা পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে ক্রান্তস্‌। শহরের মাঝখানে অসংখ্য পুরানো বাড়ি। জমিদার, প্রাদেশিক হোমরাচোমরা লোক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির জন্যে বহুকাল আগে যে সব বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি হয়েছিল, সেগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংস হতে চলেছে। সর্বাঙ্গে ফাটল, চাবড়া চাবড়া চুনবালি খসে পড়ছে। কতগুলো মনে হয় এক্ষুনি ধ্বসে পড়বে। তারই মাঝখানে মাঝখানে সবুজ বাগান। বাগানে ছাত্রীরা তাদের পরীক্ষার পড়া করছে আর খেলছে বাচ্চারা। শহরতলী ঘিরে গড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো বাড়ি-ঘেরা কারখানা। শহরটাকে দেখে মনে হয় যেন একটা প্রাচীন গাছ, বাজে পোড়া, কালের প্রভাবে পঙ্গু হয়ে এক পাশ থেকে জোরালো নতুন শাখা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। এই রকমের একটা শহরে কতই না কাজের দায়, মনে মনে ভবতে শুরু করে ক্রান্তস্‌। আর গুসেভের উপরেই এই সমস্ত এলাকার ভার। বৃষ্টি হবে কি সময় মতো? বা ঠিক সময়ে জেনারেটরগুলো পারবে কি দিতে? প্রচুর বাসস্থান তৈরি হবে কি ছাত্রদের জন্যে......? কিন্তু কিছুতেই দমে যায় না গুসেভ। যদিও গোলগাল চেহারা কিন্তু ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ম। ক্রান্তস্‌কে বলেছে গুসেভ যে তার বাবা ছিলেন রাখাল—মেষপালক। অবাক কাণ্ড! মাত্র ত্রিশটা বছর হয়েছে কি না হয়েছে, এরই মধ্যে এই ধরনের মানুষ দেখা দিয়েছে। ঠিকই বলেছে গুসেভ—আমরা শক্তিশালী। যেটা আসলে দরকার সেটা দেশ নয়, সংখ্যা নয়, মানুষ।

ওর মনে পড়ল মাড়াই-কল সম্পর্কে গুসেভ যা বলেছে ওকে। নিশ্চয়ই সে দিকে নজর দেবে ক্রান্তস্‌। বিপদ শুধু কশারেভকে নিয়ে—জন্মের মতো লোকটা ভয় খেয়ে গেছে।

কী চমৎকার একটা পার্ক আছে এখানে! ফুলের ঝাড়ে ভরা।......থমকে দাঁড়ায় ক্রান্তস্‌। একটা অবোধ চিন্তা পেয়ে বসে ওকে: কেমন হয়, যদি ঐ ঝোপের আড়ালে ভেরা থেকে থাকে......। এই যা, ও তো ঠিকই করেছে যে

ভেরার কথা আর ভাববে না, কিন্তু দিনের ভিতরে একশোবার সে এসে উঁকি দিয়ে যায় ওর মনে। নিশ্চয়ই ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে!

যে বিষয় আলোচনা করেছে গুসেভ সেটা জানতো সে। বীজ-বোনা যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করেছে মস্কো থেকে। কথাটা শুনল ক্রান্তস্ কশারেভের মুখ থেকে। আন্তরিকভাবেই খুশী হয়েছে কশারেভ। ওর আগের বাধা দেয়ার কথা ভুলে গিয়ে মনে মনে বিশ্বাস করছে যে বরাবরই সে এটাকে সমর্থন করে এসেছে।

এটা একটা সাফল্য, বুঝলে আলেকজান্দার ইলিচ। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এবার এটা তৈরি করতে শুরু করা যায়।

কশারেভের সঙ্গে বসে খাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল ক্রান্তস্। কশারেভ বলতে লাগল যুদ্ধের সময়ে আকছার ওকে কেমন করে দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কিছুই কানে তুলছে না ক্রান্তস্। শুধু একটু আবছা হাসি ফুটে রয়েছে ঠোঁটের কোণে। কেননা কশারেভ কি বলবে তা সবই আগে-ভাগেই জানে ক্রান্তস্। গোটা কয়েক গল্প আছে ডিরেক্টরের, সব ব্যাপারেই সেগুলো তিনি পরিবেশন করে থাকেন। শুধু চায় এখন ক্রান্তস্ ঘরে ফিরে যেতে আর ভাবতে ভেরার কথা।

এক মাস চলে গেছে। গ্রীষ্মের দিন, দারুণ গরম, শুকনো। দেখতে দেখতে গাছের পাতা কালো হয়ে গেছে। হলদে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ফুলের কেয়ারিগুলো গেছে শুকিয়ে। আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ছেঁড়া মেঘ—নিঃসঙ্গ একাকী। মাড়াই-কলের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলে ক্রান্তস্। আর রাতের অন্ধকারে গুমোট ঘরে শুয়ে শুয়ে অবসন্ন মনে দেখে ভেরার হাসি, তার চিন্তাক্লিষ্ট অনুরূপ-ভরা দুটি চোখ। ক্রান্তস্ বলে ওঠে, "ছোট্ট বন্য প্রেয়সী আমার" আর সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে পালিয়ে যায়।

শেষ হয়ে গেছে স্কুলের পরীক্ষা। মায়ের কাছে কুইবিশেভে চলে যাবে ভেরা। কিন্তু একটার পর একটা ছুতো করে থেকেই যাচ্ছে। তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে ও প্রতীক্ষা করছে ক্রান্তসের জন্যে। যেদিন ক্লাস-ঘরে হঠাৎ ঢুকে গিয়ে ওকে চমকে দিয়েছিল ক্রান্তস্—প্রথম সাক্ষাতের সেই প্রথম ক্ষণটি থেকেই দারুণ ছাপ রেখে গেছে ও ভেরার অন্তরে। ওর সমস্ত অবয়ব, সমস্ত সত্তা দিয়ে অভিভূত করেছে ভেরাকে। ওর আবেগমুখর ব্যবহার, ওর ইচ্ছা-শক্তি ওর চোখের কোমল দৃষ্টি ভেরার সর্বাঙ্গ ছেয়ে এনে দিয়েছিল হিল্লোল। বহুদিন থেকেই ভেরার মা জানেন যে ভেরা ভাবুক, অথবা তার কথায়, "মাথা খারাপ"। নিতান্ত বাচ্চা বয়সেই ভেরা মুখস্থ করে ফেলল লারমন্তভের "মৎসায়রি" কবিতাটা। এক রহস্যময় বীর পুরুষের স্বপ্ন দেখতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতো নদীর পারে কিংবা অন্ধকার ঘরের কোণে। হঠাৎ বাপ-মায়ের গলগ্রহ হয়ে আছে বলে চেঁচামেচি জুড়ে দিতো। মেরুপ্রদেশে যাবে বলে জুড়ে দিতো বায়না। কেমন করে আগুনে পুড়ে মরে সেটা জানা দরকার বলে হৈ হল্লা শুরু করে দিতো। ওর বাবা শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আর মা সাদাসিধে মানুষ, করেন হিসেব রাখার কাজ আর সুগৃহিণী। ঘাবড়ে যেতেন তিনি ভেরার অদ্ভুত অদ্ভুত কথা

শুনে, তার হঠাৎ স্ফূর্তির অতিশয্যের পরেই দারুণ বিষাদাচ্ছন্ন হতে দেখে। আর মনে মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করতেন এই দেখে যে ওঁর মেয়ের কোনো মেয়ে বন্ধু নেই। মেয়েদের সঙ্গে ভেরার বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হতো না। কারণ ওর দাবি ছিল বড্ডো বেশি। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তেন মা: মেয়েটা বড্ডো বোকা। ভেরার বয়েস যখন পনেরো তখন যুদ্ধ শুরু হল। ভেরা চেষ্টা করল সেনা-বাহিনীতে নাম লেখাতে। বয়েস বাড়িয়ে দিল দু বছর। আর চাইল, যেন ওকে ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর খানিকটা বুদ্ধি বিবেচনা বাড়ল। অন্ততঃ ওর মায়ের ঐ রকমেরই একটা ধারণা হল। স্কুলের পড়া শেষ করে ও ঢুকল গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে। তারপর মাত্র গত শরৎকালে চলে এসেছে পেস্ত্রুস্কিনোয়। ছাত্রাবস্থায় মনে মনে ভাবতো ক্লাপিভানকভের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। প্রেম-কে ভেরা দেখতো বহ্নি-শিখার মতো যা নাকি আনে ব্যথা, আনে ভয়। ক্লাপিভনিকভ যখন বলতো:

চল যাই ভেরা পার্কে যাই। ওখানে চুমু খাওয়া যাবে।

প্রত্যুত্তরে ভেরা বলল তাকে চলে যেতে ওর কাছ থেকে। তাতে সে-ও বলল ওকে ছেনাল। আজ সেদিনের সেই ভাবপ্রবণতাভরা ঘটনার কথা মনে পড়ে সেই ছেলেমানুষীর জন্যে হাসি পেল ভেরার। যা খুশি বলুক না কেন ক্রান্তস্, শুধু এইটুকু মাত্র জানে ভেরা যে ওকে না পেলে জীবনে শান্তি পাবে না সে কোনো দিন। ও কি শুধু বইটাই ফিরিয়ে দিতে এসেছিল? অসম্ভব! নিজেই তো বলেছে সে যে সেই রাত্রেই ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু ওকে ভালোবাসতে পারেনি সে। শুধু ভেবেছিল এই যে সরকারী খামারের কাছাকাছি একটা মেয়ে একা একা থাকে তার সঙ্গে খানিকটা মজা লোটা যাবে। মস্কোর পরে এখানে এই কারখানায় এসে পড়ে খানিকটা মনমরা হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ও কি ধরনের মেয়ে যখন বুঝতে পারল তখন সটকে পড়ল। কিন্তু আবার যদি আসে এখন, কিছুতেই যেতে দেবে না তাকে ভেরা। তার যা খুশি বলুক না কেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপও না হয় করুক, কিছুই এসে যাবে না তাতে। বলবে তাকে ভেরা যে ও তাকে ভালোবাসে। ওকে ছাড়া কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

কিন্তু এল না ক্রান্তস্। ওর ধারণা ওকে ঘৃণা করে ভেরা। তার মন অন্য কোথাও বাঁধা। শনির দৃষ্টি পড়েছে ওর উপরে। ত্রিশ বছর বয়সে এই প্রথম প্রেম এল ওর জীবনে। কিন্তু সে প্রেম নিয়ে এল কেবল বেদনা।

গ্রীষ্মের রবিবার। ভ্যাপসা গরম। মাছ ধরতে চলে গেছে কশারেভ। মজুর কারিগরেরা সব এদিকওদিক চলে গেছে। কারখানার পাঁচ কিলোমিটারের ভিতরে আছে একটা চমৎকার বন। ব্যাঙের ছাতা আর গোলাপজাম জন্মে প্রচুর। নিজের ঘরে বসে ক্রান্তস্ পড়ছিল "স্তালিনগ্রাদের পরিখায়" উপন্যাসখানা। সেই অতীত দিনের স্মৃতি জেগে উঠছিল ওর মনে: সেই উত্তেজনা, একবার বোমা বর্ষণের পরে আবার বোমা বর্ষণের মাঝখানের নিথর নিস্তব্ধতা। স্তেপ-ভূমির গন্ধ আর মৃত্যুর কথা......। কারখানার দারোয়ান এল ওর কাছে:

একজন দেখা করতে এসেছে আপনার সঙ্গে, আলেকজেন্দার ইলিচ।

যখন দেখতে পেল ভেরা, অতি কষ্টে ক্রান্তস্ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার

অত্যুগ্র কামনা চেপে রাখল। ভেরার দুখানা হাতই হাতের মুঠোয় তুলে নিল ক্রান্তস্:

ভিতরে আসুন—জানেন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে আপনি আসবেন—।

—সত্যিই একবার ভেবেছেন ক্রান্তস্: যদি সে আসে এখানে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে তো কেমন হয়?

আবির-রাঙা হয়ে উঠল ভেরার মুখ। হাত দুটো ছাড়িয়ে নিল ওর হাতের ভিতর থেকে:

বলছি সব ভেঙে—আমি এসেছি স্কুলের প্রমোদভ্রমণের সঙ্গে। আমরা চলেছি তারখানি, মানে লারমন্তভো। সরকারী খামারে গিয়ে প্লাঝকভকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার কোনো খবর দেবার আছে না কি আপনাকে। জানতাম এই পথেই যেতে হবে আমাদের। প্লাঝকভ বলে দিয়েছেন আমাকে যেন অবিশ্যি অবিশ্যি আপনার সঙ্গে দেখা করি। বীজ-বোনা -যন্ত্র সম্পর্কে আপনার জবাবের অপেক্ষা করছেন ওঁরা। ব্যস, এই পর্যন্তই—এখন আমাকে ছুটতে হচ্ছে—

কিছুতেই ওকে থাকতে রাজী করাতে পারল না ক্রান্তস্। বলল ভেরা যে ওরা অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে।

বেশ আমিও যাব তারখানিতে—অবশেষে বলল ক্রান্তস্—কোনোদিন যাইনি ওখানে।

রাস্তার উপরে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু প্রমোদ-ভ্রমণকারীদের কাউকেই নজরে এল না।

সকাল বেলা চলে গেছে ওরা—বলল ভেরা,—আমাকে নামতে হল সরকারী খামারে। সেখানে একটু কাজ ছিল। লারমন্তভোতে গিয়ে ধরে নেব ওদের। এই লরিটা যাচ্ছে ওদিকে। ড্রাইভারের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি আমাকে নিয়ে যাবে।

লরির পিছনের দিকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে দুজনে। ঝাঁকুনিতে দুলছে, কাত হয়ে পড়ছে চলার গতিতে।

হেঁটে গেলেই ভালো হতো—হাসতে হাসতে বলল ভেরা।

পারতেন হেঁটে যেতে?

নিশ্চয়ই। আমাদের ওখান থেকে স্টেশন বত্রিশ কিলোমিটার। শীতকালে একদিন ইচ্ছে হল থিয়েটার দেখতে যাবো। একটা গাড়ি পেলাম স্টেশন পর্যন্ত যাবে। কিন্তু ফিরে আসার কোনো ব্যবস্থা নেই। অপেক্ষা করতে পারলাম না, আমার পড়ানোর শুরু হবে সকালে। তাই হেঁটে ফিরলাম। তুষার ঝড় হচ্ছিল। পেস্ত্রুশেরিনায় এসে পথে পড়ল এক নেকড়ে বাঘ।

ভয় পান নি?

পেয়েছি নিশ্চয়ই। কেন্তু তেমন নয়। ভয় পেয়েছিলাম অন্য কারণে......

কি সে?

ভেরা কোনো জবাব দিল না।

লারমন্তভোয় পৌঁছে ভেরা তার দলবলের খোঁজ করল। শুনল তারা ছিল ওখানে কিন্তু চলে গেছে।

কি বেকুবিটাই হল।—ক্রান্তসের কাছে বলল ভেরা।—ওরা এখন শেম্বারে

রয়েছে। তাহলে বিদায় নিতে হচ্ছে আপনার কাছ থেকে। তারখানি দেখাটাও বাদ পড়ে যাচ্ছে দেখছি।

ওকে অনুরোধ করল ক্রান্তস্ যেন এক্ষুনি না চলে যায়। অন্ততঃ মিউজিয়ামটা যেন দেখে যায় আগে। রাজী হল ভেরা। লারমন্তভের বাড়ির ঘরের ভিতর দিয়ে ভাবতে ভাবতে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওর মনে হল যেন একটা অতি পরিচিত চেনা জায়গায় ফিরে এসেছে, যেন ফিরিয়ে আনছে অতীতের স্মৃতি। প্রদর্শিত কোনো কোনো জিনিসের দিকে আদৌ ফিরে তাকাল না ভেরা। আবার কোনো কোনো জিনিসের সামনে বহুক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মুখের দিকটা চিবানো একটা ছোট্ট পাইপ রয়েছে একটা কাচের আধারে।

তাঁর পাইপ—অস্ফুট কণ্ঠে বলল ভেরা।

দুজনে পার্কের ভিতরে চলে এল। বাতাস ছাড়তে শুরু করেছে। জেগে উঠছে বিরাট ওকের শাখায় উচ্চ মর্মর ধ্বনি। পুকুরের বুকটা দুলে দুলে উঠছে। অন্ধকার, ঠাণ্ডা সমাধির ভিতরে নেমে এল দুজনে। বাগানের রক্ষী ওদের এনে দিল একটা মোমবাতি। ক্রান্তস্ বাতিটা জ্বালাতেই কি যেন একটা চিকচিক করে উঠল—দস্তায় গড়া একটা কফিন, ছাত থেকে জল চুইয়ে চুইয়ে নেমে আসছে। উপরে খোলা জায়গায় উঠে আসার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত দুজনে চুপ করে রইল।

অবশেষে ওরা পুকুরের কাছে ফিরে এসে পাড়ে বসে পড়ল।

অত কালো কেন আপনি?—জিজ্ঞেস করল ভেরা,—মনে হয়, আপনি বোধহয় জন্মেছিলেন ককেসাসে?

না, মস্কোয়।

ক্রান্তস্ ওর মুখের দিকে তাকাল। আর দু চোখের দৃষ্টি ভরে দেখতে লাগলো ওকে। ভেরা কৃশাঙ্গী। কেমন যেন একটা দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যঞ্জনা রয়েছে ওর চোখেমুখে। মুহূর্তে মুখ-চোখের উদ্ধত বা খেয়ালী ভাব রূপান্তরিত হয়ে এক দুর্বোধ্য মৃদু হাসির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

লারমন্তভকে খুবই শ্রদ্ধা করেন আপনি, তাই না?—জিজ্ঞেস করল ক্রান্তস্।

চুপ করে রইল ভেরা।

ঘনিয়ে আসছে রাত্রির ছায়া। বজ্রগর্ভ মেঘ উঠেছে জমে। ঘন লাল আর কালোয় মেশা রঙ ধরেছে আকাশ। আর তাতে ঝড়ের পূর্বাভাস। বৃষ্টি আসার আগেই গাঁয়ের ভিতরে চলে যাবার প্রস্তাব করল ক্রান্তস্। কিন্তু ভেরা বলল, আরো খানিকক্ষণ থেকে যাবে এখানে। খুশী হয়ে উঠল ক্রান্তস্ যে শেম্বারে যাবার ওর তাড়া নেই জেনে। ভুল হতে পারে কি ওর? হয়তো সত্যি সত্যিই ভেরা এসেছে ওরই সঙ্গে দেখা করতে?

ভেরা নিকোলাইয়েভনা, সেদিন যখন আপনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—

সেদিনের কথা তুলবেন না।

নীরবে বসে রইল দুজনে। অন্ধকারের ভিতরে গাঁয়ের আলো জ্বলছে মিট-মিট করে।

জানেন আমি কি ভাবছি?—বলল ভেরা,—কোন প্রাণে মার্তিনভ গুলি করতে পারল ওঁকে? মনে হয় জীবনভোর এ-কথাটা দুর্বোধ্যই থেকে যাবে আমার

কাছে।

ওর আবেগ, ওর উত্তেজনা আপনা থেকেই সংক্রামিত হয়ে উঠল ক্রান্তসের ভিতরে। পরম আগ্রহের সঙ্গে ও বলে যেতে লাগল ওর যৌবনের কথা, যুদ্ধের কথা:

ঝায়চোঙ্কো নামে একজন লোক ছিল ওর রেজিমেন্টে। খুব ভালো গান করতো। সংগীত বিদ্যালয়ে পড়েছিল সে। এখন যেমন আমরা বসে আছি তেমনি বসতাম গিয়ে আমরা—জায়গাটা ছিল নিপারের পারে। সে বলেছিল আমার কাছে যে লুদমিলার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে একটা—সেই রাত্রেই সে মারা গেল—কত লোকই তো মরেছে, কেন যে এই মুহূর্তে আমার তার কথা মনে পড়ে গেল জানি না। হয়তো সে লারমন্তভের "দেবদূত" গানটা গাইতো বলেই। যৌবনোদ্বেল বুকে তার সেই গানের কথাহারা সুর আজও জীবন্ত রয়ে গেছে...। ফ্রন্টে একজন অফিসার ছিলেন আমার সঙ্গে। আমরা আলোচনা করছিলাম হাইনের কথা। তিনি বলেছিলেন "রোমান্টিক আয়রনি" জিনিসটা আসে প্রত্যক্ষ বোধশক্তি থেকে। স্বর্গের পাখির চাইতে সজারুর হৃদয় বোধহয় ঢের বেশি কোমল।" সব সময়েই হাসতেন তিনি—মিনাইয়েভ......আমেরিকানরা গ্রেপ্তার করেছিল তাঁকে, নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন কাগজে। এখন ছেড়ে দিয়েছে। ভেরা, আপনি কি কখনো ভাবেন ভবিষ্যতের কথা?

কদাচিৎ—আগে আগে ভাবতাম খুব।

আমি ভাবি। এখন সময়টা খুবই অদ্ভুত। মানুষ এমন একটা জায়গায় এসে পেঁছেছে যে সে এখন শুধু সবকিছুর যে ব্যাখ্যাই করতে পারে তা-ই নয়, আগে থাকতে জানতেও পারে সবকিছুই। তাছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই এমন হঠাৎ হঠাৎ ঘটে যাচ্ছে—। গুশেভ বলেছিল আমরা বিরাট একটা শক্তি। কথাটা সত্যি। ফ্রন্টে লোক আন্দাজ করতো কি ধরনের সাঁজোয়া আছে "টাইগার"-এর। গোলার আঘাতে সেটা ভেদ করা সম্ভব কি না। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের দেশের যে কোনো একটি লোকের হৃদয়ের কথাই ধরুন, হয়তো খুবই সামান্য জিনিসে আঘাত পেতে পারে—যেমন কোনো একটি মেয়ে তাকিয়েছে তার দিকে অকরুণ দৃষ্টিতে কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন বর্ম আঁটা রয়েছে তার গায়ে যে কোনো ধাতুই তাকে বিদ্ধ করতে পারে না।

বৃষ্টি আসেনি, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকে সব কিছুই আলোকিত হয়ে উঠছিল। গুরুগর্জনে ডাকছিল মেঘ। আবার ক্রান্তস্ বলল ভিতরে যাওয়ার কথা, কিন্তু তবুও প্রত্যাখ্যান করল ভেরা।

"কত গভীর প্রেমে বাঁধা ছিল কত দীর্ঘ যুগ।"

এবার আর ক্রান্তস্ নিজেকে চেপে রাখতে পারল না:

তুমি কি কোনো দিন কাউকে ভালোবেসেছ ভেরা?

না।—অস্ফুট কণ্ঠে বলল ভেরা।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্রান্তস্, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। হঠাৎ ভেরা নুয়ে পড়ে ওর ঠোঁটের উপরে চুমু খেল। ক্রান্তস্ ওকে বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ করার বা কোনো কথা বলার আগেই ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গোটা পার্কময় খুঁজে খুঁজে বেড়াল ওকে ক্রান্তস্। চিৎকার করে ডাকল নাম ধরে ভেরা! ভেরা! কিন্তু কোনো জবাব পেল না।

বজ্র গর্জনে প্রবল বেগে শুরু হয়েছে ঝড়ের মাতামাতি। বিদ্যুৎ চমকে আলোকিত হয়ে উঠছে গাছের গুঁড়ি, লারমন্তভের বাড়ির দেয়াল, আর আকাশ। অন্ধকারে আছাড়পাছাড় খেতে খেতে ক্রান্তস্ পুকুরের পাড় ঘুরে অবশেষে রাস্তায় এসে পড়ল। মুষলধারে শুরু হয়েছে বর্ষণ। পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই। কোথায় যাবে জানে না: গাঁয়ে, স্টেশনে, না শেম্বারে? সারা রাত ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

শেম্বারে পেঁছে দেখা হল অংকের শিক্ষিকার সংগে। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করল ভেরার কথা। তিনি তখন স্কুলের ছাত্রদের সংগে নিয়ে বলছিলেন তাদের কাছে লারমন্তভ সম্পর্কে বেলিনস্কির শ্রদ্ধার কথা।

ভেরা নিকোলাইয়েভনা আছে আপনার সংগে?—দুশ্চিন্তাভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্রান্তস্।

না। কাল আমরা তার জন্যে লারমন্তভে অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু সে আসেনি। বোধহয় মত বদলে ফেলেছে।

দারুণ ভয় হল ক্রান্তসের। কোথায় যেতে পারে সে? রাত্রির ঝড়-বাদলের পরে আলোয় আনন্দে ভরে গেছে দশ দিক। সূর্যের আলোয় সব কিছুই হয়ে উঠেছে সবুজ, তকতকে, সব কিছুই ঝিকমিক করছে। কিন্তু ওর অন্তরে বিগত রাত্রির অন্ধকার বাসা বেঁধে রয়েছে।

জানে না কেমন করে এসে পেঁছেছে পেস্ত্রুশকিনোয়। রাত এগারোটার সময়ে গিয়ে পেঁছেছে সেখানে। ভাগ্য ভালো ভেরার বাড়িওয়ালী তখনো শুয়ে পড়েনি। আবেগ-ব্যাকুল ভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্রান্তস্:

ভেরা নিকোলাইয়েভনা আছে?

সে তার ঘরে আছে—ভিতরে আসুন।

বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল ভেরা। ক্রান্তসের গলা শুনতে পেয়েই লাফিয়ে উঠে ছুটে এল ওর কাছে। তারপর দুহাতে ওর মাথাটা ধরে বলতে লাগল:

তোমার যা খুশি হয় বল......কি ঘটে না ঘটে কিছুই আমার এসে যায় না তাতে......আমি ভালোবাসি তোমাকে......এত ভালোবাসি......হেসো না—ভালো-বাসি জীবনের জন্যে।

বিয়াল্লিশ

'ভাল্লুক' এখন কোথায় আছে না আছে তা না জানায় মাদো তার চিঠিটা পাঠিয়ে দিল তার পুরানো ঠিকানায়। তারপর দীর্ঘদিন ঘুরেফিরে ভরোনভের কাছে পৌঁছল গিয়ে জুন মাসে। উত্তুরে বসন্তের প্রথম দিকের এক দিন। রোদের তাপ ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভরোনভ এমন একটা ছবি দেখছিল যেটা নাকি কোনোদিনই ওকে অভিভূত না করে ছাড়ে না। বিরাট বিরাট পাহাড়, সর্বাঙ্গে চাপ চাপ বরফ। হ্রদের জল এত কালো, মনে হয় যেন জলে নয় ওটা ভুসা কালিতে ভর্তি। ছোট ছোট খেলনার মত বাড়িঘর, মাটি-কাটার দল, ইঁটের পাঁজা, সিমেণ্ট......দুটি মেয়েছেলে কাজ করছে সব্জী খেতে। জমিটা মনে হচ্ছে যেন গোলা কাদা। দিনটা রবিবার। অস্পষ্ট আওয়াজে সজোরে বেজে চলেছে রেডিও। ঘুড়ির মত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শিশুর দল। ছিমছাম পোশাক-পরা একটি মেয়ে হেঁটে চলে গেল। মোড়ের মাথায় গিয়ে থামল। আবার ফিরে এল। অনেকক্ষণ ধরে এমনি পায়চারি করে ফেরার পরে অস্বাভাবিক বড়ো গোছের টুপি-পরা একটি তরুণ দ্রুতপায়ে এসে দাঁড়াল। স্বভাবতই মেয়েটি ওকে বকল আর ছেলেটি নানান রকমের হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করে কৈফিয়ত দিতে লাগল। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ভরোনভ। ভারি মজা লাগছিল মনে মনে। তারপর হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল, আজ রাত্রে শহরের একটা জন-সভায় শান্তির সংগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতাটা লিখে ফেলতে হবে ওকে। নিজে ও বক্তা নয়। তাছাড়া কি-ই বা আছে বলবার? এটা তো স্পষ্টই যে সবাই-ই শান্তির পক্ষে। আবার জানালার পথে বাইরের দিকে তাকাল ভরোনভ। ছেলেটি আর মেয়েটি ইতিমধ্যেই মিটমাট করে নিয়েছে। তারপর এক সঙ্গে হেঁটে চলেছে দুজনে আর হাসছে। সব্জীর খেতে মেয়েছেলে দুটি তখন সেই কালো কালো গোল কাদা ঘেঁটে ফিরছে। অবাক হয়ে যায় ভরোনভ, কী বুনছে ওরা ওখানে? সম্ভবতঃ আলু লাগাচ্ছে।

নিকোলাই প্লাতোনোভিচ একটা চিঠি আছে আপনার। বিদেশের চিঠি। এমন অদ্ভুত ডাকটিকেট। আমাকে দেবেন টিকেট কটা? আমার ছোট্ট ছেলেটা টিকেট জমায়।

খামটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ভরোনভ। যেন সাদর অভিনন্দন জানাল। তারপর সযত্নে টিকেটকটা তুলে দিয়েছিল দুন্যাশার হাতে। দোরটা বন্ধ করে দিল। আবার হাসল খামটার দিকে তাকিয়ে। যেন ফরাসী দেশটাই এসে ঢুকেছে ওর ঘরে। আর বলছে:

লিমোজে মুক্ত হয়েছে। এবার পারী—

ম্যাপের উপরে ঝুঁকে বসে দেদে:

কি বল ভাল্লুক, তোমার কি মনে হয় বাঁ পাশ থেকে আমরা আক্রমণ চালাতে পারি?—

সেই মুহূর্তে কতগুলো বুনো গোলাপজাম নিয়ে মিকি তার সেই শোক-সংগীতের কলিটি গাইতে গাইতে দ্রুত পায়ে এসে ঘরে ঢুকল:

মুক্তি-সেনা করে মৃত্যুবরণ,
মৃত্যু তাকে তো নেয় না কাড়ি;
পরোয়া নেইকো জীবন-মরণ,
যুদ্ধে চাই যে প্রথম সারি।

সারাক্ষণ ধরে ভরোনভ মাদোর চিঠিটা পড়তে লাগল। এক মুহূর্তের জন্যেও ওর মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল না। নিজের মনে মনেই আঁকতে লাগল সেই কয়লা-খনির মজুরদের গাঁয়ের ছবি, সেই কুয়াসা, সেই ছোট্ট ছোট্ট আলো আর সেই ভিড়ের ভিতরে—মাদো। জীবনে এমনি আর একটিও মেয়ের দেখা পায়নি ভরোনভ! কেন যে সের্গেইর মনপ্রাণ সব সময়েই ওর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকত সেটা সহজেই বোঝা যায়। সব কিছুরই ভবিষ্যত দেখতে পাওয়ার একটা অদ্ভুত সহজাত ক্ষমতা ছিল সের্গেইর। বিয়াল্লিশ সালের জুলাই মাসে সবাই যখন আশা করছিল যে মিত্রশক্তি সৈন্য নামাবে, ক্লান্ত কণ্ঠে মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল সের্গেই:

ওরা আমাদের পছন্দ করে না। কেন অত তাড়াতাড়ি নামাতে যাবে?

পারীতে এক শিল্পপতির কন্যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। মেয়েটি নিজে থেকেই পরে ভরোনভের কাছে বলেছিল যে সেই সব দিনে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ধরনের ছিল। কিন্তু সের্গেই মুহূর্তেই বুঝে নিয়েছিল ওর মনটা ছিল কি রকমের।

চিঠিটা অতীতের অনেক স্মৃতি মন্থন করে বিভিন্ন রকমের ভাবাবেগ জাগিয়ে তুলল ভরোনভের অন্তরে।

ভরোনভের সেই কথাটা প্রায়ই স্মরণ করত সের্গেই:

যখন আমরা ফিরে আসব নিশ্চয়ই আমরা পুলটা তৈরি করব। কিন্তু এখানে নয়, তিনশো মিটার ভাঁটিতে গিয়ে। সেটা বলেছিল শুলেপভের সেই রিপোর্ট করার মাত্র ক'দিন আগে:

লেফটেন্যাণ্ট ভরোনভকে আমরা হারিয়েছি।

সের্গেই-ই মারা গেল। কিন্তু উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ফিরে এল ভরোনভ লেনিনগ্রাদে। আকুল আশা বুকে নিয়ে স্টেশন থেকেই ছুটে এল ভরোনভ কিরভস্কিতে—সেই চরম দুর্দিনেও নিনার সঙ্গে পুনর্মিলনের চিন্তা ওকে রেখেছিল সজীব করে। ওকে দেখে পাশের ফ্লাটের ভাড়াটে কেঁদে ফেলল:

বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসের সতেরো তারিখ—। নিজেই তো জানেন এখানে আমাদের জীবন কী দুর্বিসহই না হয়ে উঠেছিল। নিনা পাভলোভনা শরৎকালেই শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন—। আমি ভিতরে এলাম। ভাবলাম উনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু দেখলাম তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে না। আপনার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন—

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভরোনভ। একটি কথাও বেরোল না মুখ ফুটে, একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না। ছোট্ট কামরাটা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে

ওকে। মনে হচ্ছে জীবন নিঃশেষে নিঙড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওর ভিতর থেকে। এক্ষুনি পড়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর অন্তরের অসহনীয় জ্বালাযন্ত্রণার এনে দেবে সমাপ্তি। বহুদিন কেটে যাবার পরে ভরোনভ চিঠিটা পড়ল। নিনা লিখেছে:

প্রিয়তম আমার,

গ্রীষ্মকাল থেকে তোমার আর কোনো সংবাদ পাইনি। কিন্তু আমি জানি, সবাই ভালো আছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই, চাই তোমাকে নিবিড়ভাবে বুকের ভিতরে চেপে ধরতে। বলতে চাই তুমি বেঁচে থাক, সুখী হও, খু-উ-ব সুখী হও—এই হচ্ছে আমার ভালোবাসার নির্দেশ। যে ভালোবাসাটুকুই একমাত্র প্রাণময় হয়ে থাকবে আমার ভিতরে। যদি তখনো আমার প্রাণ থাকে—তুমিই আমার সেই প্রাণবায়ু। বিদায়, প্রাণ আমার!

ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল নিনার হাসি, তার ছোট্ট দুটি হাত। ভেঙে পড়ল ভরোনভ।

সের্গেইকে বলেছিল ভরোনভ পুলটা কোথায় তৈরি হবে। কিন্তু আজ ওর নিজের জীবনের সেতুই গেছে মুছে। অতীতের স্মৃতি ঘন কুঁয়াশার মত ঘিরে ফেলেছে ওকে—কোলোনের সেই গহ্বর যেখানে বন্দীরা মরেছে অনশনে, সেই মাইন, সেই লাঞ্ছনা, মৃত্যু, শূন্যতা—মিশকা নেই, নেই নিনা চতুর্দিকে অচেনা মুখ যাদের কাছে ও বলতে পারবে না, বলতে পারে না কী ওকে সহ্য করতে হয়েছে। মাদোর লেখা চিঠিটা পৌঁছে দেয়ার জন্যে ওকে যেতে হয়েছিল মস্কো। "সের্গেই নিহত হয়েছে"—নিনা গিওর্গিয়েভনা বলল ওকে। আর তাই ও জানতে পারল সের্গেইর মৃত্যুর খবর। গাছ কেটে পরিষ্কার-করা বনের ভিতরে আকস্মিকভাবে বেঁচে যাওয়া একটা গাছের মতই নিজেকে দেখতে পেল সে নিঃসঙ্গ, একা।

লেনিনগ্রাদে ওকে কাজ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ও চাইল সুদূর উত্তরে চলে যেতে। কেননা ওর মনে হল যে ও-সব অঞ্চলে বহু নূতন লোক এসেছে। ইতিমধ্যে তারা বসতি স্থাপন করে উঠতে পারেনি ভালো করে। তাদের ভিতরে হয়তো জীবন খানিকটা সহনশীল হয়ে উঠতে পারে।

ও জন্মেছে, শৈশব কাটিয়েছে দ্ভিনা নদীর তীরে। উত্তরাঞ্চলের যে ছবি আঁকা রয়েছে ওর মনে, সেটা হচ্ছে সাদা আর সবুজের মেশামিশি। এক দিকে প্রশান্ত বিস্তীর্ণ নদী অন্য দিকে বন আর বন। কিন্তু ও দেখতে পেল এক আলাদা উত্তর খণ্ড—কালো অশান্ত। বহুক্ষণ ধরে বিরাট পাহাড়টার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কে যেন ওকে বলল:

পাহাড়টার নামের উচ্চারণ কঠিন: কুকিসভুমশ্চর। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন নতুন জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া। ভরোনভ তৈরি করে সেতু, কারখানা, বাড়ি। মজুরেরা গড়ে তোলে বল মিল, সেপারেটর, ড্রামফিলটার। একবার শহরে যাওয়ার পথে দেখেছিল ভরোনভ বলগা হরিণের একটা দল। এখানকার সব কিছুই মনে হয় যেন অতি পুরানো, প্রাগৈতিহাসিক। কিন্তু তবুও সবকিছুই যেন অবিশ্বাস্য রকমের নতুন। দেশের সমস্ত অংশ থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে। তাদের ভিতরে রয়েছে ভরোনভের অঞ্চলেরও লোক।

রয়েছে ওরেলের, উক্রাইনের। মাসে মাসে শহরটা বড়ো হয়ে চলেছে। তবুও দেখে মনে হয় যেন একটা ইমারতের প্রদর্শনী—চুন, বালি, আর রঙের গন্ধে ভরা। সব কিছুই কাঁচা, তাজা। তবুও মানুষ প্রেমে পড়ে, সন্তান ধারণ করে, মরে। যদিও শহরটা ভরোনভের চাইতে বয়সে ছোট, তবুও ইতিমধ্যেই এ শহরের বনেদী বাসিন্দার সৃষ্টি হয়ে গেছে আর তাদের ছেলেপুলেরা বলে, আমরা এ দেশেরই মানুষ......। স্মৃতি নিয়ে সময় কাটাবার অবসর দেয় না ভরোনভকে তার কাজ। একটা শেষ হতে না হতেই শুরু করে দেয় আর একটা। কি তুষার-ঝড়ের ভিতরে, কি ঝাঁকে ঝাঁকে মশাভরা গরমের দিনের মেরুর নিকষ কালো রাতে ও চলেছে গড়ে। মন্ত্রীদপ্তরের অনুরোধে মস্কো যাওয়ার সময়ে খানিকক্ষণের জন্যে সময় করতে পেরেছিল মাত্র নিনা গিওর্গিয়েভনার সঙ্গে দেখা করার। নিদারুণ কর্মবহুলতার ভিতরে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে ভরোনভ আর তা-ই ওকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে ভেঙে পড়ার হাত থেকে।

শর্টহ্যান্ড-টাইপিস্ট লেনা কলোসোভার পাঁচ বছরের মুস্যার দারুণ অনুরক্ত হয়ে উঠল ভরোনভ। দু'জনকে যখন প্রথম এক সঙ্গে দেখে ভরোনভ, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে ওরা মা-মেয়ে। লেনাকে দেখতে আঠারো বছরের মেয়ের মত। যদিও ওর বয়স তখন উনত্রিশ। যুদ্ধের বছরগুলো কাটিয়েছে লেনা লেনিনগ্রাদে। কিরভ কারখানায় কাজ করতেন ওর স্বামী। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে মেয়েটির সবেমাত্র যখন এক বছর বয়েস তখন তিনি মারা যান। লেনা এত লাজুক যে কেউ ওর সঙ্গে কথা বললেই লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার মুস্যার সঙ্গে খেলে, তাকে খেলনা এনে দেয়, মিঠাই এনে দেয়, দেখে অবাক হয়ে যায় লেনা। শিশুদের সঙ্গে বেশ মিশে যায় ভরোনভ। ওর ভিতরে স্বভাবতঃই এতটা শিশুভাব রয়েছে যে ওকে চেষ্টা করে মিশতে হয় না ওদের সঙ্গে। হয়তো বা মুস্যাকে দেখে ওর মনে পড়ে যায় নিজের সন্তান মিশকার কথা। হয়তো বা ওর অন্তর চায় কাউকে স্নেহ করতে তাই ওদের ওখানে ওর যাতায়াত খুবই ঘনঘন হতে লাগল। একদিন লক্ষ্য করল ভরোনভ যে মুস্যার মাকে বড্ডো রুগ্ন দেখাচ্ছে। ও তাকে পাঠিয়ে দিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার দেখেশুনে রোগ নির্ণয় করলেন রক্তাল্পতা। আর নির্দেশ দিলেন পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রামের। ভরোনভের যত্ন লেনার উপরেও এসে বর্তাল। ভরোনভ এত চিন্তাশীল, এত বিবেচক, যে লেনা—জীবন যার প্রতি কোনোদিনই করুণা করেনি—একদিন হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ও চেষ্টা করল তাকে সান্ত্বনা দিতে, তারপর দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে গভীর আবেগভরা কণ্ঠে বলতে লাগল :

আমরা একসঙ্গে থাকব। দু'জনার পক্ষেই ভালো হবে সেটা। আর মুস্যাও খুশী হবে খুব।

সেদিনের পর এক বছর কেটে গেছে। লেনার দেহমনে এসেছে এমন পরিবর্তন যে তাকে আর চেনাই যায় না। আরো সুন্দরী হয়ে উঠেছে, আরো বিকশিত হয়ে উঠেছে ওর অন্তর। ওর ভিতরে যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে, পারে তর্কের সময়ে নিজের মতামত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে, পারে

হাসি-ঠাট্টায় অন্যকে জব্দ করতে তারই প্রমাণ দিতে লাগল। নিজেই অবাক হয়ে যায়, ভাবে:

তুমিই আমাকে জাগিয়ে তুলেছ, ঠিক যেন এক রূপকথার মত।

আবেগভরা উদ্দীপনায় পাগলের মত কাজ করে চলে ভরোনভ। পৃথিবীর এক প্রান্তে গজিয়ে-ওঠা এই জনবিরল শহরের সঙ্গে একাত্মবোধ করে নিজেকে। গোধূলি আর ঊষার আলোর রঙ মেশানো জোৎস্নাভরা রাতে যখন সবকিছুই গোলাপী দেখায়, ছায়াময় হয়ে ওঠে আর শীতের দিনে যখন সন্ধানী আলো, কারখানার লকলকে আগুনের শিখা আর রাস্তার উজ্জ্বল আলোর সারি মিলে অনন্তকালের অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দেয় ওর অন্তর এক বিস্ময়-ভরা আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। ঐ কঠিন বন্ধ্যা মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে আটকে যায় ভরোনভ. শিকড় নামিয়ে দেয় মাটির তলায়। আর ভেবে মজা লাগে যে আজ সে-ও একজন এখানকার "মাটির মানুষ"। বাড়ি তৈরির কাজ কিভাবে এগিয়ে চলেছে, নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হবে কি না, শুধু মাত্র এইটুকুর ভিতরেই ওর ভাবনা-চিন্তা এখন আর সীমাবদ্ধ নয়। গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে আপাটাইট শিল্পের বিকাশের ধারা, সবজী খেতের মজুরদের কঠোর পরিশ্রম, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সংগঠনের কাজ, রাস্তাঘাট নির্মান আর শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা।

এ কথা একটিবারের জন্যেও মনে পড়ে না ওর যে মাত্র চার বছর হল ও এসেছে এখানে, আর মিউশ্যা ওর নিজের মেয়ে নয়। কেউ যদি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয় দারুণ বিরক্ত হয়ে ওঠে মনে মনে। যেমন বিরক্ত হয়ে ওঠে লেনা যখন ভাবে যে ও তাকে বিয়ে করেছে নিছক দুঃখ আর নিঃসঙ্গতার জন্যে। এখন ওর অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে মিউশেঙ্কা ওদের নিজেদেরই মেয়ে। এই শহরেই থেকে, শহরটার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন বড়ো হয়ে উঠবে।

শুধু মাদোর চিঠি ওকে মনে পড়িয়ে দেয় অতীতের স্মৃতি-কথা। লেখে সে খুবই কম। কিন্তু যখন তার চিঠি আসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে খিল এঁটে অতীত স্মৃতির ঘনারণ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। ভাবতে থাকে নিনার মৃত্যু, মিশকাকে হারানোর ব্যথা, সের্গেইর শেষ পরিণতি, কোলোন বন্দীশিবির আর মাকুইর কথা। তেমনি একটি মুহূর্তে: বক্তৃতা তৈরি করার পরিবর্তে ও বিভোর হয়ে ভাবতে লাগল মাদোর কথা।

ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল লিমঁসি বন: বসন্তকাল। ফুলে ফুলময়। তারই ভিতরে রয়েছে ওর চেনা বাটার-কাপ, ডগ-ডেইজি আর ব্লুবেল। রয়েছে আরো কত ফুল যা ও কোনোদিন দেখেনি জীবনে আর নামও শোনেনি কোনো-দিন। সেই পাঁচই জুন। জীবনে কোনোদিনই ভুলবে না সেই রাত্রির কথা। ওরা একটা সাঁকো উড়িয়ে দিল। কিন্তু মিকি আর ফিরে এল না। খোলা জায়গায় "ফ্রান্স"-এর সঙ্গে বসেছিল। তার কাছে গল্প করছিল বিয়াল্লিশ সালের গ্রীষ্মের কথা। সের্গেইর নাম করতেই সে এমন আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল যে দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর বহুদিন পরে বুঝতে পারল—হয়তো বা আদৌ বোঝে নি সবকিছু—কত গভীর ছিল ওদের ভালোবাসা, ছিল কত

ক্ষণস্থায়ী—। চলে গেছে সেগেই আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই গেছে ভেঙে। তবুও ওর মনে হয় এমন গভীরতম ভালোবাসা জীবনে আর কোনোদিনও দেখেনি ভরোনভ। কী সৌভাগ্য, মাদো এখনো বেঁচে রয়েছে। অন্যের ভিতরে সঞ্চারিত করতে পারছে সেই সব দিনগুলোর তীব্র আবেগভরা অনুভূতি। বলতে পারছে সদা হাসি-খুশি মিকির মৃত্যুর ইতিবৃত্ত। যে না-কি সেই সন্ধ্যেই গেয়েছিল:

আমরা ভালোবাসি জীবন
তুমি আর আমি,
কিন্তু হায়,
ভোরের প্রথম মোরগ ডেকে ওঠার আগেই
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব আমরা......

চমকে উঠল ভরোনভ। লেনা এসে ঢুকেছে ঘরে।

নিকোলাই, ওরা ফোন করেছে। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে থিয়েটারে।

ওকে এত ভালো করে চেনে বলেই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল লেনা যে ও এখন ওর সেই অন্য আগেকার জীবনের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে রয়েছে। আর একটি কথাও বলল না লেনা। বিরাট অবিন্যস্ত দেহটা টেনে তুলে উঠে দাঁড়াল ভরোনভ। এলোমেলো ঘন চুলে ভরা মাথাটা নাড়তে নাড়তে লেনাকে বুকে টেনে নিল একান্ত সন্তর্পণে—ভয়ে ভয়ে পাছে সে ওকে পিষে ফেলে।

রঙ্গমঞ্চে দারুণ ভিড়। একটা নোটবই খুলে একঘেয়ে বেসুরো গলায় রিপোর্ট পড়ে চলেছে রুদনিকভ:

সাম্রাজ্যবাদীরা আর ওয়াল স্ট্রিটের হাঙ্গারগুলো তাদের হিসেবে ভুল করে বসে আছে।......সহস্র কোটি নরনারীর অন্তরের কামনাকে রূপায়িত করে সাতষট্টিটি দেশের প্রতিনিধিরা তুলেছে তাদের সবল আওয়াজ......। চার্চিল আর মার্শালেরা চাইছে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে—

প্রথম প্রথম শ্রোতারা শুনছিল মন দিয়ে। কিন্তু ক্রমেই তাদের চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরে উঠতে লাগল। সবাই নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে যেতে লাগল। রুদনিকভের বক্তৃতা শেষ হতেই সবাই যেন বেঁচে উঠল হাঁপ ছেড়ে। হাততালি দিয়ে উঠল। সভাপতি ঘোষণা করলেন:

পরবর্তী বক্তা চিফ ইঞ্জিনিয়র কমরেড ভরোনভ।

মঞ্চের উপরে উঠে এল ভরোনভ। মনটা দমে যাচ্ছে, কি যে বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। এমনকি কোনো পরিকল্পনাও নেই মাথায়।

শান্তির সংগ্রাম সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই আপনাদের কাছে। কিন্তু তার আগে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। নইলে বোঝার দিক থেকে সেটা মোটেই সহজ হয়ে উঠবে না। আহত অবস্থায় মোর্চার পিছন দিক থেকে ফ্যাসিস্তরা আমাকে তুলে নিয়েছিল। আমার সঙ্গীরা আমাকে মৃত মনে করে সঙ্গের সমস্ত দলিল-পত্র নিয়ে যায়। কোলোন শহরে ওরা আমাদের ওপরে অত্যাচার করে চলে—তৃষ্ণায় শুকিয়ে রেখে মেরে ফেলতে চাইল। রেখে দিল এক

কলসি জল কিন্তু যে-ই জলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল তাকেই মারছিল গুলি করে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম সাতশো জন কিন্তু বিশ জনার বেশি বেঁচে রইলাম না। আমাকে পাঠিয়ে দিল ফ্রান্সে আর জবরদস্তি করে একটা খনিতে কাজে লাগিয়ে দিল। একটা ফ্যাসিস্তকে খুন করে আমি পালিয়ে গেলাম। এক কৃষকের বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে বললাম: "আমি রুশ।" সে বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে প্রতিরোধ বাহিনীর যোগাযোগ ছিল। তাদের দলে গিয়ে যোগ দিলাম। কমরেড, যারা আজ শান্তির সংগ্রামে যোগ দিয়ে লড়ে চলেছে তাদের আমি চিনি। এই মাত্র এক ফরাসী মহিলার কাছ থেকে আমি একখানা চিঠি পেয়েছি। আমাদের বাহিনীতে ওকে ডাকত সবাই "ফ্রান্স" নামে। বন্দীশালা ভেঙে ওকে মুক্ত করে আনার আক্রমণে আমিও অংশগ্রহণ করেছিলাম।......গেস্তাপোরা অত্যাচার করেছে ওর উপরে কিন্তু একটি কথাও বের করতে পারেনি ওর মুখ থেকে......আমি বলতে চাই, সেদিন ফ্রান্সে মুখ খুলে কথা বলার মত সাহস ছিল না সবার। কিন্তু শুধু কমিউনিস্টরাই বলত জোর গলায়। আর যখন গেস্তাপোরা অত্যাচার করত তাদের উপরে তখনই মাত্র তারা নীরব হয়ে থাকত। মাদো, ওটাই হচ্ছে ওর সত্যিকারের নাম। আমাদের প্রত্যেকটি আক্রমণে ও থাকত আমাদের সঙ্গে। বহু ঘুরে, বহু দিন পরে ওর চিঠিটা এসে পৌঁছেছে আমার কাছে। যখন খনি-মজুরদের ধর্মঘট চলছিল চিঠিটা লিখেছিল তখন। পার্টি ওকে পাঠিয়েছিল শিশুদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনতে। ও লিখেছে, এ যেন ঠিক যুদ্ধেরই মত। ওরা গুলি চালিয়ে চলেছে। এমন কি ট্যাঙ্ক পর্যন্ত এনে হাজির করেছে। কিন্তু খনি-শ্রমিকেরা চলেছে প্রতিরোধ করে। আমি জানি এই সভা-ঘরে বহু খনি-মজুর রয়েছেন। আমি বলতে চাই তাঁদের কাছে যে ফরাসীদেশে তাদের প্রচুর প্রকৃত বন্ধু রয়েছে। আর সে সব বন্ধুরা জানে কেমন করে আমরণ-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। আমাদের দলে ছিল একজন বুড়ো আঙুর-চাষী। তিনি আহত হলেন। মরার আগে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন স্তালিনকে জানিয়ে দেই যে বুড়ো দেশিয়ে তার আঙুর-ক্ষেত ছেড়ে যোগ দিয়েছিল প্রতি-রোধ বাহিনীতে। আর স্তালিনকে জানিয়ে গেছে অভিনন্দন। এ সব অসংবদ্ধ কথা বলার জন্যে আপনারা মাপ করুন আমাকে। এতে গভীরভাবে আমি এটা অনুভব করি যে......যখন ওরা স্তালিনকে অভিনন্দন জানায়, জানায় আমাদের সবাইকে। দেশিয়ে মরে গেছে, কিন্তু চার্লস বেঁচে রয়েছে। খনিমজুর আঁপ্রে ছিল এক অসম সাহসী লোক। খনি থেকে কতগুলো ডিনামাইট এনেছিল সে। পারী-বাসী গিভা—কাজ করত সে একটা কারখানায়—কেমন করে এদের সবার কথা বলব আমি আপনাদের কাছে? তাছাড়া শুধু ফরাসীরাই ছিল না। ছিল প্রাগের এক ঘড়ি-কারিগর। আমরা তাকে ডাকতাম 'চেক' বলে। যতদূর জানি সে এখন তার দেশ-ঘরে আছে। স্পেনের লোকও ছিল আমাদের মধ্যে। জোসে মারা গেল কিন্তু বেঁচে আছে মনোলো—বার্সিলোনার এক মোটর চালক। হয়তো আজ ফরাসী সরকার নিপীড়ন চালিয়ে চলেছে তার উপরে। কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য বলে জেনে রাখুন আপনারা যে সে কখনো মাথা নিচু করবে না...আমি ছিলাম সাধারণ একজন লেফটেন্যান্ট, কতটুকুই বা আর জানতাম? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই

ওরা বলে উঠল, "তুমি রুশ, বলে দাও আমাদের এখন কি করতে হবে।" আমাদের এই শহরটা বহু দূরে। এমন কি বিদেশী মানচিত্রে এত নিশানাটুকু পর্যন্ত নেই, কিন্তু ভেবে দেখুন, আজ সমস্ত দেশের দৃষ্টি আমাদের উপরে নিবদ্ধ। সবাই ভালোবাসে আমাদের, বিশ্বাস করে। এমনকি সেদিনেও ওরা সবাই জানত কে তাদের প্রকৃত বন্ধু আর কারা বন্ধুত্বের ভান করছে মাত্র। আপনারা কি ভাবেন ঐ ইংরেজ, ঐ আমেরিকানরা অস্ত্র-শস্ত্র যুগিয়েছিল প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে? কস্মিনকালেও না। মনে পড়ে, লাইমোজেস-এ জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পনের কথা। শহরটাকে মুক্ত করল প্রতিরোধ বাহিনী, কিন্তু আশমান থেকে নেমে এল হঠাৎ মিত্রশক্তির এক সামরিক প্রতিনিধি—একজন ইংরেজ মেজর। সে এসে বলল যে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে সুইস দূতাবাসে। আমাদের বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন একজন শিক্ষক। তাঁকে আমরা সবাই ডাকতাম দেদে বলে। তাঁর কাছে শুনেছি ইংরেজ মেজরটি কেমন করে নতি স্বীকার করেছিল এস. এস. বাহিনীর সামনে। দেদে বলেছিলেন: এদের নিয়ে প্রচুর বেগ পেতে হবে আমাদের। ওরা এখন আর জার্মানদের জন্যে ভীত নয়, ভয় পায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে।

আমি জানি মাদো আজ সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে শান্তির জন্যে। আর তেমনি করেই লড়ে চলেছে দেদে, খনি মজুর আঁকের, মানোলো আরও অনেকে। ইতালি, মেক্‌সিকো, গ্রীস, ভারত—সর্বত্র। ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের সময়ে যেমন আমরা ছিলাম তাদের সঙ্গে তেমনই আজও রয়েছি আমরা তাদের সঙ্গে। সেদিনেও এমন অনেকে ছিল যারা শুধু বসে বসে পায়তাড়া ভাঁজত আর অন্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়ত মরণের মুখে। আজ এই মুহূর্তে, এখান থেকে অনেক দূরে গ্রীসের কোনো এক স্থানে মানুষ মৃত্যুর মোকাবিলা করে চলেছে। একশো বীরপুরুষ লড়ছে নগ্ন পাহাড়ে......তাদের দৃষ্টি আমাদের এই শহরের উপরে নিবদ্ধ। এখানে আমরা শুরু করেছি এক বিরাট কর্মকান্ড। 'এ্যাপাটাইট' কথাটা একটা বিদঘুটে শব্দ, কিন্তু তার মানে "মাটির বুকে প্রাণ সঞ্চার করা"। আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে 'এ্যাপাটাইট' তৈরি করতে পারি তাহলে বিট ফলাতে পারব অঢেল। তার মানে সমস্ত শিশুরা চিনি খেতে পাবে। আর জীবনও মধুর হয়ে উঠবে...... প্রচুর এ্যাপাটাইট তৈরি করতে পারলে তুলো ফলবে প্রচুর, তার মানে মেয়েদের জন্যে হবে সুন্দর সুন্দর পোশাক, আমাদের দেশ আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী হয়ে উঠবে শান্তির শিবির। আজ আমরা সাহায্য করছি গ্রীকদের, সাহায্য করছি ফরাসী রমণী মাদোকে। যে সব খনি-মজুরদের সম্পর্কে লিখেছে মাদো তাদেরকে, আমেরিকার নিগ্রোদের আর চীনাদের। এ-কথা অবশ্যি ঠিক যে ওরা আমাদের নাম জানে না, জানে না যে এই পাহাড়টার নাম কুকিসভূমিশ্চর। এমন কি এটাও জানে না যে এই ধরনের একটা শহরের অস্তিত্ব পর্যন্ত আছে। কিন্তু তবুও তারা জানে যে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই আমরা শান্তির জন্যে সংগ্রাম করে চলেছি। আমাদের বহু লোক ফিরে আসেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তাদের আমরা স্মরণ করি। তাদের মায়েদের কাছে, সন্তানদের কাছে আমরা ঋণী। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এখন আমাদের যুদ্ধের

বিরুদ্ধেই জয়লাভ করতে হবে।

ইতিপূর্বে কোনোদিনই ভরোনভ তার অতীত জীবনের কথা বলেনি তার কোনো বন্ধুর কাছে। এমনকি লেনা পর্যন্ত অতি সামান্যই জানে তার বিগত যুদ্ধের দিনের জীবন-কথা। নিরন্তর যে কথা তার অন্তর কুরে খাচ্ছে, তাকে উদ্দীপিত করে তুলছে এই মুহূর্তে সে-কথা উচ্চকণ্ঠে বলে ফেলে কেমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ল। বহুক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চল হয়ে চুপ করে বসে রইল। তারপর সভা শেষ হতেই মঞ্চ থেকে নেমে এল। অন্যমনস্কভাবে হলঘরের চারদিকে তাকাতে লেনাকে দেখতে পেয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল:

চল বাড়ি যাই। মিউসেঙ্কা পথ চেয়ে বসে আছে—

বেরোবার পথে পাভলভ ওদের থামালেন। শহরের একজন গণ্যমান্য লোক। যৌবনে তিনিও লড়েছেন হানাদার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে। আর তাতে হারিয়েছেন একটি চোখ। ভরানভের হাতটা চেপে ধরলেন পাভলভ:

যখন আপনি ঐ ফরাসী মহিলার কাছে চিঠি লিখবেন, আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন তাঁকে। সমস্ত কমরেডরা বলেছেন আপনাকে। আর আমার নিজের তরফ থেকে এই ধরনের একটা বিশেষ অভিনন্দন বাণী পাঠিয়ে দিতে:

বৃদ্ধ স্বেচ্ছা-সৈনিক গালাকনন জাখারোভিচ পাভলভ আপনাকে তার অভিনন্দন জানাচ্ছে।—ঠিকই বুঝবেন তিনি।

তেতাল্লিশ

গ্রীষ্মের গরম এসে পড়ল। কিন্তু তবুও সাবল' রয়ে গেল মস্কোয়। নিজের কাছেই বারবার বলছে অবশ্য যে, না, আর থাকার কোনো মানে হয় না। যত দূর দেখা সম্ভব তা ও দেখে নিয়েছে। ওর স্ত্রী অপেক্ষা করে আছে ওর সঙ্গে ব্রিতানিতে যাবার জন্যে। তাছাড়া মেয়ের ছুটিও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কিসে যেন ওকে বাধা দিচ্ছে চলে যেতে। একটা দিন কাটাল সাবল' পাইওনিয়ারদের শিবিরে। ইয়াসন্যায়া পল্যানা থেকে ঘুরে এল। দেখে এল কিয়েভ। অতীতে ওর নিন্দুকেরা বলত ওকে অ্যাডভেঞ্চারার—কারণ দেশদেশান্তর ভ্রমণ, দমকা খেয়াল দুঃসাহসিক, এমনকি কখনো কখনো দারুণ বিপজ্জনক সব কাজে ভরা থাকত ওর জীবন। কিন্তু এখন ও এক অনাসক্ত ঔদাস্যের ভিতরে ডুবে গেছে। পারীতে ফিরে যাওয়াটা একটা ভীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে। রুশ-ভ্রমণে আসার আগে যাদের সঙ্গে নিজেকে এক মতাবলম্বী বলে মনে করত আবার সেই নিভেলের সঙ্গে হবে সাক্ষাৎ, আলাপ হবে বানালিয়ের-এর সঙ্গে, বেদিয়ের সঙ্গে। মেট্রোপোলের গুমোট ঘরটাই ওর মনে হল যেন জীবনের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার আশ্রয়স্থল। লিখতে শুরু করে দিল নিজের ছেলেবেলার কথা। ফেলে-আসা জীবনের দিকে পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখল এক বিভ্রান্তিভরা বিহ্বল-করা পথ। সে-পথের শুরুটাই ওর কাছে পরিষ্কার—সেই খেলাধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক, সেই বিস্ময়, প্রথম শৈশবের ব্যথাবেদনা। আর একখানা বই লেখার তাগিদ থেকেই যে ও লিখতে শুরু করল তা নয়, বরং লিখছিল এই জন্যেই যে স্মৃতির অতলে ডুবে গিয়ে ওর জীবনের সব প্রতিবন্ধক ও ভুলে থাকবে।

গরমে মুহ্যমান ধুলোয়-ভরা মস্কোর আশপাশে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘন্টার পর ঘন্টা পার্কে বসে কাটিয়ে দিতে লাগল বরফ খেয়ে। কয়েক জন রুশ ভদ্রলোককে খুঁজে পেল, আর কখনো বা লোকজনের সঙ্গে জুড়ে দিত আলাপ। অবশ্য তা প্রথম কয়েক সপ্তাহের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে নয়, ক্লেশ আর একাকীত্বের অসহনীয়তা থেকেই। এতদিনে ও বুঝতে পেরেছে যে রুশদের অন্তর বুঝে ওঠা ওর সাধ্যাতীত। গত ত্রিশ বছর ধরে ওরা জীবনযাপন করে এসেছে ইংরেজ বা ফরাসীদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। তাছাড়া ওদের রয়েছে নিজস্ব ভাবধারা, নিজস্ব আনন্দ-বেদনা। কাউকে কিছু প্রশ্ন করে না। বরং লোকে যখন ওর সঙ্গে আবহাওয়া নিয়ে, শিশুদের সম্পর্কে বা বিদেশে বাস করা যে কতখানি কষ্টকর ইত্যাদি মামুলি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে তখন খুশী হয়ে ওঠে মনে মনে। ওদের কথাবার্তার ভিতরে অনুভব করে সৌহার্দ্য। কখনো বা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এই অন্য জগতের কোনো কোনো লোকের প্রতি, আবার কখনো বা জেগে ওঠে এক ধরনের অনুকম্পায়।

একদিন ইজম্যালভ পার্কে সুদর্শন এক বেঁটেখাটো বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করছিল। বৃদ্ধ কথা বলছিলেন অল্পবিস্তর ফরাসী ভাষায়। তিনি বললেন

সাবল'কে যে বিপ্লবের আগে তিনি ছিলেন অমবভ-এ একজন আইন-ব্যবসায়ী। উপার্জন করতেন প্রচুর। আর উনিশশো বারো সনে তিনি গিয়েছিলেন নীসে। দেখেছেন কার্নিভাল। এখন বাস করছেন ছেলের সঙ্গে। ছেলে হচ্ছে একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ। সাবল' বুঝল যে তার সঙ্গীটির সোবিয়েত শাসন তেমন মনঃপূত নয়। ওর মনে হল যদি ওর প্রথম মস্কো আসার পরেই এ'র সঙ্গে দেখা হত তবে খুবই খুশী হয়ে উঠত। কারণ এই ধরনের লোকের কথাই ছিল নিভেলের মনে। যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বৃদ্ধ বলে উঠলেন:

বিপ্লব যখন এল, আমার বয়েস তখন বিয়াল্লিশ বছর। এ-বয়সে মানুষের পক্ষে বদলানো শক্ত। কিন্তু আমার ছেলের বয়েস ছিল তখন আঠারো বছর। বিয়ে করেছিলাম আমি অল্প বয়সে। ওর চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বলে, প্রচুর সুযোগ রয়েছে ওর কাজের। আর আমার নাতি-নাতনীরা তো ভাবে যে অন্য আর কোনো অবস্থায়ই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি যখন ওদের কাছে বলি বিপ্লবের আগে কিভাবে আমরা জীবন কাটাতাম, ওরা শুনে হাসে, নয়তো রেগে ওঠে। বড়োটি এই বসন্তে স্কুলের পড়া শেষ করল। সে তো সোজাসুজি বলেই দিল আমাকে:

বুঝলে দাদু, ও-সব কথা ভুলে যাও এখন।

আমার মনে হয় না যে আমি এখানে বাস করতে পারতাম।—ভ্রূ-কুঁচকে বলল সাবল'।

তার কারণ এই যে আপনি দেখছেন সব কিছু বাইরে থেকে।—প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললেন বৃদ্ধ,—এ-কথা বলব না যে আমিও চেয়েছিলাম এ-জিনিস। এ-বয়েসে আর মিথ্যে বলব কেন? বিপ্লবের আগে বেশ সচ্ছলভাবেই থাকতাম আমি। আমার মতো আরো অনেক লোকই ছিল। কিন্তু স্থির করল জনসাধারণ। কেউ কেউ পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে। তাদের দেখেছেন আপনি পারীতে। তারা বলল, তামবভ-এর একটা আইনজীবী আজ ককেশীয় কেবাব্‌দের গোলামি করছে। কিন্তু তবুও আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলাম না। যদি না আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে থাকে তো মনে আছে তোমারই এক দেশবাসী আর একটা বিপ্লবের সময়ে বলেছিলেন "বুটের সুখতলায় পুরে কেউ আর দেশটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।" জার্মানরা যখন মস্কোর উপর বোমা ফেলছিল আমি তখন ছাতের উপরে দাঁড়িয়ে 'আগুন-পাহারার' কাজ করতাম। সবাই বলল, আমার বয়েস অনেক বেশি। কিন্তু আমি জোর করলাম। তখন একটি মাত্র কামনাই ছিল আমার মনে—জার্মানদের বিতাড়িত করতে হবে। সে-দিন শুনলাম 'ভয়েস অব আমেরিকা।' একজন দেশত্যাগী বলছিল আমেরিকার ব্যবস্থা কতই না ভালো। ওখানে ওর আছে একটা সুন্দর ফ্লাট। তাছাড়া আমেরিকানরা চায় আমাদের সাহায্য করতে। এটা শুধু যে অসাধু তাই-ই নয় বেকুবি। যুদ্ধ কেমন করে মানুষের ভালো করতে পারে? আমাদের জন্যে মাথা ব্যথা করতে কেউ তো সাধেনি ওদের। ধরুন আপনি ফরাসী, ও-দেশেরই তো একজন, কি মনে করেন আপনি এ-সব সম্পর্কে?

আমি?—অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে জবাব দিল সাবল'।—এ-সব সম্পর্কে

আদৌ কিছু ভাবি না আমি—আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি। কেউ যদি বলে আমাকে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, মনে হয় তবে আমি আত্মহত্যা করতে পারি।

অনেকগুলো টেলিগ্রাম পেল সাবর্ল নিভেলের কাছ থেকে। কিন্তু একটারও জবাব দিল না। বৈদেশিক বিভাগের দপ্তর জানাল খোঁজখবর নিতে। বৃথাই ফোন করল দ্য শর্ম হোটেলে। একবারও এল না সাবর্ল ফোন ধরতে। শেষ চেষ্টা হিসেবে দ্য শর্ম নিজেই এল ওর হোটেলে। একটা টার্কিশ গাউন পরে ছোট ভাইয়ের মৃত্যুতে আট বছরের ছেলের মতো বসে লিখেছিল সাবর্ল তার স্মৃতিকথা। দ্য শর্মকে দেখেই ওর মুখখানা ঘিরে জমে উঠল মেঘ।

ভেবেছিলেন কি রুশরা আমাকে গ্রেপ্তার করেছে? দেখতেই তো পাচ্ছেন সব কিছুই ঠিক আছে। আমি লিখছি......

মৃদু তিরস্কার করল ওকে দ্য শর্ম। কেমন করে ও বন্ধু-বান্ধবদের এমনভাবে অবহেলা করে চলেছে। বিশেষত এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে? খুবই আঘাত পেয়েছেন মাদাম দ্য শর্ম। পারীতে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে.....

প্রতি সপ্তাহেই আমি আমার স্ত্রীর কাছে চিঠি দেই আর পাইও তাঁর কাছ থেকে।—বাধা দিয়ে বলে উঠল সাবর্ল।—গত কাল একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি—আমার স্ত্রী ঠিক করেছে যে আমার জন্যে আর অপেক্ষা করবেন না। মেয়েকে নিয়ে তিনি কুইমপার্লে রওনা হয়ে গেছেন। একটা ছোট্ট বাড়ি আছে আমাদের ওখানে। ওদিকে গেছেন কোনোদিন?

দ্য শর্ম বলল যে ব্রিতানির দক্ষিণ দিকটায় যায়নি সে কোনোদিন, কিন্তু অনেক প্রশংসা শুনেছে কুইমপার্লের। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে যে উদ্দেশ্যে এসেছে সে-কথা পাড়ল:

আমাদের উভয়েরই বন্ধু নিভেল আমাকে লিখেছে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যে, সংবাদ প্রতিষ্ঠান আপনার প্রবন্ধের জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিনা ভেবে নিভেলও চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

"আমাদের উভয়েরই বন্ধু" কথাটায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল সাবর্ল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করে প্রত্যুত্তর জানাল যে সে পারীতে ফিরে যাওয়ার আগে কিছুই লিখতে চায় না। আর তাছাড়া সম্ভবত শীঘ্রই ফিরে যাবে। কারণ ওর ইচ্ছে পরিজনের সঙ্গে থেকে কিছুদিন বিশ্রাম নেয়।

অনেক বার চেষ্টা করল দ্য শর্ম ওদের আলাপ-আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করার জন্যে। জিজ্ঞেস করল কি লিখছে, কেমন লাগল তলস্তয়ের বাড়িটা। বলল ফ্রান্সে জার্মান সমস্যাটা একটা দারুণ উদ্‌বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। গোমড়া মুখে চুপ করে রইল সাবর্ল।

সেদিন সন্ধ্যেয় সাংকেতিক ভাষায় তার করে জানাল দ্য শর্ম যে সাবর্ল দূতাবাসে আসা-যাওয়া করতে চায় না। তাছাড়া পোল কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করে না। স্মাইস-এর সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে ঝগড়া করেছে। ফলে স্মাইলস-এর স্থির ধারণা হয়েছে যে সাবর্ল বলশেভিক দলে যোগ দিতে মনস্থ করেছে আর মস্কোতেই থেকে যাবে। ওর ব্যক্তিগত ধারনা হিসেবে দ্য শর্ম আরো জুড়ে দিল যে যদিও স্মাইলস-এর কাছ

থেকে যে খবর পেয়েছে তার নির্ভুলতা সম্পর্কে ও স্থির নিশ্চিত নয়, তবুও সাবল' ওর মনে খুবই নিন্দনীয় ধারণার সৃষ্টি করেছে।

সংবাদ পেয়ে নিভেল এতটা হতাশ হয়ে পড়ল যে ও সংযম হারিয়ে মেরিকে গাল পেড়ে উঠল কটাচুলো বেশ্যা বলে। মনে মনে অনুভব করল সাবল'ই ওকে ডোবাবে। ওকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছেন সিনেটর আর ও নিজেই পাঠিয়েছে সাবল'কে মস্কোয়। এটাই হয়েছে মারাত্মক ভুল। বোকা বানাতেই পছন্দ করে সাবল'। আগেও আর একবার ফ্রাঙ্কোর ব্যাপার নিয়ে ওর কাগজের সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছিল। কিন্তু এর জন্যে দোষ সবচাইতে বেশি লোর। তার বোঝা উচিত ছিল যে রুশরা কিছু আর ধোয়া তুলসীপাতা নয়। যে লোক অতীতে ওদের আক্রমণ করেছিল তাকে কিছু আর ঢুকতে দেবে না ওদের দেশে। একমাত্র সাবল'কেই ও বলেছিল যাবার জন্যে। বলেছিল সাবল' যে রুশ-নীতি সম্পর্কে ও দারুণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে। আগে থেকে কে-ইবা বুঝতে পেরেছিল যে ওরা ওকে তাঁবে এনে ফেলবে? একজন বুঝদার মানুষকে এসব কথা বুঝিয়ে বলা যায়, কিন্তু ঐ কটাচুল বর্বরটাকে নয়। ভাবে গোটা দুনিয়াটাই তার ঐ মিসিসিপির মতো। স্মাইলসের দৃঢ় বিশ্বাস যে সাবল' রুশদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে। হয়তো সব কিছুই প্রকাশ করে দিতে পারে। আজ-কালকার ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে ওটা। ভাগ্য ভালো যে সাবল'র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিল ভাসাভাসাভাবে। কিন্তু এ কথাই-বা কে বলতে পারে যে দ্য শম' ভিতরের সব কিছু চাতুরীই না ফাঁস করে বসে আছে ওর কাছে? লো-র পরিকল্পনা যদি জানতেই পেরে থাকে সাবল', ট্রানসক ডুবল তা হলে। এ সময়ে কস্তার রয়েছে প্রাগে। গ্রেসন ওয়ারশতে। কম্যুনিস্টরা একটা মামলা রুজু করে দিতে পারে। নিভেল নিজে তাহলে একটা অপ্রীতিকর ভূমিকার ভিতরে গিয়ে পড়বে। কেউ কি আর মনে রাখবে যে এ সব ব্যাপারে ওর কোনো আকর্ষণ নেই, ও একজন কবি, যার কবিতা সম্পর্কে পল ভালেরির মতামত খুবই ভালো?

একটু মাথা ঠাণ্ডা হলে পরে নিভেল ঠিক করল যে আচমকা ফেঁসে পড়াটা খুবই খারাপ হয়ে উঠবে। সিনেটের কাছে রিপোর্ট পাঠাল যে রুশরা সাবল'কে কেনার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনো এক সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে যে তারা এখনো সফলকাম হয়নি। তবুও বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। তা সে যাই হোক যদিও সাবল' খুবই প্রতিভাবান সাংবাদিক, মানুষ হিসেবে তার কতগুলো দুর্বলতা আছে। টাকা-কড়ি সম্পর্কে সে তেমন উদাসীন নয়। সব কিছুই ঘটতে পারে।

রেগে আগুন হয়ে উঠল লো। গালিগালাজ করল সাবল'কে, তার জামাইকে আর সমস্ত ফরাসীদের:

ভাড়াটের দল! মার্শাল কিছুতেই তাকে আর বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে এই বেতমীজ জাতটাকে সাহায্য করে ঠিকই করেছেন। গুলি করে মারা উচিত নিভেলকে। আদৌ কোনো কর্মের নয়। টাকা পাঠাবে সে মেরিকে। যদি তার ইচ্ছে হয় তো রাখতে পারে নিভেলকে। নিভেলও বোধহয় খুশীই হবে তাতে —কারণ প্রত্যেক ফরাসীরই সবচাইতে বড়ো কামনা হচ্ছে কোনো মেয়েমানুষের

ভেড়ুয়া হয়ে থাকার। সে যাহোক এখনকার মতো থাকতে হবে নিভেলকে ওখানেই—যে জট পাকিয়েছে তা খুলতে হবে ওকেই। চিঠির জবাব লেখাল:

তোমার চিঠি পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠেছি তোমার নির্বুদ্ধিতায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও তোমার আচরণ তোমার কবিতা লেখার মতোই। কিন্তু যাক সে সব অন্য সময়ে আলোচনা করা যাবে। দেখো, রুশরা সাবলঁকে কত টাকা দিতে চেয়েছে সেটার হদিস করতে পার কি না। সেই পরিমাণ টাকাই ওকে দেবে বলে জানাও। এমন কি শতকরা দশ বা বিশ টাকা বেশিও বলতে পার। আর তুমি যেটা আশঙ্কা করছ সেটার সম্পর্কে যদি স্থির-নিশ্চিত হও, তবে সঙ্গে সঙ্গে ওকে বদনাম ছড়িয়ে খতম করে দাও। জড়িয়ে ফেলার মতো দলিল-পত্র সংগ্রহ করতে শুরু করে দাও। যদি তোমার পক্ষে সেটা সম্ভব না হয় তবে প্রাগ থেকে বিল কস্টারকে আনিয়ে নাও। খরচের জন্যে এত-টুকুও কুণ্ঠিত হবে না। সমস্ত দুনিয়া জানুক যে লোকটা কি নীচস্তরের ঘৃণ্য জীব।—তারপর একটু ভেবে আরো জুড়ে দিল লো: আপাতত কাউকে বিশ্বেস করে কিছু ভেঙেগা না। এমন কি বিলকেও না। নিজেই মাল-মশলা যোগাড় করতে শুরু করে দাও আর সাবধানে এগিয়ে চল। ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে একটা প্রবন্ধ তৈরি করে রাখ—জ্বালাময়ী প্রবন্ধ। সংবাদটা অসমর্থিত এটা আশা করে এক্ষুনি কিছু বলো না, বলে রাখছি তোমাকে। আমি প্রার্থনা করি তাই-ই যেন হয় আর সত্যের জয় অনিবার্য এরই উপরে যেন আস্থা রাখতে পারি।

লোর চিঠি পড়ে না হেসে থাকতে পারল না নিভেল এই ভেবে যে সেনেটর কিনা সাবলঁর আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করছে। যাইহোক মোটকথা ব্যাপারটা আদৌ হাসির ব্যাপার নয়। চিঠির ভিতর দিয়েই দেখা যাচ্ছে যে সিনেটর রাগে ফুটছে টগবগ করে। বিপদ ঘনায়মান।

যতদূর সম্ভব কস্তারের অনুকরণে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলল নিভেল। স্মাইলস-এর কথা যদি সঠিক প্রমাণিত হয় তবে সংবাদপ্রতিষ্ঠান থেকে ওটা প্রচার করা হবে। অবশ্য এটা ঠিক যে ওটা নিভেলের স্বনামে ছাড়া হবে না। মোটেই ওর নিজের ধরনের নয় ওটা। প্রবন্ধে বলা হল সাবলঁ যাকে অনেকে খুব সৎ লোক বলে জানে আসলে সে হচ্ছে একটি অর্থ-গৃধ্নু লোক। পয়সা পেলে সে তার নিজের পরিবারকেও পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে পারে। ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্যে স্পেনের সন্ত্রাসবাদীরা ভেলাসকোয়েৎস-এর আঁকা দুখানা ছবি দেয় ওকে। আর সে দুটো কোনো এক দালাল-প্রতিষ্ঠান মারফত বিক্রি করে দেয় ব্রাজিলের কাছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে সাবলঁ ছিল লা পাত্রি বাহিনীতে। আর তলে তলে খবর দিত গেস্তাপোদলের কাছে। তার জন্যে জার্মানেরা ওর হিসেবে মাসে মাসে ছ' হাজার করে সুইজ ফ্রাঁ জমা দিত জেনেভায়।

শেষের প্যারাটা এমনি:

এই জুডাস যে ক্রেমলিনের দেয়া ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার লোভ সামলাতে পারেনি তা শুনে কেউই বিস্মিত হবে না। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে মস্কোয় ওর মতো লোকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে তাতেই ওয়াশিংটনের পরাক্রম-নীতি যে ফলপ্রসূ হচ্ছে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যার কণামাত্রও সুনাম আছে সে কখনো

'লাল'দের সাহায্য করবে না। ওরা পেতে পারে শুধু এই ধরনের ভাগ্যান্বেষীদের —যাদের কথায় এমন কি ডেইলী ওয়ার্কার, লুমানিতে ও উনিতার নির্বোধ পাঠকেরাও তেমন আমল দেবে না।

সাবলঁ তখনো মস্কোয়। একটানা অবিশ্রাম বর্ষা শুরু হয়ে গেল। ক্বচিৎ বাইরে যায় সাবলঁ। লেখার তাগিদ অনুভব করে না আদৌ। কেমন করে সময় কাটাবে জানে না। স্ত্রীর চিঠিতে জানল ব্রিতানি এই সময়টা খুবই মনোরম হয়ে উঠেছে। মাদোলি'য়ে প্রায়ই যায় সমুদ্রতীরে। স্নান করে সমুদ্রে, টেনিস খেলে। ইতিমধ্যেই রোদে-পোড়া চেহারা হয়ে উঠেছে ওর। আর বাবার আসার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বাগানে ফুটেছে ওর প্রিয় অ্যানিমান। পরিচিত কেউ নেই ওদের ওখানে। শুধু গের্ভাইস নামে জেলে আসে ওদের খোঁজখবর নিতে, জিজ্ঞেস করে কখন সে আসবে. ওকে নিয়ে যাবে সে গলদা চিংড়ি ধরতে। চিঠি পড়ে সাবলঁ তার দো-ভাষীকে ফোন করল:

দয়া করে দেখুন তো প্রাগের প্লেন কখন ছাড়বে। যত শিগগির সম্ভব আমি চলে যেতে চাই।

এত তাড়াতাড়ির কি?—দ্বিতীয়বার ভেবে নিয়ে নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করল সাবলঁ। আবারও হয়তো চলে যাওয়াটা বাতিল করে দিত যদি না ওর মনে হত যে দো-ভাষীর চোখে নিজেকে বেকুব প্রতিপন্ন করা হবে তা হলে। ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে আর একটা দিন অপেক্ষা করল। হাসপাতালে ফোন করল, ক্রিলভ বললেন:

ঠিক আছে। কাল আসুন তিনটায়।

কেমন যেন মন-মরা মন-মরা ভাব ক্রিলভের। ওঁর পক্ষে এটা অস্বাভাবিক। অবশ্য অনেক কারণও ছিল। আগেকার দিন পার্টি মিটিংয়ে কুলাগিন অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছিল ডাঃ জ্ভিবেলকে। অবশ্য এ-কথা সত্যি যে চারমিসভ তাকে ঠান্ডা করে দিয়েছিল। তবুও ব্যাপারটা একটা বিশ্রী রেখাপাত করে যায় ওঁর মনে। তার উপরে ওর তিনটি ছেলেপুলে সুদ্ধ একটি রোগীর জন্যে একটি ঘরের ব্যবস্থা করে দেয়ার ওঁর অনুরোধ এইমাত্র প্রত্যাখ্যাত হয়েছে গৃহ-বিভাগ থেকে। নাতাশা লিখে জানিয়েছে যে সে ক্রিমিয়ায় যাবার ব্যবস্থা করছে। ওখানে এসে ভাস্যা মিলবে ওদের সঙ্গে। ক্রিলভের ইচ্ছে ছিল ছুটির দিন কটা কাটাবে নাতিটির সঙ্গে। কিন্তু ঠিক করলেন ক্রিমিয়ায় যাবেন না। কেন তরুণদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন? রাত্রে হৃদ-রোগের আক্রমণ হয়েছিল। মনে ভয় হয়েছিল, বুঝি আর উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। সকালে উঠে অবশ্য কাজে গিয়েছিলেন। যদিও পা দুটো তখনো ছিল অসাড়। অতি কষ্টেই রাউন্ড দিয়েছিলেন ওয়ার্ডে। ভেবে রাগ হচ্ছিল যে, তার অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। নাইট্রো গ্লিসারিনে সব সময়ে এখন আর তেমন কাজ দেয় না। তাছাড়া কেউ আর ওকে আর একটা তাজা হৃদপিন্ডও গড়ে দিতে পারবে না।

সাবলঁ যখন এসে ওঁর অফিসে ঢুকল, মুখে অবশ্য হাসি ফুটিয়ে তুললেন ক্রিলভ। কারুর সামনে তো আর নিজেকে ধরা দেয়া যায় না।

আপনাকে তো তেমন ভালো দেখা যাচ্ছে না,—ফরাসী ভদ্রলোকের মুখের দিকে

তাকিয়ে একটু দেখে নিয়ে বললেন, অসুখ করেছে নাকি আপনার? তাহলে তো আপনাকে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। বোধহয় একটা দিনও ছুটি উপভোগ করেননি। গরমের দিনে মস্কো খুবই ক্লান্তিকর। এখনো প্রচুর গাছপালা, বাগান ইত্যাদির অভাব রয়েছে।

কাল আমি চলে যাচ্ছি, তাই এসেছি বিদায় নিতে। ব্রিতানিতে আমার স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে গিয়ে থাকব বলে যাচ্ছি।

ভালো! ওখানকার হাওয়া-বাতাস খুবই চমৎকার নিশ্চয়ই। সমুদ্র, বলতে গেলে ওজনই। বেশ, কিন্তু কেমন কাটালেন এখানে? এখানকার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পেলেন তো?

সত্যি কথা বলতে কি, খুবই খারাপ কেটেছে আমার। অনেক কিছুই হারালাম এখানে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকালেন ক্লিলভ:

কি হারালেন? আপনার প্রতিষ্ঠান নয়তো?

নিজেকে।

মুখ-ফসকে কথাটা বেরিয়ে পড়তেই অনুশোচনা হল সাবল্'র: হয়তো ক্লিলভ হাসবেন। কিন্তু হাসলেন না ক্লিলভ।

আমার মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা। ছেলেবেলায় আমাকে তিনি যীশুর বাণী পড়ে শোনাতেন। একটা খুব সুন্দর চিত্রকল্প আছে তাতে: গমের ছড়া মরে যায় ফল দিতে। হয়তো আপনার বেলাতেও ঠিক তাই। আমি একটু কঠিন ধাতের মানুষ, কিন্তু বহুদিন হল, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমারও একবার অমনি ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল। আমি মরতে চেয়েছিলাম—

কে বাঁচাল আপনাকে?

মানুষ—একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল। সে নিয়ে গেল আমাকে তার একজন কমরেডের কাছে। সেখানে প্রায় জনাদশেক লোক ছিল। তখন পর্যন্ত শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবতাম আমি। কোথায় সত্য? যদি মরে যাও আর মরতে একদিন বাধ্য, তার ভিতরে কোনো কিছুই নেই তাছাড়া এমনিই—সমস্ত ব্যাপারটাই তোমার জানা। কিন্তু ওখানেই আমি দেখতে পেলাম মানুষ যারা নিজের কথা ভাবে না। তখনই বুঝলাম যে আমি খুঁজে পেয়েছি।

কি খুঁজে পেলেন!

খুঁজে পেলাম মানুষ। পেলাম নিজেকে। আজকের দিনে মানুষের আয়ু বাড়াবার ব্যাপার নিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ খুবই ব্যস্ত। স্বভাবতই ওটা খুবই দরকারী। কিন্তু যত দীর্ঘ দিনই মানুষ বাঁচুক না কেন, মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে তার মন সচেতন থাকে, আর তাতেই সব কিছুই বিকৃত করে ফেলতে পারে। তবুও জীবনের অবিনশ্বরতা থেকে যায়।

আপনার মা হয়তো সেটাই বিশ্বাস করতেন।

না, তাঁর কাছে এটা ছিল নিছক একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। আর আমি জানি। অবিনশ্বরতা রয়েছে মানুষের ভিতরে, রয়েছে জীবনে তার পরিপূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে। রয়েছে একের চিন্তাধারা আর একজনার বহন করে নিয়ে যাওয়ার ভিতরে।

বংশানুক্রমিকতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে। কিছুদিন আগে আমি পড়ছিলাম হেরাক্লিটাস সম্পর্কে। এক অদ্ভুত অপূর্ব ব্যক্তিত্ব! তার কাজ আর আজকের দিনে আমরা যা কিছুই করছি তার ভিতরে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়ে গেছে। তবুও কিনা কমপক্ষে পঁচিশটা শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

একটু হেসে উঠল সাবল:

শেখভের স্মৃতিকথায় গর্কি লিখেছেন কেমন করে তিনি একদিন তাঁকে দেখেছিলেন বেঞ্চের উপরে বসে টুপির ভিতরে সূর্যের কিরণ-রেখা ধরার চেষ্টা করতে। ওটা মানুষোচিত। আমরা সবাই করে থাকি—। কিন্তু আপনি ভাগ্যবান, কারণ আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার সূর্যের কিরণ-রেখা মুঠোর ভিতরে পেয়ে গেছেন। দুনিয়ায় একটি মাত্র সত্যই আছে আপনার কাছে। এই-মাত্র হেরাক্লিটাসের উদাহরণের উল্লেখেও আপনি আপনার মূল নীতিতেই অবিচল রয়ে গেছেন, পিরোর কাছে নয়। কিন্তু ধরুন যেমন আমি, আমি মনে করি প্রত্যেক মানুষেরই আছে একটা নিজস্ব সত্য।

আমাকে গোঁড়া বলে ভুল বুঝবেন না। আহরিত জ্ঞানের একটা যোগফল আছে। এটা যে শুধু সংযোজিত হয়ে বেড়ে যাচ্ছে তাই-ই নয় নতুনও হচ্ছে। কোনো এক পাভলভ বা আইনস্টাইন আসেন, তখন সবাই দেখতে পায় যে কতগুলি স্থির-সিদ্ধান্ত ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-বিজ্ঞানের বেলায়ও এটা খাটে। আমি যদি মনে করি ধনতন্ত্রবাদের চাইতে সমাজতন্ত্রবাদ ঢের বেশি যুক্তিসঙ্গত, তার মানে এ নয় যে সমাজতন্ত্রবাদই আমার কাছে চূড়ান্ত পাওয়া।

কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করতে পারবেন না যে আপনার আদর্শ হচ্ছে এমন একটা সমাজব্যবস্থার যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের অনুভূতি হবে একই রকমের, চিন্তা করবে একই ভাবে?

মোটেই তা নয়! কিন্তু দুঃখের কথা এই যে ছমাস এখানে বাস করার পরও আপনি এই ধরনের বাজে কথা বলছেন। আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্ত করা যাতে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব ধরনে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। হাসছেন আপনি? বলুন তো একবারও ভেবে দেখেছেন কি, কিসের জন্যে আমরা নিজেদের উপরে এতটা বিধি-নিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছি? আপনাদের জন্যে! অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা বলছি না, কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানের ঐ কর্তারা—বস্তুতপক্ষে যে কেউই চান যে আমরা যা কিছু অর্জন করেছি তা বিসর্জন দেই। মনে আছে সেবার আপনি যে মেয়েটি আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে বলে স্বীকার করতে চায়নি বলে তার সমালোচনা করেছিলেন। কেন সে ওভাবে বলেছিল তখন সে-কথা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম। হয়তো প্রকৃতপক্ষেই সে অমনিই ভাবে। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে আমরা এ-ধরনের গোড়ামির অনুশীলন করিয়ে থাকি। কারণ এই যে আপনারা বাধ্য করেন তাকে এইভাবে ভাবতে। গত বত্রিশ বছর ধরে আপনারা আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে আসছেন কি করে আমাদের ছুরি মারা যায় তারই পায়তারা ভেজে ভেজে। আর তারপর এসে বলেন কিনা কেন আমরা, ঐ যাকে বলে সূক্ষ্ম রুচিবোধ, গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করি না। আপনার মুখেই শুনেছি যে আপনি প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতরে ছিলেন।

বোধহয় সেখানে কিছু আর বৈঠকি, খেলার মজলিশে ব্যস্ত ছিলেন না। ভালো কথা, ধরুন একজন সুইস এসে জিজ্ঞেস করল আপনার কাছে:

কেন আপনি ফ্রান্সকে, স্বাধীনতাকে, মানবিক মর্যাদাবোধকে রক্ষা করার জন্যে লড়ছেন? প্রথমত ব্যাপারটা আদিম, দ্বিতীয়ত ওটা বিতর্কমূলক আর তৃতীয়ত ওটা হচ্ছে চূড়ান্ত অহমিকা। তার চাইতে বনে চলে যান, সেখানে গিয়ে অন্তরাবেগের রূপান্তর বিশ্লেষণ করুন গে।—আমি শুনতে চাই কি জবাব দেবেন আপনি তাকে?

সাবলং উঠে দাঁড়াল, ভারাক্রান্ত, চিন্তিত।

আপনি আমাকে রোগমুক্ত করতে পারেন নি। কিন্তু তবুও এ-সব কিছুর জন্যেই আপনাকে ধন্যবাদ।

আমি তো চাইনি আপনাকে রোগমুক্ত করতে। জীবনই আপনাকে রোগমুক্ত করতে পারে, সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। তাহলে কালকেই যাচ্ছেন আপনি প্লেনে। পারীতে কোনোদিন যাইনি আমি। যেটুকু জানি তা পুঁথিগত। শহরটা নিশ্চয়ই খুবই চমৎকার। বেলিনস্কি একবার বলেছিলেন যে পারীর মানুষ মানুষের মনের দুঃখ পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে, তাদের অন্তরের আনন্দোচ্ছলতা এত বেশি। ভালো, আপনার যাত্রা শুভ হোক। কিন্তু আপনার ঐ প্রতিষ্ঠানটা—বরং ছেড়েই দিন ওটা—দেখবেন মনটা খুবই হালকা, খুবই সহজ হয়ে গেছে।

ভালোই হল যে চলে যাচ্ছি,—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ভাবল সাবলং।—এখানকার এঁরা এমন দৃঢ়বিশ্বাসী যে ওটা সত্যিই সংক্রামক। কিছুতেই আমি কমিউনিস্ট হব না। হয়তো ওরাই ঠিক, কিন্তু তবুও তা আমার জন্যে নয়। ওরা বলে, মিচুরিন পদ্ধতিতে ওরা কলম বাঁধার পরীক্ষা করে দেখেছে, —চেরী গাছের উপরে অন্য একটা বাজে গাছ, বাবলা বা অন্য কোনো গাছও হতে পারে, মনে নেই। কিন্তু সে যা-ই কিছু হোক না কেন, যে ফল ফলল সেটা বিষ-ফল। আমার বেলায়ও হবে তাই। এই বেলা আমার চলে যাওয়াই দরকার।

দ্য শমংকে বিমানঘাটিতে দেখে অবাক সাবলং।

কে বলেছে আপনাকে যে আমি চলে যাচ্ছি?

মুচকি হাসল দ্য শমং:

আমাকে জানান নি কেন? আমার দেশের মানুষকে বিদায় দিতে আসা আমার কর্তব্য। মাদাম দ্য শমং আপনাকে সহৃদয় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আজ রাত্রেই আপনি দেখবেন পারী। আমি শুধু আপনাকে হিংসে করতে পারি মাত্র।

রেগে আগুন হয়ে উঠল সাবলং। কে খবর দিয়েছে দ্য শমংকে যে ও চলে যাচ্ছে? রাত শেষের এই ভূতুড়ে সময়ে কিসের জন্যে এসে হাজির ও এখানে?

কেমন করে জানলেন যে আমি পারী যাচ্ছি? কমিনফর্মের একটা গোপন বৈঠকে যোগ দিতে প্রাগেও তো যেতে পারি?

দ্য শমং জোর করেই এটাকে ঠাট্টা বলে ধরে নিতে চেষ্টা করল। চুপ করে গিয়ে ঘড়ি দেখতে শুরু করল যতক্ষণ না বিমান-পরিচারিকা যাত্রীদের প্লেনে আসন গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানাল। এতক্ষণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল দ্য শমং।

এখন আর ওর কোনো সন্দেহ নেই—স্মাইলস্‌এর কথাই ঠিক। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে কেন সাবলং তার চলে যাওয়া সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি। কমিনফর্ম সম্পর্কে ঐ নির্বোধ পরিহাসের ভিতর দিয়ে ওর মনোভাবই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই দ্য শমং পারীতে তার করে জানিয়ে দিল যে সাবলং চলে গেছে। কিন্তু সে সোজা চলে যাবে না প্রাগে ক'দিন থেকে যাবে তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। রুশদের সঙ্গে ওর যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে এ কথা ভাবার মতো যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। নিভেলকে জানিয়ে দেয়া দরকার।

প্লেনে চোখ বুজে বসে রয়েছে সাবলং। মনে হয় হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়েছে। বস্তুতঃ ভাবনাচিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল সাবলং। সত্যিই কি আজ সন্ধ্যেয় পারী পৌঁছতে পারবে? তাহলে ওকে তখন বসতে হবে প্রবন্ধ লিখতে। নিভেল বলেছিল, ও যা-ই কিছু লিখুক না কেন তা-ই ছাপবে। কিন্তু সে তো কথা না রাখতেও পারে। লেখা ছাপাবার জন্যে কাগজের আফিসের দোরে দোরে ঘোরার মতো লোক নয় সাবলং। জঞ্জাল ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দেয়ার জন্যে লেখার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া রুশিয়া সম্পর্কে লিখবারই বা কি আছে? স্মাইলস-এর চাইতে হয়তো বা অনেক বেশিই দেখেছে সাবলং, কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়। লিখবে কি যে রুশেরা যুদ্ধ চায় না। কথাটা অবশ্য খুবই দরকারী, ওখানে যাওয়ার আগে যেমন ভাবত তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ ভাবছে যে যে-কোনো মুহূর্তেই সোবিয়েত ট্যাঙ্ক শাম্প এলিসিতে এসে হানা দিতে পারে। কিন্তু রুশেরা যুদ্ধ চায় না শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। কেন যুদ্ধ চায় না সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা দরকার, ওদের জীবন-যাত্রা কি ধরনের, দরকার তার বিবরণ দেওয়ার। কিন্তু সে সম্পর্কে কতটুকু-ই বা জানে ও? ও দেখেছে ওরা কেমন করে বাড়ি তৈরি করছে, কাপড় বুনছে, নাচছে গাইছে। কথা বলেছে অনেকের সঙ্গে। সে সব কথাবার্তা খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। জনৈক ফরাসীর মস্কোর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটা উপন্যাস লিখতে পারে ও। কিন্তু রুশদের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে লেখা—না, ওর কম্ম নয় সেটা। যদি লেখে যে যেসব লোকের সঙ্গে ও আলাপ-আলোচনা করেছে তারা শান্তিকামী, সঙ্গে সঙ্গেই কড়া জবাব আসবে:

স্বাভাবিক কিন্তু ক্রেমলিন তো আর তা নয়। ও জানে যে বিরোধীদলের অস্তিত্বের কথা একেবারেই আজগুবি, কিন্তু সেটা প্রমাণ করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। ব্যাপারটা ভীষণ জটীল। রাজনীতি ওদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। কেন সেই স্থপতি ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেন না? ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না ওদের। সুতরাং ওদের সম্পর্কে লিখবেই বা কেমন করে?

প্রাগের বিমানঘাঁটিতে ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে দু ঘণ্টার মধ্যে যে পারীগামী প্লেন ছাড়বে তাতে ওর একটা আসন চাই কিনা। প্রত্যুত্তরে বলল সাবলং:

নিশ্চয়ই না। একটু বিশ্রাম করতে চাই আমি।—বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের ছাত্রের মতোই নিজের সিদ্ধান্তে নিজেই খুশী হয়ে উঠল। দিনভর সাবলং প্রাগের

রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরল। পরিচিত বোধগম্য সব কিছু চোখে পড়তে মনটা হালকা হয়ে উঠল। কিন্তু কেন যে মনটা এত হালকা হয়ে উঠেছে সেটা বুঝে উঠতে ওর বেশ খানিকটা সময় লাগল। প্রাগ মনে পড়িয়ে দিল ওকে সেই পুরানো ফরাসী শহরটির কথা যেখানে কেটেছে ওর শৈশব। সেখানেও ছিল অমনি হাত-বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাধুসন্তদের মর্মর মূর্তি, অমনি আঙুরলতার লাল হয়ে-আসা পাতায় ঢাকা পাথুরে দেওয়াল, গলিগুলো এত সরু যে ভীরু প্রণয়ীদের পর্যন্ত নিজেদের অজ্ঞাতেই আসতে হয় ঘনিষ্ঠ হয়ে।

পরদিন সাবলঁ খবরাখবর বিভাগের মন্ত্রীদপ্তরে জানাল যে কয়েকটা দিন ও কাটিয়ে যেতে চায় প্রাগে। ওকে জিজ্ঞেস করল যে বিশেষ করে কি দেখতে চায় ও এখানে।

বিশেষ কোনো কিছু নয়,—প্রত্যুত্তরে বলল সাবলঁ—যদি কিছু না মনে করেন তো আমি হয়তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব, হয়তো বা আমার হোটেলের শোবার ঘরেই কাটিয়ে দেব।

ওর মনে পড়ে গেল প্রাগ-এর সেই অধ্যাপকের কথা, বার্নেলিয়ে যাকে নিয়ে এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করাতে। হাঁ, ভালো কথা, এখানকার সব কিছুই ঘটেছে হালে। ফরাসীদের মতোই ছিল এদের জীবনযাত্রা। এটা স্বাভাবিক যে কিছু কিছু অসন্তুষ্ট লোকও হয়তো ছিল এখানে। অন্য ধরনের লোকও ছিল। এই ধরনের একটা পরিবর্তন আনার ব্যাপারে শুধু মস্কোর দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নয়। চেকদের নিজেদের ইচ্ছেও দরকার। ফ্রান্সও বিভক্ত হয়েছিল। বার্নেলিয়ে যে গারদকে বন্দী করে রাখত তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর কমিউনিস্টরা যদি সুযোগ পেত তবে বার্নেলিয়েকেও খুব শান্তিতে থাকতে দিত না। এ তো সোজা কথা। কিন্তু যে কথাটা আদৌও বুঝে উঠতে পারছে না তা হচ্ছে এই যে কেন ও এই পান্ডব-বর্জিত দেশের মারামারি কাটাকাটির ভিতরে এসে ঢুকল? তা ছাড়া চেকদের নিয়ে ওর মাথাঘামাবার দরকারও নেই এক রুশিয়াই ওর কাছে যথেষ্ট।

নিজেকে ভ্রমণকারীর মতো ভেবে নিয়ে দিনটা চুপচাপ কাটিয়ে দিল। পাকা বাড়িগুলোর সদরের প্রতিকৃতি আর পতাকাগুলোকে দেখেও না দেখার চেষ্টা করতে লাগল। আর শহরময় ইতস্তত ঘুরে বেড়াল বহুক্ষণ ধরে। থেকে থেকে বাড়ির উঠোনে বা প্রবেশপথে যেখানে লোকজন শান্তিতে বসে গল্পগুজব করছিল, ছোট ছোট বাচ্চারা তাদের শিশুসুলভ খেলা খেলছিল কিংবা কালো কালো দাগেভরা নোংরা মুখের মতো মুখ নিয়ে বেড়ালছানা ডাকছিল মিউমিউ করে, সেদিকে দেখছিল ফিরে ফিরে। একটা যাদুঘরে গিয়ে অতীতের এক বিখ্যাত শিল্পীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিশেষ করে একটি পরিবারের ছবি দেখে। এমন অপূর্ব শক্তি ও দক্ষতায় শিশুমুখগুলো আঁকা হয়েছে যে সে-মুখগুলোয় ফুটে উঠেছে সেই করুণ কোমলতা—যা ফুটে ওঠে মানুষের জীবন-প্রভাতে তার পর মিলিয়ে যায় পরবর্তী কালে। ক্যাটলগ দেখতে লাগল—পুরকিন। অদ্ভুত, কোনোদিনও শোনেনি এ নাম। যখন হোটেলে ফিরে এল প্রশান্তি ফিরে পেয়েছে মনে। ওর বৌ রয়েছে, আছে একটি মেয়ে। কিচ্ছু লিখবে না ও। স্কুলের ছুটি

শেষ হওয়ার এখনো ঢের দেরি। যেতে পারবে গের্ভাইসের সঙ্গে গল্‌দা-চিংড়ি ধরতে। বাগানে ঘুরে ঘুরে সময় কাটাতে। মার্দেলিয়ের সঙ্গে বেড়াতে।

ডিনারের পরে দালানে বসে দেখছিল লোকজনদের। ওখানে কয়েকজন সুইস ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী। এসেছে ব্যবসাবাণিজ্যের খাতিরে। অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছে পোস্টারগুলোর দিকে। ঐ দুজন হচ্ছে ফরাসী কমিউনিস্ট। ওদের কথার টান থেকে মনে হয় দক্ষিণ দেশের লোক। অন্য ক'জন হচ্ছে রুশ। একই উড়ো-জাহাজে করে এসেছে ওরই সঙ্গে। ওরা কেমন যেন একটু আড়ষ্ট। আস্তে আস্ত কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে। একজন ইংরেজ বসে হুইস্কি খাচ্ছে, বোধহয় কূটনীতিক। একটু দূরে একটি শ্বেতাঙ্গীনীর সঙ্গে বসে একটি নিগ্রো। নিগ্রোটিকে খুবই খুশি খুশি মনে হচ্ছে, হাসছে দন্তবিকাশ করে। সত্যি সত্যিই যেন একটা নোয়ার নৌকো—পরিচ্ছন্ন আর অপরিচ্ছন্নের মেশামিশি,—ভেবে ভারি মজা লাগল সাবল'র। এখন শোয়া যাক।

ব্রেকফাস্ট খেল ঘরে বসেই। টেলিফোন বেজে উঠল: মঁসিয়ে আউৎফ্যুয়ে ফরাসী দূতাবাসের প্রেস-এ্যাটাচী। নীচে অপেক্ষা করছেন ওর জন্যে।

কি কম্মে এসেছে এখানে?—চটে গিয়ে ভাবল সাবল',—সরকারী কর্মচারী নই আমি। এটা কি তবে নিভেলের অতি উৎসাহের ব্যাপার?

ইচ্ছে করেই সাবল' অনেকক্ষণ ধরে দাড়ি কামাল। তারপর পোশাক পরা শেষ হলে পর একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পাইপ টানতে শুরু করল। থাকুক গে ব্যাটা বসে।

বেজায় রোগা আউৎফ্যুয়ে আর দেখে মনে হয় সব সময়েই মনমরা। সাবল'র সঙ্গে করমর্দনের সময়ে চেষ্টা করে যে হাসিটি ফুটিয়ে তুলল মুখে, তাতে করে মুখখানা আরো যেন বিষাদময় হয়ে উঠল।

পারী থেকে খবর পেয়েছি আমরা যে আপনি কিছু দিন প্রাগে থাকতে চান। আপনি যদি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দুপুরে আহার করেন তবে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। আর আমার নিজের তরফ থেকে এটুকুই জানাচ্ছি যে আপনার কোনো কাজে লাগলে খুবই খুশী হব। বোধ হয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেই আপনার আগ্রহ—

আচমকা হো হো করে হেসে উঠল সাবল':

তাঁর সহৃদয়তার জন্যে দয়া করে রাষ্ট্রদূতকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাকে তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে হচ্ছে, কারণ আমি বর্তমানে হালকা পথ্য করছি। আর আপনি—সত্যি আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না কেমন করে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। পুরকিনের সঙ্গে আমি আমার পরিচয়টা আরো নিবিড় করে তুলতে চাইছি।

তা খুব সহজেই করা যাবে,—প্রত্যুত্তরে বলল আউৎফ্যুয়ে। শুধু আমাদের সূচীপত্র থেকে তার নামটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে এইটুকুই যা। কি করেন তিনি—সাংবাদিক না জন-নায়ক?

তিনি মৃত, বুঝলেন মঁশিয়ে আউৎফ্যুয়ে। সেখানটায়ই হচ্ছে যত গেরো।

—আবার হেসে উঠে বলল সাবল॑।—সুতরাং আপনার সাহায্যের দরকার হবে না। কিন্তু সত্যিই আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা খুবই আনন্দের। তাছাড়া বুঝতে পারলাম যে কী চমৎকার সব লোকই না আমাদের দূতাবাসে কাজ করে থাকে। কিন্তু এখন আমাকে মাপ করতে হচ্ছে—ঢের কাজ পড়ে আছে আমার।

খোলাখুলিই অপমান করছে বলে মনে হল আউৎফ্যুয়ের। তবুও বিনীত কণ্ঠেই বলল,—এখানে কিছুদিন থেকে যেতে চান কি আপনি ?

খুব বেশি দিন না, হয়তো বছরখানেক কি আরো কিছু।

তৃতীয়বার হেসে উঠল সাবল॑। অপমানকর বিদ্রুপেরই হাসি। তারপর আউৎফ্যুয়ের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেল হোটেল ছেড়ে।

সাবল॑র অদ্ভুত স্বভাবের কথা আগেই শুনেছিল আউৎফ্যুয়ে। কিন্তু এই ধরনের ব্যবহার আশা করেনি। এ-কথা সত্যি যে রাষ্ট্রদূত ওকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন সাবধান থাকার জন্যে। কারণ খবর এসেছে যে সাবল॑ দল বদল করছে। তবুও......। দুক্লোর সঙ্গে তো দুবার ওর আলাপ হয়েছে, তাঁকে তো বিনয়ী-ই দেখেছে। কিন্তু এই দলত্যাগী লোকটা বাদশার চাইতেও ঢের বেশি বাদশাহী। লোকটা প্রাগে কি করতে চায় জানতে পারলে বেশ হত। প্রাসেক বলেছিল ওরা বেতারবার্তা আদান-প্রদানের জন্যে ফ্রান্সে একটা শক্তিশালী বেতার-ঘাঁটি গড়ে তুলতে চায়। হয়তো সাবল॑কেই তার কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে!

আউৎফ্যুয়ের কল্পনাশক্তি খুবই প্রখর। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার নিজের কল্পনার উপরেই ভর করল। সুতরাং রাষ্ট্রদূতের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করল:

সাবল॑ এখানে আসতে অস্বীকার করেছে, তাছাড়া তার ব্যবহার অবজ্ঞাসূচক। মনে হয় বেশ কিছু দিনের জন্যেই ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে—নিজের মুখেই বলেছে আমাকে দু'বছরের কথা। সে ফ্রান্সে বেতার-ঘাঁটি গঠন করতে যাচ্ছে।

রেশমী রুমালে কপাল মুছল নিভেল: কী ভীষণ কালসাপ! কী ভয়ংকর দুর্দিনই না পড়েছে, কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই। নেই আনুগত্য, নেই মর্যাদাবোধ। সাবল॑র সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধটা আবার পড়ল নিভেল। তারপর আর একটা অনুচ্ছেদ জুড়ে দিল:

এই নোংরা চরিত্রভ্রষ্ট লোকটা প্রতারণা করার চেষ্টা করছে। ওর চতুর্দিকে যখন মহান প্রাণ সব বলি হয়ে যাচ্ছে, ধর্মযাজক, রাজপুরুষ, ছাত্র—সবাইকে গুলি করে মারছে কমিউনিস্টরা আর তারই মধ্যে কিনা মঁশিয়ে সাবল॑ আনন্দময় সোবিয়েত স্বর্গের গুনগান করে শোনাচ্ছেন আমাদের কাছে। প্রাগের বাঁশী আদৌ বিশ্বাস করি না আমরা, কারণ আমরা জানি যে যদি আজ গায়ের জোরে কমিউনিস্টদের না সংযত করা যায় কাল অন্য সুরের বাঁশী বেজে উঠবে পারীর পথে পথে—শিকারী লাল পাখির হাওয়াই আক্রমণের সংকেতধ্বনি।

প্রবন্ধটা পাঠিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মত বদলে ফেলল নিভেল। না মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আগে মুখ খুলুক সাবল॑। তখন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব কাগজের অফিসেই গিয়ে পৌঁছাবে প্রবন্ধটা।

ইতিমধ্যে প্রাগের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল সাবলঁ। আউৎফ্যুয়ের কথাবার্তায় মনটা খিঁচড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে। কেন নিভেল ওকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না? অবশ্য ওরা ওকে প্রচুর টাকা দিয়েছে অগ্রিম। তা বলে এমন উত্যক্ত করে মারার কারণ নেই। ওর দীর্ঘ সতেরো বছরের সাংবাদিক জীবনে এ-ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার পায়নি কোনোদিন। ওর আর্থিক অবস্থা কিছুটা খারাপ সন্দেহ নেই। এমন কি ওর চলে যাবার আগে স্ত্রী বলেছিল ওকে যে ব্যাঙ্কের আমানত ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিছু লিখতেই হবে ওকে। নিভেল যদি ওর লেখা না-ও ছাপে তবুও তাকে টাকা দিতেই হবে। লিখবে যে রুশরা যে শান্তি চায় তাতে এতটুকুও সন্দেহের কিছু নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হবে এই যে ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ওকে কমিউনিস্ট বলে মার্কা মেরে দেবে। কিন্তু ও আদৌ ও-ধরনের কিছু পছন্দ করে না। কেন ওরা সর্বত্র পোস্টার মেরেছে, এমন কি শুঁড়িখানায় পর্যন্ত? আর দোকানে তো মাল-পত্রের চাইতে ছবির সংখ্যাই বেশি। এখানে কোনোক্রমেই থাকতে পারবে না ও।

যখন হোটেলে ফিরে এল, দেখল আগের দিনের দেখা সেই ফরাসী কমিউনিস্টরা বসে রয়েছে দালানে। আর তাদের ভিতরের একজন বলছে:

আমেরিকানরা প্রচুর টাকা দিয়েছে সাবলঁকে। কিন্তু সে এখন......

সাবলঁকে দেখতে পেয়েই লোকটি চুপ করে গিয়ে কাগজ পড়ার ভান করতে লাগল। মনে মনে গাল পেড়ে উঠল সাবলঁ। তারপর উপরে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

কী করা যায় এখন ভাবতে ভাবতে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। ডিনার খাবে? খিধে পায়নি, কিন্তু তবুও ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে দিতে পারবে, হঠাৎ দোরের কড়া বেজে উঠল। দোর খুলতে এগিয়ে গেল সাবলঁ। ভাবল হয়তো পরিচারিকা। কিন্তু একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকল। আর উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল:

কি খবর মঁসিয়ে সাবলঁ! তাহলে এই হতভাগা প্রাগ শহরে আবার দেখা হল আমাদের!

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি বিল কস্টারের। পাঁচ বছর আগে পারী মুক্ত হবার পরে একটি সন্ধ্যে কাটিয়েছিল ও সাবলঁর সঙ্গে, আর দুজনে মিলে খালি করেছিল একটা হুইস্কির বোতল। তারপর রাস্তায় দেখা হয়েছে বার দুয়েক। কস্টারের খুবই মনে আছে সাবলঁকে। ওকে সে বন্ধু বলেই মনে করে। শুধু যারা বিরোধিতা করে তাদের ছাড়া যার সঙ্গেই পরিচয় হয় তাকেই কস্টার বন্ধু বলে মনে করে। সাবলঁ প্রাগে আছে শুনে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। হয়তো ইতিমধ্যেই দু-চার পাত্র টেনে নিয়েছে, কারণ ওর হাবভাব অস্বাভাবিক রকমের সহজ আর বেপরোয়া।

ভালো কথা, কাজকর্ম কেমন চলছে?—সাবলঁর পিঠ চাপড়ে প্রশ্ন করল কস্টার, —এখন তো আমরা এই মালিকের ঘরে কাজ করছি। একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি আপনার কাছে। আমাদের মালিক কবিতা লেখেন, কতকগুলো পড়ে শুনিয়েছেন আমাকে। একটার ভিতরে খুব একটা শ্বাসরোধকরা ভাব আছে।

সেটা হল একটা মাছ নিয়ে, মাছটা ধরা পড়ল তারপর মরল বালির উপরে। আর এক ব্যাটা বসে বসে অনন্তকালের কথা ধ্যান করছে। খুব খারাপ নয়, কি বলেন? দেখুন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মানসিক বিষাদ বা ঐ ধরনের কিছু একটা রোগে ভুগছেন। কানকো শুকিয়ে উঠেছে মনে হচ্ছে। ভিজিয়ে দেয়ার মতো কিছু আছে আমার কাছে।

বলতে বলতে তার চকচকে বাদামী রঙের কোটের বিরাট পকেট থেকে একটা বোতল টেনে বের করে টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দিল:

হোয়াইট হর্স, সেরা মাল। নীচে তো পাওয়া যায় পচা তাড়ি বা কিসমিসের ব্রান্ডি। আসুন, হুইস্কির ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়া যাক। কেন মিছামিছি বালির উপরে পড়ে পড়ে ধুঁকছেন? কি বলেন?

কস্টারকে আদৌ পছন্দ করে না সাবলং কিন্তু কিছু একটা করতে হবে সময় কাটাবার জন্যে। সুতরাং বলল:

বেশ, চলুক।

চুয়াল্লিশ

সাবল' সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল নিভেল। খুবই ভাসাভাসাভাবে আলোচনা করেছিল লো-র পরিকল্পনা সম্পর্কে। সাবল'ও ভেবেছিল ট্রানজক আর পাঁচটা সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের মতোই একটা। তেমনি সন্দেহজনক অদৃশ্যে হাত রয়েছে পিছনে, তেমনি উত্তেজনা-পরিবেশক—অন্যগুলোর চাইতে ভালোও নয় খারাপও নয়। কিন্তু কস্টারের বেলায় ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। সিনেটরের মতলব সম্পর্কে পরিষ্কারভাবেই বলেছিল নিভেল ওর কাছে। তবুও কস্টার কেন রাজী হল যোগ দিতে? প্রায়ই নিজের কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করে কস্টার আর তার যে জবাব পায় তা হল এই যে, ভিক্টোরিয়ার মতো স্ত্রী যার তাকে যে কোনো অবস্থায় গিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি থাকতে হয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে পয়সা ওড়াবার দিক থেকে মিসেস কস্টারের মতো প্রতিভা বিরল। তাছাড়া গত বছরের বিলের ব্যাপারও তেমন কিছু গৌরবজনক ছিল না। নিভেল একটা মোটা টাকা দিতে চাইল ওকে। আর বিলও জানত যে অতগুলো টাকা কিছু আর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। তবুও হয়তো অত বড়ো একটা বিপদসংকুল ঝুঁকি ঘাড় পেতে না নিলেও চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত টেনেটুনে। কিন্তু আসলে হল এই যে নিউইয়র্ক-এর জীবন সম্পর্কে ও তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল তাই নিভেলের প্রস্তাব ওকে প্রলুব্ধ করল। কাহাতক আর মানুষ দিনের পর দিন কুৎসা লিখে লিখে খবরের কাগজের পাতা ভরাতে পারে আর শুনতে পারে ভিক্টোরিয়ার অমূর্ত শিল্প-কলার পিণ্ডি চটকানো। তারপর কি না জেলের কয়েদীর মতো খাটো হাজার ডলার রোজগারের জন্যে আর শেষটায় স্রেফ নিজের পয়সায় হুইস্কি গেলো। ও যখন নিভেলকে বলেছিল যে ও কোনো একটা সত্যি-কারের উত্তেজনামূলক কাজের জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে তখন এতটুকুও ভান করেনি। ওল্ডসবের্গ বাঘ শিকার করেছিল। লৌহ-যবনিকার পিছনে কিছু বারুদ জমিয়ে তোলা মন্দ কি? যাতে করে লালগুলো উত্যক্ত হয়ে ওঠে!

প্রাগে এসে প্রথমটায় সংযত হয়ে গেল। জায়গাটা আদৌ জঙ্গলের মতো নয়। এখানকার লোকেরা ধোপদুরস্ত কাপড়জামা পরে। আইনমাফিক রাস্তায় চলাচল করে। ঘুমোতে যায় সকাল সকাল, ওঠেও ভোরে আর তাদের প্রত্যেকটির হাবভাব চলাফেরার ভিতর থেকে তাদের শৃঙ্খলার প্রতি অনুরক্তির প্রমাণই পাওয়া যায়। কস্টার বুঝল যে ধরনের যোগাযোগ করতে ও চায় সেটা খুব সহজসাধ্য হবে না। কিন্তু এখন আর পেছন ফেরার সময় নেই। ট্রানজক থেকে বেশ একটা মোটা টাকা অগ্রিম হিসেবে নিয়ে বসেছে। ও সবার কাছে বলে বেড়াতে শুরু করে দিল যে মস্কোর সেই চরম দুর্দিনে যখন জার্মানরা শহরের কাছে এগিয়ে আসছিল তখন ও ছিল মস্কোয়। সে সময় রুশদের বীরত্ব সম্পর্কে লিখেছে প্রবন্ধ। চেকদের সাহস অধ্যাবসায়ের যে ও কতখানি তারিফ করে সে কথা জোর দিয়ে জাহির করতে লাগল। স্মেতানার সঙ্গীত সম্পর্কে দেখাতে লাগল দারুণ

উৎসাহ। আর একটি বারের জন্যেও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনা করল না। মাঝে মাঝে পুতুলনাচ, কুৎনা হোরার সৌন্দর্য, খেলার খবর ইত্যাদি নিয়ে নির্দোষ রঙচঙে প্রবন্ধ পাঠাতে লাগল তার সংবাদ-প্রতিষ্ঠানে। চেকদের কাছে বলত যে ট্রানজকের চাকরি হচ্ছে একটা নোংরা কাজ। যখন ও আমেরিকায় ফিরে যাবে তখন একটা বই লিখবে চেকোস্লোভাকিয়ার উপরে—"মিথ্যার কুহেলি নিশ্চয়ই দূর হয়ে যাবে"। অল্প দিনের ভিতরেই একজন প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসেবে নাম কিনে ফেলল। সরকারী প্রচার দপ্তরে সবাই বলাবলি করতে লাগল যে সমস্ত সাংবাদিকেরাই যদি কস্টারের মতো হত!

কস্টার প্রাগে এসে পৌঁছেছে শরৎকালে। আর নতুন বছর আসার মধ্যেই অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলেছে। মার্কিন দূতাবাসে যেত কালেভদ্রে। দবজেক নামে আমেরিকা প্রবাসী এক চেক কাজ করে দূতাবাসে। সে-ই শুধু একমাত্র লোক যে জানত ট্রানজকের পরিকল্পনার খবর। দবজেকই কস্টারকে টাকা যোগাড় আর ওর রিপোর্ট পৌঁছে দিত ওয়াশিংটনে। মার্চমাসে কস্টার লো-কে জানাল যে "সত্যিকারের গণতন্ত্রের সমর্থকদের" এক করে "আজাদী জেহাদ" নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আর সিনেটরের নির্দেশ মতো জেইদাকে দিয়েছে আশি হাজার ডলার।

যুদ্ধের আগে জেইদা ছিল নগণ্য সাংবাদিক। তাঁবেদার থাকাকালে জার্মানদের হীন প্রতিপন্ন করে পুস্তিকা লিখে খানিকটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওর সম্পর্কে গল্প আছে যে ও লুকিয়ে থাকত চাষীদের ভিতরে। পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পড়তে কেটে পড়েছে ধোঁকা দিয়ে। আর গেস্তাপোরা একবার যখন ওকে চিনে ফেলল তখন চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যায়। ওর চেহারাটা সুন্দর। দেখতে কবি বা বেহালাবাদকের মতো। মাথাভরা কোঁকড়া চুল, স্বপ্নালু চোখ আর গলায় চাপ-গলাবন্ধ। ও কাজ করত একটা কমিউনিস্ট কাগজে আর যে সব শিল্পীরা কলকারখানা নিয়ে ছবি আঁকতে অস্বীকার করত তাদের আক্রমণ করে লিখত প্রবন্ধ। ও বলেছিল কস্টারকে:

আমার জিনিস ওদের কোনো সাহায্যে আসেনি। কিন্তু তাতে করে আমাকে সুযোগ এনে দিয়েছে এখন কিছু করবার।

ও ঘৃণা করত কমিউনিস্টদের।

যুদ্ধের আগের চাইতে এখন আমার অবস্থা একটু ভালো—বলল জেইদা—কিন্তু সেটা তেমন কিছু কথা নয়। সবচাইতে বড়ো কথা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা।

কস্টার ওকে মনে করেছিল কল্পনা-বিলাসী। কিন্তু অল্প দিনের ভিতরেই বুঝতে পারল যে জেইদার বৈষয়িক বুদ্ধি খুবই টনটনে।

মে দিবসের মুখোমুখি "জেহাদীরা" তাদের প্রথম সাফল্য লাভ করল। একটা বড়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার অধ্যক্ষ কারেল হোবজার উপরে হানল আঘাত। আর তার বাবা জুলিয়াস হোবজা—সৎ লোক হিসেবে যিনি খুবই সম্মানিত—তাঁকেও জড়িয়ে ফেলল ওদের ঐ সংগঠনের ভিতরে।

যুদ্ধের আগে জুলিয়াস হোবজা ছিলেন শিক্ষা-দপ্তরের একজন পদস্থ রাজকর্মচারী। রাজনীতিতে তার কোনো আকর্ষণ ছিল না কোনোদিন। ছেলেকে

মানুষ করার দিকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখতেন। গরমের দিনে কখনো কখনো সপরিবারে বেড়াতে যেতেন ফ্রান্সে। তাই দক্ষিণ বোহেমিয়ায় কিনে-ছিলেন একটি ছোট্ট বাড়ি। এক কথায় তিনি সুন্দর শান্ত জীবন যাপন করতেন আর বলতেনও তাই। বালক কারেল তখন ছাত্র। পাহাড় চড়ার দিকে তার দারুণ ঝোঁক। উনিশশো আটত্রিশে কারেলের ডাক পড়ল সেনাবিভাগে। দেশ বিপন্ন দেখে বাবাও সেনাবিভাগের ভর্তি অফিসে গিয়ে তাকেও সৈনিকদলে ভর্তি করার দাবি জানালেন। মিউনিক চুক্তির খবর পেয়েই ভেঙে পড়লেন জুলিয়াস হোবজা, কেঁদে ফেললেন। ছেলেকে ডেকে বললেন:

আমার বয়েস তেপ্পান্ন বছর। হয়তো বেশিদিন আর বাঁচব না। আমাকে কথা দে এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা জীবনে কোনোদিন ভুলে যাবি না।

জার্মানরা এল। জুলিয়াস হোবজা ঘরে গিয়ে বসে তরিতরকারি ফলাবার কাজে মন দিলেন। খুব দরিদ্রভাবেই বাস করতেন তিনি। তবুও প্রতিদিন শুতে যাবার আগে এই ভেবে আনন্দে তাঁর বুকটা ভরে উঠত যে যারা তার দেশের শত্রু তাদের সাহায্যে একটি আঙুলও তিনি ওঠাননি কোনোদিন। প্রাগেই থেকে গেল কারেল। একবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল তাঁকে যে সে এখন একটা গোপন সংগঠনের ভিতরে কাজ করছে। ছাপছে ইস্তাহার। এই সংগঠনের একজন সভ্যকে গেস্তাপোরা ধরে ফেলেছে আর তাকে চালান করে দিয়েছে তেরেজেনে।

ঠিক কাজই করছ তুমি,—বললেন জুলিয়াস। যদিও মনে মনে বুঝতে পারলেন যে তাঁর ছেলে মরণের ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়েছে। যুদ্ধের পরে পরীক্ষা দিল কারেল আর শুরু করল একটা কারখানায় কাজ করতে। গড়ে উঠল চমৎকার এক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। আর জুলিয়াস হোবজা যোগ দিলেন তার শিক্ষা দপ্তরের কাজে। দেখা হলেই বাপ-ছেলের ভিতরে চলে অফুরন্ত আলোচনা। জুলিয়াস হোবজা বলেন, যুদ্ধের আগে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই হওয়া উচিত সব কিছু। তার চাইতে বেশি কিছু উন্নতি করতে পারবে না তোমরা। রুশরা, একথা সত্যি যে তারাও স্লাভ আর সাহায্যও করেছে চেকদের কিন্তু তাদের সমাজব্যবস্থা চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

আমার মনে হয় সব কিছুই এখন বদলে যাবে,—প্রত্যুত্তরে বলল কারেল,— তুমি নিজেই বলেছ আমাকে যাতে না মিউনিক আমি ভুলে যাই কোনোদিন। রুশ-দের বিশ্বাস করি আমি। একমাত্র তারাই দাঁড়িয়েছিল নাৎসীদের বিরুদ্ধে।

মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ওরা হৃদ্যতার সঙ্গেই বিদায় নিত পরস্পরের কাছ থেকে। উনিশশো আটচল্লিশের সেই নাটকীয় ঘটনাবলী ঘটল। সমস্ত ঘটনার উপরেই দারুণ চটে গেলেন জুলিয়াস হোবজা। বললেন, কমিউনিস্টরা জার্মানদের চাইতে মোটেই কিছু ভালো নয়। আর সেই জন্যেই তিনি "দখলদারদের" অধীনে কাজ করবেন না। যখন শুনলেন যে কারেল এই নতুন সরকারকে সমর্থন করছে আর যে কারখানায় সে কাজ করত তারই অধ্যক্ষপদে বহাল হয়েছে, তিনি লিখলেন তাকে:

তুমি জান যে আমি কতখানি স্নেহ করি তোমাকে। কিন্তু তুমি হোবজা

বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছ।

জেইদা কস্টারকে বলল যে কারেল হোবজার দারুণ প্রভাব প্রতিপত্তি। ওকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া দরকার। খুন করে ফেলাটা খুবই সহজ। কারণ প্রায়ই ও একা একা পাহাড়ের ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাতে লোকজন 'জেহাদীদের' উপরে বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। কারেল হোবজা যদিও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতিকের চাইতে ভালো ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই ও পরিচিত। এমন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে কমিউনিস্টরাই ওকে তাড়িয়ে দেয়।

কেমন করে করবে তা?—জিজ্ঞেস করল কস্টার।

খুবই সহজ। স্যাটার্নিয়ান পদ্ধতিতে—।

কথায় কথায় ল্যাটিন আওড়াতে আর পৌরাণিক উপন্যাস সম্পর্কে বিদ্যের বহর জাহির করতে পছন্দ করত জেইদা।

এ ধরনের অর্থহীন ভাষায় কথা বল কেন তুমি?—তিতিবিরক্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠল কস্টার।

স্যাটার্ন,—একচুলও বিচলিত না হয়ে ব্যাখ্যা করে বলতে আরম্ভ করল জেইদা, —হয়তো জানা আছে আপনার যে সে তার নিজের সন্তানগুলোকেই খেয়ে ফেলত। খুবই পুরাকালের দেবতা। কিন্তু হালের তরুণ আমেরিকানরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে লাভবান হতে পারে। কমিউনিস্টরা নিজেরাই কারেল হোবজাকে খেয়ে ফেলবে। কারখানায় আমাদের একটি লোক আছে। তার কাছে শুনেছি ম্যানেজারের অফিস থেকে যা খুশি তা-ই বের করে আনা যায়। সামনের বুধবার ক্যানটিনের ক্লোকরুমে হোবজা তার হাত-ব্যাগটা ভুলে ফেলে যাবে। পরিচারিকার সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি আমি। ব্যাগের ভিতরে থাকবে ওর চিঠিপত্র, হিসেব, —আসলে ওর যা কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পড়ে থাকে ডেস্কের ভিতরে। আর তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি। চিঠিটার মুসাবিদা করে দিতে হবে আপনাকে। যে রকমের প্রশ্নপত্র দেখিয়েছিলেন আমাকে তেমনি। আর হোবজার রিপোর্টের খসড়াটা লিখব আমি। ক্লোক-রুমের পরিচারিকা ব্যাগটা পুলিসে জমা দিয়ে দেবে আর বলবে যে সে জানে না কে ওটা ভুলে ফেলে গেছে। একটা টেলিফোন আসবে আমেরিকার দূতাবাস থেকে। জিজ্ঞেস করবে হোবজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা। আমি স্থির নিশ্চিত যে এতেই কাজ হাসিল হবে।

আমাদের হালের চাঞ্চল্যকর ঘটনাটা কেমন লাগল?—পরে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করল জেইদা,—কারেল হোবজা আমেরিকার চর বলে প্রমাণিত হল। কে কবে ভাবতে পেরেছে এ কথা! সাংঘাতিক ধরনের কাগজপত্র পেয়ে গেল ওর কাছে।

মুচকি হাসল জেইদা। ক্ষণেকের জন্যে ওর স্বপ্নালু চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

এখন কাজের কথায় আসা যাক। কারেল হোবজার বাবা হচ্ছেন একজন খুবই সম্মানিত লোক। কমিউনিস্টদের ঘৃণা করেন তিনি। গত বসন্তকালে আমি বলেছিলাম তাঁকে আমাদের দলে যোগ দিতে। তিনি বলেছিলেন যে ব্যাপারটা গায়ের জোরে মীমাংসা করা যায় না। বস্তুত তিনি অনেক উদারনৈতিক কথা-

বার্তাই বলেছিলেন। কিন্তু ওর ছেলের সম্পর্কে এ ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর তিনি দেখা করেছিলেন আমার সঙ্গে। বললেন, এটাই হচ্ছে শেষ উপায়। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তার কতকগুলো প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে। ভদ্রলোক খুবই একজন গণ্যমান্য লোক। আমি চাই তাঁকে আমার সহকারী করে নিতে।

দেখা করার কথা বলেছিলাম আমি,—কস্টারকে বললেন হোবজা,—একটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। আপনি কি আপনার দেশকে ভালবাসেন?

নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করল বিল। কোনোদিনও এ কথা ভেবে দেখেনি যে সে আমেরিকাকে ভালবাসে কি না। দেশটা খুবই বিরক্তিকর। অবশ্য, অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, পয়সা কামানো যায় বটে। এক কথায় ইয়োরোপের যে কোনো দেশের চাইতে জীবন ওখানকার হাজার গুণ আরামের।

নিশ্চয়ই ভালবাসি,—প্রত্যুত্তরে বলল কস্টার।

তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আমার কথা। আমার দেশটা আপনার দেশের চাইতে ছোট। কিন্তু অপূর্ব দেশ। জেইদার কাছে শুনেছি কমিউনিস্ট শাসনের হাত থেকে আমাদের দেশটাকে মুক্ত করতে আপনারা আমাদের সাহায্য করতে চান। এটা সত্যিই আপনাদের দিক থেকে মহানুভবতারই পরিচায়ক। কিন্তু সুদেতেন জার্মানদের সঙ্গে আপনাদের অত মিতালি কেন বলুন তো? এ কথা বলবেন না যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান হেনলেইনকে ভুলে গেছেন? ওরা চেয়েছিল আমাদের ধ্বংস করতে। ডেকে এনেছিল ওরাই হিটলারকে। আর এখন আমেরিকানরা ওদের আবার অস্ত্র-সজ্জিত করছে। ওরা আবার শাসাচ্ছে ফিরে আসার জন্যে। আপনি আপনার সরকারকে বুঝিয়ে বলবেন যে এর জন্যেই বহু চেক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়তে নারাজ হচ্ছে।

হাসি চাপল কস্টার। বুড়োটা ভেবে নিয়েছে যে ওর বুঝি গতায়াত আছে হোয়াইট হাউসে। বোধহয় কটা-চুল বুড়োটাও এখন পর্যন্ত এ সব ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানে না। দেশের লোক তো চায় নেকড়ে, ছাগল, বাঁধাকপি সবই এক সঙ্গে পেতে। আর একমাত্র ওকেই কিনা খেতে হবে ঠোক্কর!

এটা হচ্ছে শুধু যতটুকু শক্তি সংগ্রহ করা যায় তারই ব্যাপার,—প্রত্যুত্তরে হোবজাকে বলল কস্টার।—আপনাদের সংগঠন যদি সাফল্যলাভ করে তবে আমেরিকা জার্মানিকে সাহায্য বন্ধ করে দেবে।

আরো দুজন সভ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কস্টারের সঙ্গে। একজন গ্রস, আগে ছিল একটা কাফিখানার মালিক অন্যজন জুররেতস্কি, আইনজীবী।

যাই কিছু আলোচনা করুক না কেন গ্রস, ঘুরে ফিরে সে তার কাফিখানার পরিণতির কথায় আসবেই।

কমিউনিস্টরা বলে তারা জনসাধারণকে সুখী করেছে।—বলল সে কস্টারের কাছে,—কিন্তু আমার যে কাফিখানাটা ছিল তার হাল দেখুন একবার। ওটাতে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কোনোদিন টেবিল খালি পড়ে থাকত না। কাফির সঙ্গে আমরা দিতাম টাটকা পনীর। ঢোকার মুখে থাকত খবরের কাগজ—দশটা বিশটা, সব রমকের রাজনৈতিক মতবাদের। এমনকি 'রুদে প্রাভো'ও রাখতাম। ওরা

কিনা সেই কাফিখানাটাই কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। আমি বলছি আপনাকে, আপনি একবার ঢুকে গিয়ে দেখুন ওটার ভিতরে কেমন শ্রী হয়েছে আজকাল। ভাবছেন সেই আগের মতোই আছে? খবরের কাগজের বদলে শুধু যার সঙ্গে কাগজগুলো আটকে দেয়া হত সেই হোল্ডারগুলো পড়ে আছে। শুধু আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তাই-ই নয় যেটা আমার লাগছে সেটা হচ্ছে এই যে ও জায়গাটায়ই আমার আর যেতে ইচ্ছে করে না।

জুরবেতস্কি ভুগছে অ্যাংলোমেনিয়া রোগে। ওর ধারণা যা কিছুই ঘটেছে তা হচ্ছে গঠনতান্ত্রিক মানের একটা প্রচণ্ড লঙ্ঘন। তাছাড়া ওর ব্যবসা গেছে বন্ধ হয়ে। সম্পত্তি বেচে বেচে এখন দিন গুজরান হচ্ছে। কস্টারের রূঢ়তায় বিক্ষুব্ধ হয়েছে মনে মনে, তবুও নম্রভাবেই বলল:

যখন আপনারা আমাদের মিত্রের মিত্র, তখন আমাদেরও মিত্র। এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে যখন কমিউনিস্টদের উৎখাত করা হবে তখন আমাদের সরকারও অতলান্তিক চুক্তিতে যোগ দেবে।

লো বহুবার জানতে চেয়েছে যে সংগঠন কি কাজকর্ম করছে। কারেল হোবজার কাহিনী সে বিশ্বাস করেনি।

কস্টার প্রথমশ্রেণীর সাংবাদিক,—বলেছিল লো রবার্টের কাছে,—কিন্তু ও গল্প তৈরি করে। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এ যেন ঠিক একটা উপন্যাস।

জেইদাকে বলল কস্টার:

আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা বুঝেই উঠতে পারছে না কিসে তুমি এতগুলো টাকা জলের মতো খরচ করেছ। মাত্র তিনটি লোক তো তুমি এনে হাজির করেছ আমার কাছে। হোবজা একজন গণ্যমান্য লোক এ কথা অস্বীকার করি না আমি, কিন্তু সে তো একটি অথর্ব ছাড়া আর কিছু নয়। গ্রসের তো শুধু তার কাফি-খানাটা ফিরে পাবার ধান্দা ছাড়া আর কিছু নেই। সে কোনো ঝুঁকির কাজ ঘাড়ে নেবে নিশ্চয়ই এ কথা তুমি ভাব না, ভাব কি? আর জুরচেতস্কি তো হচ্ছে একটা জোচ্চোর। ওর মতো [illegible]কিলকে আমি কানাকড়ির মামলা দিয়েও বিশ্বাস করি না। মার্চ থেকে শুরু [illegible]রে পাঁচ মাস কেটে গেছে, তোমাদের যে একটা সংগঠন আছে সে কথা আজ পর্যন্ত কেউ জানল না। কি করছ খেয়াল আছে সেটা? আরও ডলার যদি হাতড়াতে চাও তো তার আগে কাজ দেখাতে হবে। আর বেশ একটা গরম কাজ—

এই আলোচনার কয়েকদিন পরেই রুজিচ্‌কা নামে এক বৃদ্ধ কমিউনিস্ট খুন হলেন মোরাভিয়ায়। তিনি তরুণ কমিউনিস্টদের শিক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করছিলেন। একটা অন্ধকার কানাগলির ভিতরে গুলি করে মারা হল তাঁকে। 'মৃত্যুর পরোয়ানা'র নিচে 'স্বাধীনতার ধর্মযোদ্ধা' কথা কটা মৃতের বুকের উপরে পিন দিয়ে এঁটে দিয়ে অপরাধীরা পালিয়ে গেল।

রুজিচকার হত্যায় সবাই ক্ষেপে গেল।

যখন আমি তোমাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম,—জুলিয়াস হোবজা বললেন জেইদাকে,—তোমরা বলেছিলে যে তোমরা ইস্তাহার ছড়াও আর গণ-অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছ। কিন্তু কখনো বলনি যে তোমরা অন্ধকারে লোক খুন কর।

আমি জানি, রুজিচকা ছিলেন একজন কমিউনিস্ট, ন বছর কাটিয়ে এসেছেন মস্কোয়। কিন্তু আমার হতভাগ্য কারেলের মতোও অনেক সৎ কমিউনিস্ট আছে।

আরে ছ্যাঃ! লোকটাকে আমিও খুব ভালো মতোই চিনি,—প্রত্যুত্তরে নার্কাসিংটকে বলে উঠল জেইদা,—শত শত নিরীহ লোকের মৃত্যুর জন্যেই ওকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আপনার ছেলের ব্যাপারেও ওর হাত ছিল।

স্টেট সিকিউরিটি বিভাগ রুজিচকার হত্যার অনুসন্ধান শুরু করে দিল। 'ধর্মযোদ্ধার দল' নিয়ে জল্পনাকল্পনা হতে লাগল। কস্টার ভাবল যে লো এবার খানিকটা খুশী হবে। কিন্তু সিনেটর আরও কাজ দাবি করে বসল। জেইদা জানাল যে জুরবেতস্কি বিমানঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে আর গ্রস গেছে পিলসেনে। সেখানে তাকে 'ধর্মযোদ্ধার দল' গড়ে তোলার ভার দেয়া হয়েছে। অল্প কিছুদিন পরে সে আবার জানাল:

গ্রসের পিছনে পুলিস লেগেছে। সে পালিয়ে গেছে ব্যাভেরিয়ায়। জানি এটা খুবই আনন্দের কথা যে সে কমিউনিস্টগুলোকে বেকুব বানিয়ে সরে পড়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে আর ওখানে ফিরে আসবে না কোনোদিন।

হো হো করে হেসে উঠল কস্টার।

দেখে নিও, মিউনিকে গিয়ে সে কাফিখানা খুলে বসবে। টানা-পনীরের সঙ্গে ওর এক কাপ কাফি খাওয়াটাই এখন বাকি আছে আমার। বল দেখি আর কত দিনে তোমার এই ধরনের চ্যাঙড়ামো করে বেড়ানোটা বন্ধ হবে? রুজিচকার দাম দু হাজার ডলারেরও উপযুক্ত নয়।

বিমানঘাঁটি আক্রমণের ব্যাপারটা একটা প্রহসনে গিয়ে পরিণত হল। এ কথা কি করে যে জেইদা জানাবে কস্টারকে তা ভেবেই পেল না। ঠিক হয়েছিল যে জুরবেতস্কি আর তার 'ধর্ম-যোদ্ধার' দল বর্নোর কাছের ছোট বিমানঘাঁটিটার ভিতরে জোর করে ঢুকে পড়বে আর বিমানগুলোয় আগুন ধরিয়ে দেবে। জুরবেতস্কি জানিয়ে ছিল যে এ কাজটা হাসিল করতে হলে একজন বিমান চালককে ঘুস দিতে হবে। জেইদা টাকাও দিয়েছিল জুরবেতস্কিকে। বিমান চালককে ঘুসও দিয়েছিল জুরবেতস্কি এ কথা ঠিক, কিন্তু দিয়েছিল তাকে নুরেমবুর্গে পেঁছে দেবার জন্যে।

বলেছিলাম তোমাকে যে লোকটা জোচ্চোর,—বলল কস্টার।—তবে ভাগ্যি ভালো যে আমার ফাউণ্টেন পেনটার গায়ে আচড় না কেটে আঁচড় কাটতে গিয়েছিল কমিসদের বিমানের গায়ে। অবিশ্যি বিমানটাকে তো ফিরে আসতেই হবে আর জুরবেতস্কি ছাড়াও ঢের মাতাল আছে আমাদের মধ্যে। কাগজে কাগজে যদি হৈচৈ-ও পড়ে যেত ওটা নিয়ে, তবুও ও কাজের কিম্মৎ হাজার ডলারও নয়।

প্রত্যুত্তরে জেইদা জানাল যে ওদের সংগঠন একজন নামজাদা রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সেটা বাস্তবিকই একটা দুনিয়া কাঁপানো ব্যাপার হবে। তারপর কথায় কথায় বলল যে ও নিজেও ছোটখাট একটা কাজে হাত দিয়েছে। তার ফলও খুব খারাপ হবে না। একটা ভীমরুলের চাক পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিদারুণ অবজ্ঞার নাক সিঁটকে জিজ্ঞেস করল কস্টার যে পুড়িয়ে দেয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে ও কি বুঝাতে চায়—গ্রসের পুরানো কাফিখানাটা না জুরবেত-

স্কির নথিপত্তর? কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল জেইদকা, কিন্তু জবাবে বলল না কিছুই। সত্যিই তো, কেমন করে বুঝিয়ে বলবে ও কস্টারের কাছে যে মোরাভিয়ার গাঁ-অঞ্চলের ছোট্ট একটা শহরের একটা স্কুল পুড়িয়ে দেয়া একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে?

ঐ স্কুলে থাকত মারিয়া গোনজাৎকোভা নামে একটি তরুণী শিক্ষিকা। মাত্র আগের বছর সে তার শিক্ষকতার পাঠ শেষ করে মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকটি বানান-ভুলকেও সে মনে করে তার স্কুলের কলঙ্ক। ওর বাবা ত্রিশ বছর ধরে কাজ করেছেন জিলনের বাটা কারখানায়। তিনি বহুদিনের পুরানো কমিউনিস্ট। এমন কি মারিয়ার জন্মের আগে থেকেই। আর জেলও খেটে এসেছেন দুবার। এখন তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে।

আমরা লড়েছি যাতে করে আমাদের ঘরবাড়ি গড়ে তুলতে পারি।—বললেন তিনি তার মেয়ের কাছে।—এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে সে-সব গড়ে তোলা আর তোমার ছাত্রছাত্রীরাই তাতে বাস করবে।

মারিয়ার বয়েস বাইশ বছর। ওর উপরে ন্যস্ত দায়িত্বের কথা চিন্তা করে কখন অপার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কখনো বা ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

আগস্টের অন্ধকার রাত। মারিয়ার অন্তর মথিত করে বয়ে চলেছিল ভাবনার স্রোত, ওর ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয় নিয়ে নয়, চলছিল তার অন্তরাবেগের ভাবধারা নিয়ে। হাজারবার নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছে মারিয়া, কি করবে সে জোসেফের সম্বন্ধে। বসন্তকালেই ওদের পরিচয় হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। জোসেফ ইলেট্রিকমিস্ত্রি, পড়ে সান্ধ্য ক্লাসে আর লেখে কবিতা। মস্কোর উপরে লেখা ওর একটা কবিতা ছাপাও হয়েছে 'ৎভোরবা' কাগজে। বহুবার যখনই ওদের সন্ধ্যেয় দেখা হয়েছে, জোসেফ চেষ্টা করেছে ওকে চুমু খেতে। ও বলেছে, 'না'। জোসেফ ওকে চুমু খাক এটাও চায় মারিয়া মনে মনে, কিন্তু ভয়, হয়তো ওদের এ ভালবাসা সত্যিকারের ভালবাসা নয়। এ যাবত যত উপন্যাস পড়েছে সেগুলো মনে মনে ভেবে দেখল মারিয়া। প্রত্যেকটারই তো নায়ক আর নায়িকা দারুণ মনোবেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কিন্তু জোসেফ তো ভরতপাখির মতো আনন্দমুখর। আর ও নিজেও যখনই জোসেফের কথা ভাবে তার অন্তর আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। এটা প্রেম হতে পারে না—মনে মনে ভাবল মারিয়া,—খুবই খারাপ একটা কিছু। কেন জোসেফ শুধু ওকে চুমু খেতে না চেয়ে বলে না ওকে তার অন্তরের অনুভূতির কথা? ওর কথা না ভাবাই ভালো! কিন্তু কথাটা যত সহজে বলা যায় কাজে সেটা তত সহজ নয়। সেদিন সন্ধ্যেয় পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতে হঠাৎ জোসেফের কথা ভাবতে শুরু করল। ঘুম এল না কিছুতেই। সারাক্ষণ ধরে ওরই কথা ভাবতে লাগল। আলো জেলে ঘড়ির দিকে তাকাল। ইতিমধ্যেই তিনটা বেজে গেছে। বুঝল, ঘুম আর আসবে না চোখে। উঠে পোশাক-আশাক পরে ভাষা শেখানোর পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠ্যবই খুলে বসল, কিন্তু একটি বর্ণও ওর মাথায় ঢুকল না।

ঘরের ভিতরটা গরম। হয়তো বা ওরই গরম মনে হচ্ছে। ঠিক করল বাইরে

বাগানে যাবে। বাইরে দারুণ অন্ধকার। ক্ষণেকের জন্যে কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল। যদিও ওখানকার প্রত্যেকটি গাছই ওর চেনা। বুড়ো লাইম গাছটার দিকে এগিয়ে গেল মারিয়া তারপর তলার পাথুরে রোয়াকটার উপরে গিয়ে বসে, ভাবতে লাগল জোসেফের কথা। হঠাৎ ওর মনটা হালকা হয়ে উঠল: ও নিজেও তো কষ্ট পাচ্ছে। তার মানে এটা সত্যিকারেরই ভালবাসা। এমনকি জোসেফ যদি ওকে ভালো নাও বাসে তবুও তাকে চুমু খেতে দিতে ওর আর আপত্তি নেই। কাল সন্ধ্যেয় আবার ওদের দেখা হবে। সে যখন ওকে জড়িয়ে ধরবে তখন আর বলবে না যে 'না'। ওর ঠোঁটেই চুমু খাবে মারিয়া।

উঠে দাঁড়াল মারিয়া তারপর ঘরের দিকে চলতে শুরু করল। দুটো ছায়া-মূর্তি ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল ওর দিকে। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল মারিয়া পিছনে শুনতে পেল শুকনো কাঠির মড়মড় শব্দ। তেমনি চিৎকার করতে লাগল মারিয়া। স্কুলটা শহরের শেষপ্রান্তে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। আগুন দেখতে পেল। পরক্ষণেই দু'পায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে ছুটতে শুরু করল কাছের বাড়িটাকে লক্ষ্য করে। ওখানে থাকে পশুচিকিৎসক। ও দোরের ঘণ্টা বাজাল, চিৎকার করে ডাকতে লাগল কড়া নেড়ে। পশু-চিকিৎসকের ছিল টেলিফোন। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেয়া হল ফায়ার-ব্রিগেডে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হল।

তুমিই স্কুলটাকে বাঁচিয়েছ,—পরদিন সন্ধ্যেয় মারিয়া বলল জোসেফের কাছে।

তুমিও নও, আমাদের ভালবাসা।—দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল জোসেফ আর মারিয়া নীরবে ওর ঠোঁটে চুমু খেল।

নির্দিষ্ট দিনে জেইদা যখন এল না কস্টারের সঙ্গে দেখা করতে, ঘাবড়ে গেল কস্টার। আগের দুজনার মতো ও-ও কি দল ছেড়ে কেটে পড়েছে? তার মানে গেল টাকাগুলো? এমনও হতে পারে যে কটাচুল বুড়োটা টাকাগুলো ফেরত চাইতে পারে ওর কাছে। লো-র হাতেই যখন সব তখন নিভেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাটা ভুল হয়ে গেছে। নিভেল তো শুধু ইউরোপের অফিসের ভারপ্রাপ্ত। এ কথা ঠিক যে চেকোস্লোভাকিয়াটা ইউরোপেরই মধ্যে। কিন্তু ও নিজে, বিল কস্টার, হল আমেরিকান। কি বোকামোই না করেছে এই ধরনের একটা কাজের ভিতরে মাথা গলিয়ে। তবুও, পচা দুধ বোঝা বয়ে বেড়াবার কোনো মানে হয় না। জেইদা কেটে পড়তে পারবে না। লোকটা খুবই সৎ। ওর যদি কোনো দোষ থাকে তো সেটা হচ্ছে এই যে একটু বেশি রোমান্টিক। হয়তো কোথাও আটকা পড়ে গেছে। কিংবা হয়তো জ্বরও হয়ে থাকতে পারে। একটা লোকের না আসার ঢের কারণই ঘটতে পারে।

টাইপরাইটারের সামনে গিয়ে বসল কস্টার চেকোস্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে ট্রানজকের জন্যে তার নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতে। এমন সময়ে অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই হোবজা এসে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কস্টার বুঝতে পারল যে কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। কারণ কথা ছিল যে কেউই ওর হোটেলে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে না।

কেন এসেছেন এখানে? খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ—।

হোবজার এমন অবস্থা যে কথা বলার মতো ক্ষমতাটুকুও নেই ওর। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। কস্টার এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিল:

খেয়ে ফেলুন এটা।

মাথা নাড়লেন হোবজা:

দরকার নেই। ঠিক হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি। সাবধানতার কোনো প্রশ্নই আসে না এখন আর। জানেন জেইদার পরিচয় কি? ও গেস্তা-পোদের হয়ে কাজ করত।

কস্টার কিছুই বুঝে উঠতে পারল না:

এর সঙ্গে গেস্তাপোর সম্পর্কটা কি?

আমি বলছি আপনাকে শুনুন, গেস্তাপোদের হয়ে কাজ করত ও। ও বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের ছত্রিশজন দেশবাসীকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ওরা একটা দপ্তরখানায় কতগুলো নথীপত্র পেয়ে গেছে। জার্মানরা সময় পায়নি সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার। সে সময়ে যে বাড়িটায় গেস্তাপোরা ছিল সেটার ভিতরে লুকানো ছিল ওগুলো। ও বাড়িটায় এখন একটা স্কুল হয়েছে। ভাবতে পারেন কি লজ্জার কথা?

রেগে আগুন হয়ে উঠল কস্টার। সত্যিই ওরা ছিল বদমায়েস, ঐ জার্মান-গুলো। কাগজপত্রগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি ব্যাটারা! হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারে কস্টারের জেইদা। হয়তো দেবেও। তাতে কি লোকশান হবে শুর? এমন কিছু প্রমাণ নেই যে ওকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। যেমন করেই হোক না কেন চেকরা খালাস করে দিত ওকে। কিন্তু একটা গেস্তাপোর চরের পাশে বসা—সেটা তেমন ভালো দেখাত না। সিনেটর রেগে আগুন হয়ে যেতেন। রিপাবলিকানরা নিশ্চয়ই এমন একটা ব্যাপার আঁকড়ে না ধরে ছাড়ত না। আর তারপর কথা উঠত কে ট্রানজককে অর্থ সাহায্য করে থাকে। এক কথায় বেশ একটি জগাখিচুড়ি।

হঠাৎ কস্টারের মনে পড়ল হোবজা বসে রয়েছেন। ঠিক একইভাবে বসে রয়েছে বৃদ্ধ এখনো, ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

ও ধরা পড়েছে কখন?

নিদারুণ ঘৃণায় সোজা হয়ে বসলেন হোবজা:

সে তো সরে পড়েছে। গত শুক্রবার আমাকে বলেছিল যে এক সপ্তাহের জন্যে ওকে মিউনিক যেতে হবে নির্দেশ আনার জন্যে। আমি বিশ্বাস করেছিলাম ওর কথা। আমার তো আর কোনো ধারণা ছিল না যে কি পরিমাণে নীচ বদমায়েশ হতে পারে লোকটা। বিদায়ের সময়ে আমাকে আলিঙ্গন করেছিল পর্যন্ত। ওর মতো লোককে আপনি কিছুতেই আর ধরতে পারবেন না। আমার কারেল বেচারার মতো নয়। কিন্তু বলুন তো কেন জেইদা রুজিচকাকে খুন করতে চাইল? ওটা একটা বীভৎস হত্যাকান্ড। মাশারিকের মতবাদের সঙ্গে এতটুকুও মিল নেই ওর। হয়তো রুজিচকা ওর অতীত সম্পর্কে কিছু কিছু জানত। ঐ শয়তান বলেছিল আমাকে কিনা ও যখন চলে যাচ্ছে তখন সংগঠনের ভার নিতে। কিন্তু

আমি সৎ লোক, আমি চাইনে খুনী বদমায়েশ আর গেস্তাপোর গুপ্তচরদের দলপতি হয়ে থাকতে। আপনি বলবেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে যে এই ধরনের পাজী বদমায়েশদের উপরে বিশ্বাস করে কোনো লাভ নেই। সত্য যা, তা চিরকালই থাকবে। কেন অন্ধকারে মানুষ খুন করা ?

অনেক কথাই বলতে লাগলেন হোবজা। ও'র হাত থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে উঠল কস্টারের পক্ষে।

হোবজা চলে যাওয়ার পরে একা বসে ভাবতে লাগল কস্টার। যাই হোক না কেন ব্যাপারটা এখন তেমন খারাপ হয়ে ওঠেনি। ট্রানজকের গায়ে কালি লাগেনি। কিন্তু এখানে আর কিছু করবার নেই। ঐ একই টাকায় ও কিছু আর নতুন করে সব ঢেলে সাজতে পারবে না। এমনকি যদি কটা-চুল বুড়োটা এর দ্বিগুণ টাকাও দেয় তবুও আর ও এ খেলার মধ্যে নেই। ঐ হেঁড়ে-মাথা লোকটা শাসিয়েছে যে "সংগঠন ভেঙে দেবে"। আছে কি যে ভেঙে দেবে ? বাধ্য হয়ে জেইদা বাকি লোকগুলো নিয়ে কেটে পড়েছে। একমাত্র ও-ই শুধু সব 'ধর্ম-যোদ্ধাদের' চেনে। একমাত্র হোবজাই যা কিছু মাশারিকের নীতি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পেরেছে। চলে যাবে কস্টার। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো। হোবজা যে কতখানি কি হাঁড়ি ফাঠাবে তার কোনো ঠিক নেই। ও তো সম্পূর্ণই পাগলা হয়ে গেছে। কালই ওর চলে যাওয়ার ভিসা করে আনবে। কটাচুল বুড়োটার কাছ থেকে কোনো বখশিশ কিছু পাবে না, কিন্তু সিনেটর হয়তো ওর কাছে টাকাটা দাবি নাও করতে পারে। জেইদা তো চলে গেছে আমেরিকার এলাকায়। ওর কাছে টাকা চাকগে লো। কস্টার তার যথাসাধ্য করেছে। বাঘ-শিকারের পালা শেষ। এবার ও প্রাগের উপরে একটা বই লিখবে। ওটা ভালো বিক্রি হতে পারে। যা-ই হোক প্রায় একটা বছর তো ছিল ও এখানে। চেকরা ওটা তেমন পছন্দ করবে না। কিন্তু ও দুটো পয়সা করে নিতে পারবে ওটা দিয়ে। ওর জানতে হচ্ছে, ভিক্টোরিয়া ইতিমধ্যে কতটা দেনা করে বসে আছে।

পঁয়তাল্লিশ

প্রাগের শেষের দিন ক'টা খুবই একটা বিশ্রী মানসিক অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটল কস্টারের। সেদিন আলক্রন হোটেলের পানশালায় বসে গোমড়ামুখে একটু একটু করে কিসমিসের ব্রাণ্ডি চাকছিল এমন সময়ে শুনতে পেল সাবলং এসেছে প্রাগে। খুশী হয়ে উঠল কস্টার—একটা লোক এসেছে বটে যার সঙ্গে বসে একটু টানা যাবে। মদের গ্লাসের সঙ্গীর অভাবে খুবই কষ্ট হচ্ছিল কস্টারের। দূতাবাসের আমেরিকানদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিল। কয়েকজন সাংবাদিক আছে বটে, কিন্তু যেন ওকে অপমান করার জন্যেই কেউ-ই তারা মদ খেত না। একজন তো মদ ছোঁয় না, আর একজন ভুগছে যকৃতের রোগে, আর তৃতীয়টি হাড়-কেপ্পন। চেকদের সঙ্গে বসে মদ খেতে ওর ভয় করে— কে জানে কোন্ কূটনৈতিক চাল চালবে আবার এক বোতল হুইস্কি খেতে খেতে ?

নিজের আর সাবলং'র গ্লাসে মদ ঢালল কস্টার :

নির্জলাই চলবে তো ? জল মেশালে তার থাকে না কিছু। ফেরার পথে নিশ্চয়ই ?

বলতে পারছি না এখনো। হয়তো কয়েকদিন থেকে যাব।

আমি কিন্তু আপনাকে সে পরামর্শ দেব না। খাবারদাবার অতি বিশ্রী। তারপর এই কিসমিসের মদ বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেবে আপনার। তা ছাড়া যে-রাজ্য চলছে তার কথা কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু যখন আপনি মস্কো থেকে আসছেন তখন আর আপনাকে আমার বলবার কিছুই নেই। আমি বুঝতে পারছি নিজেই—জায়গাটা নিশ্চয়ই আস্ত নরককুণ্ড বলেই মনে হয়েছে আপনার। কটাচুলো বুড়োটা বোধহয় খুবই একটা নোংরা কাজের মতলব এঁটেছিল।

ভাবতে লাগল সাবলং। কস্টার কি এতই মাতাল হয়ে পড়েছে যে সে নিভেলকে কটাচুলো বলে মনে করছে ? কিন্তু ও ঠিক করল, কোনো কথাই বলবে না। শুধু মদ খাবে। সেটাই ভালো হবে সবচাইতে। ইতিমধ্যে গ্লাসের পর গ্লাস উড়িয়ে চলেছে কস্টার আর বকে যাচ্ছে অনর্গল।

অবশ্য, নিভেল একটা হোমরাচোমরা কেউকেটা গোছের ভাব দেখাচ্ছে। ভিজিটিং কার্ডে ছাপিয়েছে "পরিচালক, ইউরোপীয় কার্যালয়" আর তারই নোংরামোর ভিতরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওকে দেখতেন যদি নিউইয়র্কে ! দুমার উপরে একটা প্রবন্ধের জন্যে কি উত্যক্তই না আমাকে করেছে এসে এসে। তারপর খোলাখুলিই বলেছিল যে ওটা না নিয়ে ও যাবে না, তাহলে ওর শ্বশুর ওর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। অমন করে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন কেন ? চেনেন আপনি নিভেলকে ?

দুবার দেখা হয়েছিল, ব্যস ঐ পর্যন্তই।

ও, তাই বটে। বেশ আমি বলছি শুনুন। ওর বিয়ে হয়েছে ঐ ডাইনীটার সঙ্গে—সিনেটর লো-র মেয়ের সঙ্গে। কাব্যটাব্য খুবই ভালো জিনিস, কিন্তু লোকটার দরকার টাকার। আর কটাচুলো বুড়োটার তা বেশ দু পয়সা আছে।

তাহলেই দেখুন যে আমাদের মালিকেরও মালিক আছে।

আর এক গ্লাস শেষ করল বিল। একটু বেশ মাতাল হয়ে পড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকতার ঝোঁক পেয়ে বসেছে।

ভারি মজার ব্যাপার—একটা লোকের পিঠে চেপে রয়েছে আর একটা লোক তবুও প্রত্যেকেই এমন ভাব দেখায় যেন যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আপনি কি মনে করেন এই ট্রানজক সংক্রান্ত ব্যাপার এক লো-ই করছে সব নিজে? মোটেই না। ওয়াশিংটনের প্রত্যেকটি লোক জানে লো হচ্ছে রবার্টের হাতের মুঠোয়। আর রবার্ট—ওর পেশাটা কি? একমাত্র ভগবানই জানেন। সে ও কারুর না কারুর তাঁবেদার। আমি কাউকে হিংসে করি না, যদি না সে গুবরেপোকার মতো ঘাসের ভিতর কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায় আর ভাবনাচিন্তা জলাঞ্জলি দেয়। আসুন, খান! সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছু খুবই রঙীন মনে হবে আর আপনিও ঠিক গুবরেপোকার মতোই হয়ে উঠবেন, সত্যি। বোধহয় মস্কোতে খুবই পরিশ্রম করতে হয়েছে আপনাকে?

না, এখনও লিখিনি কিছুই।

আন্দাজেই বোঝা যায় সেটা। জোড়াতালি দিয়ে আমি ডজনখানেক কি তারও বেশি কিছু প্রবন্ধ লিখেছি মামুলিভাবে, পুতুল ইত্যাদি নিয়ে। ও শুধু চোখে ধুলো দেবার জন্যে। সত্যিকারের প্রবন্ধ নয়। কটাচুলো বুড়োটা নিশ্চয়ই কিছু একটা নোংরা চাল খেলবার মতলব করেছিল।

সময় ভালো, খুব সহজেই কাজ গুছিয়ে নিতে পারবেন,—আমার আসার আগে বলেছিল নিভেল,—শতকরা নব্বুইজনই বিপক্ষে।

পিন্ডি! এ কথা ঠিক যে, খুবই বিশ্রীভাবে দিন কাটছে ওদের। ওরা না হয়ে যদি আমেরিকানরা হত তবে নিশ্চয়ই তারা বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠত। কিন্তু চেকদের চেনেন না আপনি। ওদের মতো একগুঁয়ে জাত ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই। ওদের মাথায় ঢুকেছে যখন যে এ ব্যবস্থাটাই ভালো তখন কিছুতেই আর তা ওদের মাথার ভিতর থেকে বের করতে পারবেন না। এ কথা ঠিকই যে ওরা অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। অসন্তোষ প্রকাশ করাটা ওদের স্বভাব। তাছাড়া হাসিতামাসাও করে অনেক কিছু নিয়ে। এখানে এসে একটা সৈনিকের সম্পর্কে একখানা বই পড়েছিলাম। তখন অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের দিন। সৈনিকটি সব কিছু নিয়েই হাসিঠাট্টা করত। চমৎকার মজার বই। রাত্রে পড়ছিলাম, আর পড়তে পড়তে এত জোরে জোরে হাসছিলাম যে পাশের ঘরের লোকেরা অভিযোগ করছিল। বলতে গেলে ও-ই হচ্ছে এখানকার জাতীয় বীর। যখন এলাম এখানে লোকজনদের হাবভাব একবর্ণও বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কেউ হয়তো কমিউনিস্টদের নিয়ে খানিকটা রসিকতা করে বলল আমার কাছে আর অমনিই আমি ভেবে নিলাম, "এই লোকটাই হচ্ছে আমার কাজের যোগ্য লোক"। কিন্তু দেখা গেল সে লোকটা হচ্ছে একেবারে আপাদমস্তক গোঁড়া। বলুন এখন কি বলবেন—এ রকম জায়গায় কি কোনো কিছু করা সম্ভব?

অবাক বিস্ময়ে সাবলং তাকাল কস্টারের মুখের দিকে:

করা? মানে কি বলতে চান আপনি?

বারুদ জমিয়ে তোলা কিংবা নিভেলের ভাষায়, "একটা বিরোধী দল সৃষ্টি করা"।

আমি ওসব জানি না। মাত্র দু দিন হল এসেছি এখানে। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, ওসব ব্যাপারে আমার আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। পারীতে এক চেক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—একজন অধ্যাপক। অভিযোগ করছিলেন শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানোর জন্যে। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ মনে হচ্ছে যেন বেশ ভালোই আছে—কাজকর্ম করছে, হাসছে খেলছে।

অ্যা, এখানকার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার পারীতে? ওটাই হচ্ছে সমস্ত নষ্টের গোড়া। ঠিক কথা, অসন্তোষ আছে বৈকি এখানে—এ তো স্পষ্ট। যদি কারোর একটা কাফিখানা থাকে আর সেটা যদি কেড়ে নিয়ে জাতীয়করণ করা হয়, সে লোকটা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে না। কিন্তু আপনার ঐ অধ্যাপকের মতো ছুঁচোগুলোই ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। আপনি বলছেন এসব ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহ নেই? থাকবেই বা কেন? আপনি কি মনে করেন চেকদের সম্পর্কে আমারই কি কোনো আগ্রহ ছিল কোনোকালে? ইস্কুলে পড়েছিলাম চেক বলে একটা জাত আছে, ব্যস ঐ পর্যন্ত। নিজেকে আগ্রহান্বিত করে তুলতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু বলুন তো মস্কোতে কতটা সাফল্যলাভ করতে পেরেছিলেন? কাউকে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন না পুড়িয়ে দিতে পেরেছেন কোনো কিছু?

আমার মনে হয় মদটা এখন আপনার বন্ধ করা উচিত,—দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল সাবল্‌।—কিংবা এটা কি আপনার খুব দীর্ঘদিনের অভ্যেস?

কী যাতা বকছেন! আপনি কি বলতে চান কেমন করে মদ খেতে হয় তা আমি জানি না?—রেগে উঠে বলল কস্টার,—আরো একটা গোটা বোতল আমি হজম করে ফেলতে পারি। ভাবছেন আমি মাতাল হয়ে পড়েছি? জন্মেও না। একগাদা আজেবাজে না বকে আমি সোজাসুজি কথা বলছি আপনার সঙ্গে। আমরা দুজনেই এক কাজ করছি। অত বিনয়ের ভান করার দরকার নেই। আমি এ-ও জানি যে কত টাকা আপনি নিভেলের কাছ থেকে হাতিয়েছেন—ও আমার কাছেই ঘ্যানঘ্যান করেছে যে ওর দফা নিকেশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই, এসব কাজের দিক থেকে খুবই কঠিন একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে কেটেছে আপনার রুশিয়ায়। ওদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বত্রিশ বছরের। দুবছরের নয়। কাদের কাছে যেতে বলেছিল আপনাকে নিভেল? আমাদের লোকদের কাছে? না ফরাসীদের কাছে?

ফরাসী দূতাবাসের সেক্রেটারীর কাছে।

আপনার নিজের লোকদের কাছেই তাহলে। বেশ কিছু লোককে গাঁথতে পেরেছেন কি?

কাঁধ ঝাঁকাল সাবল্‌:

আমি সাংবাদিক, গুপ্তচর নই।

একটা বিরাট অট্টহাসি হেসে উঠল বিল:

ঈশ্বর, একেই বলি শৃঙ্খলা! আমার সঙ্গেও কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন আপনি তাহলে! ঠিক হ্যায়! চালান, মদ খান। আমি কিন্তু আপনাকে ভয় পাই না।

বাঘ মারছি আমি এখানে। ওরা নিজেদের বলে 'মুক্তি সেনাদল'। পচা মাল, কিন্তু ওরা একটা লোককে খতম করে দিয়েছে। এবার আমি দেশে ফিরে গিয়ে ওটা নিয়ে ঢাক পেটাচ্ছি—ছোট্ট একটা বই লিখছি—প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো আসবে আমার হাতে।

কোন্ প্রকাশকের কাছে গেলে সবচাইতে ভালো হবে তা নিয়ে জাব-কাটতে শুরু করে দিল কস্টার।

নিজের চিন্তায় বিভোর থাকায় ওর কথা আর কানে ঢুকছে না সাবল'র। অবশ্য, কস্টার মাতাল হয়ে পড়েছে এটা ঠিক, কিন্তু কথাবার্তা বলছে ঠিকই। এতক্ষণে বুঝতে পারল সাবল' কেন শর্ম' লোকজনের নাম জানার জন্যে এত জিদ করত, আর জিজ্ঞেস করত টাকার দরকার আছে কি না, বা সে বলত: 'আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যারা বিক্ষুব্ধ তাদের সমর্থন করা।' কী জঘন্য! এটা আদৌ সংবাদ-প্রতিষ্ঠান নয়। এটা হচ্ছে খুনে যোগাড় করার অফিস। সিনেটর লো আর একটা কে রবার্ট! তাহলে এরই ভিতরে জড়িয়ে পড়েছে সে! এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তাই আউৎফুয়েে অমন পড়িমরি করে ছুটে এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে—ভয় পাচ্ছে সাবল' ওদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সে যাইহোক, এখনো ও একজন ভদ্রলোক। ঠিক বটে যে ও একটা টাকা আগাম হিসেবে নিয়েছিল—মোটা টাকাই বটে। ওর নিজেরই দোষ কেন ও ভেবে দেখল না যে এত টাকা কেন ওরা দিচ্ছে ওকে। কিন্তু যে কোনো সময়েই বাড়িটা তো বিক্রি করে দিতে পারে। সব কিছু বিক্রি করে টাকাটা ফেরত দিতে পারে। চিরদিন সৎ জীবন যাপন করে এসেছে। তাতে করে ওকে অশুইজে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল —কিন্তু এ ধরনের পরিণতির জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। এ ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে ওকে। এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে এ সব ব্যাপারের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই।

'লাসটা শেষ করে ফেলল সাবল'। মনে হচ্ছে যেন বেশ একটু ধরছে। কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে ওর। কিন্তু জিভটা কেমন যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া কথা বলবেই-বা কার সঙ্গে? এটাকে কি মানুষ বলে—এই বিল কস্টারকে? সমস্ত আমেরিকার লোক জানে যে ও একটা নোংরা কুৎসা-লেখক।

হঠাৎ ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল:

মানুষ বল নিজেকে? বিল কস্টার ছাড়া তুমি আর কিছু নও—

কস্টার নিশ্চয়ই এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপরে।—ভাবল সাবল' মনে মনে। যেমন দেবে তেমনটি খাবে। মারপিট হবে একটা আর হোটেলের লোকজন ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু অমায়িক হাসি হেসে উঠল কস্টার:

নিশ্চয়ই। শ্রুতিলিখন দেয়ার সময়ে আমি তো বলি আমার স্ত্রীর কাছে সেই কথাই। এককালে মানুষ ছিলাম, কিন্তু আজ আমি শুধুই বিল কস্টার। কিন্তু আপনাকে অমন মনমরা দেখাচ্ছে এটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না, নিন, খান। আর একটা বোতল আছে আমার ব্রিফ-কেস-এ। এই ধরুন কানকো ভিজাবার মতো খানিকটা। হয়তো আপনি পছন্দ করেন ব্রান্ডি—কিছু ফরাসী কগ্‌নাকও পাওয়া যায় ওদের কাছে। এখনো ওরা জানে কি করে ওটার তারিফ

করতে হয়। আপনাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, নিভেলের সঙ্গে চুকেবুকে যাওয়ার পর একটা বই লিখে ফেলুন রুশিয়া সম্পর্কে। প্রাগের চাইতে ওটার আকর্ষণ হবে আরো বেশি। দিস্তা দিস্তা টাকা কামাতে পারবেন। ও জায়গার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আপনি এখন ভালো মতোই জানেন, আর বাকিটা তো হপ্তাখানেকের কাজ—রসালো কিছু একটা ভেবে বের করুন। যেমন ধরুন এমন একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে যিনি এটম-বোমা সংক্রান্ত কাজ করছেন। আর তার ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সাইবেরিয়ায়। সে ইতস্তত করছে, আপনার সঙ্গে প্রাণ-খোলা কথাবার্তা হয়েছে তার, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাকে আর বলে দিতে হবে না আপনাকে, নিজেই আপনি একজন সাংবাদিক। অমেরিকার কোনো প্রকাশকের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলি, চান কি এটা ?

এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সাবলং।

আমি বিল কস্টার নই। আমি মানুষ। ওসব নোংরা কাজে আমি হাত কালো করি না।

বিল কস্টারও এবার চটে উঠল। কিন্তু হাত চালানোর বদলে সপ্তমে গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল :

ওঃ ধোয়া তুলসীপাতা আর কি, তাই না ? সোজা কথা, আমার ডবল টাকা নিয়েছেন আপনি ট্রানজক-এর থেকে, ঠিকই জানি আমি। দূতাবাস থেকে আর কত টাকা নিয়েছেন শুনি ?

সে-টাকা আমি নিভেলের মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেব!—গর্জে উঠল সাবলং।—ভেবেছিলাম ওটা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠান, কিন্তু দেখছি ওটা একটা শুয়োরের খোঁয়াড়। আপনার মতো মানুষেরই উপযুক্ত।......কালই আমি চিৎকার করে বলব ছাদের উপরে উঠে যাতে দুনিয়া শুনতে পায়, বুঝেছেন ? আর এখন সরে পড়ুন! গোটা ঘরটা দুর্গন্ধে ভরে গেছে আপনি থাকায়—যান শিগ্‌গির!

হঠাৎ কস্টারের নেশা ছুটে গেল।

মেরে তক্তা করে দেয়া উচিত আপনাকে। দৈবক্রমে, যুযুৎসুর হাত আমার পাকা, আপনার চাইতে ঢের বেশি জোয়ান লোককেও আমি ছাতু করে দিতে পারি। কিন্তু সেটা উচিত হবে না কারণ মদ খেলাম আপনার সঙ্গে বসে। যান এখন ঘুমিয়ে মাথা ঠান্ডা করুনগে যান!

কস্টার চলে যেতেই ক্লান্ত হয়ে ডাইভানের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সাবলং। কেন এতটা মদ খেয়ে ফেলল ও ? এক্ষুনি ওর নেশা কাটিয়ে উঠতে হবে আর ধরতে হবে ভোরের পারীগামী উড়োজাহাজ। কটা বাজে এখন ? দেড়টা। মানে, আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা হাতে আছে। যা সত্যি তাই-ই লিখবে ও। লিখবে যে ও জানত না কেন ওকে পাঠিয়েছিল ওরা। যদি লা মঁদে না ছাপে তো নিয়ে যাবে লুমানিতে। বলুক ওরা ওকে কমিউনিস্ট। ওকে কস্টারের মতো ভাবুক সবাই তা ও চায় নি। কস্টার নয় সাবলং, ও মানুষ।

ঘরটা দুলতে শুরু করে দিল। সাবলং'র মনে হল ও উড়োজাহাজে করে উড়ে চলেছে পারী অভিমুখে। আর চলেছে বজ্রগর্ভে মেঘের ভিতর দিয়ে। হা ভগবান! কী ভীষণ দুলছে এটা! এক মিনিটের ভিতরেই নেমে পড়বে ওরা।

এক্ষুনি লিখে ফেলবে ও। নাম দেবে "প্রতারিতের স্বীকারোক্তি"। না ওটা অর্থহীন। শোনাচ্ছে যেন পারীর কোনো পসারিনী মেয়ের প্রেমিকের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার মতো। নিভেল নিশ্চয়ই তার বুড়ী মাগীটাকে ঠকায়। ওর চিন্তা ক্রমেই এলোমেলো হয়ে আসছে। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সাবল'।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে গেল কস্টার। অবশ্যি, মাতাল হয়ে পড়েছিল সাবল', কিন্তু তবুও ও ভান করেনি। একটা ভয়ংকর ভুল করে ফেলেছে কস্টার—এত খোলাখুলিভাবে ওর সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক হয়নি। কিন্তু কেমন করে জানবে কস্টার যে ওরা সাবল'র নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে? "মস্কোয় কাজ করতে রাজী হয়েছে সাবল'".—নিভেল বলেছিল ওর কাছে;—"ওটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, সমস্ত বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতেই হবে." সহকর্মীর মতোই আলোচনা করেছে ও সাবল'র সঙ্গে আর লোকটা কিনা ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে চাইল ওর টুঁটি টিপে ধরার জন্যে। ওর মতো মানুষ সবকিছুই ফাঁস করে দিতে পারে। ওকে নাকি ঢের টাকা দিয়েছে এর জন্যে, শুনেছে কস্টার। কস্টারকেও জড়াতে ছাড়বে না ওর ভিতরে, আর তাহলেই ও খতম। এ-ধরনের ব্যাপার কেউই ক্ষমা করে না। জেইদার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ে বলেছে খুবই সাবধানে, কিন্তু সাবল' ঢের বেশি সাংঘাতিক। নিভেলকে এক্ষুনি সতর্ক করে দেয়া দরকার।

ট্যাকসি ডাকতে পাঠাল কস্টার। অনেক সকালেই এসে পেঁৗছেছে। কিন্তু বিমান-ঘাঁটিতে বসে অপেক্ষা করতে করতে খানিকটা সাচ্ছন্দ্য অনুভব করল। কী নোংরা কাজ, তবুও!

নিদারুণ ক্লান্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল সাবল'র। একটা সিগারেট ধরাল, কিন্তু কস্টারের কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়েই গালপেড়ে উঠল বিড়বিড় করে: বেশিক্ষণ ঘুমিয়েছে। নিচে নেমে গেল।

কালকের আগে আর পারীগামী কোনো প্লেন ছাড়বে না,—বলল হলের চাপরাশী,—মিঃ কস্টার খুব ভোরে উঠে চলে গেছেন বিমানঘাঁটিতে আর আপনাকে বলতে বলে গেছেন যে উনি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

ছেচল্লিশ

ভীরু নয় কস্টার। যুদ্ধের সময়ে একাধিকবার কঠিন সংকটজনক অবস্থার ভিতরে আটকা পড়েছে। চমকপ্রদ সংবাদ-কাহিনী সংগ্রহ করতে আগুনের ভিতরে যেতেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিমানঘাঁটির জনহীন চা-খানায় একা বসে কেন ও এতটা উত্তেজনা অনুভব করছে? এ কি গত কয়েক দিনের ঘটনা ওর দেহ-মনের উপরে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া এনেছে বলে? না জেইদার পলায়ন, 'আজাদ-জেহাদীদে'র অমন লজ্জাকর অন্তিম পরিণতি আর যে নিদারুণ অপমানের বোঝা তুলে দিয়েছে ওর মাথায় সাবলঁ তারই জন্যে? কিংবা কেবল তার রোজকার মদের বোতলটা এখনও গলায় পড়েনি বলেই? হরেক রকমের অর্থহীন চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল ওর মনে। হোবজা যদি কোনো বদ লোকের কাছে বলে দেয় যে জেইদা নির্দেশ পায় কস্টারের কাছ থেকে? কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পারছে কস্টার যে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তার কাছেই বুড়ো বেকুবটা বলছে: 'রুজিচকার খুনের সঙ্গে মাসারিকের নীতির আদৌ কোনো সামঞ্জস্য নেই।' তা ছাড়া, দারুণ চটে গেছে সাবলঁ। কে জানে ও ঘাবড়ে গিয়ে সোজা পুলিশের কাছেই চলে যাবে কি না? যে কেউই চা-খানায় আসছে চমকে চমকে উঠছে কস্টার।

প্লেনে যখন উঠে বসল, খানিকটা আরাম অনুভব করল কস্টার। মনটা হালকা হয়ে উঠল। বিমান-পরিচারিকা কাফি নিয়ে আসতেই লোভীর মতো খেয়ে ফেলল তারপর চাইল এক গ্লাস ব্রান্ডি। অপূর্ব সুন্দর সকাল। ছোট্ট জানালার ভিতর দিয়ে পাহাড়, শহর আর রাস্তার দিকে তাকাল কস্টার—নক্সার উপরের সরু রেখার মতো দেখাচ্ছে রাস্তাগুলোকে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো মোটরগুলো চলে ফিরে বেড়াচ্ছে তারই বুক বেয়ে। এটা কি জার্মানি, না এখনো আছে চেকোস্লোভাকিয়ায়? উপর থেকে সমস্ত দেশগুলোই একই রকমের দেখায়। সব কিছুই এত সুন্দর এত ছোট। কথায় বলে, 'পাখির চোখে দেখা'—হ্যাঁ, ছোট্ট এতটুকু একটা পাখি সমস্ত দেশ এমনি করে দেখতে পায় উপর থেকে আর নিশ্চয়ই বিল কস্টারের মতোই অনুভব করে মানুষের প্রতি একটু অবজ্ঞা মেশানো প্রশান্তি। ঠিকই, মাটিতে থাকতেও অন্যদের চাইতে একটু উঁচু স্তরের বলে মনে করে ও নিজেকে। এ কথা সত্যি যে গোটা একটা বছর ও নষ্ট করেছে ঐ হতভাগা 'জেহাদীদের' পিছনে। কিন্তু ওর চুক্তি রয়েছে নিভেলের সঙ্গে। টাকাও নিয়েছে। তাছাড়া ও সৎ লোক। কিন্তু তা বলে চেকদের শাসনব্যবস্থা কি ধরনের তা নিয়ে আদৌ ও মাথা ঘামায়নি কোনোদিন। নিয়তির হাতের যন্ত্র হিসেবে ছাড়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারোর মতো ওদের ব্যাপারে নাকও গলাতে যায়নি ও কোনোদিন। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তবে কে জিতল না জিতল তা সবই তাঁর কাছে সমান কথা। এটা নিঃসন্দেহ যে নিজের খেয়ালখুশিতেই তিনি ঠিক করে-ছিলেন সেটা। গত যুদ্ধের সময়ে তিনি ঠিক করলেন যে মিত্রশক্তির জয়লাভ

করা উচিত। প্রচুর বোমা ছিল সকলের উপরে ছোড়বার মতো, কিন্তু তাঁকে জয়মাল্য ছুঁড়ে দিতে হল কারো না কারোর দিকে। এটা নিছক ভাগ্যপরীক্ষার খেলা। আর একটা যুদ্ধ অনিবার্য। দীর্ঘদিন ধরে কোনো কিছুর জন্যে প্রস্তুতির পরে কেউ আর অমনি অমনি হিসেবের খাতা পালটে দিতে পারে না। সেটা নেহাত বেকুবি। সে দিক থেকে যুদ্ধটাই বেকুবি। দশবছর কাটালে গড়তে আর দশ সেকেণ্ডে দিলে তা ধ্বংস করে। অবশ্য রুশদের পরাজয়ই ও চায়—আর যা-ই হোক ও আমেরিকান তো বটে। কিন্তু আমেরিকানরাই যে সঠিক এ সম্পর্কেও তো ও স্থিরপ্রত্যয় নয়। এ যেন ঠিক হোবজাদের মতো, বাপ আর ব্যাটা—কে যে সঠিক তা বলা শক্ত। শুধু একটিমাত্র জিনিসই পরিষ্কার যে ওরা ঝগড়া করে। জেইদা প্রথমে ছিল গেস্তাপোর চর, তারপর আমেরিকানদের। সঙ্গে সঙ্গে একটা লাল সংবাদপত্রেও ঢুকে পড়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই অবশ্য বেশ একটু নোংরা। কিন্তু এ-ও তো হতে পারে যে জেইদাই ঠিক। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাছাড়া সাধারণত একটু কঠিনও বটে। রাজনীতি বড় ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু প্রয়োজন টাকার—টাকা ছাড়া কোনো কিছুরই কোনো মানে হয় না। তেমন যথেষ্ট টাকা পাবে না চেকোস্লোভাকিয়া নিয়ে বই লিখে। প্রাগ আর মস্কো তো এক বস্তু নয়। তবুও হয়তো মেরেকেটে হাজার ত্রিশেক আদায় করতে পারে ওটা দিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়ল কস্টার। বিমানটা যখন নামার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন অনেকক্ষণ ধরে ওর ঘুম ভাঙাবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি করতে হল বিমান-পরিচারিকাকে।

বিল ঠিক করল সোজা এজেন্সির আফিসে গিয়ে উঠবে। সম্পূর্ণ উবে গেছে ওর হাসিখুশি ভাব। কয়েকটা হতভাগা লোকের জন্যে কী ভয়ানক ঝুঁকিই না ওকে নিতে হয়েছিল ভেবে আগুন হয়ে উঠছিল মনে মনে। গ্রেপ্তার হতে পারত, মেরেও ফেলতে পারত ওকে। আর এ দিকে নিভেল পরম শান্তিতে বসে বসে কবিতা লিখে চলত। জঘন্য নয় এটা। আর এখন কিনা কটাচুলো বুড়োটা টাকা কোথায় গেল, 'জেহাদী দলের' অবশিষ্ট যা আছে তার কি হল, পরবর্তী কাজকর্মের জন্যে কে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, হেনতেন সাত সতেরো প্রশ্নে ওকে তিতিবিরক্ত করে মারবে। কিন্তু জেইদা তো সরে পড়েছে। অবশ্যি, কস্টারের হাতের রঙ-এর তুরুপ আছে: সাবল'র আগেই সে এসে পৌঁছেছে আর বাঁচিয়ে দিয়েছে ট্রানজককে। শুধু ঐটুকুর জন্যেই অন্ততপক্ষে বিশহাজার টাকা ওর প্রাপ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কটাচুলো বুড়োটার মুঠো হাড়-কেপ্পনের মতো শক্ত।

নিভেলের প্রশস্ত অফিস ঘরে ঢুকেই একটা বিরক্তিসূচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করল কস্টার।

এখন শোন দেখি আমার কথা—!

নিভেলের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। সাবল'কে নিয়েই সামলানো যাচ্ছে না, তার ওপর বুঝি আবার কস্টারও এসে জুটল!

খারাপ কিছু ঘটেছে?

খারাপ কিছু ঘটেছে কি না জিজ্ঞেস করছ?—রাগে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল

কস্টার।—অল্পের জন্যে গুলি খেতে খেতে বেঁচে এসেছি। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি তোমাকে যে তোমার শ্বশুরটি একটি আস্ত বেকুব। আর তুমিও খুব চমৎকার লোকই বটে! আমি শুনতে চাই এ ধারণা কোথায় পেয়েছিলে তোমরা যে দশভাগের ন'ভাগই বিরুদ্ধবাদী? ওখানে কিছু করা একমাত্র শয়তানের পক্ষেই সম্ভব। তা সত্ত্বেও আমি চলে আসতাম না—কিন্তু যদি না এমন একটা সাংঘাতিক রকমের বেইমানী না ঘটত—এমন বেইমানীর কথা কেউ কখনো শোনেনি। তুমি ভাবছ যে সাবলঁকে তুমি গেঁথে ফেলেছ, কিন্তু সেই এখন তোমাকে ফাঁসাবার ব্যবস্থা করছে। কী করে তুমি কটাচুলো বুড়োটার চক্রান্তের ভিতরে ওকে নিয়ে এলে?

আমি ওর সম্পর্কে খুবই সাবধান ছিলাম। সম্ভবত আমাদের মস্কো দূতাবাসের সেক্রেটারী ওকে যতটুকু বলা দরকার ছিল তার বেশিই কিছু বলেছে।

ওসব বাজে পট্টি দিও না আমাকে! আমি কি কাজের জন্যে প্রাগে আছি মস্কো-প্রবাসী এক ফরাসী ভদ্রলোক কী করে জানবে তা? সব কিছুর উপরেই ঘৃণা ধরে গেছে সাবলঁর। সে বলেছে আমার কাছে যে ছাদে উঠে সে চিৎকার করে জানিয়ে দেবে সবার কাছে। তার মানে কি হবে বোঝ? যাতে অন্তত ওর চাইতে একটা দিনও আগে এসে পৌঁছতে পারি তাই আমি সব কিছু বাতিল করে চলে এসেছি।

আশা করেছিল কস্টার যে ওর কথায় একটা দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করবে। কিন্তু একটি চুলও স্থানচ্যুত হল না নিভেলের। এমন কি মনে হল যেন আশ্বস্ত হয়েছে। যা-ই হোক না কেন কস্টারের তো কোনো বিপদ ঘটেনি।

এতটুকুও ভয়ভাবনা হচ্ছে না তোমার?—আগুন হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল বিল।

আগেই জানতাম আমি। মস্কো থেকে দ্য শমঁ হুঁশিয়ার করে দিয়েছে আমাকে। তারপর প্রাগ থেকেও খবর পেয়েছি। আমার দিক থেকে আমি সাবধান করে দিয়েছি সিনেটরকে। একটা ছোট্ট প্রবন্ধও তৈরি করে রেখেছি। কিন্তু এখন ঐ প্রাগের ব্যাপারটা, সত্যি আমি আদৌ কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। এ হতেই পারে না যে দ্য শমঁ ওকে বলেছে তোমার কথা। হয়তো চেক পুলিশ? ওরা চেয়েছিল ওকে ফরাসী বেতার বিভাগের ভার দিতে। লোকটা পুরোপুরিই লালদের বিশ্বস্ত। ওরা তোমাকে খুঁজে ফিরছে, আমার মনে হয় —যদি না কোনো গুপ্তচর—

এতদিনে কটাচুলো বুড়োটার মাথাপাগলা পরিকল্পনা সম্পর্কে সুবুদ্ধি জেগেছে তোমার। আমি তো গর্দানের ঝুঁকি নিয়ে ছিলাম—কিন্তু এবার আমাকে রেহাই দাও এর থেকে। যদি সাবলঁ প্রচার করে দেয় যে রুজিচকার হত্যার সঙ্গে আমেরিকান সাংবাদিকের যোগাযোগ আছে তাহলে ঢের মূল্য দিতে হবে তার জন্যে। তখন তোমার শ্বশুর কি বলবেন আমি শুনি? দেখি কি লিখেছ।

নিভেলের প্রবন্ধ পড়ার পরে অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠল বিল: তোমার হাতে কবিতাই ভালো মানায়। খেলিয়ে খেলিয়ে মাছ ধরবার ব্যাপার এটা নয়। এখানে চাই কিছু সোজা মার। কিন্নর-কন্যা সম্পর্কে তোমার ঐসব গালগল্প নেহাতই

ফাঁকা। এসব আজগুবী ব্যাপার কে মনে রাখবে বল? প্রাগে ছিল একটা কথার তুবড়ি। হেনতেন বড়াই করে বেড়াত, শেষকালে খাবি খেল। গোটা প্রবন্ধটা থেকে দুটো জিনিস বাদ দিতে হবে আমাদের: চুরি করা ছবি বিক্রির কথাটা আর ঐ গেস্তাপোর কথাটা। আসল কথা হচ্ছে ওর যা বলার সম্ভাবনা আছে আগে থাকতেই সেগুলোকে খন্ডন করে রাখা।

জামাটা খুলে ফেলে টাইটা ঢিলা করে দিয়ে লিখতে বসল কস্টার। হিসেব করে যে কথায় পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে তেমনি ভাষায় লিখতে শুরু করল:

ঠান্ডা লড়াই কি গরম লড়াইয়ে পরিণত হতে চলেছে? কমিউনিস্টরা তাদের শান্তি-আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঐ ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছেন না। তোষণনীতির পালা শেষ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। আমেরিকা বারবার ঘোষণা করেছে যে যতদিনে লৌহ-যবনিকা না তুলে দেয়া হয়, আর সংবাদ আদানপ্রদানের অবাধ নীতি না স্বীকৃত হয়, ততদিন পর্যন্ত ওদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কোনো প্রশ্নই আসে না। ক্রেমলিন কিছুটা উভয়সঙ্কটের ভিতরে পড়ে গেছে। লালগুলো ঠিক করেছে যে আমেরিকার সাংবাদিকেরা গুপ্তচরবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত এ কথা প্রচার করে জনমতের সামনে নিজেদের সাফাই গাইবে। তাই প্রথম বলি হিসেবে কমিউনিস্টরা বেছে নিয়েছে নবগঠিত ট্রানজক এজেন্সিকে। এক দল স্বাধীন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত এই এজেন্সির একটি মাত্রই উদ্দেশ্য: নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন করা। সমস্ত দেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত ব্যাক্তিদের লেখা ও সমস্ত রাজনৈতিক দল-মত নির্বিশেষে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করে থাকে ট্রানজক। কে তবে লালদের ঐ ধূর্ত পরিকল্পনা কার্যকারী করে তুলবে? ওরা বেছে নিল ফরাসী সাংবাদিক সাবলঁকে। সৎ ও স্বাধীন সাংবাদিক হিসেবে এতকাল তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ ছিল। মস্কোর এই পয়লা নম্বর চরটির প্রকৃত কাজকর্ম সম্পর্কে কেউ-ই কোনোদিন কোনো সন্দেহ করতে পারেনি। দুটি লোক এক মুখোস খুলে দিতে সাহায্য করেছেন—একজন, প্রতিভাশালী মার্কিন সংবাদিক বিল কস্টার আর সোনিয়া ভ্যাম্পায়ারের মতো চোখ এক মায়াবিনী নারী।

এই ভূমিকা লেখার পরে ছেলেবেলা থেকে সাবলঁর জীবনবৃত্তান্ত রচনা করল বিল। উনিশশো ছত্রিশ সাল থেকেই সাবলঁ যোগ দিয়েছে সোবিয়েত গুপ্তচর বিভাগে। সেই সময়ে সে মুরম ডাকনামে পরিচিত সেই কুখ্যাত সোবিয়েত গুপ্ত-চরের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করত ক্লোজেরি দ্য লিলা-তে গিয়ে। মুরম এক থোকে ওকে দিয়েছিল দু লক্ষ আশী হাজার ফ্রাঁ।

সাবলঁর স্পেন-ভ্রমণের বর্ণনা শেষ করে কস্টার চলে এল উনিশশো চল্লিশ সালের ঘটনায়: কাল পর্যন্ত সামরিক বিশেষজ্ঞেরা বুঝে উঠতে পারেনি কি করে মিউজ পুলটা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল। যার ফলে ফরাসীদেশ আক্রমণ করতে শত্রুপক্ষের প্রচুর সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে সাবলঁ—যে নাকি লালদের হুকুমে জার্মান গুপ্তচরবিভাগের হয়ে কাজ করছিল, সে-ই ঐ পুলটা ধ্বংস করার নির্দেশ চেপে রেখে দিয়েছিল। এ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ তাছাড়া আর অনেক কিছুই তার দুষ্কর্মের সহচরী সুন্দরী সোনিয়ার

কাছ থেকে জানা যেতে পারে। যার সঙ্গে দীর্ঘ সাত বছর বসবাস করার পরে জুজু নামে এক ভীষণ-দর্শনা বর্ণ-সঙ্করীর জন্যে তাকে ত্যাগ করেছে সাবলঁ।

গেস্তাপোর হয়ে সাবলঁর কাজ করার বিস্তৃত বিবরণ দেয়ার পরে কস্টার লিখে চলল:

ক্রেমলিন যখন ঠিক করল যে ট্রানজক এজেন্সিকে ধ্বংস করতে হবে তখন সাবলঁ ইয়োরোপীয় অফিসের ডিরেক্টর বিখ্যাত কবি ও 'মিসিসিপির গোলাপ'-এর লেখক মঁশিয়ে নিভেলকে এসে ধরল ওকে মস্কোয় পাঠাবার জন্যে। মঁশিয়ে নিভেল, যার কাছে আমরা খবরাখবর জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাদের বলেছেন যে দীর্ঘকাল ধরে তিনি ইতস্তত করেছিলেন। তিনি জানতেন যে সাবলঁ একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক, কিন্তু ওর বিরোধীদলের সঙ্গে, যোগাযোগ করার কথা শুনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় তাঁর মনে। মঁশিয়ে নিভেল ওকে বলেন যে ট্রানজক এজেন্সির সংবাদদাতার কোনো অবস্থায়ই যে দেশে তাকে পাঠানো হয়েছে সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর দরকার নেই। এ কথা স্মরণ রাখবে বলে কথা দিল সাবলঁ। মঁশিয়ে নিভেল আমাদের পারীর সংবাদদাতার কাছে বলেছেন যে যত তাড়াতাড়ি রুশরা সাবলঁকে তাদের দেশে ঢোকার ভিসা মঞ্জুর করেছে তা দেখে তিনি তাজ্জব বনে গেছেন। কৃষ্ণ-সাগরের তীরে ভূতপূর্ব জারের প্রাসাদে অনেক মাস কাটিয়ে এসেছে সাবলঁ। সেখানে নানান ধরনের কুৎসিত আমোদপ্রমোদের অনুষ্ঠান করত। তার বর্ণসঙ্করী জুজুও গিয়ে জুটেছিল সেখানে তাঁর সঙ্গে। তারপর সে উড়ে এল প্রাগে। গত ফেব্রুয়ারীর সেই দিনগুলোর পর থেকে হতভাগ্য চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দিয়ে কী যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা সবাই-ই জানে। চেকদের সঙ্গে এঁটে উঠতে কমিউনিস্টরা অক্ষম। ক্রমাগতই নানারকমের বে-আইনী প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে। এ সব কিছুই যে আমেরিকান সাংবাদিকদের দুষ্ট প্রোরোচনায় সংঘটিত হচ্ছে এটা আরোপ করার জন্যে লালেরা সাবলঁকে এই বলে বিবৃতি দেয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছে যে সে নিজে ট্রানজক এজেন্সির হয়ে কাজ করেছে আর তার সমস্ত রহস্যজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে ভালোমতোই জানে। এ বিবৃতির উপরে আর বেশি গুরুত্ব দেয়াবার জন্যে সাবলঁ ট্রানজক এজেন্সির প্রাগের সংবাদদাতা বিল কস্টারের সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছিল। আর তার কাছে এই ধরনের একটা ঘৃণ্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল: যে কস্টারকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে যে সে 'আজাদ-জেহাদী' নামে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান যারা নাকি কমিউনিস্ট নেতা রুজিচকাকে হত্যা করেছে তাদের টাকা যোগাত। সাবলঁর নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় বিস্মিত কস্টার জানতে চাইল যে কেন সে ওকে মিথ্যা বলতে ও তার স্বদেশের মুখে কলঙ্ক কালিমা লেপন করতে বলছে? তাতে সাবলঁ তাকে রূঢ়ভাষায় বিদ্রূপ করে জবাব দিয়েছিল যে "এর জন্যে তোমার আশী হাজার ডলার মিলবে"। এককালে বিল কস্টার যুযুৎসু শিখেছিল। মঁশিয়ে সাবলঁর সুযোগ হয়েছিল এই উদার তেজস্বী মার্কিন-সন্তানের খেলোয়াড়সুলভ ক্ষমতার একটু পরিচয় পাবার।

উপসংহারে কস্টার বলল সুন্দরী সোনিয়ার ট্রানজক আফিসে আসার কথা: রুশিয়ার অভিজাত-বংশীয় টি—র মেয়ে। অনেক কুৎসিত কাজই করতে হয়েছে

তাকে সাবল'র জন্যে। হয়তো ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়েই হোক কিংবা বিবেকের দংশন থেকেই হোক, ঘটনা হচ্ছে এই যে সে আইনসংগত যে কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে মারাত্মক প্রমাণ-পত্র হাজির করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু শুধু তার নামটি উহ্য রাখতে চাইছে। কারণ সে লালদের কাছ থেকে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের ভয় করছে। অরোরের সম্পাদক থেকে শুরু করে গণ্যমান্য সাংবাদিক এসোসিয়েশন থেকে সাবল'র বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন। সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে জানা গেল যে সাবল'র ব্যাপার পুলিশ অনুসন্ধান করবে। এখন বলা যেতে পারে যে পয়লা নম্বরের মস্কো-দালালের পেশা এতদিনে শেষ পর্যায় এসে পৌঁছেছে।

একেবারে মাথা ঘেঁষে কোপ,—সমস্তটা পড়ার পরে মৃদু হেসে বলে উঠল নিভেল।—এর থেকে কাটিয়ে উঠবে সাবল' বলে তো মনে হয় না আমার।

ঘামে ভেজা কপালটার উপরে জামার হাতা বুলিয়ে মুছে ফেলল কস্টার।

আর বিল কস্টার কি করে কাটিয়ে উঠবে সে সম্পর্কে কি মনে হয় তোমার ? গত ছক বছর ধরে কিছুই লিখিনি আমি—শুধু ঐ অভিশপ্ত চেকদের নিয়ে আমার স্নায়ুবিকৃতি ঘটিয়ে ছাড়লাম। কেমন করে যে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পারলাম তাও জানি না! তোমার অভিশপ্ত এজেন্সিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। তুমি তোমার শ্বশুরকে লিখো এবং বলো যে এখনও যদি সে পথে না আসে তবে আজ হোক, কাল হোক বিল কস্টার তাকে দেখে নেবে এক হাত। এইটাই আমার শেষ কথা জেনে রেখো। আর চললাম এখন এক পাত্তর টানতে—বা একটা লম্বা ঘুম দিতে।

সাতচল্লিশ

কস্টার প্লেন ধরে চলে গেছে শুনে গলা ছেড়েই গাল পেড়ে উঠল সাবলং। গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়েছে নিশ্চয়ই—শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছিল। গিয়ে ও রিপোর্ট করবে নিভেলের কাছে যে সাবলং ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর নিভেল ওর কাছে আগাম-দেয়া টাকাটা ফিরে চাইবে। যে মুহূর্তে ও নামবে প্লেন থেকে সেই মুহূর্তেই ওরা লাগবে ওর পেছনে। খুনে গুপ্তচর ইত্যাদি আমদানি করার একটা জোর ঘাঁটি ওটা। ওরা চেয়েছিল ওকেও এর ভিতরে টেনে নামাতে, এটা তো স্পষ্ট হয়ে গেছে এখন। কিছু একটা করতে হবে এক্ষুনি। সবচাইতে ভালো হচ্ছে চেকদের কাছে গিয়ে বলা যে, "আমি একজন সাংবাদিক। কমিউনিজম দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই—কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা বড়ো কথা নয়। আমাকে জঘন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার একটা চক্রান্ত চলেছে। তোমাদের এখানে একটা দল আছে—'আজাদ-জেহাদী দল'। তারা রাজনৈতিক শত্রুদের হত্যা করে। এই সব লোকের সঙ্গে আমার আদৌ কোনো সংস্রব নেই কিংবা এক মতাবলম্বীও নই আমি ওদের সঙ্গে। আসলে এসব কাজ আমি দারুণ ঘৃণা করি।" হ্যাঁ, তাই করবে ও, ঠিক করল সাবলং। চাপরাসীকে বলল, সংবাদ-দপ্তরে একটা টেলিফোন করে তাদের প্রতিনিধিকে বলতে যে, যে-ভদ্রলোক পরশু দিন দেখা করেছিলেন তিনি একটু কথা বলতে চান আপনার সঙ্গে।

উপরে নিজের ঘরে চলে গেল সাবলং। দেয়ালের ভিতর থেকে জানালাটা তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। আধো-অন্ধকারের ভিতরে টেবিল ল্যাম্পটা ক্ষীণ আলো বিকিরণ করে চলেছে। ডাইভানের উপরে গা এলিয়ে দিল সাবলং। কিন্তু পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে বসল, এ সব কি ভাবছে ও? একটা জঘন্য অবস্থার ভিতর থেকে আর একটা জঘন্য অবস্থার ভিতরে গিয়ে পড়ছে। কস্টারটা একটা বদমায়েস একথা ঠিক, কিন্তু প্রকাশ্যে নিন্দা করার অর্থ সব কিছুকেই নিন্দা করা। ও কার যে নিন্দা করবে তাও জানে না। ঐ 'আজাদ-জেহাদীরা' হয়তো সৎ লোকও হতে পারে তারা। বানালিয়ে কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে, কিন্তু সে খুবই ভদ্র লোক। তার পক্ষে ওদের এই ধরনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। ট্রানজক সম্পর্কে যা কিছু সত্য ঘটনা ও লিখবে নিশ্চয়ই—শুধু এখানে প্রকাশ করবে না। প্রকাশ করবে কোনো একটা স্বাধীন দেশে যেখানে লোক জবাব দিতে পারে ওর লেখার। কাল ও পারীতে পৌঁছাবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রবন্ধটা নিয়ে যাবে ল্য মঁদ বা কাঁবা কাগজে। এটা ওর কর্তব্য। কোনো নিন্দাবাদের ভিতরে নিজেকে ফাঁসাবে না। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ও লিখে এসেছে গোপনে লাগানো-ভাঙানোটা নীচ মনোবৃত্তির কাজ, এমন কি যদি সঠিকও হয় তবুও।

দোরের কড়া নড়ে উঠল। সংবাদ-দপ্তরের প্রতিনিধি এসেছেন।

কী বলবে তাঁকে কিছুই ভেবে উঠতে পারল না সাবলং। ওকে বসতে অনুরোধ করতে গিয়ে বেশ খানিকটা সময় নিল। সুখ্যাতি করল প্রাগের।

অবশেষে বলল:

আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে মাপ করুন আমাকে। ভেবেছিলাম কিছু দিন এখানে থাকতে পারব, তাই আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম যে আমাকে কয়েকটা স্কুল আর কারখানা দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মাত্র খবর পেলাম কালই আমাকে পারী চলে যেতে হবে। সত্যিই এর জন্যে আমি দারুণ একটা অস্বস্তি বোধ করছি—

চেক ভদ্রলোকটি চলে যেতেই সাবলঁ টেবিলে গিয়ে বসল্ লিখতে। খুব দ্রুত এলোমেলো হাতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখে চলল:

চিরদিনই আমি বিভিন্ন দেশের ভিতরে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষপাতী। তাই আমি মস্কো যাবার জন্যে ট্রানজকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। আমি জানতাম না যে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ অনুষ্ঠানের বাহ্যিক আবরণ মাত্র। মস্কোয় থাকা কালে ফরাসী দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারি মঁশিয়ে দ্য শমঁ আমাকে সোবিয়েত সরকারের বিরোধী লোকদের নাম বলার জন্যে পেড়াপিড়ি করতেন। এটা হয়তো তেমন কিছু দোষণীয় নয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমি অন্যান্য ঘটনাও উদ্ধৃত করছি। ট্রানজকের প্রাগ-সংবাদদাতা মিঃ কস্টার আমাকে বলেছেন যে তাঁর একটা গোপন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এতক্ষণ ধরে যা লিখেছিল সযত্নে তা কেটে ফেলল সাবলঁ,—এটাও খবর দেয়ারই সামিল। ও লিখবে উদ্দেশ্য সম্পর্কে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্কে নয়।

'আমার আশংকা হয় যে, বর্তমানের এই গোলযোগের দিনে কোনো কোনো সংবাদ-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ট্রানজক এজেন্সি, তাদের স্বাধীন সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গিই হারিয়ে ফেলে অন্য দেশের রাজনৈতিক জীবনের ভিতরে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছে।”

এটাও কেটে ফেলল কস্টার। ছেলেমানুষি লেখা, আদৌ যুক্তিপূর্ণ নয়। এটার মানে কি, “আমার আশঙ্কা হয়— ?” ও কি জানে না যে একজন লোক খুন হয়েছে এখানে? রাজনৈতিক উত্তেজনা যতই মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক না কেন, সময় সময় অনেক ঘৃণ্য কাজেও প্ররোচিত করে থাকে। বিভিন্ন দেশের ভিতরে বন্ধুত্বের অবস্থা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার বদলে ট্রানজক এজেন্সি ঘৃণার মনোভাব খুঁচিয়ে তুলছে। এর প্রতিনিধিরা নানান ধরনের গোয়েন্দাগিরির কাজে লিপ্ত।” না এটাও তেমন যুৎসই নয়। কোনো কার্যকারণ না দেখিয়েই ও ওদের নীচ বলে গাল দিচ্ছে। কস্টার, নিভেল, দ্য শমঁ আর লো-র নাম করতে হবে ওকে। হ্যাঁ, ঠিক,—কিন্তু কোনো প্রমাণ আছে কি ওর হাতে? কস্টার সব কিছুই অস্বীকার করবে, নিভেল প্রচার করবে যে সাবলঁ একটা জোচ্চোর। আর বলবে যে একটা মোটা টাকা আদায় করে নিয়ে এক লাইনও লেখে তো নি-ই উলটে এখন কুৎসা রটাচ্ছে যাতে আর লিখতে না হয়। জবাবে দ্য শমঁ বলবে যে ও সব হচ্ছে সাবলঁর স্বকপোল-কল্পিত, কারণ মস্কোয় এসে ও 'মোহগ্রস্থ' হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া লো সম্পর্কেই-বা ও কতটুকু জানে? শুধু এইটুকুই জানে যে সে নিভেলের শ্বশুর। এসব ছেলেমানুষী।

কাগজগুলো দুমড়ে মুচড়ে ও আবার ডাইভানের উপরে গা এলিয়ে দিল।

গোটা দিন দুশ্চিন্তার ভিতরে কাটিয়ে সেদিন সন্ধ্যেবেলা এজেন্সির কাছে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে ফেলল।

ট্রানজকের রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে এমন সব জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছে যা নাকি সংবাদ প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত কাজ। এ-কথা জানানো আমি কর্তব্য মনে করছি যে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি মস্কো যেতে স্বীকৃত হয়েছিলাম শুধুই সাংবাদিক হিসেবে। তাই সাংবাদিক হিসেবে কাজ-কর্মের জন্যেই আমি দায়ী। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই, শুধু একটি জিনিসই আমার কাম্য—শান্তি। সোবিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে রায় দেবার জন্যে আমি মস্কো যাইনি, গিয়েছিলাম যে যুদ্ধ বন্ধ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না এটা দেখতে। কয়েক দিনের ভিতরেই এই প্রশ্নের উপর কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব আর রুশরা নিজেরা কি ভাবে সে-সম্পর্কে জানাব।

ঠিক করল পরের দিনই চিঠিটা নিভেলের হাতে পেঁছে দেবে। হয়তো নিভেল আসবে বিমান ঘাঁটিতে ওর সঙ্গে দেখা করতে। তখন ওরা খোলাখুলিই ও সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে পারবে। চিঠিটার ভিতরে নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো অপমানকর কথা লেখা নেই। ও সরলভাবেই বলবে তাকে যে, কমিউনিস্ট নয়, বা কমিউনিস্ট হবারও আদপে কোনো ইচ্ছে নেই ওর, কিন্তু রুশরা সত্যিই শান্তি চায়। তাই এখন দরকার হচ্ছে ওদের সঙ্গে নতুন করে হাত মিলাবার জন্যে চেষ্টা করা। যদি নিভেল চিঠিটা ছাপতে রাজী হয় তবে তার জন্যে ও একটা প্রবন্ধ লিখবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে বলবে যে ও টাকাটা ফেরত দেবে, কিন্তু তার জন্যে একটু সময় দিতে হবে ওকে। ওর হাতে টাকা নেই তাই আগে ওর বাড়িটা বিক্রি করতে হবে। চিঠিটা নিয়ে ও যাবে 'ল্য ম'দ' কাগজে। হয়তো বেদিয়ের সঙ্গে আগে একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হতে পারে। বেদিয়ে খুবই ভদ্রলোক, তাছাড়া প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতরেও ছিল। বেদিয়ে যদি ওকে সমর্থন করে তবে সব কাগজেই ওর চিঠিটা ছাপবে।

যেতে যেতে পথে দারুণ একটা উত্তেজনা অনুভব করল সাবলঁ, আর কিছু-ক্ষণের ভিতরেই দেখা হবে ওর নিভেলের সঙ্গে। অভ্যস্ত তিক্ত হাসি হেসে জিজ্ঞেস করবে পথে কেমন কাটল। 'চমৎকার', প্রত্যুত্তরে বলবে সাবলঁ তারপর একটা বিশ্রী ঘৃণ্য নীরবতা আসবে নেমে......

যাই হোক, কেউ-ই আসেনি সাবলঁর সঙ্গে দেখা করতে। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল সাবলঁ—দিনটা তেমন বিশ্রীভাবে শুরু হয়নি। বাড়ি চলে গেল সাবলঁ। ফ্লাটে পেঁছে মনে হল কেউ কোনোদিন বাস করেনি এখানে। দরজা জানালা বন্ধ, ছবিগুলো প্যাকিং কাগজে মোড়া, আসবাবপত্রের উপরে পুরু হয়ে ধুলোর আস্তরণ পড়ে আছে। পড়ার ঘরের দরজা খুলে ফেলল। দেখল টেবিলের উপরে টাইপরাইটারটা পড়ে রয়েছে, বিরক্তি অনুভব করল: এক্ষুনি ওকে কাজে বসতে হবে। ইচ্ছে হল এক্ষুনি ক্যাঁপেরলে চলে যায়। আজ না হোক তিন দিন পরে চিঠিটা নিভেলের হাতে পেঁছালে কি আর এমন ক্ষতি হবে? একটু বিশ্রাম

নিতে হবেই ওকে। স্টেশনে চলে এল। চল্লিশ মিনিটের ভিতরেই একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন আছে দেখে মনটা খুশী হয়ে উঠল। কামরায় আর জনপ্রাণীও নেই। ভাবল দিনটা সত্যিই আজ ভালো। বেশ খুশী মনেই পথটা কাটাল— আজ সন্ধ্যেয়ই দেখা হবে ওর পরিবার পরিজনের সঙ্গে। আর কাল,—কাল সকালের প্রথম কাজ হবে ওর সমুদ্রে যাওয়া।

এঞ্জিয়ার্স পেঁছে ট্রেন থেকে নামল পা দুটোকে একটু টান করার জন্যে। বিশ মিনিট দাঁড়ায় এখানে গাড়িটা, তাই কফি খেল তারপর খবরের কাগজের দোকান থেকে ডজনখানেক কাগজ কিনে ফেলল। গাড়ির কামরায় ফিরে এসে কাগজগুলো নামিয়ে রাখল। ওর মন স্ত্রী, মাদলিন, লাল আর নীল এনিমোন ফুল আর জেলে ডিঙির উপরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পাচ্ছে সমুদ্রের পরিচিত গন্ধ। সমুদ্র এখন আর বেশী দূরে নয়। অন্যমনস্কভাবে সাবলঁ "সামেদি সোয়ার" কাগজটা খুলে ফেলল। হঠাৎ ও যেন এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেঁথে গেল। কে লোকটা? ওর নিজের মতোই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ও-ই তো—কিন্তু ফটোটা কী অদ্ভুত ধরনের। ঠিক যেন একটা জেলের কয়েদীর মতো। কিন্তু কেন ওরা ওর ফটো ছাপল? এতক্ষণে বড়ো বড়ো হরফে লেখা হেড-লাইনের উপরে ওর দৃষ্টি পড়ল, "মস্কোর পয়লা নম্বরের দালাল"। সোবিয়েত ইউনিয়নে থাকতে ও প্রায়ই ভাবত, যদি ও লেখে, সোবিয়েত যুদ্ধ চায় না, তবে অমনি ওকে কমিউনিস্ট বলে মার্কা মেরে দেবে। আর কেউ কেউ এ-ও বলবে যে ও ঘুস খেয়েছে। কিন্তু অতর্কিতভাবেই কাগজটা ওকে আক্রমণ করেছে। কাগজটা এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ও আবার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল। যদি ধরো ও ওটা না পড়ে? নিজের উপরেই রাগ হল সাবলঁর। জানালা বন্ধ করে দিল তারপর কাগজটা তুলে নিল।

প্রথমটায় হেসে উঠল: ভেলাসক ছবিগুলো বিক্রির গল্প পড়ে ভারি মজা লাগল। যখন পলটার কথা আর গেস্তাপোদের হয়ে কাজ করার কাহিনী পড়ল, গাল পেড়ে উঠল। কিন্তু দারুণ রেগে গেল কস্টারকে ঘুস দিতে চাওয়ার কথা পড়ে। এখন সব কিছু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওরা চায় ওর মুখ বন্ধ করতে। তাই কস্টার যে আধখানা বোতল শেষ হতে না হতেই ফেলে রেখে বিমানঘাঁটিতে ছুটে গিয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছুই নেই, খাঁটি গুণ্ডার দল! কিন্তু এবার আর পার পেয়ে যেতে পারবে না। এটা আমেরিকা নয়। ফ্রান্সের লোকের মুখ বন্ধ করার সাধ্য তোমাদের নেই। এবার ও লিখবে সব কিছুই—গুপ্তচর বৃত্তি, নরহত্যা—মুখোস ছিঁড়ে দেবে ও ওদের।

ভুলে গেল সাবলঁ কোথায় ও চলেছে, ভুলে গেছে যে ও তার ফিরেছে ওর স্ত্রীর কাছে। জানালার পথে মাদলিনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই ও কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। হ্যাঁ, এই তো ক্যাঁপেরলে।

ব্যাপার কি?—জিজ্ঞেস করল ওর স্ত্রী,—তোমাকে তো দেখতে না পেয়ে চলেই যাচ্ছিলাম আমরা। নেমে আসোনি কেন?

দারুণ অস্বস্তি অনুভব করল সাবলঁ:

খুবই দুঃখিত, লুসি। ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তাছাড়া সাংঘাতিক

একটা পশবিক ব্যাপার ঘটেছে। পরে বলব তোমাকে। দেখে এসো তো পারীর ট্রেন কখন আছে। আজই আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।

অতি কষ্টে অনেক পেড়াপিড়ি করে একটা রাত ওকে থাকতে রাজী করাল ওর স্ত্রী। প্রবন্ধটা সম্পর্কে মেয়ের সামনে কোনো কথা বলতে চায়নি। চুপচাপ বারান্দায় এসে বসল ওরা। উষ্ণ ধারায় বৃষ্টি পড়ছে—পচা পাতা আর আবর্জনার গন্ধের সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে সমুদ্রের গন্ধ। খুশিভরা দৃষ্টিতে মাদলিনের দিকে তাকাল সাবলঁ—আরো লম্বা, আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে ও—যুবতী মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। সাবলঁ ভুলে গেল এজেন্সির কথা। পরে মাদলিন যখন ঘুমোতে গেল, ও কাগজটা এনে দেখাল ওর স্ত্রীকে।

এই যে পড়ে দ্যাখো। বাড়িটা আমাদের বেচে দিতে হবে।

ও জানে লুসি ওর একান্ত অনুগত বন্ধু। ফ্রাংকোর সম্পর্কে সত্য ঘটনা দিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্যে যখন ওর কাগজের সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হয় তখন নিদারুণ এক সংকটজনক অবস্থার ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছিল ওদের। হাতে পয়সাকড়ি নেই, মাদলিনের বয়েস মাত্র দু বছর, কঠিন অসুখে ভুগছে। ভুতের মতো এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারছে না। যে কোনো একটা বিস্ফোরন ঘটলেই ও নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ত। সে সময়ে লুসি মেয়েকে টেনে তুলল রোগ থেকে, টেনে তুলল তার স্বামীকেও। ঐ ছোটখাটো হাল্কা স্বভাবের মেয়েটি যে নাকি ফ্যাশান-পত্রিকা আর পিয়ের বেনোয়ার উপন্যাসের পরম ভক্ত সে যে এমন অসাধারণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি যে চরম দুর্দিনের মুহূর্তেও পারে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে আর পারে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে যেতে মুখ বুজে। জার্মান দখলের সময়ে ও সাহায্য করত ওর স্বামীকে। যখন সে ধরা পড়ে গেল, রাতভর কেঁদে কাটাত কিন্তু সারাদিন কাজ করত, সেলাই করত। বেঁচে থাকতে হলে কিছু তো মুখে দিতে হবে আর হবে মাদলিনকে বাঁচাতে। যখন সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল, আশ্চুইজ থেকে ফিরে এল সাবলঁ, ও মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ডাক্তারেরা বলল, 'স্নায়বিক দৌর্বল্য' কিন্তু ও জানত যে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল অত্যধিক আনন্দে।

ওটা লিখেছে কে?—কাগজটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

জানি না আমি। হয়তো কস্টারই লিখেছে। এখন আর ওর কোনো কিছুর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নাম উল্লেখ করতে পারে। ওরা কি কাজ করতে নেমেছে সে কথা প্রকাশ করে দেবে ও। কাল যাবে বোঁদিয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ওরা ওর লেখা না ছেপে পারবে না।

ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই শক্ত।—বলল লুসি,—কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ো না —আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা ছাপবে, তা ছাড়া টাকার জন্যে চিন্তা করো না। বাড়িটা বিক্রি করে দেব, সবই ঠিক হয়ে যাবে দেখো। কিন্তু আজ রাতটা ভালো করে ঘুমোতে হবে তোমাকে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। শুতে যাও। কাল ন'টার আগে ট্রেন ছাড়বে না।

পরদিন সকালে লুসি আর মাদলিঁয়ে ওকে তুলে দিতে এল স্টেশনে। মাদলিন একটু সরে যাবার পরে কথায় কথায় লুসি বলল:

সোনিয়া কে ? কোনো দিন তো বলনি তার কথা—

মানে তুমিও বিশ্বাস করছ ওটা ?—রেগে উঠল সাবলং। কিন্তু বৃথাই বলল ওকে লুসি যে সে ঠাট্টা করেই বলেছে কথাটা। তাছাড়া ওসব ভাবতেও ঘৃণা করে। বিদায়বেলাটা বিস্বাদ হয়ে গেল। সাবলং একটি বারও জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাল না।

গাড়ির ভিতরে বসে কেমন যেন মনটা ভারি ভারি লাগতে লাগল। এমন কি লুসিও বিশ্বাস করল। পাগল হয়ে গেছে প্রত্যেকটি লোক। ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঐ মোটা লোকটার দিকে দ্যাখে, বোধহয় ও লেখাটা পড়েছে। ফটো থেকে চিনতে পারছে ওকে আর অবাক হয়ে ভাবছে কেন সে এখনো ওর গলাটা কেটে ফেলছে না। কী ন্যক্কারজনক !

তারপর ও মনটাকে চাংগা করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। লুসির কথায় অত চিন্তা করার কি আছে। মেয়েদের মনে যখন ঈর্ষা জাগে তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। বড্ডো বেশী স্থূলভাবে রটিয়েছে, একটা বেকুবও ঐ ধরনের জিনিস বিশ্বেস করবে না। বোদিয়ে বুঝবে এটা যে এ ধরনের জিনিস অমনি অমনি ছেড়ে দেয়া যায় না। এ হচ্ছে ফ্রান্সের মুখেই চুনকালি দেয়া। হয়তো বোদিয়ের ধারণা নেই যে কোনো কোনো কূটনীতিক কি সব কাজ করছে। দ্য শমং তো খেলা করছে আগুন নিয়ে। ও যে কার হয়ে কাজ করছে তা বলা শক্ত—হয়তো লোর কাছ থেকেই হুকুম পাচ্ছে। এ ধরনের ব্যাপারের জন্যে ঢের মূল্য দিতে হবে ফ্রান্সকে।

শেষ মুহূর্তে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল সাবলং। বোদিয়ে যদি পারীতে না থেকে থাকে তবে ? কিংবা ধর সে ব্যস্ত আছে বলে দেখা করতে চাইল না ? আর সত্যিই খুবই কর্ম-ব্যস্ত লোক সে। তা যদি হয় তবে খেলা খতম। বোদিয়ে ছাড়া আর একটি লোকও নেই।

কিন্তু বোদিয়ে পারীতেই ছিল। আর সংগে সংগেই দেখা করল সাবলংর সংগে। খুব হৃদ্যতার সংগেই জিজ্ঞেস করল মস্কো কেমন দেখতে, কার কার সংগে দেখা করেছে সেখানে। সাবলংর ইচ্ছে ছিল সরাসরিই ট্রানজকের প্রশ্নে আসে, কিন্তু বোদিয়ে এমন আগ্রহ দেখাল যে সাবলং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মশগুল হয়ে গেল। সমস্ত কিছুর বিস্তৃত বিবরণ দিতে লাগল, এমন কি ক্রিলভের বর্ণনা দিতে পর্যন্ত ভুলল না।

তাহলে এক কথায় বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এই যে তোমার মতে ওরা আদৌ যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে না।—বলল বোদিয়ে।—দেখ আমি ও দেশটায় যাইনি কিন্তু বরাবরই আমি ঐ একই কথা বলে আসছি। মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না তাই ওরা সময়ে সময়ে এমন ব্যবহার করে যাতে মনে হয় যেন ওরা যুদ্ধ চায়। সেদিক থেকে আমাদেরও দোষ কিছুটা আছে। কাগজে প্রায়ই অনেক বাড়তি কথা বলে। আমেরিকার কথা তো আর বলার কিছু নেই অঢেল বেকুব আছে ওদেশে। আর প্রত্যেকটি বেকুবেরই নিজের কাগজ আছে যাতে তার যা যখন খুশি তাই-ই ছাপে। তোমার এই ঘুরে আসার ঘটনাটা যদি বিস্তৃত-ভাবে লেখো তবে খুবই ভালো হয়। ঠিকই বলেছ তুমি—আবহাওয়া পরিষ্কার

করার জন্যে যা কিছু সম্ভব সব কিছুই করতে হবে।

নিশ্চয়ই আমি লিখব। শুধু বলতে পারছি না কারা ওটা ছাপবে। ওরা চেষ্টা করছে আমার মুখ বন্ধ করতে। আমার সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধটা পড়েছ নিশ্চয়ই ?

মৃদু হাসল বেদিয়ে।

ওসব জিনিসে কে আবার কবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে ? তাছাড়া ওটা বেরিয়েছে সবচাইতে চোখা একটা কু-খ্যাত কাগজে। চমকপ্রদ খবর ছড়ানো—মার্কিন বাঁদরামো। ছবি সম্পর্কের ঐ গপ্পোটাই ধর না কেন—ভেলাসকোয়েজ যেন রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায় !...ওটার উপরে তুমি তেমন গুরুত্ব দাওনি নিশ্চয়ই ?

প্রবন্ধটার উপরে নয়—ওর লেখকদের উপরে।

ট্রানজকের কার্যকলাপ সম্পর্কে সব কিছুই বলল সাবলঁ বেদিয়ের কাছে। আর মন দিয়ে শুনল বেদিয়ে।

আমি তোমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু,—সাবলঁর কথা শেষ হতেই বলল বেদিয়ে,—জানি না তোমার মনে আছে কিনা. ডাঃ লাফোসি ছিল জেন দ্য' আর্ক বাহিনীতে। আসত তোমার সঙ্গে দেখা করতে। সে বলেছিল তোমাকে যে ব্রাইভের লোকেরা তোমার প্রবন্ধটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে। মনে আছে ? বহুদিন আমি গোটা রাত জেগে ঐ সব লেখা হাতে কপি করতাম—ডুপ্লিকেটর ছিল না আমাদের। চমৎকার দিন গেছে সে সব। আমরা সবাই ছিলাম তখন রোমাণ্টিক। কথাবার্তায় এখন তুমি রোমাণ্টিকই আছ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা রাজনীতিকেরা কঠিন গাম্ভীর্যের শিকলে বাঁধা পড়ে গেছি। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারি আমি। কিন্তু তবুও একটু সংযম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি। তুমি বললে যে রুশেরা শান্তি চায়। আমিও তোমার সঙ্গে একমত। যদিও আমি মনে করি যে ওদের শান্তিপ্রীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে পশ্চিমীদের শক্তিরই অনুপাতে। আমরা যে আজ এখানে এইভাবে বসে শান্তিতে কথাবার্তা বলতে পারছি, প্রথমত সেটাও আমেরিকার দৌলতে। আমি সরলভাবেই বলছি তোমাকে, খুবই সংকটজনক অবস্থার ভিতরে পড়েছে আমাদের সরকার। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের জড়িত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে কমিউনিস্টরা। তুমি তখন এখানে ছিলে না. যখন আগষ্ট মাসে শোভাযাত্রাকারীরা প্লেস দ্যদা কঁকর্দ-এ জোর করে ঢোকার চেষ্টা করেছিল আর হামলা করেছিল মার্কিন দূতাবাসের উপরে। আমরা তো আর কমিউনিস্টদের চাকায় তেল দিতে পারি না। ট্রানজকের পর্দার আড়ালের কার্যকলাপের উপরে তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ। আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে তুমি একটু অতিরঞ্জিত করছ—এখানেও আবার তোমার সেই রোমাণ্টি-সিজমেরই ব্যাপার এসে দাঁড়াচ্ছে। আদপেই ওরা ঐ সব নরহত্যাটত্যার ভিতরে যেতে চায় না। শুধু ধুয়ো তোলে ডলার আদায় করার জন্যে। একটু থাম। যে দিক থেকেই তুমি দ্যাখো না কেন ট্রানজক হচ্ছে একটা মার্কিন প্রতিষ্ঠান। আর এ-ও জানি আমি যে নিভেল রয়েছে এর ভিতরে। কিন্তু সে তো আর রাজনীতিক নয়, তাই নয় কি ? ও একজন খ্যাতিমান কবি. ব্যস্—ওকে আর পাঁচটা মানুষের হিসেবে বিচার করা চলে না। আমরা দুজনে যখন প্রতিরোধ

আন্দোলনের ভিতরে কাজ করছি ও তখন সামরিক পুলিসের দপ্তরখানায় বসে সার্সি'র উপরে কবিতা লিখছে। না, আমি ওর বিরুদ্ধে কোনো দোষারোপ করতে চাই না—ও হচ্ছে ঐ ধরনেরই ছেলে। তুমি নিজেই বলেছিলে না, রবার্ট বলে কোনো একটা লোক সমস্ত ব্যাপারটা পরিচালনা করছে। ঐ নামটা আমি আর আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু হয়তো তোমার কথাই ঠিক। অবশ্য, যখন আমি লোকপরম্পরায় শুনলাম যে তুমি ওদের হয়ে মস্কো যাচ্ছ তখন আমি আদৌ খুশী হইনি। কিন্তু সে সব এখন অতীতের ইতিহাস। কী আশা কর তুমি? প্রচুর যথেচ্ছাচারী উৎকেন্দ্রিক লোকের সৃষ্টি হচ্ছে আমেরিকায়। তারা বয়সে তরুণ, সংসারী হয়নি এখনো। যখন একজন প্রস্তাব করছে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে প্রত্যেকটি চীনাকে ধ্বংস করে ফেলার কথা, আর একজন তখন প্ল্যান ভাঁজছে মস্কোর উপরে বিরাট একটা জমকালো অভিযান চালাবার। আর তৃতীয়জন বিল কস্টারকে পাঠাচ্ছে প্রাগে বিপ্লব সংগঠিত করার জন্যে। এ সব হচ্ছে যাকে বলে চূড়ান্ত বেকুবি। কিন্তু তবুও এ কথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে যে আমরা আমেরিকার সঙ্গে আলাদা হয়ে গিয়ে একা একা নিজেদের নিয়েই থাকতে পারি না। শোনো সাবল', আমাকে লোকে বলে আশাবাদী, বলে প্রতিশ্রুতি দেই বেশি কিন্তু কাজে করে উঠতে পারি না। এর ভিতরে একটা রহস্য আছে —ওটা হচ্ছে আমার পেশারই একটা অঙ্গবিশেষ। আমি সাহায্য করব তোমাকে —সমস্ত ব্যাপারটা ভালোকরে মেপেজুকে ধীরে ধীরে টেনে তুলব। কিন্তু ভাববিলাসী হয়ো না। ট্রানজকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে নিজেরই লোকসান হবে তোমার। ওদের পেছনে প্রচুর শক্তি আছে। তাছাড়া তোমার মতো প্রথম শ্রেণীর এক সাংবাদিক, একজন ফরাসী, মানে একটা সভ্য জাতির প্রতিনিধির পক্ষে একটা সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে লড়াই ঘোষণা করে এভাবে শক্তি, স্বাস্থ্য, আর সময় নষ্ট করার কি মানে হতে পারে?

তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে তোমার মত হচ্ছে আমি চুপ করে যাব?

না, আমি তা বলি না যে তুমি চুপ করে যাও। প্রত্যেকটা বিষয় ধরে এক এক করে বিচার করে দেখি এস। প্রথমত তোমার এজেন্সি: আমার মনে হয় ও ব্যাপারটা সহজেই ফয়সালা করা যায়। বলেছিলে অগ্রিম টাকা নিয়েছ তুমি। কোনো ক্ষতি নেই তাতে। অনেক দিন কোনো কিছু লেখনি আর টাকাটা খরচ করে ফেলেছ। টাকাটা ফেরত দেয়া নেহাত বোকামি হবে। দ্বিতীয়ত ঐ প্রবন্ধটা—তোমার গায়ে কাদা ছেটানোর চেষ্টা। বিনা প্রতিবাদে ওটা অমনি অমনি ছেড়ে দেব না। যদি তুমি রাজী থাক, জবাবটার মুসাবিদা আমিই করতে চাই। অবিশ্যি তুমি আমার চাইতে হাজার গুণ ভালো লেখ। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমি লেখার স্টাইলের কথা আদৌ চিন্তা করছি না, বরং ভাবছি ঠিক মতো রাজনৈতিক দিক দিয়ে লেখার কথা—প্রত্যেকটি কথা ওজন করে করে বসাতে হবে। সব শেষে আসছে তোমার প্রবন্ধ। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, তোমার জবাবটা ছাপা হয়ে গেলে পরে যে কোনো একটা বড় কাগজে তোমার লেখাটা প্রকাশ করা শক্ত হবে না। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে এ সম্পর্কে দুমে'র সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।

অগ্রিম টাকা আর ঐ প্রবন্ধের ব্যাপার—ও সব এখন এই মুহূর্তে অবান্তর। খুব সাদামাঠা কথায়ই বলতে হচ্ছে আমাকে যে তার মানে তুমিও ভাব—

তোমার কথায় বাধা দিচ্ছি বলে মাফ করো ভাই, বিশ মিনিটের ভিতরেই আমাকে যেতে হবে রামাদিয়েরয়ের কাছে। খবরটা কাল আমি পাঠিয়ে দেব তোমারে কাছে। স্টাইলের দিকে নজর দিও না, আমি সাবল্ঁ নই—আমি লিখি মফঃস্বলের উকিলের মতো। তাছাড়া দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে এক্ষুনি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে আমাকে।

গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সাবল্ঁর করমর্দন করল বেদিয়ে।

পরের দিন বেদিয়ের এক সেক্রেটারি চিঠিটার মুসাবিদা নিয়ে এল সাবল্ঁর কাছে:

কোনো একটা সংবাদপত্র "মস্কোর পয়লা নম্বরের দালাল" শিরোনামা দিয়ে কতকগুলি বানানো মিথ্যে কথা লিখেছে আমার নামে। সেগুলো সত্যের এমন নিদারুণ অপলাপ যে আমার পক্ষে তা খণ্ডন করতে যাওয়াও বাহুল্য বলে মনে হয়। সে যা-ই হোক, তবুও আমার মনে হয় এটা জানিয়ে দেয়া দরকার যে কোনোদিন মস্কোর দালাল হওয়া তো দূরের কথা আমি সমগ্রভাবে সোবিয়েত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী। কারণ পশ্চিমী স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে ওর কোনো তুলনাই হয় না। এই কারণেই ফরাসী কমিউনিস্ট যারা ক্রেমলিনের সমর্থক তাদের আচরণকে আমি ঘোরতর দেশদ্রোহিতা বলে মনে করি। কোনো একটা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি মস্কো যাবার এবং লৌহ যবনিকার আড়ালে কি ঘটছে না ঘটছে তা লেখার জন্যে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। ছ'মাস সোবিয়েত ইউনিয়নে থাকার পরে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে ক্রেমলিন সম্পর্কে যে সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করা হয়েছে আর যে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংগঠন স্থাপিত হয়েছে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। রুশরা এ শিক্ষা পেয়েছে যে তারা যে আক্রমনাত্মক নীতি অনুসরণ করে চলেছিল তাতে তাদেরকেই বিরাট একটা বিপজ্জনক ঝুঁকির ভিতরে জড়িত হয়ে পড়তে হবে। আর তাতেই শান্তির জন্যে তাদের এতটা ব্যগ্র করে তুলেছে। আমি আশা করি যে আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে যতই আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন দৃঢ় হবে ততই আমরা শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হব আর পূবের দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার যুগকে নিকটতর করে তুলবে।"

রাগে আগুন হয়ে উঠে সাবল্ঁ কাগজখানাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলল।

বেদিয়েকে গিয়ে বলো যে আমি কোনো মন্ত্রীর রক্ষিতা নই—আমার নাম সাবল্ঁ, বুঝেছ? বলো গে যে সে—যদি না মিথ্যে কথা বলে,—আমার লেখা প্রবন্ধ নকল করে চালাতে পারে, কিন্তু আমি তার ঐ পা-চাটা চিঠি নকল করতে যাচ্ছি না। বৃথাই সে তার মেহনত খরচ করেছে। তোমাদের মন্ত্রী-দপ্তরটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করা উচিত, বুঝলে হে ছোকরা? প্রচুর নোংরা জমে উঠেছে ওখানে। দুর্গন্ধ ছাড়ছে! দূষিত বায়ু বের করে দেয়ার সময় এসেছে।

সেক্রেটারি গিয়ে জানাল:

আমি মঁশিয়ে সাবলঁর কাছে গিয়েছিলাম স্যার। আমার মনে হয় উনি মৃগীরোগী। আমার সামনেই সত্যি সত্যি ফিট হল। আপনার চিঠিটা পা দিয়ে দলে, চেঁচিয়েমেঁচিয়ে—

মনে মনে ভাবতে লাগল বেদিয়ে। ওর হাতের মুঠো গলে ফসকে বেরিয়ে যাবে সাবলঁ সেটা কি করে ঠেকান যায়? রুশরা ওর মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। অবশ্য, ও পুরানো ধরনের মানুষ, ছোঁয়াচ লাগার ঊর্ধ্বে। কিন্তু ওকে বেশি দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ওরা যদি অগ্রিম নেয়া টাকা ফেরত দেবার জিদ করে খুবই কঠিন অবস্থার ভিতরে পড়ে যাবে ও। আর মানুষ যখন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় তবে যে কোনো ধরনের বোকামি করাই তার পক্ষে সম্ভব।

নিয়েলের ওখানে একসঙ্গে বসে খাচ্ছিল বেদিয়ে। কথায় কথায় সংবাদ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কথা উঠল। আর সেই সুযোগে বেদিয়ে সাবলঁ সংক্রান্ত সব ঘটনা বলল তার কাছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষে কস্টার হয়তো ঠিকই উপযুক্ত লোক, কিন্তু আমাদের পথটা একটু অন্য ধরনের। ওভাবে সাবলঁর সঙ্গে আলোচনা করা তার উচিত হয়নি। এককভাবেই ওকে প্রবন্ধটা লিখতে দিলেই পারত। এরকম অবস্থায় সাবলঁকে ফেলে দেয়াটা উচিত হয়নি। সাবলঁ প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক, তাছাড়া খ্যাতিমান।

মুচকি হাসল নিয়েল।

তুমি কি ভাব কস্টার চেকোস্লোভাকিয়ার দিক থেকে উপযুক্ত লোক, তাই, কি? আমি তা ভাবি না। জর্জিয়ার মতো অঙ্গরাজ্যের পক্ষেও উপযুক্ত কিনা সে সম্পর্কেও আমার সন্দেহ আছে। ও হচ্ছে একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ।

নিয়েল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাই পরে নিজের মনেই বলেছিল যে গোঁয়ার-গোবিন্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজের উপরেই বিপদ ডেকে এনেছিল। একবার জেনারেল রিজিয়ন এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। ও ঠিক করল তাকে ওর সংগ্রহ দেখাবে। দেখতে দেখতে জেনারেল হাত থেকে একটা নস্যির ডিবে ফেলে দিল—একটা সিভ্রে পোর্সিলিনের উপরে 'নতরদাম দ্য তেরমিদোর'-এর মতো থেরেসি তালিয়েঁর ছবি আঁকা। নিয়েলের চোখে মুখে নিদারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে রিজিয়ন বলল: ওটা তো জুড়ে নিতে পারবেন। আজকাল এ সবের উপরে শিল্পকর্ম করা শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কে আমাকে একটা থালা উপহার দিয়েছিল—তাতে আঁকা ছিল আমার ছবি। পিছনে ছিল 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। আমার স্ত্রী সেটা ভেঙে ফেলল। কিন্তু সেটা এমনভাবে জুড়ে দেয়া হল আবার যে বুঝতেই পারবেন না।

ভাঙা নস্যির কৌটাটা সামনে নিয়ে নিয়েল ভাবতে লাগল: কী সব জঘন্য লোকই না আছে আমেরিকায়। জেনারেল রিজিয়নের কাছে তার মুখ আঁকা একটা বাজে প্লেট আর একটা শিল্প নিদর্শন হল গে একই বস্তু। লোকটা কী করেছে সেটুকু বুঝতে পর্যন্ত পারল না। ইয়োরোপ অবশ্য একটা বিরাট যাদুঘর। আর আমেরিকানদের বসান হয়েছে তারই কর্তৃত্বের আসনে। ঐ

জেনারেল রিজিয়ন এখানকার সমর-নায়কদের কাঁধে পা দিয়ে মাথার উপরে বসে রয়েছে। খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আচারব্যবহার তো শেখা উচিত মানুষের। স্নানঘর তো আর আস্তাবল নয়।

সাবল'র কথা মনে পড়ল ওর। ঠিক করল নিভেলের সঙ্গে কথা বলবে।

এ ধরনের ব্যাপারট্যাপার আদৌ আমি পছন্দ করি না। সাবল' আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।

তার নমুনা পেয়েই আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি।—আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল নিভেল,—এখন আর কোনো রকমের বিপদের ভিতরে ফেলা ওর পক্ষে শক্ত। একটি মাত্র পথই এখন খোলা আছে ওর সামনে—সেটা হচ্ছে লু'মানিতে।

সেটা তো আরো খারাপ।—উষ্ণ হয়ে উঠে বলল নিয়েল,—কমিউনিস্টদের এমন একটি উপহার দিতে যাওয়া কেন? তুমি যে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছ তা আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু প্রবন্ধটা নিতান্তই ভোঁতা। কস্টারের কাছে সাংবাদিকতা আর মুষ্টি-যুদ্ধ একই কথা। সবকিছু ধ্বংস করতেই ও ওস্তাদ।

নসি্যর ডিবেটার কথা মনে পড়ল ওর। নিদারুণ ব্যথায় মুখখানা বেঁকে উঠল।

বেশ, তাহলে আমার কি করা উচিত বলে মনে হয় আপনার?

সাবল'র সঙ্গে গিয়ে কথা বল। বলগে যে প্রবন্ধটা নোংরা। ওসব কোনো কিছুই তুমি বলনি। কস্টার একটা গুন্ডা। মোট কথা ওকে শান্ত কর। খবর পেয়েছি আর্থিক দিক থেকে ও সংকটের ভিতরে আছে। সেদিক থেকে চেষ্টা কর ওকে টেনে আনার। ও যেন না মনে করে যে ওকে কোণঠাসা করে কাজ হাঁসিল করা হচ্ছে ওকে দিয়ে।

সেই রাত্রেই নিয়েল আতস কাচ নিয়ে নসি্যর ডিবেটার টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে বসে গেল। সমস্ত টুকরোগুলো সংগ্রহ করল কিন্তু থেরেসি তালিয়ে'র চোখ দুটো খুঁজে পাওয়া গেল না। মেরামতের অযোগ্য হয়ে গেছে।

অবাক কান্ড, বরার্টসের মতো চালাক চতুর লোক কী করে এ ধরনের বেকুবি করতে পারে! ট্রানজম-পরিকল্পনাটা চমৎকার। কিন্তু ঐ কস্টারকে পাঠানো লো-র কাছ থেকে এর বেশী কিছু আশা করেনি। লোকটা একটা আস্ত বোকা। কিন্তু বরার্টস? হয়তো বা নিয়েলের মুঠো আলগা হয়ে যাচ্ছে আর শুরু করেছে ইউরোপীয়দের মতো চিন্তা করতে?

তুমি সব কিছুই বিচার করছ ইউরোপের লোকদের দৃষ্টিকোণ থেকে।—জেনারেল রিজিয়ন বলেছিল একবার ওকে। যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে সেটা খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি। ইউরোপ দেউলে হয়ে পড়েছে, দিনে দিনে আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। ফরাসীরা আমেরিকার প্রতিরক্ষা ব্যূহের ভিতরে পশ্চিম জার্মানিকে ঢোকানোর বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিল। অবিলম্বেই ওদের শায়েস্তা করা হয়েছিল। কখনো কখনো একটু কড়া হাতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাটা ক্ষতিকর নয়। অবশ্যি সেটা মানুষের বেলায়, নসি্যদানির বেলায় খাটে না।

নিভেলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেল সাবল':

প্রিয় সাবল',—তোমার কাছে চিঠি লিখতে খুবই সংকোচ বোধ করছি।

আমার ভয় হচ্ছে, কোনো একটা বিবৃতির জন্যে হয়তো তুমি আমাকেই দায়ী করেছ। কিন্তু ওতে আমার কোনোই হাত ছিল না। তাছাড়া ওতে সম্মতি দেয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে সব কথা আমি কোনোকালেই বর্লিন প্রবন্ধটার ভিতরে যখন আমার জবানীতে লেখা সেই সব কথা পড়লাম তখন দারুণ বিরক্তি বোধ করলাম। এই চিঠির বক্তব্য ছাড়াও অনেক কিছু কথা আলোচনা করবার আছে আমার তোমার সঙ্গে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

গালপেড়ে উঠল সাবর্লং। হাত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করছে, ব্যাটা নোংরা জীব! ও কি সত্যি সত্যিই ধরে নিয়েছে যে সাবর্লং বিশ্বাস করবে ওর কথা? ওর মতো একটা শয়তানকে কখনো উঠোন মাড়াতে দিতে নেই। তারপরেই ইতস্তত করতে শুরু করল সাবর্লং। যা-ই হোক না কেন, মানুষকে তো আর অত সহজে বুঝে ওঠা যায় না। নিভেল যদি তার বক্তব্য শোনাতেই চায় ওকে, ও তো আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। এমন তো হতে পারে যে ও তেমন বেশি কিছু জানে না এ সম্পর্কে?

কিন্তু নিভেলের মুখের অমায়িক হাসি দেখেই ওর নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আবার পস্তাতে শুরু করে দিল মনে মনে। ওর উচিত ছিল লিখে দেয়া যে অগ্রিম হিসেবে ও যে টাকাটা নিয়েছিল সেটা ফেরত দিয়ে দেবে, কিন্তু তা বলে কোনো বেশ্যার দালালকে অভ্যর্থনা করতে রাজী নয়। আদিম কালের কাহিনী থেকে শুরু করল নিভেল। বলল মানুষের জীবনে আকস্মিকতা ও নির্বাচনের স্বাধীনতার আপেক্ষিক ভূমিকার কথা। শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে মানুষ তার নিজের পথ বেছে নেয়ার দিক থেকে স্বাধীন, অন্তত পক্ষে আত্মিক জগতে তো বটেই। বাহ্যিক ঘটনাবলী মানুষের উপরে হয়তো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু চিন্তা ও অনুভূতির উপরে নয়। একান্ত সতর্কতার সঙ্গে ও এল ট্রানজক সম্পর্কিত ব্যাপারে। বলল যে যখন এজেন্সি দ্য শর্মকে বলেছিল সাবর্লংকে তাড়া দিতে তখন ও পারীতে ছিল না।

মাত্র একবারই তুমি আমাদের এজেন্সির সম্পর্কে এসেছ। এ যেন একটা গোটা পৃথিবী। যেখানে একজন জানে না যে অন্য অফিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে ফরাসীরা মনে মনে সবাই নৈরাজ্যবাদী। আমি শুনলাম কস্টারের ঐ বক্তব্যের জন্যে খুবই চটে গেছ তুমি। আমি ওর কোনো মানেই বুঝতে পারি না। বেশ দীর্ঘদিনই আমি আমেরিকায় বাস করে এসেছি। ও দেশটার সঙ্গে আমার বেশ শক্ত একটা বন্ধনও আছে যার জোরে এ কথা বলার অধিকার আছে আমার যে কতগুলো আমেরিকানের কাজ-কারবার দেখে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কস্টার হল গিয়ে একটা সাংবাদিক-গুন্ডা। আমেরিকান-দের যদি এতটুকুও জ্ঞানগম্যি থাকত তবে ওর মতো লোককে পাসপোর্টই দিত না। তা সে যা-ই হোক, ও প্রবন্ধটার সঙ্গে আমাদের এজেন্সির আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। মনে হয় তুমি নিজেই বুঝতে পেরেছ যে তোমার সম্পর্কে আমি ওসব কথা বলতে পারি না—অসম্ভব অসম্ভব সব কথা আমার বক্তব্য বলে চালিয়েছে।

তবে আমি যে প্রতিবাদ প্রকাশ করি নি তার একমাত্র কারণই এই যে তা হলে ঐ কুৎসাকারীর ফাঁদেই পা দিতে হ'ত। একটু চুপচাপ থাকলে যেটা আর কারুর নজরে আসবে না সেটা নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ কি?

মন্তব্যটা একটু থেমে থেমেই উচ্চারণ করল নিভেল। কি জবাব দেবে সাবর্ল, কিন্তু একান্ত ধৈর্যে চুপ করে রইল সাবর্ল। নিভেল বলে চলল:

তোমার প্রবন্ধটা ছাপা সম্পর্কে আমি কথাবার্তা শেষ করে ফেলতে চাই। শুনলাম রুশদের সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা নিয়েই ফিরেছ তুমি। ভালো কথা, আমার নিজের তরফ থেকে এইটুকুই বলতে পারি যে ঠিকই আছে। যা-ই হোক না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে বিশুদ্ধ একটি সংবাদপ্রতিষ্ঠান। এতটুকুও রাজনৈতিক ভিত্তি নেই এর পিছনে। তাছাড়া তোমার বুদ্ধির উপরে এটুকু আস্থা আছে আমার যে তুমি জাতির বিপক্ষে দাঁড়াতে চাও না। বৈষয়িক দিক থেকে আমার মনে হয় যে সব চাইতে ভালো সমাধান হবে যে তোমার প্রবন্ধের জন্যে আমাদের তরফ থেকে টাকা দেয়া। তা প্রবন্ধটা আমরা ছাপি আর না ছাপি। কারণ আমরা যখন লিখতে বলেছিলাম আর তাতে তোমার সময়ও ব্যয় হয়েছে প্রচুর। তুমি কিন্তু ওটা অন্য কোথাও দিও না। আশাকরি ভুল বুঝবে না, কিন্তু বিশ্বাস কর আমাকে ব্যাপারটা হচ্ছে নিছকই প্রতিযোগিতার ব্যাপার।

সাবর্ল উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই নিভেলের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। ও শুনেছে যে সাবর্ল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, হয়তো তাই মুষ্ঠিযোগের ব্যবহার করে বসাটাও ওর পক্ষে অসম্ভব নয়।

আমার বয়েস চুয়াল্লিশ বছর,—ধীর শান্ত-কণ্ঠে বলল সাবর্ল।—অজ্ঞতার অজুহাত দেখানো হবে বেকুবি। আমার বয়সের একটা লোক যখন একটা কুখ্যাত বদমায়েশকে ঘরে ঢুকতে দেয়, তার জন্যে দায়ী সে নিজেই। বদমায়েশ চিরদিনেরই বদমায়েশ। কি অবস্থায় পড়ে সে বদমায়েশ হয়ে ওঠে তা আমি জানি না। আকস্মিকতার ভূমিকা সম্পর্কে বলছিলে না তুমি হয়তো তা-ই। তা সে যা-ই হোক না কেন, তোমার বেলায় এ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বহুদিন আগে। আর ঐ টাকার কথা বলছ, সে আগাম নেয়া টাকাটা আমি ফেরত দেব। আমি খুব ভালো করেই বুঝি যে টাকাটা তুমি আমাকে দান করতে চাইছ, নয়তো আমার নীরবতাটাই কিনতে চাইছ। কিন্তু সেদিক থেকে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে না—ঢের বোকামো করে ফেলেছি, ওটুকু আর নয়। বছর শেষ হবার আগেই তুমি তোমার টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবে। তাতে যদি তোমার অসুবিধে হয় তবে মামলা এনো আমার নামে। ব্যাস্ স্পষ্ট কথা।

নিভেল বুঝতে পারল তার বাক্য ব্যায় বৃথা। উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা মামুলি শুকনো নমস্কার করে বেরিয়ে গেল। ওর চলে যাওয়ার পরে পিছনে দোরটা বন্ধ হতেই এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগে ফেটে পড়ল সাবর্ল। টেবিলের উপরের স্তূপীকৃত খবরের কাগজগুলো দু হাতে তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।

ক্যাঁপেরলে থেকে মাদলিন আর ওর স্ত্রী ফিরে এল।

এরই মধ্যে ছুটি শেষ হয়ে গেল, সে কি ?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সাবলং। লুসি জানে যে একটা নিদারুণ মানসিক উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কাটছে ওর দিন। এ সময়ে ওকে আপন মনে থাকতে দেয়াই ভালো। তাই চেষ্টা করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। প্রত্যেক দিন ভোরে উঠে প্রথমে একটা বড়ো ব্রিফ-কেসের ভিতরে করে ট্রানজকের উপরে লেখা ওর সরু পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে চারটে খবরের কাগজের অফিস ঘুরে এসেছে—সবাই ওকে ডেকে বসিয়েছে সমাদর করে। ঐ কুৎসিত প্রবন্ধটার উপরে করেছে ঘৃণাপ্রকাশ। কিন্তু যে মুহূর্তে এজেন্সিটা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছে অমনি সবার মুখের হাসি গেছে মিলিয়ে, মুখগুলো হাঁড়ি হয়ে উঠেছে। জবাব পেয়েছে নানান রকমের: একটা সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের উপরে আক্রমণ করাটা ঠিক হবে না, কেন না সেটা একটা অসাধু প্রতিযোগিতা বলেই ধরে নেবে সবাই। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা ও ধারণার ভিত্তিতে অভিযুক্ত করাটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়—প্রায় সমস্ত চিন্তাশীল লোকদের কাছে সেটা ওর বিরুদ্ধে যে পন্থা গ্রহণ করার জন্যে নিদারুণ ঘৃণার উদ্রেক করেছে, এতেও ঠিক সেই কথাই মনে করিয়ে দেবে।

লা মদং কাগজের এক সুপরিচিত সংবাদদাতা লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিল সাবলংকে। সাবলং যখন তার কাছে ট্রানজকের কার্যকলাপ সম্পর্কে বলল, আদৌ বিস্মিত হবার কোনো ভাব দেখাল না সে।

গত শরৎকালে আমি ছিলাম আমেরিকায়। বরার্টের নাম শুনেছি। একটি চরিত্র বটে। রিপাবলিকান ও হ্যারিম্যান দু দলের সঙ্গেই ওর খুব সদ্ভাব। ও যে খুব একটা প্রভাবশালী লোক তা নয়। অবিশ্যি ওরা আমাদের মতো এমন ঢিলেঢালাও নয়। অল্পবিস্তর সবাই ওখানকার গোছালো। ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি তোমার। ফরাসী সংবাদপত্রগুলোকে আমি দু ভাগে ভাগ করে থাকি: এক দলে হচ্ছে যারা নিজে থেকেই আমেরিকানদের খিদমত করতে শুরু করে দিয়েছে আর এক দল—যারা শুধুই নতি স্বীকার করে। নিভেলকেই ধর না কেন। লোকে বলে ও একজন ভালো কবি—কিন্তু আমার তো ওর কবিতা বিরক্তিকর লাগে, অন্তর স্পর্শ করে না। 'মিসিসিপির জামাই' নামেই ও পরিচিত। হ্যাঁ, কিন্তু কি আশা করতে পার তুমি ওর কাছ থেকে? জার্মান আমলে ও কি করেছে না করেছে ভগবানই জানেন। ওর ভাগ্য ভালো যে মুক্তির পরে প্রথম মাস কয়েক ও ছিল অনেক মাইল দূরে। নইলে ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত।

তোমার কি মনে হয়—জিজ্ঞেস করল সাবলং,—ট্রানজক সম্পর্কে লা মদং কিছু ছাপতে রাজী হতে পারে, অন্ততঃ সম্পাদকের নামে চিঠিপত্র হিসেবেও ?

মোটেই না। ইতিমধ্যেই আমাদের সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেছে যে আমরা পরের চরকায় কাঠি দিয়ে থাকি। এমন একটা কাগজও নেই যে ওটা ছাপবে—অবশ্য একমাত্র ল্যু'-মানিত ছাড়া। দেখছ না এখন আমরা আমেরিকার সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা। আর তুমি চাইছ কি না ওদের আক্রমণ করতে। নেহাত বোকামো। আমার কথা হচ্ছে এই যে ও সব ব্যাপার চেপে যাও।

সাবলং চেপে যেতে পারল না। ফ্রাঁ-তিরোর কাগজের সাংবাদিক ওর পুরানো

বন্ধু শমেকে খুঁজে বের করল সাবলঁ। স্কুলে পড়ার সময় থেকে ওরা পরস্পর পরিচিত। জার্মান দখলের সময়ে ওর চালচলন খুবই ভালো ছিল। কোনো কাগজে কিছু লেখেনি। কায়ক্লেশে জীবনধারণ করেছে। সাবলঁর কাহিনী শুনল শমে।

আমেরিকানরা মূর্খ,—রেগে উঠে বলল শমে, সবাই জানে সে কথা—তুমি কিছু আর একটা নতুন দুনিয়া আবিষ্কার করনি। কিন্তু তুমি কি করছ তা বুঝতে পারছ ? মানে, সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্টরা ওটাকে আঁকড়ে ধরবে—অমন একটা ব্যাপার ফাঁস করে দেয়া তো ওদের কাছে সোনার খনি হাতে পাওয়ার সামিল। ওটার ব্যাপারে আমার সাহায্য তুমি আশা করো না। এমন কি ঐ কমিউনিস্টদের ভাষায় যদি "কিনে নিয়েছে" এ বদনামও দাও তবুও না।

সাবলঁ ঠিক করল বানালিয়ের সঙ্গে দেখা করবে। 'লা পাত্রি' দলের পুরানো সাথী সে ওর।

বানালিয়ে কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে সত্য,—বলল সাবলঁ লুসির কাছে,—কিন্তু লোকটা ন্যায়নিষ্ঠ।—মনে আছে যখন গেস্তাপোরা আমাদের পেছু ধাওয়া করছে সে আমার আর গারোর কাছে বলেছিল, 'তোমরা চলে যাও, আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখবখন যাতে গন্ধটুকুও না পায়।

একটু দেঁতো হাসি হাসতে হাসতে বানালিয়ে শুনতে লাগল সাবলঁর কথা।

আমি এর ভিতরে অন্যায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কস্টার সৎ চেকদের সাহায্য করেছিল বলে তুমি রুখে উঠেছ ? কী অপূর্ব গৌরবজনক ব্যাপার—নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করছে মানুষটা। ওরা যদি একটা কমিউনিস্টকে খুন করে থাকে তবে আমি এই জন্যেই ওদের গাল দেব যে কেন আরো বেশি কমিউনিস্ট খুন করেনি। কম করে অন্তত ওদের হাজার দশেককে খুন করে ফেলা উচিত। তোমার যদি কমিউনিস্টদের দলে যোগ দেবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে যাও। তোমাকে গুলির মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়ার প্রথম সুযোগের জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকব। গারো ছিল আমাদের সঙ্গে প্রতিরোধ আন্দোলনে। বিশ্বাস কর ওরা যদি তাকে বন্দী করে নিয়ে যেত বা গুলি করে মারত তবে অন্তত আমি এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলতাম না। ওদের সঙ্গে মোলায়েম হবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেকটি লোকই সৈনিক। নিরপেক্ষ বলে কোনো কথা নেই—ওটা হচ্ছে উনিশ শতকের বাসি কথা। তুমি কিছু আর স্বর্গের দেবদূত নও, সাধারণ মানুষ। তার মানে তোমাকে নির্দিষ্ট ভাবে স্থির করতে হবে—হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে, নয়তো ওদের সঙ্গে।

হয়তো, যদি তেমন অবস্থা ঘটে তবে আমি গুলির মুখেই দাঁড়াব—মুচকি হেসে বলল সাবলঁ,—কিন্তু এই মুহূর্তে তেমন কোনো বাসনা নেই। মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে চিরবিদায় নেয়ার সময় হয়েছে, এমন কি করমর্দনেরও তার দরকার নেই।

কী বলল বানালিয়ে ?—লুসি জিজ্ঞেস করল।

কী আর বলবে ? বলল কমিউনিস্টদের দলে যেতে। ওর কাছ থেকে তাদের ঠিকানা জেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই আমার। নিভেল বলেছিল, নির্বাচনের

স্বাধীনতার কথা। ও সর্তের চেলা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। ওরা আমাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মাতাল যেমন মদ্য-বর্জন সমিতিতে যায়, কমিউনিস্টদের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ঠিক তেমনিই।

তাহলে কি করবে এখন ঠিক করলে?

তা তো ওরাই ঠিক করে দিয়েছে। এখন আমার যেটুকু করবার তা হচ্ছে চুপচাপ বসে থাকা আর মদ খাওয়া।

সাবল' নিজের হাতেই এক গ্লাস কালভাদো ঢেলে নিয়ে নিদারুণ বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে রইল। আর একটি কথাও বলল না লুসি। ও স্পষ্ট বুঝল যে ওর স্বামী এক অসাড় জড়ত্বের ভিতরে ডুবে যাচ্ছে—মাস কয়েকের দারুণ উত্তেজনার পরে যেমন করে লোকে অবসাদে ডুবে যায়।

আটচল্লিশ

সাবল'র সম্পর্কে প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল লো-র মুখে। সুসংবদ্ধ লেখা, যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি তিক্ত—আবার সত্যও বটে। লেখাটি যে কস্টারের তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। একমাত্র ওর পক্ষেই সম্ভব এ ধরনের লেখা। বোধহয় একটা বছর ওকে প্রাগে ফেলে রাখাটা বোকামোই হয়ে গেছে। অবশ্য কিছুটা কাজ ওরা হাসিল করেছে ওখানে আর রবার্টও খুশী হয়েছে। কিন্তু বাদাম ভাঙতে তো আর ভারী হাতুড়ি ব্যবহার করা যায় না। লোকটা অসৎ ব্যবহার করেছে নিভেলের সঙ্গে। অবিশ্যি সে হল ফরাসী। কোনো ফরাসীই বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু নিভেলও পথ খুঁজে বের করেছে। কোনো আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন পত্রিকাই আর সাবল'র দিকে ফিরে তাকাবে না। সবার চোখেই ও লাল ছাপ-মারা হয়ে গেছে। লজ্জার কথা যে মেরী চিরজীবনের মতো একটা ফরাসীর সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে ফেলেছে। কিন্তু সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে। আর তাছাড়া ফরাসী হিসেবে নিভেল খুবই ভদ্র। সবার তো আর আমেরিকান হয়ে জন্মাবার সৌভাগ্য হয় না। প্রচুর ফরাসী আছে—তিন কোটি, চার কোটি। ফরাসীদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না—সেদিক থেকে নিভেল খুবই উপযুক্ত লোক। ছেলেটার সঙ্গে খুবই কড়া ব্যবহার করেছে ও। প্রকারান্তরে ওকে শাসিয়েছে পর্যন্ত—শিক্ষা দেবে বলে। খুবই নির্মম ব্যবহার হয়েছে সেটা। সমস্ত ব্যাপারটার সফল পরিণতির জন্যে ওকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা তার করে দিতে হবে। ট্রানজককে ধ্বংস করার জন্যেই লালগুলো সাবলকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রভু তাঁর অনুগত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করেন নি।

গত এক বছরে অনেক বেশী বুড়িয়ে গেছে সেনেটর লো। ভুগছে রোগে, আর ভাবতে শুরু করেছে মৃত্যুর কথা। প্রত্যেকটি কথার পরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে জুড়ে দেয়—"প্রভুর ইচ্ছা" কথাটা। মেয়ে নেই কাছে। বারবারই মেরী তার চলে আসার সময় পেছিয়ে দিচ্ছে। এপ্রিল মাসে ফিরে আসবে বলে গিয়েছিল। তারপর লিখল আসবে জুনে, কিন্তু এখন জানিয়েছে একেবারে সেপ্টেম্বরে। প্রায়ই ভাবে লো যে তার যতটুকু শক্তিসামর্থ্য অবশিষ্ট ছিল সবটুকুই সে লাগিয়েছে আমেরিকান সেবায়। তাছাড়া ওর পরিবারও নেই। আছে মাত্র একটা মেয়ে। সেও কিনা আবার চলে গেছে ইয়োরোপে। এই কথা ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে একদিন ঈশ্বর ওকে পুরস্কৃত করবেন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, পরলোকে বিশ্বাস করেন কিনা আপনি, প্রত্যুত্তরে বলে ওঠে: তার মানে, নিশ্চয়ই। এ সম্পর্কে কারোর মনে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে ভাবতেও ঘৃণায় ওর অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যা-ই হোক না কেন, স্বর্গ সম্পর্কে কোনোদিনও সে কল্পনায় কোনো ছবি আঁকেনি। মনে হয় ঈশ্বরের করুণাই ওর কাছে সবচাইতে বেশি কাম্য: নির্বাচনে সাহায্য করবেন ঈশ্বর, চড়িয়ে দেবেন তিনি তুলোর দাম, আর ওর জীবনের মেয়াদ অন্ততপক্ষে আরো পাঁচ থেকে দশটা বছর দেবেন

বাড়িয়ে।

মৃত্যুকে দারুণ ভয় লো-র। অনেক সময়েই মনে মনে ভাবে: যদি সিনেটে আবার নির্বাচিত না-ও হয় সে-ও ভালো, এমন কি যদি দেউলে হয়ে যায় তাও, বরং ভালো যদি তার পরিবর্তে আরো পাঁচটা, কি নিদেন তিনটা বছরও বেঁচে থাকতে পারে। আজকাল প্রায়ই মূর্ছার আক্রমণ হয়। অসাড় হয়ে এসেছে দুটো পা। কানের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে আসছে। অকারণেই হঠাৎ হঠাৎ দারুণ রেগে ওঠেন। চিৎকার চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেন, পা ছোড়াছুড়ি করেন, তারপর এক সময়ে অসাড় হয়ে এলিয়ে পড়েন। রক্তের চাপ পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা দিয়েছে ডাক্তারেরা। ওষুধের উপরে ও'র বিশ্বাস ঠিক ঈশ্বরের উপরের বিশ্বাসের মতোই অটল। কাঁটায় কাঁটায় ডাক্তারের নির্দেশ পালন করে চলে। কিন্তু যখনই ওষুধ খান তখনই মনে মনে ভাবতে থাকে: 'প্রভুর ইচ্ছেয় দুদিন বেশি বাঁচব।'—মনে ভয়-পাছে বিধির বিধানকে বানচাল করার প্রচেষ্টার দরুণ যদি শাস্তি পেতে হয় ভগবানের কাছ থেকে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সত্যি সত্যিই অসুখে ভুগছে লো। সাবল'র ব্যাপার নিয়ে নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছিল। নিভেলের কাছ থেকে এসেছে ভীতিজনক তারবার্তা। যখন তখনই রবার্টস টেলিফোনে ডাকছে ওকে। একটা দুর্ণামের আশঙ্কা ঘনিয়ে আসছে ট্রানজককে ঘিরে। রাত্রে একদিন অমনিভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়ার পরে মেরীকে চিঠি লিখে দিল যে কত দিন ওকে কাছে পাচ্ছে না, তারপর অনুরোধ জানাল যেন অবিলম্বে চলে আসে।

শুধু এইমাত্র কস্টারের প্রবন্ধটা পড়ার পরে ওর বুকের উপর থেকে যেন চেপে-বসা পাথরটা নেমে গেল। অবশ্য লালগুলো হাল ছেড়ে দেবে না, কিন্তু ওদের বুঝিয়ে দেয়া হল যে ট্রানজকের গায়ে হাত না দেয়াই ভালো। নিভেলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা তারবার্তা লিখিয়ে দিয়ে কাজ নিয়ে বসে গেল। সিনেটের বৈদেশিক সংযোগ কমিটিতে একটা বক্তৃতা দিতে হবে ওকে। সমস্ত আমেরিকায় ওর বক্তৃতাটা নিয়ে হবে আলোচনা। বলবে, যে চীনের ঘটনাবলীর পরে আর গড়িমসি করাটা হবে অপরাধ। প্রভু রয়েছেন আমেরিকানদের সহায়, ওদের এখন কাজ শুরু করে দিতে হবে।

গত শীতেও লো তর্ক করেছে রবার্টসের সঙ্গে। রবার্ট বলেছিল এটম বোমা তৈরি করতে পারার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের উচিত লালদের আক্রমণ করা। লো প্রতিবাদ করে বলেছিল যে একটি আমেরিকানের জীবন বলি না দিয়েও ওদের স্নায়ু-যুদ্ধেই ঘায়েল করা যাবে।

ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি রবার্টস মস্কো থেকে সদ্য-প্রত্যাগত মেজর ইএডের একটা স্মারকলিপি দিল ওর হাতে। লো ঠিক করল ওটা নিজেই পড়বে আর পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে। বিছানায় ঢুকে আরাম করে কম্বল মুড়ি দিয়ে তন্ময় হয়ে পড়তে শুরু করে দিল।

সোজা কথা বলছি তোমাকে,—পরদিন রবার্টসের কাছে বলল লো,—কাল তুমি প্রায় আমাকে মেরে ফেলেছিলে। রাতটা সাংঘাতিক ভাবে কাটল। যা-ই কিছু ওষুধপত্তর খাই না কেন কোনো কাজে আসে না। একটা ভয়ংকর দলিল ওটা।

এমন সন্দেহ হয়েছিল আমার যে ওটা হয়তো লালদেরই লেখা।

গত দশ বছর ধরে আমি ইএডকে চিনি,—মৃদু হেসে বলল রবার্টস,—আমাদের বিভাগের ভিতরে ও একজন সেরা অফিসার।

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত দুটো মেলে ধরল লো।

লোকে বলে আমি গোঁয়ারগোবিন্দ। কিন্তু নিজের ভুল কি করে শুধরে নিতে হয় তা আমি জানি। তোমার কথাই ঠিক। ভুল বুঝো না আমাকে আর। আমি ভাবতাম তুমি একটু কল্পনা-প্রবণ, রোমান্টিক। সব সময়েই একটু অতি-রঞ্জিত করে দেখ। কিন্তু দেখছি, তুমিই হচ্ছ খাঁটি বাস্তববাদী। আমি হিসেব করেছিলাম এ দিক থেকে যে "লাল"গুলো যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি করে তবে সে খেলায় নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ তোমার মতো ওদের মুখের সামনে টোপ ফেলে যাবে সেটা একটা হাস্যকর ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি জান যে ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের বিরুদ্ধের আওয়াজ তুলে এসেছি। প্রায় প্রতিমাসেই কোনো না কোনো সেনেটর ওদের উপরে বোমা ফেলার জন্যে আওয়াজ তোলেন। তাছাড়া খবরের কাগজের কথা তো আর না বললেই চলে। আমি হিসেব করেছিলাম এইভাবে: লালগুলো তো ভীত হয়ে পড়েছে। নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই যখন ডেকে আনছে তখন আমেরিকানরা দেখুক যে সেনেটর লো শান্তির স্বপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এ দৃষ্টি-ভঙ্গি আমি নিজের জন্যেই যে নিয়েছি তা নয়, নিয়েছি আমাদের পার্টির জন্যে, আমেরিকার জন্যে। আমি স্পষ্ট কথা বলছি তোমাকে নিজেই ছিলাম রোমাণ্টিক। তোমার ঐ মেজর বলছে ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা গত দু বছরে ওরা অনেক বেশী সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা-ই যদি হয়ে থাকে তবে সত্যিই ওদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে আমাদের। আর তা দশ বছর পরে নয়, আজই এই মুহূর্তে।

ওঁর গলার আওয়াজ এমন তীক্ষ্ন কর্কশ হয়ে উঠল যে সেটা খুব ভালো বলে মনে হল না। রবার্টস ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

শুনুন শুনুন, অতটা ভেঙে পড়বেন না। আপনার স্বাস্থ্য আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান। তা ছাড়া সমগ্র আমেরিকার কাছেই মূল্যবান। যদি আপনি অনুমতি করেন তো কয়েকটা পরামর্শ দিতে চাই আপনাকে: যেমন চলেছেন ঠিক সেই পথেই চলতে থাকুন। ঐ তো বললেন নিজেই যে আমাদের এখানে যুদ্ধের হুংকার ছাড়ার লোকের অভাব নেই। লালগুলো চাইছে তাদের শান্তির প্রচারের ভিতর দিয়ে জনগণের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করতে—মায়ের চোখের জল, শিশুর দোলনা, পায়রা—এক কথায় সব কাঁদুনে মালমশলা। মোটেই একে আমরা ছোট করে দেখব না। বিশেষ করে এই মুহূর্তে, যখন নির্বাচন এসে পড়েছে একেবারে দোরগোড়ায়। সবাই জানুক, সিনেটর লো দাঁড়িয়েছে শান্তির পক্ষে। কিন্তু যখন ঠিক অবস্থা তৈরি হয়ে উঠবে আর আপনি বলবেন যে এখন সময় হয়েছে সক্রিয় হয়ে ওঠার, অন্যের চাইতে আগে তখন সবাই বিশ্বাস করবে আপনার কথা।

রবার্টসের পরামর্শ খুবই সঠিক বলে মনে হল সিনেটরের কাছে। যদিও সেই অনুসারে চলা খুবই মুস্কিল। মনে যখন যা আসে তাই-ই বলে ফেলতে

আজীবন অভ্যস্ত লো। এখন এই সাতষট্টি বছর বয়সে রবার্টস কি না বলছে ওকে কূটনীতিক হয়ে উঠতে। ভালো করে ভেবেচিন্তে সিনেটর ঠিক করলেন মাস কয়েকের ভিতরে এ সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দেবেন না। তাছাড়া স্বাস্থ্যের দিক থেকেও উপকার হবে। প্রভুর ইচ্ছেয় গরমের দিনে বলবেন ওর যা বক্তব্য।

সুযোগ পেলেই সিনেটের লবিতে বক্তৃতা দিয়ে তার মনের ভার লাঘব করে:

প্রেসিডেন্ট যদি বোমাগুলো কাজে লাগান, তবে ভবিষ্যত বংশধরেরা স্বীকার করবে যে তিনি আমেরিকাকে বাঁচিয়ে গেছেন।

লো এখন এটম বোমার সম্পর্কে বই প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়ে। বর্ণনা যতই ভয়ংকর হয় ততই বেশি বল পায় মনে। পরম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে কেমন করে দশ মাইল ব্যাসার্ধের ভিতরের কোনো কিছুরই চিহ্নমাত্রও থাকবে না। বোমা ফাটার সময়ে যদি সব লোক না-ও মারা যায় তবে এক সপ্তাহের ভিতরে হয় বমি করতে করতে নয়তো রক্তপাত হয়ে নিশ্চয়ই মারা যাবে —আর বাইরের যারা তারা মরবে দু হপ্তার ভিতরে। তারপর আরো বলে: 'প্রভু শুধু একা আমেরিকার হাতেই বোমা তুলে দিয়েছেন। ফলে আমাদের চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।' "এটম বোমা" কথাটা কখনো মুখে আনেন না লো—এটম বোমার উপরে তাঁর ভক্তির গভীরতা প্রকাশের এটা একটা ভঙ্গি। শুধু এক কথায় বলেন 'বোমা'। মামুলি অনেক অস্ত্রশস্ত্রই তো আছে—গোলা, হাত-বোমা, বিস্ফোরক বোমা, আগুনে-বোমা—এ সব জিনিস তো মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটর, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ইত্যাদিরই সামিল। কিন্তু প্রভুর আশীর্বাদ হল—বোমা।

এল গরম কাল। কিন্তু অবস্থা এতটুকুও পরিষ্কার হল না। লো-র স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়েছে, কিন্তু মেরী এল না। শীতকালটা জার্মানিতে কাটিয়ে খুবই স্ফূর্তিভরা মন নিয়ে ফিরে এল স্মিডল:

লালগুলোর বেশ শিক্ষে হয়েছে,—বলল স্মিডল,—ওদের সমস্ত পরিকল্পনা ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে।

ওকে দেখে সিনেটর ভারি খুশী। যেন স্মিডল ওর নিজেরই ছেলে। যদিও জার্মানি ছেড়ে চলে আসায় দুঃখিতও হয়েছেন একটু। স্মিডল বলল যে যত শিগ্গির সম্ভব আবার সে বার্লিনে ফিরে যাবে। কিন্তু এক্ষুনি ওকে একবার বাড়ি যেতে হবে। সেখানকার অবস্থা খুব ভালো নয়। চিন্তিত হয়ে পড়লেন লো। ওর খুবই ইচ্ছে একবার দক্ষিণ দেশে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা-বলীর জন্যে আটকা পড়ে গেছে। অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে চলেছে।

তুমি বিশ্বাস করবে না, কত চীনা যে আছে ওখানে। কিন্তু অতি দ্রুত আমরা তাদের হারাচ্ছি।—দারুণ শংকিত হয়ে বলল সে রবার্টসের কাছে।—স্পষ্ট কথায় বলছি তোমাকে, হাতের মুঠোর বালুর মতো চীন আমাদের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট তো তাঁর নিজের দলবল নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছেন—এদিকে একটার পর একটা কেলেঙ্কারী ঘটে চলেছে! রিপাবলিকানরা ভোটে জিততে চাইছে কিন্তু ভান করছে যেন এ সব ব্যাপারের ভিতরে তাদের

কোনো হাত নেই। তাছাড়া ম্যাকআর্থার তো নিজেকে ভাবে "ঈশ্বরের পুত্র"। সশরীরেই তিনি স্বর্গে যাবেন। কাল যদি আমরা ফরমোসাও হারাই তবুও বিস্মিত হব না আমি।

কতগুলো বড়ো বড়ো ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। এতে এত বেশি আগুনে হয়ে উঠল সিনেটর যে চিৎকার জুড়ে দিলে:

সবগুলোকে কেন গ্রেফতার করছে না ওরা? আমি জানতে চাই আর কতকাল ওরা এদের প্রশ্রয় দিয়ে চলবে? গোলাপী জেলী নয়, এখন চাই আমাদের লোহার মতো কড়া হাতের মুঠি।

সে বুঝতে পেরেছে যে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে। ঈশ্বরের সামনে, সমগ্র আমেরিকার সামনে তার বক্তব্য সে বলবে জোর গলায়। যদি শুধু সিনেট কমিটিতেও বলতে পায় তবুও সেটা প্রত্যেকটি আমেরিকানের কানে গিয়ে পেঁছাবে।

ওদের যদি আরো পাঁচ কিংবা দশ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয় তবে লালগুলো শুধু যে আরো বেশি ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে তাই-ই নয়, 'বোমা' তৈরি করতেও শিখে ফেলবে। আর তাই যদি হয় তো তবেই সর্বনাশ হয়ে গেল আমেরিকার। মেরীর একটাও ছেলেপুলে নেই—সবই প্রভুর ইচ্ছে!—লো-র বংশ শেষ হতে বসেছে। কিন্তু আমেরিকার শিশুরাই ওর বংশধর। আমেরিকাকে রক্ষা করতেই হবে ওকে এদের জন্যে। একটি মাত্র সম্ভাবনাই আছে তাদের—'বোমা'। সাধারণ যুদ্ধ শুরু করে কোনো লাভ নেই। যতক্ষণে আমেরিকার বাহিনী ইয়োরোপে গিয়ে পেঁছাবে ততক্ষণে লালরা পিরানিজে এসে হাজির হবে। কে আছে ওদের বাধা দেবে? এখন ফরাসীদের ভালোমতোই চিনেছেন লো: নিভেল—ও তো হচ্ছে সবচাইতে সেরা ফরাসীদের একজন—কিন্তু কবিতা লেখা আর অন্যের পয়সা ধ্বংস করা ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা নেই ওর। ইংরেজদের উপরেও ভরসা করা যায় না। ওরা তো কতগুলো অর্থহীন জাতীয়করণ করা বা ঐ ধরনের হেনোতেনো সাত-সতেরো নিয়ে হৈ-চৈ করে চলেছে। কিন্তু চীনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে ঘাবড়ে যায়। আসলে ওরা হচ্ছে অধঃপতিত জাত। স্মিডল বলেছে জার্মানদের মতিগতি খুব খারাপ নয়। কিন্তু ওদের কোনো সত্যিকারের সেনাবাহিনী নেই। আছে শুধু গড়ে তোলার পরিকল্পনা মাত্র। জেনারেল ব্রাডলে পছন্দ করে খেলনা বাহিনী। আর তাই তিনি লুক্সেমবুর্গ বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছেন। এটা হচ্ছে একটা প্রহসন যার পরিণতি হতে পারে সকরুণ। ভালোর মধ্যে এই যে ওখানে বোমা আছে। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসে পরমাণু ভাঙাটা হচ্ছে একটা পৃথিবী-চমকানো আবিষ্কার। নিউটনের আপেলের কথা শিখেছিলেন স্কুলে পড়তে। বাজে! মধ্যাকর্ষণের নিয়মকানুন দিয়ে কি পরিবর্তনটাই আনল? কিচ্ছু না। এখন হচ্ছে ঐ বোমা—সব কিছুই বদলে দিল। গোটা দুনিয়ার মালিক হতে চলেছে আজ আমেরিকা।

বক্তৃতাটা লিখতে লিখতে লো ঘনঘন তাকাচ্ছিল ম্যাপের দিকে। আলস্কা থেকে মস্কোর দূরত্ব চার হাজার একশো মাইল। রবার্টসের মতে ওটা এখন আর

কোনো সমস্যাই নয়। তবুও আইসল্যান্ড থেকে অনেক কাছে। তা ছাড়া বার্লিন থেকে তো এক ঢিলের পথ। আলাস্কা থেকেও উরালের উপরে আঘাত হানা যায়। আর তুরস্ক থেকে তো অনায়াসেই বাকুকে ধ্বংস করে ফেলা যায়। বিজয় গর্বে ফুলে উঠছে লো যেন এখন ফ্লাইং ফোর্টরেসগুলো এরই মধ্যে লালদের ধ্বংস করে ফেলেছে।

পায় হেঁটেই গেল সিনেটে। ডাক্তাররা বলেছে একটু ব্যায়াম করা দরকার ওর। পাঁচ-ছ বছরের একটি বাচ্চা ছেলের দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর। ছেলেটি কাঁদছে। একটু আদর করে মাথা চাপড়ে জিজ্ঞেস করল লো ওর মা কোথায়। ছেলেটি বলল সে কাজে গেছে; খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে ওর হাঁটুতে চোট লেগেছে। একটা দোকানে গিয়ে লো ঐ ছেলেটির জন্যে একটা চকলেট কিনে নিয়ে এল। "প্রভু আমায় দীর্ঘায়ু করেছেন"—মনে মনে ভাবল লো—কারণ এই যে কচি মানুষটি-দুনিয়ায় এসেছে হয়তো একদিন সে আর একজন ওয়াশিংটন, এডিসন কিংবা ফোর্ড হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা আমেরিকাকে রক্ষা করতে সফল হই।

কমিটিতে প্রথমে বললেন রিপাবলিকন জয়েস। তিনি বললেন যে যুক্তরাষ্ট্র নিজে ক্ষতি করেও পরের ব্যাপার নিয়ে বড্ডো বেশি মাথা ঘামায়। উত্তেজিত হয়ে উঠলে লো কানেও আরো বেশি কম শুনতে পায়। কিন্তু চটে যাওয়ার জন্যে যতটুকু দরকার সেটুকু শুনতে পায় ঠিকই। আমেরিকার ভবিষ্যত সম্পর্কে এত-টুকুও মাথা ব্যাথা নেই জয়েসের, ওর ভাবনা শুধু নির্বাচন নিয়ে। কী বিশ্রী বিরক্তিকর স্বার্থপর নীতি। লো—আমেরিকার মতোই—একটিবারও নিজের কথা ভাবে না। প্রভু যাদের ভালোবাসেন তাদের কাছ থেকে দাবি করেন আত্মত্যাগ।

সাধারণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করল লো। চীন হারানোর ফল হবে অতি ভয়ংকর। জেনারেল ব্রাডলে যতদূর বুঝতে পেরেছেন তাতে ইয়োরোপের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। কমিউনিস্টরা প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করতে চেষ্টা করছে। লালদের তিনশো ডিভিশন ফৌজ তৈরি হয়ে রয়েছে। এই অল্প কিছুদিন আগে যিনি মস্কোয় ছিলেন এমন একজন উপযুক্ত লোকের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে ক্রেমলিন পশ্চিমী দেশগুলোর উপরে আক্রমণ চালাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এই বিপর্যয় ঠেকানোর একটিই মাত্র উপায় আছে। আমেরিকার হাতে এমন একটা অস্ত্র আছে যা লালদের নেই।—

সিনেটর কেন্ কী যেন বলে উঠলেন চিৎকার করে। রাগে লাল হয়ে উঠলেন লো: কেন্ কি তবে চাইছেন লালদের পরখ করতে, তাদের সমর্থন করতে? কেউ কোনোদিন শুনেছে না কি এ কথা? কতবার বলেছে ও যে মস্কোকে একটু ভালো মতো শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে আর হঠাৎ এখন কিনা ভয় পেয়ে গেল। আরো জোরে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল লো:

লালগুলোর হাতে বোমা আসার আগেই আমাদের আরম্ভ করে দিতে হবে—

চারদিক থেকে তুমুল চিৎকার শুরু হয়ে গেল। শংকিত হয়ে লো ঘরের চতুর্দিকে তাকাল। কোথায় রয়েছেন তিনি? লালগুলোর ভিতরে? এটা কি আমেরিকান সিনেট?

চিৎকার করে আপনারা আমাকে দাবিয়ে দিতে পারবেন না! আমি আমেরিকান! আমার ঠাকুরদা প্রাণ দিয়েছিলেন রিচমণ্ডের পাঁচিলে—

ও'র মুখখানা নীল হয়ে গেছে। দেখে মনে হয় যেন যে কোনো মুহূর্তেই মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়বেন। সিনেটর কেন্ ছুটে এল ও'র দিকে। হাতের কাগজগুলো এমনভাবে অস্ত্রের মতো ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে লো, মনে হয় যেন সে কোনো আক্রমনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করছে। কিন্তু কেন্ ওর কানের কাছে চিৎকার করে বলে উঠল:

ওদের হাতেও বোমা আছে! এক ঘণ্টা আগে সরকারীভাবে সেটা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে লো বলতে চাইল—কী! কিন্তু শুধু একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল ও'র মুখ থেকে। সিনেটর কেন্ ওকে ধরে ধরে নামিয়ে আনলেন মঞ্চ থেকে। সভার কাজ মুলতবী রাখার কথা ঘোষণা করলেন সভাপতি।

যখন ওরা আবার সভায় এসে বসল, লো জানিয়ে দিল যে তার বাকি বক্তৃতা সে আগামী বৈঠক পর্যন্ত স্থগিত রাখছে। হোয়াইট হাউসে চুপচাপ বসে সে শুনে গেল প্রেস কনফারেন্সের রিপোর্ট। তারপর চলে গেল রবার্টসের সঙ্গে দেখা করতে।

এ কি সত্যি?—ওর বসবার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল লো।

মুচকি হাসল রবার্টস।

অনেকদিন থেকেই আঁচ করছিলাম, কিন্তু এখন আর কোনো সন্দেহই নেই। মধ্য এশিয়ায় ওরা পরীক্ষার কাজ চালাচ্ছে।

রেগে উঠল লো:

হাসছ কি করে এ নিয়ে?

বৃথাই রবার্টস চেষ্টা করল ওকে ভরসা দিতে:

লালগুলো খুবই পেছনে পড়েছিল। এই উৎপাদনব্যবস্থা খুবই জটিল, প্রত্যেকটি বোমা তৈরি করতে অসম্ভব রকমের খরচ। আমেরিকার হাতে রয়েছে বিরাট পুঁজি। এত দিন লো অন্ধের মতো বিশ্বাস করে এসেছে রবার্টসকে, কিন্তু এই মুহূর্তে এক নিদারুণ অবিশ্বাসভরা এমনকি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাল ওর দিকে। রবার্টসের মাথার ভিতরে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেছে। নইলে পারত সে ও'কে স্তোক দিয়ে শান্ত করতে।

কী বলতে চাও তুমি, অসম্ভব খরচ!—গর্জে উঠল লো।—নিজেই বলেছ তুমি যে দেউলে হয়ে পড়া দূরের কথা ওরা দিনে দিনে আরো ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠছে। তাছাড়া, সে যা-ই হোক না কেন, যখন প্রশ্নটা বোমার তখন কে আবার খরচ-খরচার কথা ভেবে থাকে? শোনো, ভুল বুঝো না আমাকে, তুমি হচ্ছ আস্ত একটি উট-পাখি! গত চার বছর ধরে তুমি আমাকে প্রমাণ করে বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছ যে বোমাই সব কিছু নিষ্পত্তি করে দেবে। ওরা তো কালই এখানে উড়ে এসে হানা দিতে পারে আর তুমি কিনা শুধু হাসছ বসে বসে এখানে? আমার ধারণা ছিল যে পেণ্টাগনে অন্তত তোমরা শত্রুর শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু তোমরা ওদের সেনাবাহিনীর হিসেব করতে এতই ব্যস্ত ছিলে

যে বোমার কথাই ভুলে গেলে। সাফ কথা বলে দিচ্ছি শোন, আমাদের এখন একমাত্র ভরসা ভগবান!

রবার্টসকে একটা বিশ্রী মন-মরা অবস্থার ভিতরে ফেলে রেখে চলে গেল লো। নিশ্চয়ই প্রভু লো-কে এবং বাকি সবাইকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু প্রভু যদি লালগুলোর হাতে বোমা দিয়েই থেকে থাকেন তবে কে আর তাদের ঠেকাবে ওয়াশিংটনের উপরে হাওয়াই হামলা করতে? বরাবরই ও বলে এসেছে যে এচিসন কূটনীতি নিয়ে খেলা করছেন। কিন্তু এবারে তার খেলা খতম। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসছে যেদিন হিরোশিমার চাইতে বেশি কিছু আর বাকি থাকবে না আমেরিকায়।

প্রতি বুধবারে যে ডাক্তার আসেন, তিনি এলেন সিনেটরের রক্তের চাপ পরীক্ষা করতে। লো খেঁকিয়ে উঠলেন তাঁকে দেখে:

ছেড়ে দাও এ সব ধোঁকাবাজি! কী হবে আমার রক্তের চাপ পরীক্ষা করে যখন আজকের রাত্রেই আমরা সবাই টুকরো টুকরো হয়ে খতম হয়ে যেতে পারি? কী? এখনো শোন নি? কেন, কিছু আগেই তো সরকারীভাবে স্থিরিকৃত হয়ে গেছে: ওরা বোমা তৈরি করে ফেলেছে।

সবাই চলে গেলে পরে, আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটা বই নিয়ে আবার পড়তে শুরু করে দিল। কিন্তু এখন আর তেমন উৎসাহ অনুভব করল না। বরং থেকে থেকে আঁৎকে উঠে আপন মনেই বলে চলল, কোনো আশ্রয় নেই, এমনকি আশ্রয়স্থলেও না। গেল আমেরিকা, সর্বনাশ হয়ে গেল। অবিশ্যি ওরা প্রথমে হামলা করবে ওয়াশিংটনের উপরে। যদি কংগ্রেস, প্রেসিডেণ্ট আর মন্ত্রিমণ্ডলী ধ্বংস হয়ে যায় তবে আমেরিকা ছত্রছান হয়ে যাবে। তখন যেখানে খুশি, সেখানেই ওরা সৈন্য নামাবে। আর অধ্যাপক আদামস লাল ফুলের তোড়া নিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করবে। সঙ্গে সঙ্গেই নিগ্রোরা মিসিসিপির শ্বেতাঙ্গদের ধ্বংস করতে শুরু করে দেবে। উদ্ধার পাওয়ার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। এক হপ্তা কি বড়োজোর দু হপ্তার ভিতরে মৃত্যু অনিবার্য।

সে রাতটা আদৌ ঘুমোতে পারল না লো। একটা শুকনো বেদনাদায়ক কাশির প্রকোপে নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করছিল সে। লক্ষ্য করল রুমালে রক্তের দাগ। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে এল: রক্তমোক্ষণ সম্ভবত? অসুস্থ বোধ করতে লাগল। কাশতে কাশতে বমি করতে শুরু করে দিল। ডাক্তার ডাকতে হল। ব্রোমাইডের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তার বললেন যে সবচাইতে প্রধান যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বিশ্রাম আর মানসিক প্রশান্তি। কিন্তু সকালে উঠেই লো হুমড়ি খেয়ে পড়ল খবরের কাগজের উপরে। কাগজের পাতা ভর্তি লালদের বোমার কথা। ডাক্তারের নির্দেশ তুচ্ছ করে লো চলে গেল সিনেটে। এক্ষুনি আর কালবিলম্ব না করে কিছু একটা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। দেশকে কিছুতেই তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারাবার বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে দেয়া যায় না। অনেক গভীর করে আশ্রয়স্থল তৈরি করলে চলতে পারে কিনা তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। তাতে যদি না হয় তবে গোটা কংগ্রেসকে একটা ট্রেনের ভিতরে স্থান নিতে হবে। তাহলে লালগুলোর পক্ষে সেটা খুঁজে পাওয়া

শক্ত হয়ে উঠবে। আর যদি তেমন প্রয়োজনই হয় তবে ট্রেনটাই একটা বড়ো পাহাড়ের তলার সুড়ঙ্গের ভিতরে নিয়ে রাখা যাবে। কিছু সংখ্যক সিনেটর বলল যে লো-র কথাই ঠিক। অন্যেরা মনে করল যে বিপদের সম্ভাবনাটাকে খুবই অতিরঞ্জিত করে দেখছে লো। তারা ব্যাপারটা মার্শালকে জিজ্ঞেস করল। মার্শাল বলল যে আণবিক বোমার রহস্য জানতে পারা এক কথা আর সত্যি সত্যি তাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা আর এক কথা,—এ দুয়ের মধ্যে ঢের ফারাক। কিন্তু তবুও লো আশ্বস্ত হল না। সে রাত্রে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল। অনবরতই ওর কানে ইঞ্জিনের গুনগুন শব্দ আসছে ভেসে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে নেমে এল জানালা দিয়ে দেখতে। শেষ পর্যন্ত চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে যেখানে একটিও জানালা নেই।

পরের দিন রবার্টস এল ওর সঙ্গে দেখা করতে।

এ সময়ে যদি আপনি দক্ষিণ দেশে চলে যান তো সেটা তেমন মন্দ হয় না। আপনি বলেছিলেন আমার কাছে যে মেজর স্মিডল জার্মানিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। খুবই ভালো হয় তাহলে। ওখানে তাঁর সাহায্য হবে অমূল্য। কিন্তু এ সময়ে মিসিসিপি নেতৃত্বহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই নির্বাচনের মুখে। ওটা হচ্ছে একটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের অন্যতম —আমেরিকান মনোবলের রক্ষাকবচ। আজকের দিনে আগের চাইতে অনেক বেশি করে প্রত্যেকটি আমেরিকানকে তার কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। আপনি না হলে কে আর তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলুন?

ডাক্তারের উপদেশ বা মার্শালের ভরসা দেয়ার চাইতে লো-র উপরে ঢের বেশি কাজ হল রবার্টসের কথায়। নিজেকে ধিকৃত মনে করতে লাগল সিনেটর। সে ভুলে গেছে তার ব্রত। আমরণ সে তার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে কর্তব্য করে যাবে। রবার্টসের কথাই ঠিক: ওর স্থান এখন মিসিসিপিতে।

জ্যাকসন স্টেশনে নেমে একটা স্বস্তির হাসি হাসল লো: এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছে। ওয়াশিংটন থেকে কত ভালো। শান্ত, বিশ্বাসভরা মুখ, নেই কোথাও অস্থির চাঞ্চল্যভরা হৈচৈ, পাগলের মতো এলোমেলো ছুটোছুটি। মানুষগুলো ধীরস্থির। এমন একটা দেশের সঙ্গে লালগুলো কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না।

ওঁর চোখের দৃষ্টি স্মিডলকে খুঁজে ফিরতে লাগল। কথা ছিল সে আসবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ দেয়ালের দিকে চোখ পড়ল, লেখা রয়েছে: আমরা শান্তি চাই! এ ধরনের লেখা দেখেছে সে নিউ ইয়র্কে। অবশ্য এ সব হচ্ছে লালগুলোর চালাকি। সবাই-ই শান্তি চায়। নিজেও তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতায় বলেছে সে কথা। কিন্তু শান্তি আর শান্তি। সে আর তার লোকেরা চায় যে আমেরিকা সমস্ত জাতিকে রক্ষা করুক। আর লালগুলো শান্তির কথা লেখে শুধু তাদের ট্যাঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে। নিউইয়র্কে প্রচুর লাল আছে—সেটা তেমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু এখানে—! লালদের হাতে বোমা আছে এ সংবাদের মতোই দেয়ালের গায়ের ঐ স্লোগানটা একটা বিরাট আঘাত। স্মিডল যদি না ধরে ফেলত তবে হয়তো প্লাটফর্মের উপরেই সে অজ্ঞান হয়ে

পড়ে যেত।

ওটা কী?—লেখাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল স্মিডলের কাছে।

কেলেঙ্কারীর ব্যাপার!—হয়তো লালগুলোর কেউ লিখেছে রাতের বেলায়। কিন্তু এখনো ওটা মুছে ফেলার সময় হল না ওদের। হয়তো স্টেশনমাস্টার নিজেই লালদের কেউ একটা হবে। ঠিক আছে, দেখতে হচ্ছে তদন্ত করে।

দুটি তরুণ নিগ্রো প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে হাসাহাসি করছে। লো-র মনে হল ওরা হাসছে তাকে দেখে।

তোমার কি মনে হয় না যে ঐ নিগার দুটোও লাল?—স্মিডলের কাছে জিজ্ঞেস করল লো।

খুবই সম্ভব। প্রচুর লাল আছে এখানে। আমি যখন জার্মানিতে, এ রাজ্যের অনেক কিছুই সেই ফাঁকে হাতের বাইরে চলে গেছে। সাফ করা শুরু করে দিয়েছি আমরা। আর ভালোই হল যে আপনি এসে পড়েছেন। আপনাকে পেয়ে খুবই সাহায্য হবে আমাদের।

এই একটু আগেও লো জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো চলছিল ধুঁকেধুঁকে। হঠাৎ সে কোমর টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। ওর মনে হল যেন সে চলেছে যুদ্ধ করে। ওর ঠাকুরদা, যিনি রিচমণ্ডের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরই মতো সে-ও যুদ্ধ করে চলেছে আমেরিকার জন্যে। এটা কিছু আর জেনারেল ব্রাডলের খেলনাবাহিনী নিয়ে খেলাখেলা নয়। প্রকৃত সংগ্রাম ঘনিয়ে আসছে এখানে। লালগুলো চেষ্টা করছে মিসিসিপি গ্রাস করার জন্যে। কিন্তু এখানে রয়েছে স্মিডল, রয়েছে হাজার হাজার ন্যায়নিষ্ঠ আমে-রিকান। লো-কে নিশ্চয়ই তাদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রভু ওকে শক্তি যোগাবেন।

ওদের দেখে নেব আমরা—সতেজ কণ্ঠে বলে উঠল লো স্মিডলের কাছে।—বোমা কোনো সাহায্যে আসবে না ওদের। সাফ কথা বলে দিচ্ছি আমি তোমাকে, লো জন্মেছে স্বাধীন আমেরিকায় আর মরবেও স্বাধীন আমেরিকায়। এক্ষুনি আমি প্রাতরাশ খেয়ে নেব, তারপরেই বসে যাব আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে।

উনপঞ্চাশ

স্মিডল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। মনে মনে বলল, অভিশপ্ত নিগারটা যে দড়িটা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তাই নিয়েই শুরু হয়েছে যত কিছু সব। অবশ্য, ফাঁসির দড়ি বরাত ফিরিয়ে দিল উনিশ শো চল্লিশ সালে ওষুধের দোকানের সামনের ল্যাম্প-পোস্টে জিম যখন একটা নিগ্রো ছেলেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, সেই ফাঁসির দড়ির একটা টুকরো সে দিয়েছিল স্মিডলকে। যুদ্ধের বাজারে খোদ শয়তানের ভাগ্য ছিল ওর মুঠোয়। কিন্তু আত্মহত্যার দড়ি হল অন্য জিনিস। একমাত্র ভগবানই জানেন কি করে ওরা এই নোংরা ব্যাপারের ভিতর থেকে কাটিয়ে উঠবে।

ওর জার্মানি যাওয়ার সময়ে জজ গিলমোর কথা দিয়েছিল স্মিডলকে যে সে উকিল ক্লার্কের মুখোস খুলে দেবে। যে-লোক প্রকাশ্যেই বলে কি না যে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের চাইতে খারাপ নয় জ্যাকসনে, সে-লোককে বরদাস্ত করা যায় না। এ ধরনের কথাবার্তার ফল খুবই খারাপ হয়ে উঠতে পারে। এমনি-তেই নিগ্রোরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ক্লার্ক বলেছে যে শিকাগো কংগ্রেসে সে অপরাধ নিবারণের উপায় সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিল। কিন্তু সে কংগ্রেসের উদ্যোগ আয়োজন তো করেছিল লালগুলো। নিউইয়র্ক আর শিকাগোর লোকেরা লালদের ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো বারে যাও কি রেস্তোরাঁয় যাও, ওদের সঙ্গে গা ঘসাঘসি না করে ঢোকার উপায় নেই। হয়তো দেখবে কোনো একটা ডাকাত চুপচাপ বসে ডেইলি ওয়ার্কার পড়ছে, তার সঙ্গেই তোমার কাঁধ ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। খুবই খারাপ ব্যাপার। সবচাইতে কুৎসিত রোগও তোমার গা-সওয়া হয়ে যেতে পারে কিন্তু তবুও তাতেই তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে। উত্তুরে দেশগুলো বরাবরই একটু পচা। আর এখন তো দুর্গন্ধ স্বর্গে গিয়ে ঠেকেছে। মুক্তি যদি আসে তো আসবে দক্ষিণ দেশগুলো থেকে। মিসি-সিপিতে লালগুলোর কোনো স্থান নেই।

চলে গেল স্মিডল। অন্যের চরকায় তেল দিতে দিতেই কেটে গেল ছ'মাস। আগেকার নাৎসী অফিসারদের সম্পর্কে বিলি বন্দোবস্ত করা, প্রত্যেককে অভয় দেয়া যে লালদের অবরোধ অচিরেই ভেঙে ফেলে দেয়া হবে আর পূর্ব-জার্মানির বিশ্বস্ত লোক পাঠানো। এতটুকুও সময় ছিল না ওর নিগ্রোর গলার দড়ি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার।

কিন্তু জজ গিলমোর বহুবারই ভেবেছেন যে ক্লার্কের ব্যাপার নিয়ে নাকের-জলে চোখের জলে হতে হবে ওকে। চলে যাওয়ার আগে অনেকগুলো সংবাদ-পত্রের পরিচালকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছে স্মিডল। কাগজে লিখল, ক্লার্ক—যাকে লোকে "লাল উকিল" বলে সে-ই নিগ্রোটার হাতে সিলকের দড়ি গুঁজে দিয়েছিল গোপনে। মিসিসিপি পোস্ট যাতে লিখত মেজর স্মিডল, একটা লম্বা প্রবন্ধই লিখে ফেলল ক্লার্কের উপরে। আর শেষ করল এই কটা কথা

দিয়ে:

এই যে নরাধম যে নাকি আমাদের সুন্দর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কলংকিত করেছে, কবে সে ঐ গলায় দড়ি দেয়া নিগ্রোটার শূন্য ঘরে বাসা নেবে?

খুব দৃঢ় চরিত্রের মানুষ নন জজ গিলমোর। স্মিডল দূরে চলে যেতেই সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে ফেলে রাখার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। অবশ্য মেজরের বন্ধুবান্ধবেরা ছিল খুবই সতর্ক। ক্লার্ককে ডেকে পাঠালেন জজ-সাহেব। একথা ওকথা বলে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ক্লার্কের শরীর কেমন আছে, কেমন আছে বেলা। অবশেষে অতি সাবধানে ঘুরিয়েফিরিয়ে এলেন নিগ্রোটির আত্মহত্যার আলোচনায়।

জানতে চান কে হ্যারিসনকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যা করতে?—ও'র কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ক্লার্ক।—তার জবাব হচ্ছে এই: আপনি করেছেন। জানি আমি, আপনি খুব খারাপ লোক নন, কিন্তু ওরা আপনাকে তাতিয়ে তুলেছে—মেজর স্মিডল, জেলার সরকারী উকিল, গভর্নর আর ঐ ধরনের আরো অনেকে।

প্রধান কারারক্ষী নিকোলসন জেলার সরকারী উকিল ব্রাউনের অফিসে এসে বলল তাঁকে যে সে একদিন ক্লার্ককে দেখেছে ছোট্ট মতো কি যেন একটা নিগ্রোটার হাতে গুঁজে দিল। হয়তো সেটা কিছু একটা লেখা চিরকুটও হতে পারে অথবা বিষও হতে পারে। আর একবার—বলল নিকলসন,—ক্লার্ক নিগ্রোটাকে বলে-ছিল যে ওর দরুনে কিছু টাকা পেয়েছে সে—মানে প্রচুর টাকা। এরই ভিত্তিতে ব্রাউন পরোয়ানা জারী করলেন ক্লার্কের উপরে। জজসাহেব সমন পাঠালেন আর সরকারী উকিল কৈফিয়ত তলব করে পাঠালেন যে ঠিক কি জিনিস নিগ্রো-টাকে দিয়েছিলেন আর কোন টাকার কথা বলেছিলেন ওর কাছে।

আমি কোনো কিছুই গোপনে গুঁজে দেইনি হ্যারিসনের হাতে—জবাবে বললেন ক্লার্ক।—স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি কি করে কারারক্ষী এই ধরনের জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলতে পারে। যদি সে আমাকে আসামীর হাতে কিছু দিতে দেখেই থাকে তবে তার কর্তব্য ছিল তাকে তল্লাসী করা। আমি এ কথা বলতে চাই না যে নিকলসন স্বেচ্ছায়ই মিথ্যা কথা বলছে। কারণ ওর মাথায় কি করে এ সব জিনিস এল তা আমি জানি ভালো করেই। চলে আসার সময়ে আমি করমর্দন করেছিলাম হ্যারিসনের সঙ্গে। আর তা করেছিলাম ওর প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করতে, ওর মনে একটু ভরসা জাগিয়ে তুলতে। নিকলসন বলেছিল আমাকে কি করে একটা নিগ্রোর সঙ্গে আমি করমর্দন করলাম, বিশেষত একটা খুনের সঙ্গে। আমার মনে হয় খবরের কাগজগুলো যখন আজ নর-হত্যার আওয়াজ তুলেছে, তখন সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে আমি ওর হাতে দড়ি গুঁজে দিয়েছিলাম। ঐ টাকার কথা যেটা সেটা সম্পূর্ণ সত্য। আমি বলেছিলাম হ্যারিসনকে যে ওর জন্যে আমি তিনশো ডলার পেয়েছি।

কার কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছিলেন?—জিজ্ঞেস করলেন জেলার সরকারী উকিল।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন ক্লার্ক। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন:

সে কথা আমি বলতে পারব না আপনাদের কাছে। কিন্তু হ্যারিসনের আত্মহত্যার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। কোনো বে-আইনী কাজ আমি করি নি। এমন কি আমি টাকাটা পর্যন্ত দেইনি তাকে। কারারক্ষীর সামনেই শুধু এইটুকুই মাত্র জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে যে টাকাটা সম্পর্কে কি করতে বলে ও আমাকে—জেলের ব্যাঙ্কে জমা করে দেব, না ওর খালাস পাওয়া পর্যন্ত রেখে দেব আমার কাছে।

ক্লার্কের সাক্ষ্যপ্রমাণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন জজসাহেব। একটু আগে পর্যন্তও তিনি বিশ্বাস করেন নি যে ঐ উকিল ভদ্রলোক দড়ি যুগিয়ে ছিলেন নিগ্রোটাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মনে হল যে তাঁর সামনে দাঁড়ানো ঐ লোকটি সত্যি সত্যিই একটি অপরাধী।

আপনিই দড়িটা দিয়েছিলেন ওকে। এটাই হচ্ছে ঠিক কথা!—চিৎকার করে উঠলেন জজসাহেব।—আপনি একজন অভিজ্ঞ আইনজীবী অথচ আপনার কাজকর্ম শিশুসুলভ। ওসব বাজে কথা শোনাচ্ছেন কেন আমাদের। নিগ্রোটা যে অপরাধ করেছে সেটা জেনেশুনেও তার খালাস পাবার কথাটা বলা উচিত হয়নি আপনার। অন্যের আগে ও নিজেই হয়তো হেসে উঠেছিল আপনার কথা শুনে।

হ্যারিসন যে নির্দোষ সে সম্পর্কে আমি দৃঢ়নিশ্চিন্ত ছিলাম আর এখনো আছি। অবশ্য এটাও জানতাম যে আমাদের রাষ্ট্রে কোনো নিগ্রোকে নিরপরাধ প্রমাণ করা অসম্ভব। কিন্তু তবুও আমি চেয়েছিলাম ওকে একটু ভরসা দিতে। ওর মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। হয়তো তখন থেকেই ও ভাবছিল আত্মহত্যার কথা।

একটা নিগ্রো জোর করে ঢুকল গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গের বাড়িতে, একটি অসহায়া নারীর ঘরে আর একটা মোটরের আওয়াজ শুনতে পেয়েই লাফিয়ে পড়ল জানালা দিয়ে, তার পরেও আপনি এসে কিনা বলছেন সে নির্দোষ—

হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। যদি সে অপরাধী হয়ে থাকে তো তার একমাত্র অপরাধ এই যে সে নিগ্রো আর জন্মেছে এই মিসিসিপিতে।

ঢের শোনা গেছে ওসব বক্তৃতা! এটা আপনার ইয়ারবন্ধুদের সভা নয়। বিচারকের কামরায় এখন আপনি দাঁড়িয়ে। আমাদের রাষ্ট্রের অবমাননা করতে নিষেধ করছি আমি আপনাকে।

সম্ভবত মিঃ ক্লার্ক এ কথাটা বুঝিয়ে বলবেন যে হ্যারিসনের দরুণ টাকাটা তিনি পেয়েছিলেন কার কাছ থেকে?—নাক-সিঁটকে জিজ্ঞেস করলেন সরকারী উকিল।

ও প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে আমি রাজী নই।

জজসাহেব থ বনে গেলেন। মেজর স্মিডল মোটেই তা হলে বাড়িয়ে বলেন নি! ক্লার্ক একটা লাল। আর তাদের দলের একটা পাণ্ডাগোছেরও বটে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে টাকাটা ওদের কোনো একটা "কমিটি"র কাছ থেকেই এসেছে। ওরা শ-য়ে শ-য়ে এসে জমা হয়েছে উত্তরে। সর্বত্রই লালদের প্রভাব।

জেলার সরকারী উকিল মামলা চালাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সমস্ত কাগজ উঠে পড়ে লাগল ক্লার্কের স্বীকারোক্তি নিয়ে। বলতে লাগল, "লাল

উকিল” কোনো একটা অজ্ঞাত সংগঠন থেকে নিয়মিতভাবে মোটা টাকা পেয়ে আসছে।

কিছুদিন পর্যন্ত ক্লার্কের মামলার খবর ‘হাঙ্গেরির নৃশংসতা’ ‘ভেটোর অধিকারের অপব্যবহার’ ‘উড়ন্ত চাকী’ প্রভৃতি খবরগুলোকে সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে সরিয়ে দিল। মিসিসিপি পোস্ট লিখল ক্লার্ক টাকা পায় কমিনফর্ম থেকে। কথাটা সে আধাআধি স্বীকার করে ফেলেছে। এখন কিনা সে সাধারণ মানুষের মতো স্বাধীনভাবে জ্যাকসনের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা কী করে সম্ভব? কেউ লিখল কালো চামড়া আর লাল মার্কার উপরে জজসাহেব গিলমোরের একটা অদ্ভূত আকর্ষণ আছে.........

জানা গেল যে শিকাগোর কংগ্রেসের বক্তৃতায় ক্লার্ক প্রথমত বলেছিল যে দক্ষিণ দেশগুলোতে অপরাধমূলক কাজের বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ভাগ-চাষীদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা। আর দ্বিতীয়ত চতুর্দিক থেকে ঘনিয়ে-আসা অমঙ্গলের অশুভ সংকেত। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করার এতটুকুও ইচ্ছে তাঁর নেই। নেই যে তা খানিকটা এই জন্যেই যে সংগ্রাম করে কোনো লাভ আছে বলে তাঁর বিশ্বাস নেই। তাছাড়া রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি জনজীবনের কাজকর্ম থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। যে শিকাগো কংগ্রেস সম্পর্কে মেজর স্মিডলের এত উষ্মা সেটা ডাকা হয়েছিল একটা আইনজীবী সংগঠনের দ্বারা। তাতে এতটুকুও রাজনীতির গন্ধ ছিল না। খবরের কাগজের উপরে শুধু চোখ বুলিয়ে যান ক্লার্ক। দুই পার্টির প্রতিযোগিতা, ট্রুম্যানের বক্তৃতা, খনি-মজুরদের ধর্মঘট কিংবা রুশ চক্রান্তের চমকপ্রদ বিবরণ কোনো কিছুর সম্পর্কেই তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। শুধু চেষ্টা করেন তাঁর মক্কেলদের দুঃখের বোঝা লাঘব করতে আর তাদের কাজকর্ম করে দিতে। তাছাড়া আর সবকিছু থেকেই নিজেকে নির্লিপ্ত রাখেন। ও'র আধ্যাত্মিক জগতে পরিধি তো সংকীর্ণ। যদিও তাঁর নিজের ধারণা সেটা সীমাহীন। ঠিক যেন লুথারান গীর্জার মতো শূন্য, কঠোর, বেদনাময়।

কোনো কিছুরই পরিবর্তন করানো আমার সাধ্যাতীত।—প্রায়ই বলে থাকেন তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে।—সবার মতো আমিও নৈতিক আপোসের পথই গ্রহণ করেছি। আমার একটিমাত্র সান্ত্বনা এই যে, জীবনে কোনো দিনও কারোর সঙ্গে এতটুকুও নোংরা ব্যবহার করি নি।

এই স্বল্প-বাক মানুষটির অন্তর এক গভীর বেদনায় অহরহ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিছুতেই ভুলতে পারেন না তাঁর সেই হাসিখুশি উদারচেতা ছেলে ফ্রেডের কথা—যে আর ফিরে আসেনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। আগে আগে মেয়ের আনন্দমুখর কলহাস্য ও'র মনটাকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলত। কিন্তু লুইস যখন সম্বন্ধ ভেঙে দিল বেলার মুখের হাসি গেল নিভে। বেগুনী-ফুলের লতায় ঘেরা বারান্দাওয়ালা ছোট্ট বাড়িটি দেখে মার্থকের মনে হতে পারে স্বর্গ বলে কিন্তু ভিতরে কেমন যেন একটা দম-আটকে-আসা বিষণ্ণ স্তব্ধতা গুমরে মরছে। স্মিডল যখন ওকে শেষ করে ফেলার মনস্থ করল, ক্লার্কের জীবন আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠল। ও'র স্ত্রী রাস্তায় বেরুতে ভয় পান। সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় ও'কে

দেখে। কেউ হয়তো শুনিয়ে শুনিয়েই বলে ওঠে, "ওটা লাল উকিলটার বৌ"। একটা সংগীত বিদ্যালয়ে পড়ে বেলা। প্রায়ই কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে আসে। কোনো শিক্ষিকা হয়তো বলেছে: "তোমার তো আর রোজগার করার দরকার নেই। মস্কো থেকে অঢেল টাকা পায় তোমার বাপ।" বহু ব্যবসায়ী যাদের কাজকর্ম করতেন ক্লার্ক তারা ওকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। জমার অঙ্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

জানা গেল যে শিকাগো কংগ্রেসের বক্তৃতায় ক্লার্ক বলেছে যে, দক্ষিণ প্রদেশের অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথমত ভাগ-চাষীদের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার যোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত শ্বেতাঙ্গদের কথার উপরে নির্ভর করে, তা তাদের নৈতিক চরিত্র যা-ই হোক না কেন, কালো-চামড়াদের সাক্ষীসাবুদের উপরে আস্থা স্থাপন করতে দক্ষিণ প্রদেশের আদালতগুলো পরাঙ্মুখ।

পুলিস জেলার সরকারী উকিলকে খবর দিল যে হ্যারিসনের আত্মহত্যার দুমাস আগে ক্লার্ক নিউইয়র্ক থেকে "রুশিয়া উইদাউট সিক্রেট" শুধু কতগুলো বে-আইনী ধরনের বইপত্র পেয়েছিল।

অবশেষে তুলো-ক্ষেতের মালিক ক্রাউথার এল সরকারী উকিলের সঙ্গে দেখা করতে:

আমার ছেলে লুইসের ক্লার্কের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা হয়,—হলফ করে বলল ক্রাউথার।—লুইস এখনো ছেলে মানুষ—তার বয়েস ছিল তখন মোটে তেইশ বছর। মেয়েটার পাল্লায় পড়ে ছেলেটা আমার অবাধ্য হয়ে ওঠে। মেয়েটার ধ্যান-ধারণাও ঠিক তার বাপেরই মতো সাংঘাতিক। লুইসও বলতে শুরু করেছিল যে মিসিসিপি হচ্ছে একটা অনুন্নত দেশ। আর সিনেটর একটা জোচ্চোর। তাছাড়া ও রুশদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না, কারণ তারাও আমাদেরই মতো মানুষ। একবার এমন কথাও বলেছিল যে লালদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আমি আমার ছেলেকে ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছি। ক্লার্কের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা ও ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু একজন সৎ আমেরিকান হিসেবে আমি আজ এসেছি এখানে এই জন্যেই যে ক্লার্কের কার্যকলাপের ধরন যে কতদূর সাংঘাতিক সেটারই প্রমাণ দিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে যে শুধু ঐ নিগ্রোটাকে দড়ি যুগিয়েছে তাই-ই নয় আরো অনেক অপরাধমূলক কাজ করেছে যা এখন পুলিসের হাতে ধরা পড়েনি।

ফলে জেলার সরকারী উকিল লুইস ক্রাউথারকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে সমন পাঠাল, কিন্তু অসুস্থতার ওজুহাতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করে সে হাজির হল না। অনেক সপ্তাহ পরে সরকারী উকিল আবার সমন পাঠাল। কিন্তু দেখা গেল যে সে তার বাবার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে ভেনেজুয়েলায় চলে গেছে।

পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে ক্লার্ক এই অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করে চললেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি এর জন্যে তৈরি করে এসেছেন নিজেকে। বহুদিন ধরেই অনুভব করে আসছিলেন মাঝে মাঝে ওর মনে হয় হ্যারিসনের জন্যে কার কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন সেটা বলতে অস্বীকার করে ঠিক করেছেন কি না? একটি-

মাত্র কথাই ও'কে বলতে হয় তাহলে যে টাকাটা পাঠিয়েছে সিনেটর লো-র মেয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো সরকারী উকিল মামলাটা তুলে নেবে। কিন্তু যখন-ই মেরীর কথা ভাবেন তিনি নিজের কাছেই নিজে বলেন যে, অমন চমৎকার মেয়ে, কিছুতেই এমন কাজ করতে পারেন না যাতে সে বিপদে পড়ে। তার চেয়ে বরং তাঁর-ই সর্বনাশ করুক ওরা।

বসন্তকালের কাছাকাছি জেলার সরকারী উকিল ব্রাউন লালদের সঙ্গে ক্লার্কের যোগাযোগ সম্পর্কে কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করল।

কাশিদে নামে একজন আইনজীবী এসে জানাল যে একদিন যখন সে হাঙ্গেরির বিচার প্রহসন সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করে বলছিল যে লালগুলো এক কার্ডিন্যাল নামে কোনো এক নির্দোষী কে সাজা দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে ক্লার্ক বিদ্রূপ করে উঠে বলেছিল:

হাঙ্গেরি বহু দূরের পথ। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা সঠিক জানা শক্ত। কিন্তু এখানে যে ছ-জন নিগ্রোকে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করা হল, কই খবরের কাগজগুলো তো তার বিরুদ্ধে একটুও প্রতিবাদ করে নি।

ব্লাকেট নামে এক ব্যাঙ্কের কেরানি নিজে থেকে এসে জানাল যে তার সামনেই ক্লার্ক কমিউনিস্টদের প্রশংসা করেছিল আর বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে উচ্ছেদের কথা।

কি কি বলেছিল সব কথা আমার মনে নেই,—ক্লার্ক কি কি বলেছিল আরো বিশদভাবে বলার জন্যে যখন ওকে বলা হয় প্রত্যুত্তরে বলল ব্লাকেট,—কিন্তু একটা কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল যে, "রুজভেল্ট যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো রুশদের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসার পথ-নির্দেশ করতে পারতেন। যুদ্ধে আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। তাই খবরের কাগজ-গুলো যখন যুদ্ধের আওয়াজ তুলে হৈচৈ করে আমার মোটেই ভালো লাগে না।

সরকারী উকিল প্রমাণ করলেন যে গত চার বছরের ভিতরে ক্লার্ক উনিশটা মামলায় দাঁড়িয়েছে কালা আদমীদের পক্ষে। আর দু দুবার তার মক্কেলকে লিপ্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে।

স্মিডল যখন ইউরোপ থেকে ফিরে এল জজ গিলমোর বললেন তাঁকে:

আমার যতদূর সাধ্য করলাম। হ্যারিসনের জন্যে তিনশো রুবল পেয়েছে বলে স্বীকার করেছে ক্লার্ক। কিন্তু কার কাছ থেকে পেয়েছে সে কথা বলবে না কিছুতেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে সে নিগ্রোটাকে দাঁড় যুগিয়ে ছিল। কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। আমরা চেষ্টা করছি অন্য দিক থেকে ব্যাপারটার কিনারা করতে—চাইছি লালগুলোর সঙ্গে ও'র যোগাযোগ সপ্রমাণ করতে। নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রচুর কিন্তু সবগুলোই কমবেশি ছড়ানো গোছের। কোনোটাই সংশয়াতীত নয়। খবরের কাগজগুলো বিচারের জন্যে হৈচৈ করছে ঠিকই। কিন্তু জেলার উকিলের মামলা চালানোর মতো আইনসংগত কোনো উপযুক্ত ভিত্তি নেই। আমি একজন বিচারক। আমাকে আইনকানুন মেনে চলতে হবে। ক্লার্ক কিছু আর নিগ্রোর ভাড়াটে লোক নয়। সে নিজে আইনজীবী। আর আপীলও করবে নিশ্চয়ই। এ মামলা নিয়ে আমি আমার নিজের গলা কাটাতে চাই না। হয়তো

আমাদের সমস্ত ব্যাপারটাই ছেড়ে দিতে হতো পারে।

মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার !—চটে আগুন হয়ে উঠল স্মিডল,—আপনি বলছেন যে, ও কোনো লোকের কাছ থেকে টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে আর তবুও কিনা চাইছেন আপনি মামলা তুলে নিতে ? কোনো এক শুভদিনে নিগ্রোরা শুরু করে দেবে আমাদের গলা কাটতে আর আপনি প্রস্তাব নিয়ে এলেন কিনা তাদের দলের চাঁইটাকে পুনর্বাসন করাতে ! ব্রাউনের হাতে যদি এত সব খবরা-খবর থেকেই যাবে তাহলে আপনার বাধল কোনখানটায় ?

শোনো আমি বুঝিয়ে বলছি। আমি না হয় ধরেই নিচ্ছি যে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ক্লার্কের লালদের উপরে সহানুভূতি আছে। এ-ও হয়তো সম্ভব যে সে কোনো একটা গোপন সংগঠনের ভিতরে আছে। তবুও সরকারী উকিলের পক্ষে সেটা আইনত প্রমাণ করা সম্ভব নয়। বলতে দাও আমাকে। ধরো সে কোনো একটা কমিটি বা ঐ ধরনের কিছু একটা থেকে তিনশো ডলার পেয়েছে। নিশ্চয়ই সে টাকাটা পেয়েছে নিগ্রোটার কেটে পড়ার দরুণ। কিন্তু তারও কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। অবশেষে, এটাও ঠিক যে ক্লার্কের সমস্ত আচরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে সে দড়িটা গোপনে চালান করে দিয়েছিল নিগ্রোটার হাতে কিন্তু তা-ও ঐ পর্যন্তই। কেউ-ই চাক্ষুস দেখতে পায় নি তা।

আপনি আমাকে তাজ্জব করে দিচ্ছেন !—বলল স্মিডল,—গোটা দুনিয়াটাকে আমরা ওলটপালট করে দিতে চলেছি আজ। দেখে এসেছি কি করে ওরা লাল-গুলোকে ধরে ধরে খাঁচায় পোরে। আচ্ছা শিগগিরই আমি যাচ্ছি উত্তর প্রদেশে। দেখি হয়তো কিছু খবরাখবর সংগ্রহ হতে পারে ওখানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ক্লার্ক টাকাটা পেয়েছে নিউইয়র্ক বা শিকাগো থেকে।

এর কিছু দিন পরেই জেলার সরকারী উকিলের হাতে দারুণ একটা মূল্যবান দলিল এসে পৌঁছাল।—উনিশশো আটচল্লিশ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর ক্লার্কের লেখা নিউইয়র্কের সংগঠন "ফ্রেন্ডস অব পীস"-এর একখানা চিঠির নকল। চিঠিটার নিচে স্বাক্ষর জোসেফ ইলিয়টের। লালদের তরফে গোয়েন্দাগিরি করার অপরাধে যে নাকি গ্রেফতার হয়েছে উনিশশো উনচল্লিশ সালের মে মাসে। চিঠিটায় ক্লার্ককে লিখেছে যে মিসিসিপিতে শান্তির প্রচার জোরদার করতে হবে। আর তার জন্যে "আন্তর্জাতিক কেন্দ্র" থেকে সে কিছু টাকা দেয়াবার জন্যে চেষ্টা করবে। তাছাড়া, হ্যারিসনের মুক্তির জন্যে ক্লার্কের অবিলম্বে ব্যবস্থা-অবলম্বন করতে হবে। চিঠিটার ভিতরে হাজার ডলার দেয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। ক্লার্ক যদি হ্যারিসনের মুক্তির ব্যবস্থা না করতে পারে তবে যেন সে যাতে "নীরবে জীবন ত্যাগ করতে পারে" তার জন্যে যথোচিত সাহায্য করে। কারণ ওর মামলা দক্ষিণ প্রদেশের জনসাধারণের মনে 'ফ্রেন্ডস অব পীস' সম্পর্কে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করতে পারে।

দলিলটা আদালতে পেশ করা হল। আদালতের কাজ শুরু হতেই সরকারী উকিল ইলিয়টের চিঠিটা ক্লার্কের হাতে দিল। ক্ষেপে গিয়ে ক্লার্ক সরকারী উকিলকে গাল পাড়ল জোচ্চোর বলে আর যে সব বদমায়েশ চিঠিটা লিখেছে তাদের বলল বেকুব। হ্যারিসন ছিল একজন অত্যন্ত সাধারণ নিগ্রো, নিউইয়র্কের

কারোরই তার সম্পর্কে কোনো উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়।

ক্লার্ক ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইলেন জজসাহেব।

আমার মনে হয় আদালত অবমাননার অপরাধে আপনাকে হাজতে রাখা আমার কর্তব্য।—বললেন জজসাহেব।—যে দলিলখানার সম্পর্কে আপনি অমন অবজ্ঞা-সূচকভাবে কথা বললেন সেটা জেলার সরকারী উকিলের কাছে পাঠিয়েছে নিউ জেরসীর বিচার বিভাগের অধিকর্তারা। কিন্তু একটা কথা এখনো আমার কাছে পরিষ্কার হল না: বাকি সাতশো ডলার আপনি খরচ করলেন কী বাবদে? টাকা-কড়ি সম্পর্কে আপনি সৎ লোক তা আমি জানি, তাই এটা আমার বিশ্বাস হয় না যে টাকাটা আপনি আত্মসাৎ করেছেন। তাহলে এটাই সম্ভব যে আপনি ঐ টাকাটা জেলখানার রক্ষীদের ঘুস দিতে চেষ্টা করেছিলেন আর দিয়েও ছিলেন।

একটু চিন্তা করে জবাব দিলেন ক্লার্ক:

আজ বত্রিশ বছর ধরে এই জ্যাকসনে আইন-ব্যবসা করে আসছি। আমি জানি মিসিসিপিতে তুলো আছে, আছে ভাগচাষী, এমন কি মেজর স্মিডলের মতো লোকও আছে। কিন্তু যাকে বলে ন্যায়বিচার সে বস্তুটি মিসিসিপিতে নেই। আপনাকে ছেলেবয়েস থেকে আমি জানি। আপনি বঞ্চক নন—কিন্তু দুর্বল চেতা মানুষ। তাছাড়া বুদ্ধিশুদ্ধিও আপনার তেমন প্রখর নয়।

শুনানী মুলতবী রাখার প্রস্তাব করলেন সরকারী উকিল। বাকি টাকাটা ক্লার্ক কিভাবে খরচ করেছেন সেটা প্রমাণ করতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যেয় জজসাহেব ডাঃ হেলিটের সঙ্গে বসে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। ক্লার্ককে কি করে ওরা জেলে পুরেছে সবিস্তারে সেটা বর্ণনা করার পরে ফিস ফিস করে বলল:

এতদিনে আমি বুঝতে পারছি আমেরিকা কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন! ক্লার্ককে আমি অন্তত চিনি। তার বাড়িতেও গেছি। ওর হাবভাবের ভিতর দিয়ে বরাবরই এই রকমের একটা ধারণা পেয়ে এসেছি যে লোকটি শান্তশিষ্ট, ভালো একটি সংসারী লোক। খাওয়ার আগে ভগবানের নাম করে খায়। ওটা হচ্ছে ওর একটা পৈশাচিক ছদ্মবেশ। দেখা গেল লোকটা ভয়ংকর গোঁড়া। এই ধরনের লোক দিয়েই পঞ্চম-বাহিনী গড়ে ওঠে।

ক্লার্ক জেলখানার রক্ষীদের ঘুস দেবার চেষ্টা করেছিল এ খবরটা কাগজে পড়ে কপাল চাপড়াতে লাগল নিকলসন: মুহূর্তে বিজলী চমকের মতো মনে পড়ল ওর। তারপর ছুটে চলে গেল জেলার সরকারী উকিলের বাড়ি।

হয়তো স্যার, আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারেন—কিন্তু সব জিনিস আমি প্রথমটায় চট করে বুঝে উঠতে পারি না। যখন ক্লার্ক জেলখানায় এলেন—মানে, যে দিন ঐ নিগ্রোটা গলায় দড়ি দিয়ে মরল—সে দিনটা ছিল দারুণ গরম। আমাকেও তিনি বলেছিলেন ঐ কথাই—'বেজায় গরম'। জবাবে আমিও বলে-ছিলাম, 'হ্যাঁ বড্ডো গরম'। খানিকক্ষণ বসলেন তিনি বিশ্রাম-ঘরে। সে ঘরটা তত গরম ছিল না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন কি ভাবে চলছে আমার। বললাম তেমন ভালো না। তিন তিনটি ছেলেপুলে। তারপর তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন আমার কত আয়, কতদিন পরপর মাইনে বাড়ে। এখন

মনে হচ্ছে ও সব কথার ভিতরে ইঙ্গিত ছিল। হয়তো কিছু পয়সাকড়ি গুঁজে দেবার মতলব ছিল আমার হাতে। এটা কি আপনি স্যার কাগজে লিখে দেবেন যে সে আমাকে মানে আর্থার নিকলসনকে ঘুস দিতে চেয়েছিল। আমার জন্ম তারিখ পেয়েছেনই আপনি। আর লিখে দেবেন যে আমি যুদ্ধফেরতা সৈনিক—

আরো একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল একটা গ্যাস কোম্পানির কর্মচারী, হ্যারি মিলসের কাছ থেকে। সে বলল যে গত শরৎকালে—ওর যতদূর মনে পড়ে সেটা অক্টোবর মাস, ও গিয়েছিল নিগ্রো এলাকায়। সেখানে ও ক্লার্ককে দেখেছিল কোনো একটি মেয়েছেলের ঠিকানা খুঁজে ফিরতে। ক্লার্ক কার খোঁজ করছে সেটা জানতে পারেনি মিলস। অবশ্য কালা-চামড়ারই কাউকে নিশ্চয়ই। কারণ ও অঞ্চলে কোনো শ্বেতাঙ্গী বাস করেন না। ওর ভুল হবার জো নেই। মিল ভালো করেই চেনে ক্লার্ককে। প্রায়ই ও যেত ক্লার্কের বাড়ি তার মিটার পরীক্ষা করতে।

সরকারী উকিলের দৃঢ় ধারণা হল যে 'ফ্রেন্ডস অব পীসের' আড্ডা নিশ্চয়ই নিগ্রো এলাকায়। অবাক হওয়ারও কিছু নেই। কারণ এমন একটি নিগ্রোও নেই যে না কি মনে মনে লালগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল নয়। পুলিস দারুণভাবে খুঁজে বেড়াল কোন মেয়েছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ক্লার্ক কিন্তু তাদের খোঁজাই সার হল।

ক্লার্ককে জীবনে কখনো দেখেনি বলে জানোয়ারগুলো আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মেরেছে—সরকারী উকিলের কাছে এসে অভিযোগ করে বলল পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট।—ব্যাটাদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। এক্ষুনি কাউকে পাঠিয়ে ওদের ভিতরে ভগবৎ-ভীতি ঢুকিয়ে দেয়া দরকার।

কিন্তু সে যা-ই হোক ক্লার্কের সহযোগী অপরাধীর কোনো হদিস পাওয়া গেল না।

আমরা জানতে পেরেছি কোনো একটি কৃষ্ণাঙ্গী আপনার সহকারী হিসেবে কাজ করেছে,—আবার মামলা উঠতেই প্রশ্ন করলেন সরকারী উকিল।—আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জজসাহেব লক্ষ্য করলেন ক্লার্কের চোখে-মুখে একটা ভাবান্তর ঘটেছে। হ্যাঁ! তার মানে ওরা ঠিক পথেই এগিয়েছে।

জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন ক্লার্ক:

আগামী কাল পর্যন্ত মামলা মুলতবী রাখার জন্যে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। —বললেন ক্লার্ক।—আমি একটা বিবৃতি দেব......

জজসাহেব তো হাতে স্বর্গ পেলেন। প্রায় এক বছর ধরে মামলাটা ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা বুঝি এবার ফলপ্রসূ হবে! এতদিনে তিনি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। সে রাত্রে তিনি তাঁর রাঁধুনীর ঘরে গেলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন রাঁধুনীর কাছে:

শিগগিরই আমি একটা কেউকেটা হয়ে উঠছি, বুঝলে? বিলাসব্যসনের জীবন......তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে। তুমি কালো হতে পার। কিন্তু তুমি যে একটি খাসা মাল তা তো জান নিশ্চয়ই।

সকালে উঠেই টেলিফোন করলেন মেজর স্মিডলকে:

আজ সকালের দিকে আদালতে আসুন। কপাল খুলে গেছে আমাদের। ক্লার্ক কথা দিয়েছে আজ সে পুরোপুরি স্বীকারোক্তি করবে।

জজসাহেবকে অভিনন্দন জানাল স্মিডল। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করে জানাল যে সে আজ আসতে পারবে না। কারণ ওকে যেতে হবে স্টেশনে—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সিনেটর লো আসছেন।

সমস্ত রাতভর নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলেন ক্লার্ক। হ্যারিসন ওঁকে অনুরোধ করে গেছে প্রয়োজন বোধে জেনিকে রক্ষা করার জন্যে।—"কে জানে ওরা আরো কত কি মতলব ভাঁজছে।" দ্বিতীয়বারও মেরীর কাছ থেকে টাকা পেয়েছেন ক্লার্ক। দুশো ডলার। চিঠিতে লিখে জানিয়েছে:

ডেভিডের যদি কোনো আত্মীয়স্বজন থাকে, তবে টাকাটা দয়া করে তাদের দিয়ে দেবেন।—ভগবান জানেন কী করে ওরা দেখতে পেয়েছিল যে ও দেখা করতে গিয়েছিল জেনির সঙ্গে আর চেষ্টা করেছিল তাকে পাঁচশো ডলার দেবার। ওরা জেনিকে শেষ করে দিতে পারে, কিন্তু মেরীর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। সিনেটর লো-র মেয়ের গায়ে হাত দিতে কেউ-ই সাহস করবে না। কিসের ভয় তাঁর? খবরের কাগজের জুলুম? কিন্তু সে রয়েছে এখন বহুদূরে—ইউরোপে। নিগ্রো মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে।

পরের দিন আদালতে বললেন ক্লার্ক:

আমি বলতে রাজী আছি কার কাছ থেকে আমি হ্যারিসনের জন্যে টাকা পেয়েছিলাম। মিসেস মেরী নিভেল—সেনেটর লো-র মেয়ে টাকাটা পাঠিয়ে-ছিলেন আমাকে। বার্কলে অ্যান্ড স্মিদ-এর ব্যাঙ্কের দুটো চেক পাই আমি তাঁর কাছ থেকে। আপনারা ব্যাঙ্কে গিয়ে এটা যাচাই করে দেখে আসতে পারেন। সিনেটরের মেয়েকে আমি চিনি। আর আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই যে—

ক্লার্ককে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে দিলেন না জজসাহেব। সরকারী উকিল মামলাটা মুলতবী রাখার দাবি জানালেন। তিনি প্রমাণ করবেন যে ক্লার্কের বিবৃতি একটা ঘৃণ্য প্রবঞ্চনা মাত্র।

বাড়ি ফিরে গিয়ে হাকিমসাহেব দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মামলাটা যে কোন দিকে মোড় নেবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল কিমোনো-পরা মেরীর চেহারা আর তার উন্মত্ত হাসি:

নিগ্রোটি যে আমার সঙ্গে প্রেমে পড়ে নি তা-ই বা না কেন?—অনেক বছর কাটিয়ে এসেছে মেরী ইউরোপে। আর সেই জন্যেই ওর স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া ওর মেজাজ আগুনে-পাহাড়ের মতো। নিগ্রোটার সঙ্গে ওর কিছুটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার থাকাটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। জুরিরা হয়তো এটা টেনে বের করে আনতে পারে। খবরের কাগজের লোকেরাও। ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল যে সিনেটর আজই আবার এসে পেঁছাচ্ছেন। তিনি যদি জানতে পারেন তবে কোনোদিনই আর গিলমোরকে ক্ষমা করবেন না। আপদ, কী করবে সে এখন?

স্মিডলকে ফোন করল। কিন্তু বাড়িতে পেল না তাকে। মেজরকে খুঁজে

পেতে পেতে প্রায় সন্ধ্যে। নীরবে শুনল স্মিডল কাহিনীটা। হাকিমসাহেব তাকাল তার মুখের দিকে:

হা ঈশ্বর! কী হয়েছে লোকটার! আদৌ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না তো ওকে! এমন হতাশায় ভেঙে-পড়া মূর্তি কখনো দেখেন নি তিনি মেজরের। দু হাতের ভিতরে মুখ গুজে বসে রয়েছে স্মিডল—ঠিক এই মুহূর্তে সে মনে মনে বলছে যে আত্মহত্যার গলার দড়িটাই এই দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে।

অবশ্য সব দিক চিন্তা করে দেখতে গেলে,—একটু সন্দেহভরা কণ্ঠে বললেন হাকিম সাহেব,—এতে মূলত অভিযোগের দিক থেকে কিছু এসে যায় না। টাকাটা যে ও মিসেস নিভেলের কাছ থেকে পেয়েছে এর আইনত কোনো মূল্যই নেই। যেটা আসল কথা সেটা হচ্ছে এই যে ও "ফ্রেন্ডস অব পীস" থেকে এক হাজার ডলার পেয়েছে। তাই না?

ওঁকে কৃতার্থ করতে স্মিডল কোনো জবাব দিল না। ও কি এমনই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে কথা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে?—মনে মনে ভাবলেন হাকিম সাহেব। কিন্তু পরক্ষণেই স্মিডল চাঙ্গা হয়ে উঠল।

না। অবশ্যি, অভিযোগ ঠিকই থাকে। কিন্তু যেটা আমার সন্দেহ হচ্ছে মনে মনে সেটা হল ক্লার্কের আচরণ। আমি জানি যে মিসেস নিভেলের পক্ষে উদ্ভট ঐৎকেন্দ্রিকতা সম্ভব। হয়তো যে নিগ্রোটা তাঁকে খুন করতে গিয়েছিল তার উপরে তাঁর করুণা হয়েছিল। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। কেন ক্লার্ক এ সম্পর্কে আগে কোনো কথা বলে নি? বলুন আমাকে, এটা কি স্বাভাবিক বলে মনে হয় আপনার?

আমি আর এর কি বলতে পারি?—প্রশ্নটার দরুণ হাকিমসাহেব একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন।—এ সম্পর্কে মোটেই ভাবি নি আমি কোনোদিন। লোকটা বেজায় একগুঁয়ে আর আমার মতে যে কোনো গোঁড়া একগুঁয়ে লোকই অল্পবিস্তর মাথাখারাপ।

নিঃসন্দেহ। কিন্তু ক্লার্ক শুধু যে গোঁড়া তা-ই নয়, ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। একটু ভেবে দেখুন তবেই আপনি একমত হবেন আমার সঙ্গে। ঠিক কথা, এক বছর আগেও লোকটা এমন ছিল না। জোসেফ এলিয়ট ভেবেছিল সে ঠিক লোকের কাছেইই টাকাটা পাঠিয়েছে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ফলাফলের ভয়েই ক্লার্কের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মনে আছে আমি যখন ওকালতি করতাম, অনেক মামলাই ডিসমিস করে দিতে হয়েছে শুধু এই জন্যে যে বিবাদীর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে গেছে। এতে ক্লার্কের লাভ হয়নি এক পয়সাও। লক্ষণ দেখে মনে হয় যে ওর এ ব্যাধি দুরারোগ্য। আপনার জায়গায় আমি হলে এ ক্ষেত্রে আমি বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করতাম। ডাঃ হেলিয়টের সঙ্গে আজ একবার আমি আলাপ করে দেখতে পারি। এটুকু দয়াদাক্ষিণ্যের কাজ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সিনেটর গাল দিতে পারেন এমন কোনো পথও আমরা রাখছি না—অকারণে লো-র নামে কেউই আর কাদা ছিটাতে আসবে না......

দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লেন জজসাহেব। এটা তো কোনোদিন তার মাথায় আসেনি। সত্যিই একটা চমৎকার পন্থা। ঠিকই বলেছে মেজর—একটা

দয়ার কাজও বটে।

দুদিন পরে ক্লার্ককে জেলখানা থেকে বদলী করা হল মানসিক হাসপাতালের নির্জন কক্ষে। আর যেহেতু সে পুরুষ আর্দালীদের বাধা দিয়েছিল, সেই-হেতু তাকে ভয়ংকর ধরনের পাগলের শ্রেণীভুক্ত করে রাখা হল।

মিসিসিপি পোস্ট লিখল:

প্রভু ভগবান কখনো কখনো মানুষের চাইতেও ভয়ংকর শাস্তিবিধান করে থাকেন। লাল-উকিল তার বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য তার যা ছিল তাকে যদি বিচারবুদ্ধি নাম দেয়া যায়। কারণ সে চক্রান্ত করেছিল আইন-সংগতভাবে নির্বাচিত সরকারী সংস্থাগুলোকে উচ্ছেদ করে মিসিসিপি প্রদেশে চেকোস্লোভাকিয়ার আদর্শে জন-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে। এই অভিশপ্ত অপরাধের জন্যে পাগলাগারদের দরজা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

লো রেগে গেছে।

স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, তোমাকে, তোমরা তোষণ-নীতি অনুসরণ করে চলেছ। লালগুলো যে-কোনো মুহূর্তেই আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। আর তোমরা ভালো করেই জান যে তাদেরও বোমা আছে। ওরা যে মেক্সিকোর উপকূলে এসে নামবে না তা কি করে জানলে তোমরা? অবশ্য আমার বিশ্বাস আছে যে প্রভু আমাদের জয়লাভ করাবেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের দরুণ আমি লজ্জিত বোধ করছি। রুশিয়াকে পরাজিত করতে হবে আমাদের আর তবু কিনা তোমরা একটা সামান্য উকিলের হাতে মার খাচ্ছ। এটা আমি আশা করি নি তোমাদের কাছ থেকে। গুপ্তচরদের সঙ্গে ক্লার্কের যোগাযোগ ফাঁস হয়ে গেছে। সন্দেহজনক সূত্র থেকে টাকাকড়ি যে সে পেয়ে থাকে তা নিজেই স্বীকার করেছে। সুতরাং নির্মম হাতে শায়েস্তা করতে হবে ওকে। একটি মাত্র দাওয়াই-ই আছে যাতে ওর রোগ সারবে—কড়া রকমের একটা গুলি। আমার নিজের মনের যে কি অবস্থা তা আর আমি বলতে চাই না। ঐ নিগারটা কি না খুন করতে গিয়েছিল মেরীকে। আর যা-ই হোক, আমি তো ওর বাপ। প্রথমত তোমরা নিগারটাকে আঙুলের ফাঁকা দিয়ে ফসকে যেতে দিলে—ক্লার্ক সাহায্য করল ওকে গলায় দড়ি দিতে। আর এখন কিনা তোমরা ক্লার্ককেও খসে পড়তে দিচ্ছ। ওকে ডিনারে মুরগী দেবে না মুরগীর জুস দেবে তাই নিয়ে ডাক্তারেরা মাথা ফাটাফাটি করছে। এ ক্ষেত্রে, ভুল বুঝো না আমাকে, ব্যাপারটা হচ্ছে নিতান্তই নর্বর ব্যাপার। তোমরা হয়তো মনে ভাবতে পার যে আমরা জ্যাকসনে নই, আছি মস্কোয়।

ক্লার্কের অবস্থাটা আদৌ তেমন লোভনীয় নয়।—প্রত্যুত্তরে বলল স্মিডল। বদ্ধউন্মাদদের ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ওকে। শুনেছি সব সময়ের জন্যেই ওকে ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, ও হচ্ছে অন্য লোকের হাতের ঘুঁটি। কিন্তু আমরাও খোঁজ পেয়ে গেছি তাদের। শিগ্গিরই টেনে তুলে ঢুকিয়ে দেব। কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপারে। সেই যে আপনি স্টেশনে লেখাটা দেখেছিলেন—কোন এক ব্যাটা খালাসি না ফায়ারম্যান তাড়াতাড়ি করে লিখেছিল ওটা। নির্ঘাত লালগুলোর সমর্থক লোকজন আছে এখানে। ওরা নিগ্রোদের ক্ষেপিয়ে তুলছে আমাদের বিরুদ্ধে। যদি আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করি তবে কালই ওরা আমাদের উপরে ছুরি চালাতে শুরু করে দেবে। পনেরো দিন আগে পুলিস একটা নিগ্রোকে গ্রেফ্‌তার করেছে। সে স্বীকার করেছে যে সে তার মনিবের গলা কাটতে যাচ্ছিল। এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না।

দুঃখদুর্দশা সবাইকেই সইতে হয়। ঈশ্বর বিরাট একপাল নিগারকে আমাদের কাঁধে সওয়ার করে দিয়েছেন। খুবই কঠিন ব্যাপার কিন্তু তবুও ধৈর্য ধরে সহ্য করে যেতে হবে আমাদের। তাছাড়া ওদের একেবারে বাদ দিয়েও তো চলে

না আমাদের। ধর, যেমন আমার মজুরেরা—তারা সবাই-ই তো নিগার।

নিগ্রোদের দ্বীপান্তর পাঠাবার কথা আমি বলছি না—সেটা হবে নিছক কাল্পনিক ব্যাপার। আমি যা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের লোকেরা একটু সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করুক।

ভুলে যেও না নির্বাচন এগিয়ে এসেছে। এখন বাড়াবাড়ির সময় নয়। প্রচুর ঘটনা ঘটতে চলেছে। আমেরিকাকে দৃঢ়বদ্ধ আর স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়াতে হবে।

মৃদু হাসল স্মিডল। ওর সমস্ত অবয়ব ঘিরে ফুটে উঠল এক সহৃদয় বিশ্বস্ততার ভাব।

ঠিক এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই নরম হয়ে এল লো। মনে হয় যেন ওর স্বগৃহে বসবাস ওকে সত্যিকারের বিশ্রাম দিতে পেরেছে। ভুলে গেছে সে বোমা আর ক্লার্কের কথা। বিভিন্ন ব্যাপারে বক্তৃতা দিয়েছে সে আর সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছে বিপুলভাবে। লোকে বলে সে মিসিসিপির গৌরব। নিজেই অনুভব করতে পারছে যে তার শরীর ভালো হয়ে উঠছে। রক্তের চাপের আক্রমণ হয়নি আর। শ্রবণশক্তিও অনেকটা ভালো হয়ে এসেছে। ক্ষিদে বেড়েছে। ওর সবচাইতে প্রিয় খাদ্য খুবই আয়েস করে খেতে শুরু করেছে—ক্যারামেল সস-এর সঙ্গে শুয়োরের মাংস। যেটা ওঁর নিগ্রো বাবুর্চি খুবই নিখুঁত করে রাঁধে।

মেরীর চিঠি এল যে সে শিগ্‌গিরই আসছে।

মিসিসিপির হাওয়ায় নিশ্বাস নেয়া ওর স্বাস্থ্যের পক্ষেও খুবই ভালো হবে। —স্মিডলের কাছে বলল লো।—একমাত্র নিভেল ছাড়া ইয়োরোপে আর কি যে ওর আকর্ষণ থাকতে পারে আমি ভেবেই পাই না।

প্রাতঃরাশ খাওয়ার সময়ে স্থানীয় শহরের ঘরের ছাপমারা একটা চিঠি দিয়ে গেল ডাক-পিয়ন। হয়তো কোনো নিমন্ত্রণপত্র,—ভাবল লো। কিন্তু খামের ভিতরে লিথো করা একখানা ইস্তাহার। নিদারুণ ঘৃণায় চিৎকার করে উঠল। যে কথাগুলো ভয়ংকর মারাত্মক বলে মনে হল সেগুলো পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখল।

লিংকন বলেছেন যে শ্বেতাঙ্গেরা যখন তাদের নিজেদের শাসনভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করার দাবি তোলে, সেটা তখন তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবি; কিন্তু যখন তারা চায় অন্যের উপরে শাসন বিস্তার করতে, সেটা নিরঙ্কুশ স্বৈরাচার।.........

ঈশ্বর সমস্ত মানুষকেই এক সমান করে গড়েছেন—সাদা, কালো, হলদে...

পাঁচ বছর আগে রুজভেল্ট বলেছিলেন যে আমেরিকান, ব্রিটিশ, রুশ, চীনা ও ফরাসীরা একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ—দীর্ঘস্থায়ী শান্তি।......

যারা আজ রুশিয়ার বুকে আণবিক বোমা ফেলতে চায় তারা যেন ভুলে না যায় যে যারা তলোয়ার তোলে তারা সেই তলোয়ারেই ধ্বংস হয়ে যায়......

ইস্তাহারের তলায় সহি রয়েছে: ফ্রেন্ডস অব পীস। লোর মনে পড়ল সেই গুপ্তচরটার কথা যে টাকা পাঠিয়ে ছিল ক্লার্ককে। এর মানে, এখনো চলছে সে সব। স্মিডলকে ডেকে পাঠাল লো।

দেখেছ এটা ?

এ হচ্ছে ঐ দো-আঁশলা মেয়েমানুষটার কাজ—গ্রান্থামের। আরো এক জোড়া নিগ্রো স্বামী-স্ত্রী আছে তার সঙ্গে। ভাববেন না এর জন্যে ভালো রয়ালটি দেব আমরা ওদের।—হোহো করে হেসে উঠল স্মিডল।—কিন্তু যারা এসব পড়ে তাদেরও একটু ভালো মতো শিক্ষা দিতে হবে আমাদের।

গত তিন হপ্তা ধরেই তো ও সব শোনাচ্ছ আমাকে। সাফ কথা বলে দিচ্ছি তোমাকে, তুমিও ট্রুম্যানের মতোই মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ছ। এও হতে পারে যে তুমিও তাঁর ঐ একই সুরে সুর মেলাতে যাচ্ছ ? কর্নেল রবার্টের কাছ থেকে আজ আমি একটা চিঠি পেয়েছি। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে জার্মানি যাবার জন্যে সে জোর দিচ্ছে। মোটামুটিভাবে তার কথাই ঠিক—ঝড়ের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে জার্মানি। অন্যদিকে এখানকার কাজকর্ম যেমন আছে তেমনি ফেলে রেখেও তুমি চলে যেতে পার না। অন্যথায় আমরা যখন পশ্চিম জার্মানির লোকদের বাঁচাবার কাজে ব্যস্ত থাকব, ততদিনে নিগারগুলো আমাদের জ্যাকসনবাসীদের শেষ করে ফেলবে।

আমি আশা করছি নভেম্বর পর্যন্ত চলে যেতে পারব। ইতিমধ্যে এখানকার সব কিছুই ঠাণ্ডা করে দিতে হবে। এই কুৎসাভরা চোথা কাগজটা আমার হাড়পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি আপনার কাছে যে এর লেখককে খুব সহজে পার পেতে দিচ্ছি না আমি।

পুলিসের বড়কর্তা বলল স্মিডলকে যে এ নিশ্চয়ই সেই বর্ণ-সংকরী এলেন গ্রান্থাম। যাকে ক্লার্ক খুঁজে বেড়িয়েছিল। দু বছর আগে ও এসেছে এখানে নিউইয়র্ক থেকে। পুলিসের কর্তা খবর দিল যে নিগ্রোদের সঙ্গে ওর খুব দহরম-মহরম। যেমন একজন হল সাংবাদিক—টমসন, আর একজন রুটির কারখানার মালিক—ব্যাং।

মেজর বসে বসে তার কর্মপন্থা চিন্তা করছে। উৎসাহের চোটে এক গ্লাস সাদা রাম-ই গলাধঃকরণ করে ফেলল। তারপর টেলিফোন তুলে পুলিশের কর্তাকে জিজ্ঞেস করল যে গত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে কি কি ঘটনা ঘটেছে। জবাবে পুলিসের কর্তা জানাল যে কোনো এক অজ্ঞাতনামা লোক একটা শেভ্রলে গাড়ি চুরি করেছে। জহুরী এচিসনের দোকানে ডাকাতি হয়ে গেছে। মিসেস মরিস নামে এক মহিলার ন বছর বয়সের একটি ছেলে হারিয়ে গেছে। তাছাড়া কালা-আদমীদের বস্তিতে আগুন লেগে এক ছুতোরের কারখানা জ্বলে গেছে। টেলি-ফোনের রিসিভারটা রেখে দিয়ে স্মিডল আর এক গ্লাস রাম খেল।

যদি এ কথা জানতে পারত যে ইস্তাহারটা লিখেছেন একজন সাদা মানুষ। যিনি গণ্যমান্য লোক হিসেবেই পরিচিত আর তাঁর নাম ফ্রাংকলিন মুর, ইতিহাসের শিক্ষক, তবে অবাক হয়ে যেত স্মিডল। আশেপাশে যে সব জিনিস ঘটে যাচ্ছে তা দেখে বহুদিন থেকেই মনে মনে দারুণ আঘাত পেয়ে আসছিলেন মুর। এ কথা জানেন শুধু তার স্ত্রী আর জাস্টিন রেলওয়ে ডিপো ফোরম্যান, জিস ও কনেল যার সঙ্গে মুর প্রায়ই দাবা খেলে থাকেন। ক্লার্কের মামলা যেন মুরের গায়ে

চাবকে আগন্ন ধরিয়ে দিল। আইনজীবী ভদ্রলোককে চিনতেন তিনি। রোটারি ক্লাবের ভোজসভায় আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। যদিও একট্ন দন্র্বল-চরিত্রের লোক তব্ও তাঁকে মনে করেন মন্র একজন খাঁটি ভদ্রলোক বলে।

কেন, দন্র্বল-চিত্ত কেন?—জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মন্র,—মক্কেল আছে ও'র, ঢের পয়সাকড়ি রোজগার করেন।

সে কথা বলছি না আমি।—প্রত্যুত্তরে রেগে উঠে বললেন মন্র,—কিন্তু উনি জানেন যে আমরা ধ্বংস হতে চলেছি, কিন্তু সেদিক থেকে কিছ্নই করছেন না।

তুমি কি করছ?—জিজ্ঞেস করলেন ওর স্ত্রী।

আমি? কিছ্নই না।—প্রত্যুত্তরে বললেন তিনি। কিন্তু আমি তো একটা হেজিপেজি লোক আর ক্লার্ক একজন কেউকেটা। আমার মনে হয় উনি গান্ধীর চেলা।

থাম, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না!—দার্ণ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন মন্র।—এখন তুমি কিছ্ন আর ইস্কুলে পড়াচ্ছ না। এই গান্ধী কি করেছিলেন না-করেছিলেন তা কি আমাকে শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে?

কি করেছিলেন তিনি জান না?—জবাবে ম্চকি হেসে বললেন মন্র,—যদি বল তো কিছ্নই করেন নি, ঠিক ঐ ক্লার্কে'রই মতো। উপোস করেছিলেন...। রবি যখন দন্ষ্টনুমি করে তবে খাবার সময়ে মিষ্টি না দিয়ে তুমি তাকে শাস্তি দাও। কিন্তু গান্ধীর মতে এটা দার্ণ একটা নিষ্ঠ্নর কাজ। তোমার করা উচিত এই যে রবিকে তুমি মিষ্টি দেবে, কিন্তু নিজে খাবে না।

ক্লার্কে'র গ্রেফ্তারের সংবাদ পড়ে মন্র তার পড়শীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

এক বাজি হবে না কি?—জিজ্ঞেস করলেন ও'কনেল।

দাঁড়াও একট্ন। আর এক 'খেইল' শন্র্ন হয়ে গেছে এখন। পড়েছ ক্লার্কে'র ব্যাপার? নিউইয়র্কে'র লোকেরা করছে কিছ্ন একটা—'ফ্রেণ্ডস অব পীস'—ভালোই মনে হচ্ছে আমার শন্নে। মেজর স্মিডল যদি পছন্দ না-ও করে সেটা তবন্ও ভালো। বলছি শোনো জিম, আমাদেরও কিছ্ন একটা করতে হবে। নিউ-ইয়র্কে'র লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি কিন্তু ওরা মিসিসিপিকে উপহাস করে। আর তারা যে খন্ব অন্যায় করে তাও নয়। ওরা বিচার করে আমাদের সিনেটর বিলবো বা ফকনারের উপন্যাস দিয়ে যার ভিতরের প্রত্যেকটি চরিত্র হচ্ছে বাজে, পচা। জ্যাকসনের প্রত্যেকটি লোককে তুমি চেনো। মাত্র দশটি লোক আমরা চাই। আমরা এক সঙ্গে বসে একটা ঘোষণা প্রকাশ করব। টেলি-ফোন ডাইরেকটরি দেখে সবাইকে খবর দাও। একবারেই যে করে ফেলতে পারব তা নয় নিশ্চয়ই। বর্ণানন্ক্রমেই শন্র্ন করে দেব।

একট্ন চিন্তা করল ও'কনেল।

দশজন লোক পেতে পার ঠিকই। ব্রাডলে আছে। আছে ছাত্র কাশিডি। ওষন্ধের দোকানের মালিক, ওয়েলস—সে অবিশ্যি কোনো কাজ করবে না, কিন্তু টাকা দেবে। রাসেলও আছে, তুমি চেনো তাকে। লেবয়েস। কিং ভাইয়েরা। স্মিদ আর হার্ডি। বেশ, তাছাড়া আমরা দন্জন। কিন্তু বিপদ হচ্ছে এই:

হার্ডি হচ্ছে একজন নামজাদা লোক। তার নাম রাখা উচিত কিন্তু দোষের মধ্যে হচ্ছে সে কমিউনিস্ট। অবশ্য এ কথা ঠিক যে সে বলে বেড়ায় না সে কথা। শুধু বলে সে প্রগতিবাদী। কিন্তু আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওর ঘরের দেয়ালে স্তালিনের ছবি টাঙানো রয়েছে দেখলাম।

কমিউনিস্ট বলে ভয় হচ্ছে না কি? শান্তির জন্যে যদি আমাদের ভালোবাসা থেকে থাকে তবে সবাইকে নিতে হবে আমাদের ভিতরে।

নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি চিনি তাকে। ওর মাথায় কিছু নিগ্রোকেও টেনে আনার খেয়াল চাপবে। এমন একটি লোক যে সে সব কিছুই নীতির উপরে ভিত্তি করে থাকে। আমার নিজের দিক থেকে কোনো প্রশ্নই নেই। নিগ্রো বলেই ক্ষেপে উঠব এমন কথা বলতে পার না আমাকে। কারণ আর যাই হোক আর দশজনার মতো ওরাও মানুষ। কিন্তু যদি একটি নিগ্রোকেও আমাদের ভিতরে নি-ই তবে ওয়ালেস আসবে না। আসবে না কাশিডি। মানে ব্রাডলে ছাড়া বাইরের কেউ-ই আর আসবে না।

বেশ, পাঁচজন নিয়েই আমরা কাজ করে যাব। তুমি আমি হার্ডি ব্রাডলে আর একজন নিগ্রো। নিগ্রো থাকলেও হার্ডিকে নিয়ে কোনো গোলমাল হবে না। ওর সবাই একই রকমের চিন্তা করে থাকে.........তাছাড়া ওয়ালেসও টাকা দিতে পারে। তাছাড়া আর তো কিছুই করবে না সে।

এই পর্যন্তই হয়ে রইল। সমস্ত পরিকল্পনাটার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠল হার্ডি। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ও'কনেল যে কোনো নিগ্রোকেই নিয়ে এল না হার্ডি। বলল:

ওদের সংগে কথা হয়েছে আমার। ওরা সব কিছুই করবে ওদের নিজেদের মতো করে। তোমাদের ভিতরে ওদের না টানাই ভালো—কেন ওদের শিকার হিসেবে দাঁড় করানো? পুলিস তো পাগলা হয়ে উঠেছে—ক্লার্কের সেই নিগ্রো মহিলার খোঁজখবর করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়াচ্ছে প্রত্যেককে।

বল তো, ক্লার্কের কাছে যারা চিঠিপত্র লিখত নিউইয়র্ক থেকে, সে সব ছেলেদের চেন না কি তুমি?—জিজ্ঞেস করল ও'কনেল।

কারোর সংগেই কোনোদিন চিঠিপত্র লেখালেখি করে নি ক্লার্ক,—ঘৃণাভরা কণ্ঠে বলে উঠল হার্ডি,—সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে স্মিডলের ধাপ্পা। দু একটা ঘটনা জানতে পেরে গেছি আমি। ক্লার্কের মামলা সম্পর্কে একটা বিবৃতি ছাড়ব আমরা। আর আমি হলফ করে বলতে পারি, তাতে করে ওদের কাঁপুনি ধরে যাবে।

ওর নিগ্রো বন্ধু বেঞ্চের কাছ থেকে জানতে পেরেছে হার্ডি যে ক্লার্কের মামলার পিছনে কি চক্রান্ত রয়েছে। বেঞ্চের বয়েস বছর পঞ্চাশেক, মোটাসোটা স্ফূর্তিবাজ লোক। কাজ করে রেডিও কারখানায়। ও নিজের জন্যে একটা চমৎকার রেডিও তৈরি করে নিয়েছে। হালের সমস্ত খবরাখবর ওর নখদর্পণে। আর মুখটিপে হাসতে হাসতে এসে বলে:

কাল ভিশিনিস্কি ডালেসকে নিশ্চয়ই একটা কড়া ধমক লাগিয়েছে।

এলেন গ্রান্থাম যে কাগজটায় লেখে সেটা সম্পর্কে ঘৃণাভরা বিদ্রূপের হাসি

হাসে বেণ্ড :

ওরা অনবরত এটা প্রমাণ করার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে যে স্মিডল লোকটা তেমন খারাপ নয়—মাঝে মাঝে একটু মাত্রাধিক্য হয়ে যায় বটে এই যা। কিন্তু লোকটা খাঁটি দেশপ্রেমিক। কাল যদি কু-ক্লাকস্-ক্লান আমাকে ফাঁসি দেয় তবে এলেন গ্রান্থাম লিখবে যে ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের। কিন্তু এর ভিতরে বে-আইনী কিছু নেই—বাজারের সব চাইতে সেরা সাবান দিয়ে দড়িটাকে মসৃণ করা হয়েছিল।

বেণ্ডকে নিয়ে প্রবীন নিগ্রোরা শঙ্কিত। "ওর জিভে বড্ডো ধার"—বলে তারা। —"এর জন্যে আমাদের না খেসারত দিতে হয় শেষ পর্যন্ত।" তরুণরা আসে ওর কাছে পরামর্শ নিতে আর ঠাট্টা করে বলে ওকে "কালো গভর্নর"। পুলিস যখন সেই রহস্যময়ী নিগ্রো মহিলার খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছিল, জেনীর ভাই এল বেণ্ডের কাছে।

একটা গোটা সন্ধ্যে জেনীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কাটাল বেণ্ড। জেনী বলল ওকে কেমন করে সিনেটরের মেয়েটা জোর করে ডেভিডকে বাধ্য করেছিল তার কাছে যেতে। কেমন করে সে উকিলকে খুঁজে বের করেছিল। তারপর টাকা পাঠিয়েছিল নিউইয়র্ক থেকে।

আমি টাকা নেই নি। ক্লার্ক বলেছিলেন যে ও মরমে মরে আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। ডেভিড বলেছিল আমাকে যে ও বাধ্য করছে তাকে ওর কাছে যেতে—এমন কি সে ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে যে যদি সে তার কথামতো কাজ না করে তবে ভীষণ খারাপ হবে তার পক্ষে। কি করে একে মর্মান্তিক আঘাত পাওয়া বলে ? মেয়েটাও ওর বাপেরই মতো। ওদের সবারই এক ধরন। এ কথাও বলেছিল ডেভিড। এখন ওরা আমাকে খুঁজে ফিরছে। সবার কাছে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে ক্লার্ক কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি না যে তাঁর মাথাখারাপ হয়ে গেছে—বোধহয় তিনি ওদের সুরে সুর মিলাতে রাজি হননি তাই। কখনো তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এই একটি মাত্র শ্বেতাঙ্গকেই দেখছি যিনি মর্মান্তিক দুঃখ পেয়েছেন। গত তিন রাত আমি বাড়িতে ঘুমোই নি।

ভয় পেয়েছ খুব ?

না, ভয় পাব কেন আমি ? ওরা ডেভিডকে খুন করেছে। সে লিখেছে আর বলেও গেছে যে আমার গর্ব অনুভব করা উচিত।

কোনো দিন ওদের ক্ষমা করো না।—এই কথাই লিখে গেছে ডেভিড। আমি একটি মাত্র জিনিস শুধু চাই—

কি চাও তুমি বাছা ?—দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেণ্ড।

ডেভিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে—নিচু কণ্ঠে বলল জেনী।

বেণ্ড ওকে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখল। কয়েক দিন পরে দেখা করতে এল ওর সঙ্গে।

এই নাও তোমার টিকেট—এসে বলল বেণ্ড জেনীকে—আজই তুমি নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছ। একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কয়েকজন লোক আছে

ওখানে, তারা তোমার থাকার আর কাজ পাওয়ার দিক থেকে সাহায্য করবে তোমাকে।

তাঁরা কি ডেভিডের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করবে আমাকে?

জবাব না দিয়ে বেণ্ড নীরবে ওর মাথার উপরে সস্নেহে চাপড় মারতে লাগল ধীরে ধীরে।

ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যের অনেক পরে। তখনো সময় রয়েছে জেনীর শহরের শেষ প্রান্তের সেই বনের ভিতরে ছুটে গিয়ে একবার দেখে আসার। আজও বনটাকে ভাবে জেনী "আমাদের বন"। দেখতে পেল সেই বনশ্যাওলা-ঘেরা গাছটা। ভাঙা কুটির আর সেই দুটো ফণীমনসার গাছ। আজ আর কেউ নেই যার জন্যে ওরা থাকবে সতর্ক পাহারায়। বুঝি বা বুকের উপরে অনুভব করল জেনী ডেভিডের হাতের স্পর্শ। ওর সর্বাঙ্গ ছেয়ে জেগে উঠল কম্পন। পরক্ষণেই দ্রুত ফিরে এল শহরে। না, আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না ডেভিড। জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ওকে। ডেভিড বলেছে ওকে ওর গর্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেমন করে? দূরে কোথায় যেন একটা তারা মিট মিট করছে—এই মুহূর্তে সবুজ প্রেম আর বেদনার একটি নক্ষত্র—তারপর মুহূর্তেই আবার লাল হয়ে যাচ্ছে—হাতের তালুতে যে ছোট্ট লাল তারাটি আঁকা ছিল ডেভিডের—সেই রুশ লোকটির সঙ্গে সাক্ষাতের স্মারকচিহ্ন হিসেবে।

প্লাটফর্মে জমে উঠেছে ভিড়। লোকেরা হাসছে, বিদায় দিচ্ছে তাদের প্রিয়-জনদের। জানলার পথে মাথাগুলো ঝুঁকে পড়ছে, রুমাল নাড়ছে। গাড়ি ছাড়তেই জেনীও মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল, হাত নাড়তে শুরু করে দিল—রাতের উদ্দেশ্যে, আকাশের তারা আর ডেভিডের উদ্দেশ্যে।

মরিসের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে নিগ্রোরা ওর ছোট্ট ছেলেটাকে খুন করেছে এই ভয়ংকর সংবাদ প্রচারিত হওয়ার এক হপ্তা আগেই চলে গেছে জেনী। মরিসের কথা ভালো করেই মনে আছে সবার। ইউরোপ থেকে ফেরার অল্প কিছুদিন পরেই মারা যায় মরিস। সে ঘৃণা করত নিগ্রোদের:

আর্দেনিসে একটা জার্মান অফিসারকে গুলি করে মারার জন্যে একটা মেডেল পেয়েছি আমি,—বলেছিল মরিস,—কিন্তু স্টোনের মেয়ের উপরে বলপ্রয়োগ করতে উদ্যত একটা নিগ্রোকে ধরে গলায় দড়ি দিয়ে লটকে দিলাম তারজন্যে আমাকে পুরস্কার দেয়া তো দূরের কথা দু-দুবার করে থানায় টেনে নিয়ে গেল সওয়াল-জবাবের জন্যে। একে কি ধরনের বিচার বলে? লোকটা ছিল মাতাল আর ঝগড়াটে। ওর প্রথম স্ত্রীকে মেরে ফেলে। মরার এক বছর আগে ও খামখেয়ালী স্বভাবের একটি পানশালার পরিচারিকাকে বিয়ে করে। প্রতিবেশীরা বলে যে সে তার সৎ ছেলেটাকে দারুণ যন্ত্রণা দিত। মরিসের মৃত্যুতে কেউই অবশ্য তেমন দুঃখিত হয়নি। কিন্তু ছেলেটাকে খুন করেছে শুনে গোটা জ্যাকসনের সাদা মানুষেরা দারুণভাবে আহত হল। অনেকেই বলতে শুরু করল: এ কাজ শুধু নিগ্রোদের পক্ষেই করা সম্ভব। ওরা তো আর মানুষ নয়। কড়া হাতে লাগাম কষতে পার যদি তো ওরা খুবই ভালো, আজ্ঞাবহ মজুর। কিন্তু এতটুকুও আস্কারা দাও তো অমনি ওরা হিংস্র বন্য পশু হয়ে উঠবে। ন বছরের একটা

ছেলেকে কিনা খুন করল শেষটায়! আর এমন পাগলও কিনা আছে কয়েকজন যারা ঐ বদমায়েসগুলোকে ভোট পর্যন্ত দিতে চায়!

এখানেই ঘুমোও তুমি—বেঞ্চকে বলল হার্ডি।—তুমি যে এখানে এসেছ তা কেউই দেখতে পায় নি, তাছাড়া ওরা কেউ-ই আসবে না এখানে।

অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতেই কয়েক শ লোক শহরের পার্ক থেকে নিগ্রো-বস্তির দিকে এগিয়ে চলল। ওদের ভিতরে আছে প্রবীণ বয়সের লোক, যেমন আমেরিকান লিজিয়নের স্থানীয় শাখার সভাপতির রাইড, আর মিসিসিপি পোস্টের নাট্য-সমালোচক হচকিস। কিন্তু বেশিরভাগই তরুণ। এ সময়ে সাধারণত ভিক্টোরিয়া বারে গোল হয়ে বসে 'ফলের রস' নামক পাঁচমিশালী মদ খায়। কিংবা গাড়ি হাঁকিয়ে পাশের ভিজা স্টেটের সীমার কাছাকাছি শুঁড়িখানায় গিয়ে জমে। ওদের পুরোভাগে রয়েছে তুলো-ক্ষেতের মালিক রিমণ্ডের বড় ছেলে। কুখ্যাত গুণ্ডা। এবার বসন্তকালেই ও সরাইখানার মালিক পিটারকে ধরে পিটেছে। আর মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই ডাঃ হেলিটের স্ত্রী মাতাল অবস্থায় তাঁর সিলকের ব্লাউজ ছিঁড়ে দিয়েছিল বলে প্রকাশ্যে ওকে চড়িয়েছে।

ব্যাটাদের নোংরা শরীরের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দেয়া যাক, কি বল?—চিৎকার করছিল ও।

কি বল?—বলছিল বারবার। আর তরুণ দল সমস্বরে সমর্থন করছিল। ওদের পিছনে পিছনে আসছে স্থানীয় তিনটা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও ফটো-গ্রাফার।

নিগ্রো-বস্তি অন্ধকার। ভয়ে সবাই আলো নিবিয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে রিচমণ্ড একটা বাচ্চা ছেলেকে মাড়িয়ে দিল। জেগে উঠল দারুণ আর্তনাদ।

বেজন্মার দল!—গালপেড়ে উঠল রিচমণ্ড,—সব সময়ে ব্যাটাদের নোংরা শরীর-গুলো লোকের পায়ের তলায় গিয়ে পড়বে।

নিগ্রো সংবাদপত্রের অফিস বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল জনতার ভিড়। সব কিছুই তছনছ করে ফেলল। এলেন গ্রান্থামকে না পেয়ে ওরা বারান্দার তলা পর্যন্ত খুঁজে দেখল। খবরটা পরে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে পুলিসের বড়কর্তা আগেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সাংবাদিক টমসনকেও পাওয়া গেল না। কিন্তু রুটিওয়ালা ব্যাং ছিল ঘরেই। আগে আগে ঢুকল গিয়ে রিচমণ্ড। সোজা কাউণ্টারের সামনে এগিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্রভাবে হাতের এক ঝটকায় বাসনপত্র সব মেঝের উপরে ফেলে দিল। অন্য সবাই শুরু করে দিল আসবাবপত্র গুঁড়িয়ে দিতে। ব্যাং-এর মেয়েটিকে বিছানা থেকে টেনে এনে তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে লাগল।

রাইডের দুশ্চিন্তা হল: তরুণরা স্ফূর্তি করতে ব্যস্ত কিন্তু এদিকে পাখি না উড়ে যায়। হচকিসকে ডেকে এনে দুজনে মিলে ব্যাংকে বেঁধে ফেলল দড়ি দিয়ে। রাইড দড়ির মাথা ধরে ব্যাংকে টেনে বের করে নিয়ে এল। তারপর আবার সবাই ফিরে গেল সংবাদপত্রের অফিসে। ছাপাখানাটা ভেঙেচুরে গুড়ো-গুড়ো করে ফেলল আর গুড়িয়ে দিল সবকিছু। যুবকেরা পাশের বাড়িতে গিয়ে ঢুকে অন্ধকারে গেরস্থদের মারপিট করে হাতের কাছে যা কিছু পেল

ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আরম্ভ করল রাস্তায়। লিফট-বয় ডেভিডসনের স্ত্রীর একটা দাঁত ভেঙে যাওয়ায় দারুণভাবে চিৎকার জুড়ে দিল। ভারি মজা পেয়ে গেল রিচমন্ড। সঙ্গে সঙ্গে ফিলমের সেই বীভৎস গানটা গাইতে শুরু করে দিল: আমার বরটি একটি শুয়োর। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোঁতঘোঁত শব্দে সমবেত কণ্ঠের কোরাস শুরু হয়ে গেল। ভাঙা কাঁচ ঝনঝন শব্দে গুড়োগুড়ো হয়ে যেতে লাগল। তারস্বরে শিশুকণ্ঠে জেগে উঠল চিৎকার।

কাজে যাবার সময় হয়েছে এবার—হচ্‌কিসকে বলল রাইড। শহর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা। গাড়ির পিছনে ব্যাংকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি হাঁকিয়ে চলল রাইড। একটা প'ড়ো জমির কাছে এসে থামল ওরা। তারপর গাড়ি থেকে কয়েকটিন পেট্রোল বের করল। মাটিতে একটা খোটা পুতে ব্যাংকে বেঁধে দিল তার সঙ্গে তারপর পেট্রোল ঢেলে দিল ওর গায়ে। এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে ব্যাং-এর। সে বিড়বিড় করে বলে উঠল:

ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ছেলেটার গায়ে হাত দিইনি।

ক্ষণেকের জন্যে নেমে এল নিস্তব্ধতা রাইড একটা স্তোত্র আওড়াল। পরক্ষণেই আগুনের শিখা ঢেকে ফেলল ব্যাংকে। এই প্রথম রিচমন্ড এ-ধরনের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছে, তাই ওর মুখ থেকে মন্তব্য বেরিয়ে এল:

নিশ্চয়ই ব্যাটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসে খবরটা শুনল লো। বারান্দার রেলিং বেয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া কাঠ-গোলাপের ঝাড় দেখতে দেখতে মনে মনে তারিফ করছিল সে; এমন সময়ে হঠাৎ নজর পড়ল ওর বুড়ো বাবুর্চি অতি কষ্টে পা-টেনে টেনে আসছে।

কি হয়েছে তোমার জো ?—সহানুভূতিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল লো।

ওরা আমার ভাইঝিটাকে মেরে ফেলেছে—ফ্রেডের মেয়েকে। মাত্র চার বছরের মেয়ে আর তাকেই ওরা খুন করল—

গত রাত্রের জ্যাকসনের ঘটনা আদ্যোপান্ত বলল সে সিনেটরের কাছে। দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল লো-র। অবিশ্যি নিগারগুলোরই দোষ। দেয়ালের গায়ে যা খুশি তাই লিখে রাখা উচিত নয় ওদের, তাছাড়া ঐ ধরনের কুৎসিত ইস্তাহার পাঠানো, কিন্তু তা বলে চার বছরের কচি মেয়েকে খুন করবে কেন ? তাছাড়া এই নির্বাচনের মুখে! খুবই অন্যায়, ভারি অন্যায়!

স্মিডল আসতেই লো তাকে যৎপরোনাস্তি কটু কথা শোনাবার জন্যে তৈরি হয়ে রইল মনে মনে। কিন্তু আগে থেকেই স্মিডল তার সে মতলব ফাঁস করে দিল:

কী বীভৎস ব্যাপারই যে ঘটেছে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না! অবশ্য জানি যে শ্বেতাঙ্গদের মরিয়া করে তুলেছিল কিন্তু তবুও হিংসা—হিংসা। আমাদের হাতে আইন আছে, হাকিম আছে, এ-ধরনের বাড়াবাড়ি না করেও আমরা ওদের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারতাম। আর যাই হই আমরা তো আর লাল নই।

অনেকক্ষণ ধরে সে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

আমি আদৌ বুঝতে পারছি না যে কেন পুলিস সময়মতো হস্তক্ষেপ করল না ? ব্যাং ঐ নোংরা ইস্তাহারটার লেখক। আইনটা নিজেদের হাতে তুলে না নিয়ে ওরা তাকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্যে চালান দিতে পারত। ঐ কচি মেয়েটার ব্যাপারটা আমার মেজাজ একদম বিগড়ে দিয়েছে। আপনার জো একজন একান্ত অনুগত ভৃত্য। তাকে অন্তত ওরা রেহাই দিলে পারত। অকথ্য ব্যাপার! একমাত্র সান্ত্বনা এইটুকুই যে এর কিছুটা ফলাফল পাওয়া যাবে। কথাটার ভিতরে খানিকটা সত্য আছে যে, প্রত্যেক মন্দ জিনিসেরও একটা ভালো দিক থাকে। নিগ্রোদের প্রাণের ভয় এতটা বেড়ে যাবে যে ঐ ধরনের ইস্তাহার আর আমাদের চোখের সামনে আসবে না। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে এটা তো কেউ আর চায় না। তাছাড়া দেয়ালের গায়েও আর কেউ আঁচড় কাটবে না। ঐ ফায়ার-ম্যান খালাসি-গুলোও দারুণ ভয় পেয়ে যাবে বলেই আমার ধারণা।

মোটামুটি ছেলেটার কথা ঠিকই,—মনে মনে ভাবল লো। পুলিসের অবশ্য উচিত ছিল সময়মতো ছেলে-ছোকরাগুলোকে হুঁসিয়ার করে দেয়া। কিন্তু কী চমৎকার শিক্ষাটাই না হল নিগারগুলোর! জো-র জন্যে দুঃখ হল ওর। তাছাড়া ঠিকই বলেছে 'ছেলেটা'—লোকটা খুবই অনুগত ভৃত্য। বাবুর্চিকে ডেকে একশো

ডলার দিল তার হাতে:

তোমার ভাইকে দিও। মেয়েটার জন্যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে আমার। তবু এ-ও ভালো যে তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে আছে। তাছাড়া তোমার উপরে খুবই সন্তুষ্ট আমি—তুমি সত্যিকারের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

অবশেষে সেদিন সন্ধ্যেয়ই মেরী এসে পেঁছাল। অভিভূত হয়ে পড়ল সিনেটর। আনন্দে কেঁদে ফেলল।

আমার ছোট্ট মেয়েটা! আমার ছোট্ট মেয়েটা!—বারবার করে বলতে লাগল। বাপের সম্পর্কে খুবই কোমল আর বিবেচক মেরী। কিন্তু ওর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল সিনেটর। মেরীর খামখেয়ালী রুচির কথা অজানা নেই তার কাছে কিন্তু এ ধরনের কোনো কিছু জীবনে দেখেনি। ওর পরনে গাঢ় সবুজ পোশাক তাতে কমলা রঙের মাছ আঁকা আর মাছের চোখগুলোয় গাঢ় নীল রঙের পাতা।

অমন পোশাক পেলে কোথায়?—জিজ্ঞেস করল লো।

একজন শিল্পীর আঁকা নক্সা। দক্ষিণ ফ্রান্সে থাকেন। তিনি আমেরিকান। ও'র ছবিগুলো চমৎকার। কিন্তু তাতে জীবিকা চলে না। তাই কাপড়ের কাজও করে থাকেন। ভালো লাগছে তোমার?

জান তো এখানে আমরা ওসব দেখতে অভ্যস্ত নই। চোখে লাগছে আমার। আর ঐ ফিতেটা?

এটাও তাঁরই তৈরি। খুবই সাধারণ। দেখছ নেহাত মামুলি জিনিস দিয়ে তৈরি। গড়, শামুক খোলা, একটু ঘোড়ার লেজের চুল, এক টুকরো টিন—কিন্তু এখানে দেখ নাম সই করা রয়েছে—'কিং'। এই রকম একটা নাম সইয়ের দামই পাঁচশো ডলার।

লোর ইচ্ছে হল আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে দেয় মেয়েকে। ঐ রকমের একটা ঘোড়ার গলার দড়ি, চাষার ঘুড়ীও যেটা গলায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তা আবার কি করে পয়সা দিয়ে কেনে লোকে? কিন্তু ঠিক করলেন কিছুই উচ্চবাচ্য করবেন না, পাছে প্রথম সন্ধ্যেটাই মাটি হয়ে যায়।

দুদিন পরে এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁছাল সিনেটর যে ইউরোপ সত্যি সত্যিই মেরীকে বেচাল করে দিয়েছে। একদিন মেরী শহর থেকে ফেরার পরে ও'রা লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। মেয়েকে কাছে পাওয়ার আনন্দে গদগদ সিনেটর মিষ্টি চাটনির সঙ্গে খাচ্ছিলেন শুয়োরের মাংস। হঠাৎ মেরী বলে উঠল:

আজ আমি কালা লোকদের বস্তিতে গিয়েছিলাম। কী ভয়ানক ব্যাপার! তোমার ঐ স্মিডল আর তার চেলাচামুণ্ডারা মিলে সত্যিকারের দলবদ্ধ হত্যা-অভিযান চালিয়েছিল।

ওর সঙ্গে স্মিডেলের কোনো সম্পর্ক নেই। সে তোমার মতোই ক্ষুব্ধ হয়েছে ব্যাপারটায়। তাছাড়া তোমার বোঝা উচিত যে এর জন্যে নিগারগুলোই দায়ী বেশি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি একটা জিনিস তোমাকে।

পড়ার ঘরের আলমারিতে তুলে-রাখা ইস্তাহারটা নিয়ে এল লো। পড়া হয়ে গেলে পরে হেসে উঠল মেরী:

বেশ তো, কী হয়েছে তাতে? ইউরোপে সবাই আজকাল বলে থাকে ও কথা। তুমি জান তো যে রাজনীতি নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই—কে নির্বাচনে জিতল না জিতল কিছুই এসে যায় না আমার। কিন্তু আমাদের বেচারা জো-র ভাইঝিটাকে খুন করা হল আর খুনীকে কেউ গ্রেফতার করল না। চুল-ছাঁটার দোকানে ওরা বলল আমাকে যে রিচমন্ড জুনিয়র ময়ূরের মতো বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছে সবার কাছে যে সে নিজের হাতেই ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে খুন করেছে। এটা রাজনীতি নয়—নিছক খুন। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হল এই যে মরিসের ছেলেটা ফিরে এসেছে। সেই কথাই বলল সবাই ওরা চুল-ছাঁটার দোকানে। ছেলেটা সৎ-মার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে চলে গিয়েছিল তার মাসীর কাছে। আর ওর মাসী জানতও না যে সবাই ছেলেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন ওকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু শুনলাম যে একটা খবরের কাগজও এটার উল্লেখমাত্র করেনি। এ-সবই হচ্ছে স্মিডলের কীর্তি। তুমি যা-ই বল আমি মানতে রাজী নই। স্মিডল তোমাকেও টেনে নিয়ে চলেছে।

রাগে লাল হয়ে উঠল সিনেটর:

মেরী!—গর্জে উঠল।

উঠে টলতে টলতে পড়ার ঘরে চলে গেল। দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ল মেরী। হয়তো হৃদ-রোগের আক্রমণ শুরু হবে! চলতে চলতে মনে মনে বলতে লাগল, ও আর এমন কিছুই করবে না যাতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে—খুবই অসুস্থ, খুবই সতর্ক হয়ে চলা দরকার। কথাবার্তা সামলে না বলার জন্যে এতক্ষণে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে। একান্ত ভয়ে ভয়ে পড়ার ঘরের দিকে পা বাড়াল। আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে লো।

মেরী, কোনো নিগ্রোর সামনে এমন কথা আর কক্ষণো মুখে এনো না। লক্ষ্য করছিলাম জো একমনে তোমার কথা শুনছে। শোনো, ভুল বুঝো না আমাকে, তুমি নেহাতই একটা বোকা মেয়ে। বোঝো না যে এর ভিতরে লালদের হাত রয়েছে। ওরা চায় যে নিগ্রোরা আমাদের কচুকাটা করুক। আর তুমি কি না তাদের সাহায্য করছ—

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মেরী যে আর কখনো সে একটি কথাও বলবে না নিগ্রোদের সম্পর্কে। ঠিক করল কারুর সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাত করবে না। বাপের সেবা শুশ্রূষা নিয়ে কাটিয়ে দেবে তিন সপ্তাহ। ঘরের শান্তি ফিরে এল। ক্বচিৎ কখনো আসে স্মিডল, আর যখনই আসে সিনেটরের সঙ্গে দু-একটা কথা বলেই তাড়াতাড়ি চলে যায়। সিনেটর চায় যে ও আসুক, সন্ধ্যেটা কাটাক এসে মেরীর সঙ্গে, কিন্তু তার সে-সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। মেজর বলে যে সে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তাই কাজের চাপ পড়েছে খুব। কিন্তু আসলে স্মিডলের যেটা ভয়, সেটা হচ্ছে এই যে মেরী হয়তো ক্লার্কের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেবে। শুনতে পেয়েছে স্মিডল যে চুল-ছাঁটার দোকানে গিয়ে মেরী ঠিক লাল-দের মতোই আচরণ করেছে। ও যদি সিনেটরের মেয়ে না হত তবে দোকানের মালিক নিশ্চয়ই পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিত ওকে। স্মিডল ঠিক করল তাড়াতাড়ি চলে যাবে। শহরের সব কিছুই এখন শান্ত। নিগ্রোদের

স্পষ্টতই দমন করা হয়েছে। কিন্তু মেরীর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই ওর স্নায়ুবিকৃতি হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

না না—বলল লো,—এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না। যদি ঠিক করেই থাক যে বুধবার চলে যাবে তাহলে কাল আমাদের এখানে এসে খাবে, নইলে আমি তোমাকে ছাড়ছি না।

খাওয়ার সময়ে খুবই খুশী মনে খাচ্ছিল লো, প্রচুর খেল, প্রচুর হাসল। কিন্তু ওদিকে মেরী আর স্মিডল দুজনেই ফুঁসছিল মনে মনে। খাওয়ার শেষের দিকে যখন জো ওমলেটের ডিস পরিবেশন করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড় উঠল।

বেশ, তোমরা শিগগিরই ইউরোপ পাড়ি দিচ্ছ,—শ্যামপেনের গ্লাসটা তুলে ধরে বলল লো।—তুমি চললে বার্লিন আর তুমি মেরী, তুমি চললে পারী। তোমাদের দুজনার উদ্দেশ্যেই আমি পান করছি। আমেরিকানদের পক্ষে ইউরোপে বাস করা কী যে কষ্টকর তা আমি ধারণা করতে পারছি। প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে 'লাল'। প্রভু তোমাদের শক্তি দিন!

প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানাল স্মিডল:

ঠিকই বলেছেন আপনি,—বিনীতভাবে বলল স্মিডল,—সত্যি, আমাদের পক্ষে ইউরোপে বাস করা খুবই কষ্টকর। বর্বরতা চলেছে চতুর্দিকে। আমার জার্মান বন্ধুরা যদি অমন একান্তভাবে অনুরোধ না করত তবে কিছুতেই আমি জার্মানিতে ফিরে যেতে চাইতাম না। ওরা যে ধ্বংসের মুখে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পেতে আমাদের সাহায্য করতেই হবে—

বুঝিবা মেরীর পানের মাত্রা একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল—ওর মুখময় ফুটে উঠেছে চাপ চাপ লাল দাগ। হঠাৎ মেরী হো হো করে হেসে উঠল। নিভেল ভালো করেই চিনত ওর এই হাসিটা—জানত এটার লক্ষণ ভালো নয়। কিন্তু বাপের সামনে মেরী স্বভাবতই সংযত। তাই অবাক হয়ে গেল লো।

এত হাসির কী পেলে?

কয়েক দিন আগে আমার এক বন্ধু ফিরে এসেছে জার্মানি থেকে। তার মুখে শুনেছি প্রতি পায়ে পায়েই আপনাদের চোখে পড়ে, লেখা রয়েছে "মার্কিন-মিতা দেশে ফিরে যাও!" আমার অনুমান যে মেজর স্মিডল মনে করবেন যে ওসব তাঁর উদ্দেশ্যে লেখা নয়।

ধৈর্য হারিয়ে রেগে উঠল লো:

বাজে কথা বলো না! দেয়ালের গায়ে অমন অনেক কিছুই ওরা লিখে থাকে! আমি যেদিন এখানে এসে পেঁৗছলাম, দেখলাম কোন এক অভিশপ্ত নোংরা জীব স্টেশনের দেয়ালে লিখে রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইউরোপের লোকেরা আমাদের সাহায্যের মূল্য দিয়ে থাকে।—স্মিডলের মুখের দিকে তাকাল লো,—তোমার কি মনে হয়?

নিশ্চয়ই দেয়। জার্মানদের তো কথাই নেই, আমি পারীতেও কাটিয়ে এসেছি দু হপ্তা, যেখানেই গেছি সেখানেই প্রকৃত কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দেখতে পেয়েছি আমি।

আবার হেসে উঠল মেরী:

কৃতজ্ঞতা? হয়তো কফিখানার পরিচারিকাদের কথাই বলতে চাইছেন আপনি? যদিও উদারতা বলে কোনো বস্তু আপনার ভিতরে কখনো আমি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। এইতো গোটা এক বছর আমি কাটিয়ে এলাম ফ্রান্সে। আমেরিকান নই এটা প্রমাণ করতে প্রচুর দাম দিতে হয়েছে আমাকে। একদিন ছিল যখন ওরা আমাদের পছন্দ করত। এখানকার চাইতে ঢের বেশি আরাম পেতাম তখন পারীতে থাকতে। কিন্তু আজ ওরা আর আমাদের সহ্য করতে পারে না। দিন আসছে যখন তোমাদের লজ্জায় পুড়ে মরতে হবে।

লালগুলোর মুখে শুনেছ তুমি এসব কথা।—চিৎকার করে উঠল লো।—কাদের সঙ্গে মেলামেশা কর তুমি? রূঢ় মন্তব্য করতে চাই না আমি তোমার সম্পর্কে, এ সব ব্যাপারে তুমি একটি কচি খুকী বললেই চলে। কিন্তু আমি বলতে চাই কী ভেবেছে তোমার স্বামী? কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছ না করছ সে দিকে নজর রাখা দরকার ওর—

এসব কথায় কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন?—আপোসের সুরে বলল স্মিডল।—মেরী সব সময়েই ক্ষেপায় আমাকে—আর আমিও ওতে অভ্যস্ত। ও জানে যে লাল-গুলোর মুখের কথা কেউ ফিরে বললে সেটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। মেরী তোমার চির যৌবনের কামনায় এক পাত্র পান করতে দাও আমাকে।

মেরীর ইচ্ছে হল মদের পাত্রটা ছুড়ে দেয় স্মিডলের দিকে আর জিভের বাঁধন দেয় আলগা করে। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কথা চিন্তা করে ধৈর্য অবলম্বন করল।

একা হতেই ভাবতে লাগল লো যে মেরীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে খারাপ দিকে। খেসারত না দিয়ে এত দীর্ঘদিন ইউরোপে বাস করার উপায় নেই। ও কথাবার্তা বলছিল ঠিক ঐ লালগুলোর মতো—বিশ্বাস করা শক্ত যে ও তাঁর নিজেরই মেয়ে।

স্মিডল পাড়ি দিল ইউরোপে। মেরী আর কখনো তার বাবার মনে কষ্ট দেয়নি। সেদিনকার সেই ভোজের ব্যর্থ পরিণতির কথা ভুলে গেল লো। একটা সপ্তাহ কাটল খুবই চমৎকার। লম্বা পথ বেড়িয়ে আসেন পায়ে হেঁটে, ফুলের চারা তুলে লাগায় স্থানান্তরে। চলে ফেরে ঘোঁতঘোঁত করে। জো-র সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে। আসছে রবিবার চলে যাবে ওরা এখান থেকে। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে লো ওয়াশিংটনে ফিরে যাবার জন্যে, প্রচুর কাজ জমা হয়ে আছে সেখানে। আর মেরীও চাইছে পারীতে ফিরে যাবার আগে নিউ ইয়র্কে তার শিল্পীর কাছে গিয়ে কটা দিন কাটিয়ে আসতে।

এতদিন সন্ধ্যায় গ্রীষ্মাবাসে বসে শান্তিতে আরাম উপভোগ করছিল দুজনে:

আমার ছেলেবয়সে,—দার্শনিকতা শুরু করল লো,—আজকের সব এই নতুন নতুন আবিষ্কার তখন কিছু ছিল না। না ছিল উড়বার ব্যবস্থা, না শুনতে পেত কেউ রেডিও। তাছাড়া এখান থেকে ওয়াশিংটন যেতে লাগত পুরো এক হপ্তা। হ্যাঁ, তখন মানুষের চালচলনও ছিল খুবই সাধারণ গোছের। লোকে বলে প্রগতির ভিতরেই রয়েছে সুখ। কিন্তু আমি তা মনে করি না। যদিও রেল লাইন ছিল না সেদিন তবুও আমার মনে হয় দশ বছর আগে হয়তো লোক ঢের বেশি সুখী

ছিল। হয়তো তুমি কোনো এক নক্ষত্রপুঞ্জে উড়ে যেতে পার ঘণ্টায় তিনশো মাইল গতিতে, কিন্তু তবুও মানুষ আজ খুবই অসুখী। শুধু একটা জিনিসেরই আমি মূল্য দিই খুবই—সেটা হচ্ছে এই জ্ঞানটুকু যে, ঈশ্বর আর আমেরিকার দিক থেকে আমার বিবেক সম্পূর্ণ নির্মল।

একটা ট্রের উপরে করে সন্ধ্যের খবরের কাগজ আর খানকয়েক চিঠি নিয়ে এল জো। চিঠিপত্রগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লো।

দেখতে পাচ্ছ তো, একটি মুহূর্তও নেই নষ্ট করার মতো।—মন্তব্য করল লো। —রিপাবলিকানরা পালটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে। রবার্টস-এর ইচ্ছে ট্রানজকের তরফ থেকে কেউ একজন বুখারেস্ট যাক। ওখানে কিছু একটা গড়ে তুলেছে ও—

শেষ চিঠিখানা খুলেই চিৎকার করে উঠল লো। চমকে উঠল মেরী।

কী হল বাবা ?

ভয় হল পাছে ইস্তাহারটা মেরীর চোখে পড়ে তাই তিনি উঠে পড়ার ঘরে চলে গেলেন।

আগের ইস্তাহারটার মতোই এটার তলায়ও লেখা রয়েছে "দি ফ্রেন্ডস অব পীস"। কয়েকদিন আগের ঘটনা দিয়ে শুরু করে পরে অবতারণা করেছে মূল প্রসঙ্গের :

আমাদের শহরটাকে কলঙ্কিত করেছে। মেজর স্মিডল সত্যি সত্যিই একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত করেছিল। আটচল্লিশ বছর বয়সের সম্মানিত নাগরিক ব্যাংকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। খুন করেছে একটি চার বছরের কচি মেয়েকে। আহত হয়েছে অনেকে। কিন্তু ঐ খুনেদের একটিকেও গ্রেফতার করা হয়নি। ভিক্টোরিয়া বারে বসে সবার সামনে রিচমন্ড জুনিয়র বুক ফুলিয়ে সবার সামনে বলেছে, কেমন করে সে ব্যাংকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে আর ঐ কচি মেয়েটিকে হত্যা করেছে। কতকাল আর আমরা এই বিধির বিধান আর গঠনতন্ত্রের পরিহাস সহ্য করে চলব ?

সিনেটর লো আর তার দালাল মেজর স্মিডলের নেতৃত্বে একদল চোর জোচ্চোর আর খুনী আমাদের রাষ্ট্র শাসন করছে। আমাদের রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকদের জানা দরকার যে এরা কতদূর পর্যন্ত নিচে নামতে পারে। কেন নির্দোষ নিগ্রো ডেভিড হ্যারিসন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে আর কেনই বা বিখ্যাত আইনজীবী ক্লার্ক ধ্বংস হয়ে গেছে তার সত্য কাহিনী আমরা প্রকাশ করছি :

সিনেটর লোর একটা মেয়ে আছে মেরী নামে। কুৎসিত, বিগতযৌবনা, অনেকদিন আগেই তার যৌবনের ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে। কে ভাবতে পারে যে তার পক্ষেও এ ধরনের নটঘট করা সম্ভব। এই নষ্ট-চরিত্রা মহিলাটির দৃষ্টি পড়েছিল সেই ভদ্র নিগ্রো-তরুণ ডেভিড হ্যারিসনের উপরে। সে অবশ্য তার সেই অবৈধ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। তারপর সে এই নিগ্রো তরুণটিকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে একদিন রাত্রে তার ওখানে যেতে। সিনেটরের বাগানে মেজর স্মিডল তাকে ধরে। অমানুষিকভাবে মারপিট করা হয় যে সে সিনেটরের কন্যার অমূল্য জীবন নাশের চেষ্টা করেছিল। নিজের এই অসদাচরণের প্রকাশ্য বিবৃতি প্রকাশ করতে ভীত হয়ে এই চরিত্রহীনা নারী তার বিবেকের দংশন এড়াবার জন্যে

ঠিক করল দান হিসেবে হ্যারিসনকে কিছু টাকা পাঠাবে। নিগ্রো তরুণটির উকিল ক্লার্ককে দুবার সে চেক পাঠাল। প্রথম চেকটা পাঠিয়েছিল ডেভিড হ্যারিসনের নিজের জন্যে। আর দ্বিতীয়টা তার আত্মহত্যার পরে তার ভালোবাসার পাত্রীটির জন্যে। একটি ভদ্রমহিলার মানসম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যে, যদিও আমাদের মতে হারাবার মতো কোনো মানসম্ভ্রমই তার নেই, ক্লার্ক কার কাছ থেকে টাকাটা পেয়েছেন তা বলতে অস্বীকার করেন। অবশ্য ক্লার্কের এই ব্যবহারে আমরা এতটুকুও আশ্চর্য হইনি। কারণ চিরদিনই তিনি গান্ধীপন্থী। পাছে ক্লার্ক সিনেটরের মেয়ের নাম প্রকাশ করে দেন এই ভয়ে ঐ গুন্ডাদলটি তাঁকে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর এই পুলিশ যারা রাজনৈতিক দলেরই আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করে তারা ডেভিডের ভালোবাসার পাত্রীটিকে খুঁজে বের করার জন্যে লেগেছে উঠে পড়ে। কিন্তু তারা তাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কারণ আমেরিকা বিশাল দেশ আর তার বুকে এখন রয়েছে অনেক বীর সন্তান।

হ্যারিসনের মতো একটি নির্দোষ লোককে কেন খতম করতে চাইল লো-স্মিডল গুন্ডাদল? কেন ওরা আইনজীবী ক্লার্ককে গ্রেফতার করল আর দলিল জাল করে দেখাল যে টাকাটা পেয়েছিল লুলদের কাছ থেকে, সিনেটর লো-র মেয়ের কাছ থেকে নয়? কেন এই গুন্ডাদল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে ব্যাং আর ঐ কচি মেয়েটাকে হত্যা করল? এ প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে পারি:

লো-স্মিডল গুন্ডাদল আমেরিকার বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন গুন্ডাদলের সঙ্গে যুক্ত। তারা একযোগে জনসাধারণের ভিতরে লাল-আতঙ্ক সৃষ্টি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর একটা যুদ্ধ বাধাতে চায়। কিন্তু গুন্ডাদলের সংখ্যার চাইতে দেশে শান্তিকামী মানুষের সংখ্যা ঢের বেশি। এই জ্যাকসনেও শান্তি-কামী বন্ধুরা রয়েছেন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, যা সত্য তা শাশ্বত হয়ে রইবে চিরকাল। আর শান্তি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা—যে সম্পর্কে ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট তাঁর মৃত্যুর আগে বলে গেছেন—তা জয়যুক্ত হবে। অন্যদিকে লো, স্মিডল ও অন্যান্য গুন্ডাদলকে বিচার আদালতের সামনে তাদের কু-কীর্তি ও অপরাধের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে।

মেরী যতই চেষ্টা করল ওর বাবার পাওয়া সেই ভয়ংকর সংবাদটা কী তা বের করার জন্যে, কিন্তু পারল না। পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল লো যে মানুষ কত নিচেই না নামতে পারে। দেখ না রাজনৈতিক উত্তেজনা কোথায় নিয়ে যেতে পারে মানুষকে! একটি অসহায় নারীর বিরুদ্ধে পর্যন্ত ওরা কুৎসা প্রচার করতে পারে। মানুষ নামেরও যোগ্য নয় ওরা। কী ভয়ানক! লো চেষ্টা করল প্রার্থনা করার। ঈশ্বরের কাছে সব কিছু নিবেদন করে দিয়ে চেষ্টা করল ভারমুক্ত হতে। কিন্তু সারাক্ষণ ঐ ইস্তাহারটার কথাই ওর সমস্ত চিন্তা-ধারাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। বেচারী মেরী!

ঠিক করল লো, ইস্তাহারটা লুকিয়ে রাখবে, যাতে না মেরীর চোখে পড়ে। আরো বেশি যেন স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠল সে মেরীর সম্পর্কে: বেচারা মেয়েটা! ঐ পশুগুলোর এতদূর স্পর্ধা যে অপমান করে ওকে। স্মিডলের কথা ভাবতেই মনটা তেতো হয়ে উঠল—কাজটা আধাখেচড়া করে রেখেই চলে গেল স্মিডল।

অবিশ্যি ছেলেটা খুবই চমৎকার, কিন্তু অতটা আত্মপ্রত্যয়শীল হওয়ার অধিকার নেই কারও। ধরেই নিয়েছিল যে যেহেতু একটা নিগ্রোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে আর অমনি লালগুলোকেও উচ্ছেদ করা হয়ে গেছে!

সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো গোপন থাকত, কিন্তু একদিন মেরীর কাছে একটা মন্তব্য করতে গিয়ে সবই প্রকাশ হয়ে পড়ল:

আমার এখন আশা আছে যে ক্লার্ককে আবারো কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া যাবে। লোকে বলে ও নাকি গান্ধীর শিষ্য। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ও রুশ সন্ত্রাসবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে।

মাত্র একবারই মেরী গিয়েছিল শহরে চুল-ছাঁটার দোকানে। তাছাড়া খবরের কাগজও পড়ত না। তাই এই প্রথম শুনল সে ক্লার্কের কি হয়েছে না হয়েছে।

বুঝলে,—বলতে লাগল লো, লোকটা গোপনে নিগ্রোটাকে দড়ি যুগিয়েছিল আত্মহত্যা করার জন্যে। তারপর টাকা পেয়েছিল নিউইয়র্কের লালগুলোর কাছ থেকে। তাছাড়া কার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে সেটা বলতে অস্বীকার করল।

হা ঈশ্বর!—বাধা দিয়ে বলে উঠল মেরী,—আমিই তো ওকে টাকা পাঠিয়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল। এক্ষুনি এ সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিতে হবে আমাদের।

তুমি টাকা পাঠিয়েছিলে? কেন?

আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল লোকটার জন্যে।

দাঁড়াও এক্ষুনি আমি দেখাচ্ছি তোমাকে, কী ধরনের একটা বদমায়েশের উপরে তোমার করুণা বৃথাই নষ্ট করেছ!—ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল লো।—তুমি হচ্ছ একটি আস্ত নির্বোধ, হ্যাঁ ঠিক তাই! পড়ে দেখ লালগুলো কী সব বলছে তোমার নামে।

ইস্তাহারটা পড়ার পরে চুপ করে মনে মনে ভাবতে লাগল মেরী। কেন ওরা ওকে কুশ্রী বুড়ী বলে অভিহিত করল? এটা সত্যি কথা নয়। অবিশ্যি এখন আর ওর যৌবন নেই এ কথা ঠিক, কিন্তু ওর চেহারাটা সুন্দর আছে এখনো। হয়তো ডেভিড তার প্রেমিকাটির কাছে বলেছিল ও কথা যাতে না তার হিংসে হয় মনে। তা-ই যদি হয়ে থাকে তবে তাকে ও ক্ষমা করবে। মেরী তো আর জোর করে তাকে ওর ঘরে আসতে বাধ্য করেনি, শুধু নিমন্ত্রণ করেছিল আসার জন্যে। হয়তো যতটুকু বলা উচিত ছিল তাঁর চাইতে একটু বেশিই বলে ফেলেছিল, কিন্তু তা বলে শাসায়নি ওকে, এটা ঠিক কথা নয়। মেরী অবশ্য বুঝতে পারছে কেন ওরা অমনভাবে লিখেছে। ডেভিডের প্রেমিকাই বলেছে ওদের কাছে। তাছাড়া হিংসেও হয়েছে তার মনে নিশ্চয়ই। আর ঐ বেচারা ছেলেটা নিজের দোষস্খালনের চেষ্টা করেছিল। এখনো মনে আছে ওর, দুজনে ওরা যখন পাশাপাশি হাঁটছিল কেমন করে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েছিল ডেভিড আর ও তার হাতটা তুলে নিয়েছিল নিজের হাতে।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মেরী। ভুলে গেছে যে ওর বাবা বসে রয়েছে ওর সামনে। ও কি বলে তা শোনার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করছে লো।

বুঝলে তো এখন কেন ওরা দয়ার যোগ্য নয়?—অবশেষে বলে উঠল লো।

মোটামুটি কাথাটা ঠিকই। মানে, আমার সম্পর্কে যেটুকু লিখেছে সেটুকু সত্যি। কিন্তু তোমাকে যেভাবে অপমান করেছে তা ভয়ংকর। তাছাড়া স্মিডল্ সম্পর্কে ওদের সঙ্গে আমি এক মত। কিন্তু তোমাকে আক্রমণ করতে আমি দেব না কিছুতেই।

কী বলতে চাইছ তুমি, সত্যি ? নিশ্চয়ই তুমি এ কথা বলছ না যে, ঐ নিগারটাকে তুমি তোমার কাছে আসতে দিয়েছিলে ?

দিয়েছিলাম।

তোমার কি মাথাখারাপ ? কিছুই বুঝতে পারছি না আমি এর—কেন তুমি তাকে আসতে দিয়েছিলে?

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মেরী।

দেখো বাবা, আমার বয়েস এখন চুয়াল্লিশ বছর। কিন্তু তুমি এমনভাবে কথা বল যেন আমি এখনো স্কুলে-পড়া খুকীটি। ধর্মত বলছি, এ-কথার জবাব আমি দিতে পারব না—এমন অনেক কথা থাকে যা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করা যায় না।

লো-র আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠল থরথর করে। অসহায়ভাবে দোরের খুঁটিটা আঁকড়ে ধরল। তারপর গড়িয়ে পড়ে গেল কার্পেটের উপরে।

প্রায় মাসখানেক পড়ে রইল বিছানায়। ডাক্তার খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে রইল। তারপর কৌশলে মেরীর প্রশ্নের জবাবে এড়িয়ে গিয়ে বললেন:

আপনার বাবার—করুণামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন—শরীরের গড়ন ঠিক ষাঁড়ের মতো। অল্পের উপর দিয়ে গেল এবার। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, ও'র পক্ষে এখন সম্পূর্ণ মানসিক প্রশান্তি একান্ত দরকার।

এক মুহূর্তের জন্যেও বাবার বিছানার পাশ থেকে ওঠে না মেরী। পরম উৎসাহের সঙ্গে সেবা করে চলে অক্লান্তভাবে। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না লো। সাধারণত কথা বলছে কম আর নিজের চিন্তার ভিতরেই বিভোর হয়ে থাকে। এতদিনে মনেপ্রাণে অনুভব করছে সে যে এগারো বছর আগে ইউরোপ যেতে সম্মতি দিয়েই দারুণ অপরাধ করে বসেছে। সে দিনই সে নিজের হাতে নিজের মেয়ের সর্বনাশ করে বসেছে। এখন আর ওকে দোষ দিয়ে কি হবে? গত এগারো বছরের ভিতরে আট বছরই কাটিয়েছে ও ইউরোপে। জ্যান্ত পচে মরেছে সেখানে। আমেরিকা যদি লালগুলোর বিরুদ্ধে না দাঁড়াত তবে সবাই-ই অধঃপাতে যেত। কোনোদিন কি বেচারী এগনিস কল্পনাও করতে পেরেছিল যে তাঁর মেয়ে একটা নিগারের উপপত্নী হতে পারে? অসম্মান—এরই ভিতর দিয়েই কি লো-র জীবনের আসবে সমাপ্তি! বড্ডো বেশিদিন ধরেই আত্মসুখে গা ভাসিয়ে এসেছে—ফুলের চাষ করে আর মেরীকে আদর করে। তাই ভগবান ওকে দিয়েছেন শাস্তি। কিন্তু ভগবান চান আত্মোৎসর্গ। যদি তিনি এবার ওকে রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেন তবে কায়মনপ্রাণে আমেরিকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। লালগুলোকে

ধ্বংস করতেই হবে ওদের। নইলে মেয়েরা হবে নিগারগুলোর শয্যা-সঙ্গিনী, আর ক্লার্কের মতো বদমায়েশগুলো সিনেটরদের পিছনে লেগে তাদের গদীছাড়া করে ছাড়বে। তখন শুধু নামটি ছাড়া আমেরিকার আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ডাক্তার বাধা দিতে চেষ্টা করলেন লো-কে। অন্তত আর একটা মাস যাক, তারপরে যাবে লো। কিন্তু আর বিশ্রাম নেবার কথায় কান দেবে না লো।

আমার উপরে কতখানি দায়িত্ব রয়েছে তা বুঝতে পারেন আপনি? শরীরের কথা চিন্তা করার সময় নয় এটা মোটেই। লালগুলো বোমা পেয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তেই তারা আমাদের আক্রমণ করতে পারে।

চলে যাওয়ার আগে শহরে গেল সিনেটর। ঠিক করল উইল তৈরি করবে। ওর সমসাময়িক পুরনো বন্ধু উকিল জনসন শুকনো হাসি হাসল:

ঠিকই করছ তুমি—বলল জনসন,—আমরা এখন আর আমাদের প্রথম যৌবনের কালে নেই। এক্ষুনি মুসাবিদা করে ফেলি এস। বোধহয় তুমি তোমার সম্পত্তি মেরীকে দিয়ে যাচ্ছ?

লেখ, আমি আমার যাবতীয় স্থাবর ও অবস্থাবর সম্পত্তি মেজর স্মিডলকে দিয়ে যাচ্ছি যাতে সে ট্রানজক এজেন্সির কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর বছরের ত্রিশ হাজার করে ডলার লালগুলোর দ্বারা নির্যাতিতা যারা—তাদের দান করতে পারে। আমার মেয়ে মেরী নিভেলকে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের কুলক্রমাগত সম্পত্তির অধিকার আর তার মায়ের রত্নালঙ্কারগুলি। আমার বাবুর্চি জো-কে দিয়ে যাচ্ছি পাঁচশো ডলার—

ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা। কল্পনায় বুঝতে পারছে সে নিভেলের মনের অবস্থা। সব কিছু জেনে বুঝেই সে বিয়ে করেছিল শুধু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ারই লোভে। উচিত শিক্ষা দেয়া যাক ওকে। ইউরোপকে শিক্ষা দেয়া দরকার—মোলায়েম মিষ্টি হাতে নয়, চাবুকের ডগায়—ভালো আমেরিকান চাবুকে—

পুরনো বন্ধুর মতোই কর্নেল কলিনস স্মিডলকে জানাল সাদর অভিনন্দন। যা-ই হোক না কেন, সে দিনের সেই দুশ্চিন্তাভরা অবরোধের মাস কটা এক সঙ্গে কাটানো খুব চারটিখানি কথা নয়।

কর্নেল রবার্টস কেমন আছেন?—জিজ্ঞেস করল কলিনস।

চমৎকার। আসার পথে ওয়াশিংটনে দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে। ওর বয়েসটা যেন আরো কমে গেছে।

শুনলাম সিনেটর লো-র নাকি সাংঘাতিক অসুখ। সন্ন্যাসরোগ কি ঐ ধরনের কিছু একটা। ভয় হয়েছিল যে পাছে আপনার কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে।

পারীতে থাকতেই খবরটা পেয়েছিলাম। কিন্তু একটু বাড়িয়েই বলা হয়েছিল। সেরে উঠে তিনি কাজে ফিরে গেছেন। ওয়াশিংটন থেকে লেখা চিঠি পেয়েছি ওঁর আমি। কাজকর্ম যেভাবে চলেছে তাতে উনি খুবই খুশী।

অবস্থাটা কেমন মনে হয় আপনার?

খুব যে খারাপ তা মনে হয় না। দুজনার ভিতরে ট্রুম্যান হচ্ছে মন্দের ভালো। মজুরদের ঠাণ্ডা করার দিক থেকে ডিউএ-র চাইতে ট্রুম্যানের পক্ষেই সহজ। খুবই ভালো হয়েছে যে লালগুলো যতটা আশা করেছিল মোটে তার তিন ভাগের একভাগ ভোট পেয়েছে ওয়ালেস। এবার আমরা পরাক্রমের নীতি গ্রহণ করাবার জন্যে জোর দিতে পারব। এ কথা অস্বীকার করার যো নেই যে নির্বাচনী প্রচার মানুষের মনে ধোঁকার সৃষ্টি করে। দিনের পর দিন বলতে হয় শান্তির কথা। আর মানুষের স্বভাব ঠিক তেমনি। এ ধরনের প্রচার মানুষের মনকে মিইয়ে ফেলে। কিন্তু সব কিছুই এখন ঠিক পথে এসে দাঁড়াচ্ছে।

বার্লিন কেমন দেখছেন?

এই এক রকমের আর কি। মনে হয় বার্লিনের লোকেরা একটু নরম হয়ে পড়েছে। হয়তো এটা আমার প্রাথমিক ধারণা হতে পারে কিন্তু আজ সকালে পৎসদম-প্লাজ-এ দাঁড়িয়ে বরং আমার দুঃখ হল সেই অবরোধের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে। সেদিন পার্কটা ছিল যেন লড়াইয়ের ময়দান। কিন্তু আজ ওটা আর পাঁচটা পার্কের মতোই নেহাত মামুলি—সর্বত্রই ফটকাবাজেরা বাকচাতুরী করে ফিরছে। মনে পড়ে কেমন করে বিজলী বন্ধ করে দেয়া হত আর মানুষজন বসে থাকত অন্ধকারে। অন্যদিকে লালদের এলাকায় সব কিছুই আলোয় ঝলমল করত। কিন্তু তবুও সেদিন বার্লিনের মনোবল ঢের ভালো ছিল। মাথার উপরে ফ্লাইং ফোর্টরেসগুলো দেখলে পরেই আশা জাগত সবার মনে। আজ সবার দৃষ্টি মাটির দিকে, আকাশের দিকে নয়।

শান্ত জীবন মোটেই বরদাস্ত করতে পারত না স্মিডল। হয় গুলিচালানো, নয় ওৎপাতা, কিংবা কোনো একটা জটিল ষড়যন্ত্র—এসব উত্তেজনার কিছু একটা

চাই-ই ওর। ঘণ্টাখানেক ওর বুইক গাড়িতে কাটিয়ে এসে ডাঃ হ্যালিটের স্ত্রী তার এক বান্ধবীর কাছে চুপি চুপি বলেছিল:

স্মিডল যে কি পরিমাণে রোমাণ্টিক তা বুঝতে পারলাম কাল রাত্রে। হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে গাড়িটা মাঠের ভিতরে ছুটিয়ে দিল। গাড়ি উলটে চুরমার হয়ে যেতে পারতাম আমরা। স্বভাবতই চিৎকার করে উঠেছিলাম। ও যেন ক্ষেপে উঠল। প্রায় পিষে চ্যাপটা করে দিয়েছিল আর কি আমাকে। তারপর হয়ে গেলে পরেই শিস দিতে শুরু করে দিল, ভাবতে পার? বিদায় নিয়ে চলে আসার সময়ে জিজ্ঞেস করলাম ওকে কি শিস দিচ্ছিল। ও বললে, ওটা "কমান্ডারস ডেড মার্চ"। না লোকটাকে বুঝে ওঠা অসাধ্য! এমন আর একটা মানুষ আমি দেখিনি কোনোদিন।

স্মিডলের রোমাঞ্চকর কাজের প্রতি আকর্ষণ খুবই তারিফ করে কর্নেল কলিনস। আর সায়ও দেয় মিসেস হ্যালিটের মতে:

আমাদের কাজের ভিতরে কাব্য এনেছে স্মিডল। অন্য সবাই কাজ করে ধীরেসুস্থে কিন্তু ও যেন উৎসাহ উদ্দীপনার প্রতীক। সব সময়েই হয় কোনো একটা কিছুর মতলব ভাঁজছে, নয়তো কোনো কিছু বের করে আনছে গোয়েন্দা-গিরির ভিতর দিয়ে। হয়তো এর কারণ এই যে ও দক্ষিণ দেশের মানুষ। তা সে যা-ই হোক না কেন ওর স্বভাবটা হচ্ছে রোমাণ্টিক।

স্বভাবতই তাই হিলদা রিশতার প্রেমে পড়ল স্মিডলের। বয়েস বা অভিজ্ঞতা ওর অন্তর প্রশমিত করতে পারেনি। যখন-ই কোনো সুন্দর চেহারার পুরুষের উপরে ওর নজর পড়ে, মনে মনে বলে ওঠে, এই হচ্ছে ওর জীবনের আদর্শ পুরুষ। সত্যিকারের আনন্দ এল ওর জীবনে অনেক দেরিতে। তাই ছিনিয়ে নিতে হবে ওকে। কারণ ওর বয়েস এখন ছত্রিশ। আর দু-দিন পরেই যে সব বুড়ীরা বসে বসে স্বামীর জন্যে পুলোভার বোনে আর করুণা করে কনডাকটরেরা যাদের সাহায্য করে ট্রাম থেকে নামতে তাদের দলেই গিয়ে নাম লেখাতে হবে। এখনো ওর দেহে আছে সৌন্দর্যভরা আকর্ষণ—বালকদের মতো কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল, উজ্জ্বল সবুজ রঙের গোল দুটি চোখ, আছে পরিণত নারীর অন্তর-আবেগ আর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি। ওর সর্বশেষ ভালোবাসার মানুষ দর্শনের ডাক্তার হোলৎজ, যে এখন খুলেছে মহাজনী-দোকান, সে বলেছিল ওকে একদিন:

তুমি যেন ঠিক একটি দক্ষিণ দেশের ফুল। তুষার পড়ার আগে শুধু দুদিনের জন্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছ।

হিলদার যুদ্ধোত্তর প্রেমিকদের তালিকার ভিতরে হোলৎজ ব্যতিক্রম। কারণ ওর নটঘট যত কিছু সবই হত বিদেশীদের সঙ্গে। জার্মানদের চাইতে তাদের ভিতরেই ও আকর্ষণ খুঁজে পেত বেশি। তাছাড়া এ-ও ভাবত যে এতে স্বামীর কাছে অবিশ্বাসী হওয়ার কোনো কথা ওঠে না। অন্য জগতের মানুষের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠাটা একটা হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রথম বার্লিনে আসার ক'দিন পরেই ওর দেখা হল স্মিডলের সঙ্গে। ওর চেহারা দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল হিলদা। ধূসর রঙের চুল, তামাটে

মুখ, প্রভুত্বব্যঞ্জক কঠিন চোখ।

আপনাকে দেখে সাংবাদিকের চাইতে স্বর্ণসন্ধানী বা সিংহশিকারী বলেই বেশি মনে হয়।—বলল হিলদা।

কনুইয়ের উপরে ওর হাত দুটো এত জোরে টিপে ধরল স্মিডল যে হিলদা বলে উঠল:

আঘাত পেতে চাই না আমি।

দাঁত বের করে হাসল স্মিডল:

আমি যখন আহত হয়ে পড়েছিলাম, বিকারের ঘোরে ঠিক আপনার মতো একটি মেয়েকে দেখতাম সব সময়ে। অমনি সুন্দর, অমনি বোকা।

তিনদিন পরে হিলদা ওর উপপত্নী হল। দারুণ উত্তেজিত আর আত্মসমর্পণের ইচ্ছে নিয়ে ছুটে এল ওর কাছে আর এসেই কৈফিয়ত দিতে শুরু করল:

বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। কিছুতেই আর আগে বেরোতে পারলাম না। হিংসুটে স্বামী আছে একটি আমার।

কথাটা ঠিক। কুর্টের জন্যেই ওর দেরি হয়ে গেছে। ওর রাতের খাবার তৈরি করছিল হিলদা। ঠিক সময়মতো খাবার তৈরি না হলে দারুণ চটে যায় কুর্ট। কিন্তু হিলদার চালচলন সম্পর্কে ওর মাথাব্যথা অনেকদিন আগেই ঘুচে গেছে।

রিশতার যখন যুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে করে, ওর মনে হয় অন্য এক রিশতার বেঁচেছিল সে সময়ে। তার ছিল প্রতিষ্ঠা, ছিল সুশৃংখল অভ্যাস, আর ছিল সম্ভাবনাভরা ভবিষ্যৎ। একটা অক্ষত শহরে তখন তৈরি করত বাড়ি, যেত প্রাগার দেইলে কাফেতে। পড়ত ফ্রয়েড, যেত ব্যক্তিগত শিল্পপ্রদর্শনী দেখতে। জানত যে সে যদি মাসে দুশো মার্ক করে জমাতে পারে তবে হিলদাকে বেড়িয়ে আনতে পারবে ফ্রান্সে—বিয়ারিৎজ বা সেইন্ট—ট্রোপেজ-এ। কেউ কেউ হয়তো বলবে এটাকে পেটি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু এটাই ছিল যুদ্ধের আগের সেই আর এক রিশতারের জীবন। তারপর হঠাৎ একদিন সব কিছুই ঘুরে যেতে শুরু করল। তারপর থেকেই একটা দুরন্ত ঘূর্ণাবর্তের ভিতরে পড়ে গেল। কখনো কখনো ওর মনে হত সব কিছুই হিটলারের দোষ। তাসের উপরে সমস্ত মানুষের জীবন আর কেউ বাজি রাখতে পারে না। মানুষ একবারই বাঁচে। যদি তাদের সব কিছুই ছিনিয়ে নিয়ে নেয়া হয়, কেন তবে তারা মানবে যে ঐতিহাসিকেরা কে কবে কি বলল না বলল তাদের সম্পর্কে? অন্য সময়ে মনকে বোঝাত যে এ সব কিছুই হচ্ছে ভবিতব্য। হিটলারের মতোই আজ আমেরিকানরাও যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। সুতরাং আগেও যা হয়েছে আর এখনো যা হতে চলেছে এ সব কিছুই যুক্তিসঙ্গত। জার্মানরা যুদ্ধে হেরে গেছে। কিন্তু যুদ্ধ চলেছেই। এতখানি যে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে জার্মানিকে তার কারণ তারাই শুরু করেছিল প্রথম। কিন্তু কাল হয়তো জার্মানি ঘটনাচক্রে করবে মধ্যস্থতা। কিন্তু ওর নিজের পক্ষে এটা একটা দারুণ দুর্ভাগ্য। কারণ ও সৈনিক নয়, স্থপতি। শিক্ষা পেয়েছে গড়ে তুলতে, কিন্তু আজ আসল

জিনিস হচ্ছে কি করে ধ্বংস করতে হয় তাই জানা। কিন্তু সময়ের গতিরোধের চেষ্টা করাটা হাস্যকর।

ইতিহাসের অগ্রগতির কথা ছাড়াও আরো অনেক কিছুই আছে ওর চিন্তা করবার। রিশতার ভালোবাসে আরাম, ভালো খাবার, রাইনের মদ, ব্রেজিলের সিগার। বহুদিন থেকেই হিলদা সম্পর্কে এসেছে ওর ক্লান্তি। তাই প্রত্যেক বুধবার ও যায় ক্যাবারে-নর্তকী ছোট্ট লট্টির কাছে। লট্টি ভালোবাসে নাইলন আর গুরল্যাঁ সেন্ট। এটা ঠিক যে যুদ্ধের ক'বছর রিশতারও যাপন করেছে সৈনিকজীবন। কিন্তু তখন কুরফার্স্টেনডামে ছিল না কোনো সুসজ্জিত দোকান, ছিল না কোনো রেস্তোঁরা বা মনোহারিণী নারী। যারা বলে যে এ সময়টা হচ্ছে দুটো যুদ্ধের মাঝখানে সাময়িক বিরতি মাত্র, হয়তো তাদের কথা ঠিক। কিন্তু ইতিমধ্যে পাঁচটা বছর কেটে গেছে। তাছাড়া জীবনের বিকি-কিনির মেয়াদও সাধারণত খুবই সংক্ষিপ্ত। কে বলতে পারে কত দীর্ঘ দিন সে বেঁচে থাকবে? এই সব তিক্ত চিন্তাভাবনা ওকে বাধ্য করল রুশ এলাকায় গিয়ে কাজ নিতে। অনেক লোক আছে যারা ওকে বলে জার্মানির কু-সন্তান। প্রচারে ভুলে গিয়ে লাল বনে গেছে। কিন্তু এসব কথা যখন ওর কানে এসে পেঁছায় ও তখন শুধু মুচকি হাসে: সবার চাইতে রুশদের ও বেশি চেনে। চার বছর ধরে ও যুদ্ধ করেছে পূর্ব সীমান্তে। খুব সহজ কথা নয়, শেষ অবধি ও যুদ্ধ করেছে, টিয়ারগার্টেন পর্যন্ত। কেউ ওকে কমিউনিস্ট বানাতে পারেনি। পশ্চিম এলাকায় ওরা কোনো কিছুই যে গড়ছে না সেটা কি ওর দোষ?

এক কথায়ই কিছু আর ও রাজী হয়নি লালদের কাছে যেতে। সে সময়ে হিলদার একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার চলেছিল হ্যামবুর্গ থেকে আসা এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে। সে বারবার করে বলতে লাগল স্বামীর কাছে:

এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁর স্বামী হ্যামবুর্গের ডেপুটি শাসনকর্তা। তোমার হয়ে বলবেন বলে তিনি কথা দিয়েছেন। প্রচুর বাড়িঘর তৈরির কাজ হচ্ছে ওখানে। কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোকটি অল্পদিনের ভিতরেই চলে গেলেন। তারপর থেকে হিলদাও আর হ্যামবুর্গের সেই মহিলার নাম করে না। বেশ গভীরভাবে চিন্তা করার পরে কুর্ট একটা স্কুলবাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিল লালদের জন্যে।

রিশতার পরিবার বাস করত ইংরেজ এলাকার কেইজারেলিতে।

তুমি খেতে চাও ভালো ভালো মুখরোচক খাবার,—অভিযোগ করে বলল হিলদা,—কিন্তু হাতে তুলে দাও কয়েকটি পেনিমাত্র।

প্রচুর টাকা রোজগার করত কুর্ট। কিন্তু ওকে টাকাটা ভাঙিয়ে নিতে হত হয় দর্শনের ডাক্তারের মহাজনী দোকানে, নয়তো জেদাশচৎনিসাকিরকির পড়ো-বাড়িতে যে সব ফটকাবাজেরা এসে ভিড় করত তাদের কাছ থেকে। প্রথম প্রথম ওরা পূর্বাঞ্চলের চারটা মার্কের বদলে পশ্চিম অঞ্চলের এক মার্ক দিত। তারপর ছয় এমনকি সাত মার্ক পর্যন্ত দাবি করতে লাগল। রিশতার মনকে প্রবোধ দিত এই ভেবে যে পশ্চিম জার্মানি শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর লালেরা দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু মনে মনে এ-ও আশা করত যে পূর্বাঞ্চলের মার্কের

দাম যদি একটু বাড়ে। মিতব্যয়িতা শিখতে আরম্ভ করল হিলদা। ও কুর্টের পোশাকের জন্যে কিছু বিলিতি কাপড়চোপড় আবিষ্কার করল চার্লটেনবুর্গে আর খুঁজেপেতে বার করল এক দরজীকে আলেকজেন্দার প্লাজ-এ:

ওকে পূর্বাঞ্চলের মার্কে দাম দিও। প্রচুর টাকার সাশ্রয় হবে তাতে।

হিলদা নেবু কিনত পশ্চিম জার্মানিতে কিন্তু তরিতরকারি আনত পূর্ব-জার্মানি থেকে। ওর এই পার্থক্যের একটি মাত্র অর্থই ছিল ওর কাছে, সেটা হচ্ছে কোথায় সস্তায় সুবিধে মতো কেনাকাটা করা যায়। এ সব জিনিস ঘৃণা করত রিশতার। কিন্তু একদিন নিজেই ভাবতে শুরু করল: লাল-এলাকায় চুল ছাঁটিয়েছে ও নিজে কারণ ওখানে অনেক সস্তা। কী নিচেই না নেমে গেছে! কমিউনিস্টদের জন্যে ও স্কুল গড়ছে, প্রত্যেকদিন এক অঞ্চল থেকে যাচ্ছে আরেক অঞ্চলে, কিন্তু এটুকু নজরেও আসছে না যে এটা হচ্ছে দুটো আলাদা জগতের সীমা-রেখা। জার্মানির মানুষ কিভাবে বাস করে—নিউইয়র্ক কি মস্কো কোথাকার লোকেরাও সেটা অনুভব করতে পারবে না। রাস্তার এক পারে মামুলি বিজ্ঞাপন পোস্টার। আর অন্য পারে পতাকা, ছবি, স্লোগান। অবশ্য ও লালদের কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে এ কথা ঠিক কিন্তু ওরা তো আর ওকে কিনে নেয় নি। ওদের জীবন-যাত্রার ধরণ ঘৃণা করে কুর্ট। একটাও ক্যাবারে নেই যাতে নগ্ন-দেহ নারীর দেখা মেলে। সর্বত্র প্রচার আর প্রচার: নির্মাণকার্য সম্পর্কে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্পর্কে, শান্তি রক্ষার জন্যে। প্রত্যেক রাত্রে লেগেই আছে সম্মেলন। কিন্তু একটিবার সুরঙ্গ-পথে নাম, পনেরো মিনিটের ভিতরেই গিয়ে হাজির হবে কুর্ফাস্টেকডাম-এর কোনো একটা কাফেতে। পাবে সেখানে মদের তালিকা, সুবেশা নারী, আর বিদেশী লোকজন। ও যে খুব একটা দারুণ স্বার্থপর লোক তা নয়। শুকনো রুটি চিবিয়ে আর উকুনের কামড় খেয়েও কেটেছে ওর দিন। কিন্তু তখন ও লড়ছিল একটা আদর্শের জন্যে—তখন ছিল একটা মাত্র জার্মানি। এখন কার জন্যে ও স্কুল-বাড়ি তৈরি করছে? ওরা শেখাবে ওখানে কেমন করে রুশ আদর্শে জীবন-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

রিশতার কখনো ভাবে না কেমন করে ও স্মোলেনস্ক এলাকার গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে মারাবো হত্যা করেছিল শিশুদের বা কটা-চুল কার্ল ফাঁসি দিয়েছিল একটি নারীকে। ওর শুধু এইটুকুই মনে আছে যে শীতে কী ভীষণ কষ্টই না পেয়েছিল, কেমন করে কাদার ভিতরে পড়ে ধড়ফড় করতে হয়েছে আর কেমন করে হয়েছে পালাতে। ওর মনে আছে কি করে রুশেরা মারাবো আর কটা-চুল কার্লকে হত্যা করেছে, তারপর সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে এসে ঢুকেছে বার্লিনে। রিশতার ফ্লাটে একজন রুশ স্থপতি বাসা নিয়েছিল। ভদ্রতার আড়ালে ওকে অপমান করার কি চেষ্টাই না করত দুবৃত্তটা! নিজের মুখেই বলেছে লোকটা যে সে ছিল গেরিলা-দলে।

সাধারণত এ সব চিন্তা এসে ভর করে ওকে সন্ধ্যেবেলা যখন একা একা বিষণ্ণ মনে বসে খবরের কাগজ পড়ে, আর হিলদা চলে যায় তার প্রেমাভিসারে। লালদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করার নেই ওর। প্রচুর স্থপতি কাজ করে পূর্বাঞ্চলে। তারাও ওর চাইতে বেশি লাল নয়, মনে মনে বলে রিশতার। অধ্যাপক

উলফ্-এর কথাই ধরা যাক—কাইজারের আমলে প্রথম কাজ শুরু করেন তিনি, খ্যাতিমান লোক, প্রতিভাবান স্থপতি। লালদের জন্যে কাজ করতে নিশ্চয়ই মনে মনে ঘৃণা করেন তিনিও।

সময়ের গতিতে নিজের কাজ, মুদ্রা-বিনিময়ের দোকান, দুই জগতের জীবন এ-সব কিছু সম্পর্কেই অভ্যস্ত হয়ে উঠল রিশতার। রুশ এলাকার ভিতর দিয়ে পথ চলতে চলতে এখন আর ছবি স্লোগান ইত্যাদি ওর চোখে পড়ে না। তারপর যখন কোনো একটা কমিউনিস্ট কাগজ স্কুলটার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সপ্রসংশ ভাবে উল্লেখ করল ওর নাম, মনে মনে খুশী হয়েই ভাবল:

গোঁড়ামি আছে সত্যি কিন্তু ওদের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে।

হিলদা কখনো তার প্রেমিকদের আলাপ করিয়ে দেয় না কুর্টের সঙ্গে। মনে করে সেটা অবৈধ কাজ। কিন্তু স্মিডল জিদ ধরল ওর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। যখন হিলদার কাছে শুনল যে তার স্বামী যদিও লালদের ঘৃণা করে তবুও তাদের জন্যে বাড়ি তৈরি করছে, ও চাইল রিশতারের সঙ্গে দেখা করতে।

স্মিডল রিশতারের কাছে নিজের পরিচয় দিল একটা বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক বলে। আর বলল যে সে জার্মান স্থপতিদের সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লেখা মনস্থ করছে। চাল-চলনে স্মিডল ফুটিয়ে তুলল খুব একটা গাম্ভীর্যের ভাব, আর শ্রীমতী রিশতার সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়ে জানাল যে একটা কনসার্টে শ্রীমতী ল্যাঙ্গিমুলার ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ও'র সঙ্গে। একটা গোটা সন্ধ্যে কাটিয়ে দিল স্মিডল ওর সঙ্গে। তারপর বলল:

আপনি ফ্রাংকফুর্টে চলে আসুন না কেন? চমৎকার প্রাণবন্ত জায়গা। জেনারেল হয়েসের সঙ্গে কথা বলতে পারি এ-সম্পর্কে। আপনার মতো প্রতিভাবান স্থপতির জন্যে সব সময়েই কাজ আছে ওখানে। আরো ভালো কাজও দেয়া যেতে পারে আপনাকে। যেমন ধরুন একটা গোটা শহর পুনর্গঠনের জন্যে নক্সা তৈরি করা। তাছাড়া, লালদের সমাজের উপরে আপনার তেমন কোনো আকর্ষণ নেই নিশ্চয়ই।

রিশতার খুশী হয়ে উঠল মনে মনে। ব্যাপারটা দু-চার দিনের ভিতরেই আবার আলোচনা করবে বলে কথা দিয়ে গেল স্মিডল।

এর পর থেকে দৈনিকই আসে স্মিডল রিশতারের কাছে। হিলদাকে রূঢ়-ভাবেই বলে দিয়েছে:

আর এস না আমার কাছে। তোমার স্বামীর সঙ্গে এখন আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। তার সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে চাই না।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে মেনে নিল হিলদা। প্রায়ই স্মিডল রাজ-নীতি চর্চা করে। সমালোচনা করে লালদের।

জানি, যুদ্ধে কখন থেকে আমরা হেরে যাচ্ছিলাম—ভাবল রিশতার, তখন চুয়াল্লিশ সালের গরম কাল, কর্নেল গ্যাবলার ছিলেন একজন মহাপুরুষ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এখন আমাদের হিটলারের সংস্রব ত্যাগ করে মিত্রশক্তির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা উচিত। আমেরিকানরা স্বার্থপর দাম্ভিক সন্দেহ

নেই, কিন্তু আমাদের নিজেদের স্বার্থেই ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলা দরকার। আজ হোক, কাল হোক ওরা রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবেই। শুরু হবে এখান থেকেই। সুতরাং কোনো নিরপেক্ষতাই আমাদের বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু যদি আমেরিকার পক্ষে থাকি তবে আমরা স্টেটিন, ব্রেস্‌ল, কোয়েনিগসবার্গ পুনরুদ্ধার করতে পারব। আর তাহলে তখন যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে বসবাস করতে পারব।

আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলেছি—বলল স্মিডল রিশতারের কাছে,—কিন্তু ওদের মনে এখনো একটু সন্দেহ আছে আপনি লালদের ওখানে কাজ করেন বলে। কোনো কোনো দুর্মুখ এ-কথাও বলে যে যৌবনে আপনি নিজেও কমিউনিস্টই ছিলেন।

বাজে কথা।

আমিও ভাবলাম হবেও বা। কিন্তু কুৎসা-প্রচারকারীদের মুখ তো বন্ধ করতে হবে। পূর্ব জার্মানিতে আজাদী-যোদ্ধাদের একটি সংগঠন আছে, অবশ্য গোপন সংগঠন। লালগুলো তো আর এসব জিনিস পছন্দ করে না। আমি আপনাকে বলছি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

এই প্রথম আমি শুনলাম ওদের কথা।

স্বাভাবিক, ওরা কাজ করে খুবই সাবধানে। একজন সভ্য আর একজনকে জানে না। আপনি সাহসী লোক। অনাবশ্যক ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে লাভ কি আপনার, আমি বলে দেবখন ওদের। তাতেই হয়ে যাবে।

বরং তার চাইতে কাজটাই ছেড়ে দেই না কেন? স্কুল তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা এখন বলছে আমাকে স্টেডিয়ামের একটা নকসা তৈরি করে দিতে, কিন্তু আমি না বলে দিতে পারি।

এত তাড়াতাড়ির কি আছে? হ্যামবুর্গ থেকে সঠিক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত সেটা সমীচীন হবে না। শ্রীমতী রিশতারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তিনিও নিশ্চয়ই আমার মত সমর্থন করবেন। আমি উচ্চ আদর্শের পক্ষপাতী, কিন্তু মানুষকে তো বাঁচতে হবে কোনো রকমে।

মনে মনে আশ্বস্ত হল রিশতার। এক হপ্তা পরে স্মিডল এসে বলল ওকে:

আজাদী-যোদ্ধাদের দলের একটা নিয়ম আছে: প্রত্যেক নতুন সভ্যকে তিন-জন করে লোক আনতে হবে তার দলে। ওরা চায় যে আপনি পুব-অঞ্চলের স্থপতিদের ভিতরে চেষ্টা করে দেখুন।

কেন? আমি নিজেই তো ছেড়ে দিচ্ছি—

মার্কিন এলাকায় যদি আপনি কাজ পেতে চান তো আপনাকে আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হবে। জেনারেল হয়েজ বলেছেন আমাকে যে লালদের নামের তালিকায় আপনার নাম আছে।

দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ল রিশতার। এটা কি তবে একটা ফাঁদ? কিন্তু স্মিডল তো একজন সাংবাদিক, খ্যাতনামা এক সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। কেমন করে ওর নাম উঠল লালদের খাতায়? অবশ্য এ-কথা ঠিক যে ও লালদের

জন্যে কাজ করছে, কিন্তু সে তো নিতান্ত দায়ে ঠেকে। হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে ওখানে। হয়তো ওরা জানতে পেরেছে যে এককালে ওর আগ্রহ ছিল বলশেভিজম সম্পর্কে। আর গিয়েও ছিল একবার কুগনেৎস্ক-এ। কিন্তু নাৎসীরাও সে অভিযোগ আনতে পারেনি ওর বিরুদ্ধে। তাছাড়া পশ্চিম জার্মানিতে স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি কমিউনিস্টরাও সেখানে স্বাধীনভাবে মতামত প্রচার করতে পারে। লাল হিসেবে পরিচিত হতে মোটেই রাজী নয় ও। উলফ কি আরো দু-চার জনার সঙ্গে আলাপ করে দেখলে কেমন হয়? সাবধানতা অবলম্বন করবে ঠিকই। আগে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেখবে ওরা কি বলে। মোট কথা বিপদের ঝুঁকি আছে তা ঠিক, কিন্তু এতে করে ওর ফ্রাংকফুর্টে যেতে সুবিধে হবে। একটা বেয়াড়া অবস্থা—এক পা ইয়োরোপে আর আরেক পা এশিয়ায়। পা হড়কে পড়তে কতক্ষণ!

কথাটা মনে পড়ে ওর হাসি পেল যে একদিন ও হিলদাকে বলেছিল যে দারুণ বিপদসংকুল অবস্থার ভিতরে বাস করতে হবে জার্মানদের। বোধহয় ঢের বিপদের ভিতর দিয়েই কাটিয়ে এসেছে। সর্বত্র ধ্বংসকান্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। তবুও ওর এখনো মনে হচ্ছে যেন আর একটা ধাক্কা দিয়ে দেখে কোনো একটা কিছুতে। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘাড়েই এসে পড়বে...। এটা কি কালেরই দোষ না ওর স্বভাবেরই ভিতরের একটা কিছু?

ও ঠিক করল অধ্যাপক উলফ, ভদ্র, স্বল্পবাক স্থপতি ক্রামার আর শেষ-পর্যন্ত লেম্‌কের সঙ্গে আলোচনা করে দেখবে। লেম্‌কের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল সিনস্কের কাছে। সে তখন একটা স্যাপার-বাহিনীর অধিনায়ক।

শুরু করল উলফকে দিয়ে। জানাল তাঁকে যে স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা নিয়ে একটু আলাপ করতে চায় তাঁর সঙ্গে। উলফ ওকে ডাকলেন তাঁর বাড়িতে। উলফের বয়েস সাতষট্টি বছর। শুনে অবাক হয়ে গেল রিশতার, যে বাড়িতে উনি জন্মেছেন সেই বাড়িটাতেই বাস করছেন এখনো। রাস্তাটার সবগুলো বাড়ি বোমার ঘায়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেলেও ভোজবাজির মতো তাঁর বাড়িটা এখনো খাড়া রয়েছে। নামসহি করা ছবিগুলো ঝুলছে দেয়ালে: রয়েছে হপ্‌টমান, মইসি, রাদেনোর প্রতিকৃতি। বসার ঘরের আসবাবপত্র সব সেকেলে ধরনের। ভালো একটা চুরুট দিলেন প্রফেসর রিশতারকে খেতে।

এগুলো কি পুব-এলাকার তৈরি?—পরিহাসভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রিশতার।

মুচকি হাসলেন উলফ:

উপহার হিসেবে এক বাক্স পেয়েছি হল্যান্ড থেকে।

স্টেডিয়ামের পরিকল্পনা সম্পর্কে ওর মনে যে-সব সন্দেহ জেগেছে তা বুঝিয়ে বলল রিশতার। শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনল তাঁর উপদেশ। তারপরে বলল:

যেখানে মানুষের বাস করার জায়গা নেই, সেখানে স্টেডিয়ামের কি প্রয়োজন তা আমি বুঝে উঠতে পারি না।

তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহ খুবই বেশি। তাদের কাছে ফ্লাটের চাইতে স্টেডিয়ামটাই বেশি জরুরি।

আমার কিন্তু ঠিক মনে হয় না যে নিছক ফুটবল খেলার জন্যেই ওটা তৈরি হচ্ছে। সম্ভবত সভাসমিতি করার জন্যেই বেশি দরকার হয়ে পড়েছে। অন্তত 'টেলিগ্রাফ' তো সেই কথাই বলছে।

উলফের মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

'টেলিগ্রাফ' তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে একটা প্রবন্ধ লিখেছে যে আমি নাকি সব গোপন কারখানা তৈরি করছি। কিন্তু আমি যা তৈরি করে যাচ্ছি তা বাস করার জন্যে বাড়িঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি বুড়ো মানুষ। আমার কাছে তো এই নতুন ব্যবস্থাটা একটা তাজ্জব ব্যাপার। প্রথম প্রথম এই সব পরিবর্তন সম্পর্কে আমিও ভয় পেতাম। কিন্তু এখন দেখছি যে ফল পাওয়া যাচ্ছে। এর ঠিক কি ভুল সে কথা আমি বিচার করতে পারি না। যেটুকু আমি বলতে পারি সেটুকু হচ্ছে এই যে উপরে সৎ লোক আছে। আর সেটুকুই এখনকার জন্যে ঢের। তাছাড়া ওরা যুদ্ধ চায় না। এটা হচ্ছে দারুণ সুবিধে! আমার বাড়ির সব দিকেই ধ্বংসস্তূপ। নাৎসীরা জুয়ার টেবিলে গোটা দেশটাকেই বাজি রেখেছিল। কিন্তু আমরা সামরিক লোক নই। তুমিও নও, আমিও নই। আমরা গড়ছি। বাড়িগুলো আমাদের কাছে ভোজবাজি নয়, আমাদের শ্রমের ফল। কিছুদিন আগে আমি আমার মেয়ের কাছে গিয়েছিলাম ব্রেমেনে। সেখানে সবার মুখেই একটিমাত্র কথা: কবে শুরু হচ্ছে আবার? উন্মত্ততা। তাছাড়া ভাবতে পার, নাৎসীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। শুনলাম, শিগগিরই আবার নাকি একটা সেনাবাহিনী গড়ে উঠছে। তাহলে ছিটেফোঁটা যেটুকু যা বেঁচে আছে তা-ও ধ্বংস হয়ে যাবে। ওখানে থাকতে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে: পশ্চিম অঞ্চলের টাকা, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি। কি দরকার আছে আমার ওসব জিনিসের? ক'দিন আর বাঁচব? ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমাকে যে স্টেডিয়াম গড়ার ভার দিয়েছে খুবই ভালো হয়েছে সেটা। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমস্ত বাধাবিপত্তি তুমি কাটিয়ে উঠতে পারবে।

রিশতার বুঝল যে সে ভুল করেছে। উলফ খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছেন। যে কোনো রকমের পরিবর্তনকে ভয় পান তিনি। যে বাড়িতে জন্মেছেন সেই বাড়িতেই মরতে চান।

কয়েকদিন পরে ক্রামারকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল রিশতার। খুব ভালো পরিচয় নেই তার সঙ্গে ওর। কিন্তু তবুও ওর ধারণা পুব-জার্মানির শাসন-ব্যবস্থার সে বিরোধী। রিশতারের সামনে বলেওছিল একবার: 'এ ধরনের ঘরবাড়ি দেখেছি আমি পারাপিগননে। লোকটা যদি তার ছুটি কাটাতে ফ্রান্সে গিয়ে থেকে থাকে তবে তাঁর মানে সে প্রচুর টাকা রোজগার করত এককালে। খুব আরামেই যে বাস করত এ তো পরিষ্কার। এখন তাকে বাধ্য হতে হচ্ছে সভা-সমিতিতে হাজিরা দিতে আর লালদের জন্যে কি সব সংস্কৃতি-সৌধ ইত্যাদি গড়তে।

হিলদা কফি এনে দিয়ে চলে গেল।

মনে হচ্ছে আপনি প্রায়ই ফ্রান্সে যেতেন।—বলল রিশতার।

সবশুদ্ধ বছর সাতেক কাটিয়েছি ওখানে।

বোধহয় এখন আর না যেতে পেরে খুবই কষ্ট হয়?

হ্যাঁ, আজকাল ও দেশটা কেমন হয়েছে দেখতে খুবই আগ্রহ জাগে। বিশেষ করে আবার একবার স্পেনে যেতে ইচ্ছে হয় খুবই।

অবাক হয়ে গেল রিশতার: লোকটা তাহলে স্পেনেও ছিল। কি করে কথাটা পাড়া যায়?

ফরাসী দেশটা চেনেন আপনি?—জিজ্ঞেস করল ক্রামার।

একটু একটু। সাঁৎ ত্রোপে-তে ছিলাম আমি, আর ছিলাম বিদারে। সে সব বহুদিন আগের কথা। আমার কপাল খারাপ—গোটা যুদ্ধের সময়টা ছিলাম আমি পুবসীমান্তে। আপনি কি যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সেও ছিলেন?

হ্যাঁ, ওখানেই আমি যুদ্ধ করেছি গোটা সময়টা।

খুবই দুঃসময় গেছে আমাদের সবারই।—দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল রিশতার, —আবারও কি আমাদের যুদ্ধ করতে হতে পারে? কিছুই আমার আর মাথায় ঢোকে না। আমেরিকানরা রুশদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছে আবার রুশরা দোষারোপ করছে আমেরিকানদের। বোধহয় দু দলই ভুল করছে। বলতে পারি না আমি। কিন্তু আমাদের কি করতে হবে?

গড়ে চলুন, হের রিশতার, যতটা পারি আসুন আমরা গড়ে যাই। শিক্ষকরা ছেলেদের শিক্ষা দিচ্ছে, কৃষি-বিজ্ঞানীরা করছে বাগান, ইঞ্জিনিয়াররা কারখানা তৈরি করতে শুরু করেছে, আর আমাদের কাজ হচ্ছে বাড়িঘর তৈরি করা।

কিসের জন্যে? বোমার ঘায়ে আবার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাক সেই জন্যে?

বোমা আপনাআপনি উড়ে বেড়ায় না—দরকার মানুষের। তার মানে চেষ্টা করতে হবে আমাদের যাতে প্রত্যেকটি মানুষকে স্বপক্ষে টানা যায়। কাজটা যে খুবই সহজ সে কথা বলছি না আমি। কেউ যদি তলিয়ে দেখে তবে দেখতে পাবে যে প্রচুর গলদ এখনো জমা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এটা কি লক্ষ্য করেন নি যে গত চার বছরের মধ্যে সবকিছুরই কেমন পরিবর্তন এসেছে? আমরা যখন মাদ্রিদের কাছে যুদ্ধ করছিলাম, তখন জার্মান ছিল মুষ্টিমেয়—থেইলমান ব্যাটালিয়ন। ভাবতে দারুণ বিশ্রী লাগত যে আমরা কত কম আর নাৎসীরা প্রায় গোটা দেশ-জোড়া। তখন একথা ভেবে মনকে প্রবোধ দিতাম যে এখনো কিছু মানুষ আছে—। কিন্তু এখন দেখছি হাজার হাজার তরুণ। এখন আর একটা থেইলমান ব্যাটালিয়ন নয়, এখন গোটা দেশটাই থেইলমানের। আজ প্রকৃতই এক নতুন জার্মানি।

আপনার যে এত সব অভিজ্ঞতা আছে তা আমি জানতাম না।—তাড়াতাড়ি বলে উঠল রিশতার।—এ বিষয়ে সম্পূর্ণ এক মত আমি আপনার সঙ্গে যে আমাদের গড়ে যেতে হবে। তাছাড়া যুদ্ধ আর হবে না, হবে কি? আর একটু কফি দিই আপনাকে।

নিজের উপরেই দারুণ বিরক্তি ধরে গেল রিশতারের: চমৎকার ষড়যন্ত্রকারী বটে! ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল আর কি। কিন্তু কি করেই বা বুঝবে—পার্টি-সভ্য নয় ক্রামার। তাছাড়া শিক্ষিত লোক। ভগবানকে ধন্যবাদ

যে ও পেটের কথা ফাঁস করেনি।

তবুও মনে হল ওর যে লেম্‌কের কাছে একবার কথাটা পেড়ে দেখবে। লেম্‌কেকে নিয়ে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই ওর। কারণ লেম্‌কে নিজেই ছিল একজন নাৎসী। তাছাড়া রুশিয়ায় থাকতে লোকেদের সঙ্গে তেমন ভদ্র ব্যবহার যে করেছে তা নয়।

রিশতার রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্রই বোমার মতো ফেটে পড়ল লেম্‌কে:

মানবতার জন্যে জীবনধারণ করে করে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি। এখন জীবনধারণ করতে চাই স্রেফ লেম্‌কের জন্যে। চার বছর ধরে উকুনের ভোজ দিয়েছি। নাভি ছেঁদা করে গুলি ঢুকেছে, নির্ভেজাল সত্যি কথা বলছি। কিন্তু তখন অন্তত এটা জানতাম যে যদি আমরা জিতি আমাদের জন্যে অন্তত কিছু একটা সুরাহা হবে। এখন আমেরিকানদের মতলব হচ্ছে আমাদের দিয়ে তাদের জন্যে লড়াই করিয়ে নেবে। ওরা বোমা তৈরি করবে আর স্পিলনটার ঢুকবে আমার পেটে। আমার দ্বারা ওসব আর নয়! কমিউনিস্টদের ঘৃণা করি আমি। কিন্তু ওরা আমার কাজের জন্যে পয়সা দেয়। আমেরিকানরা যদি ম্যাকক্লয়-এর ঘৃণ্যতম কুকুরটার জন্যেও আমাকে পায়খানা তৈরি করার কাজ দেয় তাও আমি নিতে রাজি আছি। কিন্তু ওরা যদি আমাকে দুনিয়ার রাষ্ট্র-পতিও করে দিতে চায় তবুও ওদের জন্যে আমি যুদ্ধ করব না। আমার একটা মাত্রই নাভি আছে, দুটো তো নেই। যত খুশি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করুন না কেন, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। লেম্‌কে বাঁচতে চায়।

রিশতার তার ব্যর্থতার কথা জানাল স্মিডলকে। ভাবছিল হয়তো স্মিডল অন্য কোনো লোক খুঁজে বের করার জন্যে চাপ দেবে। কিন্তু স্মিডল শুধু বলল:

আপনি যে ওদের সঙ্গে একমত হন নি সেটা ভালো কথা। দেশে ফিরে যাবার জন্যে ডাক এসেছে আমার। দু-তিন মাসের মধ্যেই ফিরে আসছি। আশা করি তখন আপনার স্থান বদল সম্পর্কে কোনো না কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। আপনার দিক থেকে ভালো স্থপতি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকুন।

খুবই ভদ্রভাবে বিদায় নিল হিলদার কাছ থেকে। আবেগ, আকুলতা, ঘৃণা, ক্রোধ এক সঙ্গে ফেনিয়ে উঠল হিলদার বুকে। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবল কামনা প্রাণপণে চেপে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। ঘৃণ্য ব্যবহার করেছে স্মিডল ওর সঙ্গে, ভাবল পরে। কুর্টের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আদৌ বিশ্বাস করে না ও। সে চেয়েছিল শুধু ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে। ঠিক জানেও স্মিডল আর ফিরে আসবে না।

গোটা গ্রীষ্মকালটা মনমরা হয়ে কাটাল হিলদা। তারপর শরতের শেষের দিকে যখন স্মিডল ফিরে আসছে আসছে, এমন সময়ে এবার ফ্রান্সের একটি তরুণ কর্মচারীর প্রেমে পড়ল।

রিশতারও বিশ্বাস করেনি যে স্মিডল আবার ফিরে আসবে। আর যে-ইমাত্র পশ্চিম-অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিল, ওর বুকটা হালকা হয়ে উঠল। গোপন সংগঠন সম্পর্কে আর বোকার মতো কোনোদিন কোনো আলোচনা করেনি। কঠিন পরিশ্রম করতে লাগল। আর যদিও এ কালটা সম্পর্কে অভিসম্পাত করতে ছাড়ত না তবুও প্রত্যেক বুধবার সুন্দরী লোটি কয়েক ঘণ্টার জন্যে কালের কঠোরতার কথা ভুলিয়ে দিত ওর মন থেকে।

অবশ্য ফিরে এল স্মিডল। ওর ফরাসী প্রেমিকের প্রেমে মশগুল হিলদা কেবল একবার অবজ্ঞাভরা দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু রিশতার চনমনিয়ে উঠল: কি বলবে ওকে স্মিডল? আর যা-ই হোক এই দুটো দুনিয়ার মাঝ-খানে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার চাইতে ফ্রাংকফুর্ট শতগুণে কাম্য।

ঐ গোপন সংগঠন সংক্রান্ত ব্যাপারের পরে স্মিডল সম্পর্কে একটু ভয় ঢুকেছিল রিশতারের মনে। যে কোনো ব্যবহারই পেতে পারে সে স্মিডলের কাছ থেকে। কিন্তু আমেরিকানটা যা বলল শুনে তো বোবা মেরে গেল রিশতার। তার কথার সারমর্ম হল এই যে, স্টেডিয়ামের আসনগুলো অনায়াসেই ভেঙে পড়তে পারে। অবশ্য সেটা নির্ভর করে স্থপতির উপরে। ডলার হল ডলার। চূড়ান্ত সময় আসছে। তাছাড়া রিশতার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে—এমন একটা সংগঠনে যোগ দিয়েছে, যারা দলত্যাগীকে ক্ষমা করে না কখনো। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা ধরে দাবি জানাল, প্রলোভন দেখাল, শাসাল: যখন কোনো একটা বড় অনুষ্ঠান হবে তখন আসনগুলো ভেঙে পড়া চাই-ই চাই। তার বদলে তিন হাজার ডলার পাবে রিশতার আর সুযোগ পাবে হাওয়াই পথে ফ্রাংকফুর্ট চলে যেতে।

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল রিশতার:

এ-সব পাগলামো। শুধু নাৎসীদের পক্ষেই এ ধরনের পরিকল্পনা করা সম্ভব। ছেলেমানুষ নয় রিশতার। তাছাড়া লালরাও কিছু আর বোকা-বেকুব নয়।

ভেবে দেখুন নিজে।—বলল স্মিডল,—আমি আপনার বন্ধু। চাই আপনাকে বাঁচাতে। পশ্চিম এলাকায় লালদের খাতায় আপনার নাম উঠে গেছে। বন পুলিসের চোখে আপনি হলেন উলব্রিখটের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। অবশ্য ইচ্ছে হলে আপনি রুশদের দলে চলে যেতে পারেন। দোষ দেব না আমি আপনাকে—মানুষকে তো বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু সেখানেও একটু ফ্যাকড়া আছে। রিবেনট্রপের নথিপত্রের ভিতরে কর্নেল উইলকি নামে কোনো জনার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তাতে সে বলছে যে উনিশশো চল্লিশ সালে নাৎসী গুপ্তচর বিভাগের তরফ থেকে আপনি গিয়েছিলেন মস্কোয়। এটা যদি ছাপিয়ে দেয়া হয় তবে লালরা আপনাকে কাজ দেবে না। আমি সেটা এই বলে লুকিয়ে রাখতে বলেছি যে আপনি আমাদের হয়ে কাজ করছেন। এখন সব কিছুই আপনার নিজের উপরে নির্ভর করছে।

রিশতারের প্রথমটায় মনে হল যে সাহস করে ওর গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল সেটা মোটেই সমাধান নয়। কারণ ও চায়

বাঁচতে। দুঃখে এতটা আত্মহারা হয়ে পড়ল যে ও ঠিক করল হিলদার কাছে সব কিছু খুলে বলবে। যদিও এর আগে কোনোদিনই সে হিলদার কাছে ওর অন্তরের কোনো কথাই বলত না।

আশা করেছিল রিশতার যে শুনে অবাক হয়ে যাবে হিলদা। হয়তো প্রতিবাদ করে উঠবে সঙ্গে সঙ্গেই। নয়তো কেঁদে ফেলবে। কিন্তু সে শুধু শান্ত কণ্ঠে বলল:

স্মিডল একটা বদমায়েশ। অনেকদিন আগে থেকেই জানি আমি।

জানলে কেমন করে?

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল হিলদা:

কেমন করে জানি তা শুনে হাতিঘোড়া হবে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে ও একটা আস্ত পাজী বদমায়েশ। তুমি অস্বীকার করবে তাতে যা-ই কিছু হোক না কেন। জীবনটাকে নিয়ে ঢের ছিনিমিনি খেলেছ, আর না। মনে আছে তুমি বলতে আমাকে যে হিটলারের কথাই ঠিক—মানুষ লড়বে আর দুঃখ বরণ করবে? তখনো সে কথা আমি বিশ্বাস করি নি। আমিও অনেক কিছুই সহ্য করেছি। যখন বোমাপড়ার কথা মনে পড়ে পাগলের মতো আমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে শুরু করে দেয়। আর ওরা কিনা আমাদের দিয়ে তৈরি করিয়েছে ব্যারিকেড। কিসের জন্যে? না যাতে রুশরা এসে হাজির হয় উনটার-ডেন-লিনডেনে আর আমেরিকানরা পসডামার্স্ট্রাসিতে? আমি মিনতি করে বলছি তোমাকে কুর্ট, তুমি অস্বীকার কর। জান আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ কত দিন? সতেরো বছর। তার মানে অনেকদিন। আমাকে তুমি হেলাফেলা করতে পার না। যদি তুমি রাজী হয়ে যাও তবে কমিউনিস্টরা খুন করে ফেলবে তোমাকে। তাই চাও নাকি তুমি? অবশ্য এক সময়ে আমরা ভালোভাবেই থাকতাম। কিন্তু এখনো খুব যে খারাপভাবে আছি তা নয়। তোমার চাকরি আছে। তাছাড়া ওর প্রস্তাবটা কি? সাধারণ মানুষ, স্ত্রীলোক, শিশু তারা থাকবে ঐ সব আসনে বসে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে ও লোকটা একটা আসল গুণ্ডা। কাউকে কোনোদিন আমি খুন করতে চাই না, কিন্তু হাসতে হাসতে আমি ওর গলায় ছুরি বসাতে পারি।

আমি যদি রাজী না হই তবে ও কর্নেল উইলাকির রিপোর্ট ছাপিয়ে দেবে। তখন আর পশ্চিম এলাকায়ও পালিয়ে যেতে পারব না। এভাবে হোক আর ওভাবে হোক মারা পড়বই আমি।

আমি তোমাকে বলছি না যে তুমি বলে দেবে যে তুমি রাজী নও। বল, আমি আর একটু ভেবে দেখি। আশা করে থাকুক না বসে। কিন্তু করবে না তুমি কিছুতেই।

কেঁদে ফেলল হিলদা। বুঝতে পারল কুর্ট বেড়াজালে পড়ে গিয়েছে আর সেটা ওরই দোষে। ও-ই স্মিডলকে ডেকে এনেছিল বাড়িতে। আজ সতেরো বছর এক সঙ্গে ঘর করছে ওরা। কিন্তু আজ যদি কুর্ট ওকে প্রহার করে তবে ঠিক কাজই করবে।

মনে মনে মতলবটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে লাগল রিশতার: হয়তো ব্যাপারটা

ঢুকিয়ে দিতে পারে। বলবে, সে মূলত একমত। কিন্তু আসলে কাজটা খুবই জটিল। কিন্তু যদি ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, স্মিডল আবার চলে যায় ফিরে আমেরিকায় তো কেমন হয়?

রাতভর একটুও ঘুমোল না রিশতার, ভাবতে লাগল। হঠাৎ স্মিডলের পরিকল্পনাটা ওকে প্রলুব্ধ করে তুলল। অবশ্য সবার চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা হাশিল করা খুবই শক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি ভালো করে সব দিক থেকে ভেবেচিন্তে দেখা যায় তবে হয়তো করে ওঠা সম্ভব। বাজে কথা বলছিল হিলদা—শিশুরা আসবে কোথা থেকে ওখানে? আসনগুলো সরকারী লোকজনদের জন্যে। ওরা ওখানে বসে রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কথা শেখাবে ওদের! কুর্ট রিশতার খাঁটি জার্মান। শেষ বুলেটটি দিয়েও সে লড়েছে বার্লিন রক্ষা করার জন্যে।

সকালে উঠে কাজে চলে গেল। সমস্ত দিন ধরে ভাবতে লাগল স্মিডলের প্রস্তাব সম্পর্কে। হিলদা অপেক্ষা করছিল ওর বাড়ি ফেরার জন্যে। আসতেই জিজ্ঞেস করল:

কি ঠিক করলে তুমি?

জানি না। এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারি নি। একটু একা থাকতে দাও আমাকে।

হিলদার যাবার কথা তার ফরাসী প্রেমিকটির কাছে। কিন্তু গেল না। ওর বিবেক ওকে কশাঘাত করছে। বিছানায় পড়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল হিলদা। কারণ ফরাসী ভদ্রলোক অপেক্ষা করে আছে ওর জন্যে আর যাবার জন্যে ও নিজেও ছটফট করে মরছে। কারণ, বার্ধক্য উঁকি মারছে আর সেটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। কাঁদছে আসনগুলো ধ্বসে পড়ার আতঙ্কে, কচি শিশুগুলোর পিষে মরার ভয়ে আর বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থলগুলো মনে করে।

হঠাৎ রিশতারের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: কেন, আজই তো বুধবার! সঙ্গে সঙ্গেই সে চলে গেল তার লোটির কাছে। একটা সোফার উপরে বসে বড় একটা সাদা বেড়ালের মাথার উপরে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল লোটি। লোটিকে চুমু খাবার জন্যে এগিয়ে এল কুর্ট। কিন্তু বেড়ালটাকে দেখিয়ে বলে উঠল লোটি:

সাবধান, ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেবে দেখছি।

বল তো লোটি, বিপদসংকুল জীবন ভালো লাগে তোমার?

তুমি একটি বুড়ো বেকুব! কোনো লোকেরই কি ভালো লাগে? বিরক্তির সুরে জবাব দিল লোটি।

জানি না আমি। বোধহয় কারুরই ভালো লাগে না কিংবা, হয়তো আমারই লাগে।

তিপ্পান্ন

অবিচল অধ্যবসায়ের জন্যে ভাস্কর কার্ল ব্রেনার নিডারওয়াল্ড ও ওবের-ওয়াল্ডের সবার কাছেই সুপরিচিত। গত চার বছর ধরে সে প্রেম করে আসছে 'হোয়াইট স্ট্যাগ' সরাইখানার মালিক গুস্তাফ স্পেয়ারের তরুণী বিধবা আনার সঙ্গে। বহুদিন আগেই যখন একবার সেনাবাহিনী থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছিল তখনই সে প্রেমে পড়ে আনার। তখন গুস্তাফ স্পেয়ার বেঁচে। তাই আনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলত কার্ল। যাওয়ার সময়ে নিজের হাতে তৈরি করা একটা লকেট দিয়ে গেল ওকে স্মরণ-চিহ্ন হিসেবে—হাতির দাঁতের তৈরি হৃদপিণ্ড।

আনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অনেক। দেখতে সুন্দরী, হৃষ্টপুষ্ট অথচ মোটা নয়। নীলকান্তমণির মতো নীল দুটো চোখ আর, হালকা সোনালী রঙের বেণীবাঁধা চুল। ওর চালচলন এত শালীনতাপূর্ণ যে কুৎসা-রটনাকারীরা এতটুকু খোরাক পায় না। যদিও ওবেরওয়াল্ড-এ কুৎসা-রটনাকারীদের সংখ্যা একটু বেশিই। আনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের আকর্ষণ আনার দিকে যতটা তার থেকে ঢের বেশি 'হোয়াইট স্ট্যাগ' সরাইখানা আর তার ছোট্ট রেস্তোরাঁর দিকে।

ওবেরওয়াল্ড-এর বার্গোমাস্টার আইনজীবী সাইদিলিৎস্ আগে ছিলেন স্টালহেলম-এর সভ্য কিন্তু এখন 'মডারেট ডিমোক্রাট'। একদিন তাঁর স্ত্রীর কাছে বললেন :

আনার কপাল খারাপ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র দু-চার দিন আগে বেচারা গুস্তাফ মারা পড়ল।

ঠিক তার উলটো। আমার তো মনে হয় ওর কপাল খুবই ভালো।—প্রত্যুত্তরে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলে উঠল তাঁর স্ত্রী।—মনে আছে তোমার গুস্তাফ কত করে চেয়েছিল সরাইখানাটা নিডারওয়াল্ডে করতে, কারণ সে বলত জায়গাটা ঢের বেশি সুন্দর? তাহলে আনা কি করত এখন? তোমার কথায়ই বলতে গেলে এও বলা যেতে পারে যে কয়েক কিলোমিটার দূরে থেকে সর্বনাশের হাত থেকে বাস্তবিকই বেঁচে গেছে আনা।

এখনো বসে আছে কেন আনা? কার্ল ব্রেনার বুড়োও নয় আর দেখতেও খারাপ নয়। কুশলী ভাস্কর হিসেবে সুনামও আছে তার। যুদ্ধের আগে ভ্রমণকারীরা ওর হাতের কাজ কিনে নিয়ে যেত। তাছাড়া আজও শুধু ভাইমার বা ইনায়ই নয় বার্লিনের দোকানে দোকানে পর্যন্ত ওর তৈরি জিনিস বিক্রি হয়। দু-দুটো মেডেল পেয়েছে ও হাতের কাজের জন্যে। ফলের বাগান সুদ্ধ একটা বাড়ি আছে ওর নিজের। তাছাড়া সব চাইতে যেটা বড় কথা সেটা হল এই যে ওকে দেখামাত্রই আনার দেহ-মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর দিকে তাকালেই আনার স্বচ্ছ চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে আসে। বালিকা বয়েস থেকেই আনা ওর প্রতি

অনুরক্ত। কিন্তু আনার বাপ-মা ঐ সরাইখানাটার জন্যেই ওকে বিয়ে দিয়েছিল গুস্তাফের সংগে। বিয়েটা হয়েছিল যুদ্ধ শুরু হবার মুখে। কার্ল যখন ছুটিতে বাড়ি এল দারুণ বিচলিত হয়ে উঠল আনা। ওর দেয়া লকেটটার ভিতরে পুরে রাখল ওর ফটোগ্রাফ। কিন্তু এখনো যে সেটাকে আলনায় ঝুলিয়ে রেখেছে সেটা এ জন্যে নয় যে আনার মন বিরূপ হয়ে পড়েছে ওর প্রতি। রেখেছে শুধু এই জন্যেই যে কার্ল থাকে নিডারওয়াল্ড-এ। যেখানে গুস্তাফ তার সরাইখানাটা গড়তে চেয়েছিল, তারই কাছে। নিডারওয়াল্ড আর ওবেরওয়াল্ড-এর ভিতরের দূরত্ব মোটে চোদ্দ কিলোমিটার। কিন্তু দুটো শহরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোবিয়েত এলাকা আর আমেরিকান এলাকার মধ্যবর্তী সীমা রেখা। তিন বছর আগে কার্ল প্রায়ই আসত ওবেরওয়াল্ডে। কিন্তু ইদানিং ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে। পুলিস পাশ দেখতে চায়। এটা সত্যি যে চোরাকারবারীদের যাতায়াত এখনো অবাধ—ওষুধ, মোজা, সিগার ইত্যাদি গোপনে পাচার করে থাকে। কিন্তু কার্ল মোটেই কারিৎকর্মা লোক নয়। তাই আনার সংগে দেখা-সাক্ষাৎ দিনের পর দিন খুবই বিরল হয়ে আসছে। ও বলেছে আনাকে যে ওদের এখন বিয়ে করে ফেলা দরকার। তা হলেই আনা চলে এসে বসবাস করতে পারবে নিডার-ওয়াল্ডে। কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না আনা। ওর বাবা মারা গেছেন পঁয়তাল্লিশ সালে। মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ। তাছাড়া নিডারওয়াল্ডে যাবার কথা কানেই তুলবেন না। বলেছিলেন:

তোর মাথা খারাপ, দোকানটা বেচে দিয়ে লালদের সংগে গিয়ে বাস করতে চাস।

আনা যখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল কার্লকে যে সে কেন ওবেরওয়াল্ড-এ এসে বাস করে না। জবাবে বলল কার্ল:

আমার ভাস্কর্যের প্রতিষ্ঠান রয়েছে এখানে। হোটেলওয়ালা হতে চাই না আমি। আমি একজন শিল্পী।

কিন্তু ওর চলে আসতে না পারার আসল কারণটা যে কি তা ভেঙে বলল না ওকে কার্ল। ওবেরওয়াল্ড-এর সম্ভ্রান্ত লোকেরা ওকে 'লাল কার্ল' ছাড়া আর কোনো নামে ডাকে না।

কার্লের বাবাও ছিলেন ভাস্কর। নিজেকে বলতেন তিনি সোস্যাল ডেমোক্রাট। যদিও কোনো পার্টির সভ্যই ছিলেন না। হিটলার যখন ক্ষমতায় এল এতটা ভেঙে পড়লেন তিনি যে বিছানা নিলেন।

তোর বয়েস এখন আঠারো বছর—ছেলেকে ডেকে বললেন,—এই বয়সে অল্প-বয়সী ছেলেরা বখামো করে বেড়ায়। তোর যদি ইচ্ছে হয় বখামো করে বেড়াতে তবে মদ খাস, মেয়েদের পেছনে ঘুরিস, জুয়া খেলিস তবুও ঐ গুণ্ডাদের দলে যোগ দিস না।—একান্ত অনুগতভাবেই কার্ল তার বাবার উপদেশ পালন করে চলেছে। অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় সে এ কথাও চিৎকার করে বেড়ায়নি যে সে ফুয়েরারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বন্ধুবান্ধবের ভিতরে "জিগ্ হাইল্" বলে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পথে পথে চেঁচিয়ে বেড়ানো চাষাড়ে লোকগুলোর বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ করত। যখন যুদ্ধ শুরু হল কার্ল বলল ওর বোনের কাছে:

জানতাম ঐ হেঁড়ে-মুখো ভাড়াটে গুণ্ডাগুলো আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধ করল। প্রথম বলকানে, তারপর আফ্রিকায়, শেষ পর্যন্ত রুশিয়ায়। উনিশশো চুয়াল্লিশে হঠাৎ ও নিজের অজ্ঞাতেই বীর বলে বিখ্যাত হয়ে পড়ল। একদিন সে তার বন্ধুদের কাছে বলেছিল: রুশিয়ার গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দেয়াটা হচ্ছে বোকামো। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন নিডারওয়াল্ডে আমার নিজের বাড়িটাই জ্বলছে।

তোমার নিজের বাসস্থান জ্বলছে তা যাতে দেখতে না হয় তার ব্যবস্থা করছি আমরা।—দেঁতো হাসি হেসে বলল কর্পোরাল। বদলি করে দিল ওকে শাস্তি-বাহিনীতে। ওর কপাল ভালো যে বেঁচে রইল। আর নিডারওয়াল্ডে ফিরে এসে দেখতে পেল যে ওর বাড়িটাও অক্ষত আছে। কেউই জ্বালিয়ে দেয় নি সেটা। কিন্তু ওর অদৃষ্টে আরো অগ্নিপরীক্ষা বাকি ছিল। ওর সেই ব্যর্থ দুঃসাহসিকতার কথা ছোট্ট শহরটার ভিতরে জানাজানি হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই দেখল যে সে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-কারী হিসেবে বার্গোমাস্টার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে গেছে। বাপের মতো কার্ল কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে মাথাঘামায় নি। সচেতনভাবেই সে তার কর্তব্য করে যেতে লাগল কিন্তু তাতে এতটুকুও উৎসাহ পেত না। সত্যি কথা বলতে কি, কি যে ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে ও কিছু ধারণাই করতে পারত না। কার্ল ভাবত নাৎসীগুলো পাজী বদমায়েশ। কিন্তু সৌভাগ্য যে এসব ব্যাপার চুকে-বুকে গেল। ও ফিরে যেতে পারল ওর নিজের কাজে—পাথর কেটে কেটে হরিণ বা ভল্লুকের ছানা তৈরি করত। তবুও এ সম্পর্কে কোনো রকমের গোলমাল করার কোনো প্রয়োজনই হয় নি। সবচাইতে ভালো হত যদি ওর বাবা যাদের কথা বলতেন সেই 'সোস্যাল ডেমোক্রাটরা' দেশের শাসনভার গ্রহণ করত। প্রথম ওবেরওয়াল্ডে এসে অবাক হয়ে গেল দেখে কার্ল যে ওকে সবাই নাম দিয়েছে লাল কার্ল। ওবেরওয়াল্ডের বার্গোমাস্টার সাইডলিৎস দিয়েছে নামটা আর সেটাই চালু হয়ে গেছে। এমন কি নিডারওয়াল্ডেও যারা এই নতুন ব্যবস্থা অপছন্দ করত তারাও ফিসফিস করে বলত:

চুপ চুপ, ঐ লাল কার্ল আসছে!

তারপর তরুণ শুলৎস যখন নতুন বার্গোমাস্টার নির্বাচিত হল, রেহাই পেল কার্ল। শুলৎস ফিরে এল বন্দীশিবির থেকে আর সে ছিল সত্যিকারের লাল। কার্ল ভাবল যে এখন হয়তো সবাই ভুলে যাবে ওর কথা। কিন্তু আনা বলল:

সাইডলিৎস বলেছে আমি যেন কিছুতেই তোমাকে বিয়ে না করি। কারণ, তুমি লাল। আর রুশরা যখন চলে যাবে তোমাকে ওরা জেলে পাঠাবে।

আমি তো লাল নই—প্রত্যুত্তরে বলল কার্ল,—ও শুধু কথার কথা। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে নাৎসীরা আবার হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে। আমার মনে আছে সাইডলিৎস কেমন করে চিৎকার করে বেড়াত যে পোলদের তুলোধুনো করে দিতে হবে। কিন্তু তার বদলে আমরাই তুলোধুনো হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবে কার্ল যে কমিউনিস্টরা বড্ড গোঁয়ার। কেন ওরা আমেরিকানদের সঙ্গে

একটা রফা করে ফেলে না? আমেরিকানদের কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার। তাছাড়া আছে সেই সাংঘাতিক বোমা! রুশরা যদি আমেরিকানদের সঙ্গে মিটমাট করে নেয় তবে মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারে। কার্লও পারে আনাকে বিয়ে করতে। সরাইখানার ভারটা ছেড়ে দেবে মায়ের হাতে আর তাকে দেখে আসবে প্রতি রবিবার। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্টরা গাল দেয় আমেরিকানদের। কিন্তু নিছক পাগলামো। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে কার্ল। সাইডলিৎস রিপাবলিকের আইনকানুনকে বলে মারমুখী। কিন্তু তাতে এতটুকুও অসুবিধে মনে হয় না কার্লের। কিংবা বিচলিতও হয় না টাউন হলে থেইলমানের প্রতিকৃতি দেখে বা শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে অটোবাহন-এর কাছে রুশ বাহিনীর ঘাঁটি আছে বলে। কখনো সখনো যদি রুশ মেজরের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় নম্রভাবে কার্ল জিজ্ঞেস করে:

"কেমন আছেন? চমৎকার আবহাওয়া আজকের।" বা "আছেন কেমন? বড্ড হাওয়া দিচ্ছে আজ।" তারপর আকুল আগ্রহে পাইনভরা কখনো সবুজ, কখনো কমলারঙ বা কখনো কালো-হয়ে-ওঠা পাহাড়টার দিকে তাকায়। ঐ পাহাড়টার ওপারে রয়েছে আনা। আর কেবলই ওর মনে হয় যে এতদিনে আমেরিকানদের সঙ্গে একটা মিটমাট করে নেবার সময় হয়েছে কমিউনিস্টদের।

দ্বিতীয়বার যেদিন কার্ল আবার আকস্মিকভাবে বীর হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়ল, বরফের মতো কনকনে হাওয়া বইছিল সেদিন। কিন্তু রুশ মেজরের কাছে সে সব কোনো কথা বলার কোনো উপলক্ষ্যই ঘটে নি সেদিন। কারণ ওর পাশ না থাকায় পুলিসের চোখ এড়িয়ে বনের পথে যাচ্ছিল ওবেরওয়াল্ডে। লাল কার্লের পক্ষে কাজটা একটু বিপজ্জনকই বটে। কিন্তু আনার সঙ্গে দেখা করার এমন এক আকুল আগ্রহ জেগে উঠল ওর অন্তরে যে নিজেকে কিছুতেই আর সামলাতে পারল না। সঙ্গে নিয়ে গেল দু সপ্তাহ ধরে কুঁদে কুঁদে তৈরি-করা বাটওয়ালা একটা ছুরি আর একটা ছোট্ট বাকস আনাকে উপহার দেবে বলে।

হোয়াইট স্ট্যাগ রেস্তোরাঁ তখন জমজমাট। কার্লকে দেখতে পেয়েই আনার মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তাতে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। আনা ওকে বলল নিচের ঘরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতে। কারণ দারুণ ভিড় খদ্দেরের। হিমসিম খেয়ে উঠছিল পরিচারিকাটি তাদের সামলাতে। বলল, ঘণ্টাখানেক পরে ওর হাতের কাজ শেষ করে দুজনে বসবে গিয়ে উপরে ওর ঘরে। একা একা একটা টেবিলে বসে কার্ল ঠান্ডা টক মদ খেতে খেতে অপেক্ষা করতে লাগল। সময় কাটাবার জন্যে পকেট থেকে সেদিনের খবরের কাগজটা বের করে পড়তে লাগল। কেননা সকালে সেটা পড়ার সময় হয়নি ওর।

কাউন্টারের সামনে একটা লম্বা টেবিল জুড়ে বসে কয়েকজন আমেরিকান—একজন সামরিক পুলিস আর দুজন বেসামরিক ভদ্রলোক। ওরা চড়া গলায় কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে আর অনবরতই ডাকছে পরিচারিকা মেয়েটিকে। কেউই ওদের দিকে লক্ষ্য করছে না। ওবেরওয়াল্ড যখন থেকে সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটি হয়েছে তখন থেকেই 'হোয়াইট স্ট্যাগ' রেস্তোরাঁটা ওদের খুব পছন্দসই

বিশ্রামের জায়গা হয়ে উঠেছে।

জায়গাটা বড্ড চুপচাপ,—ক্যাপটেন কিনেলের কাছে বলল স্মিডল।

বিনীত হাসি হাসল কিনেল।

আর খানিকটা কির্শ্চ খাওয়া যাক আসুন।—বলল কিনেল।

প্রায়ই ওবেরওয়াল্ডে আসে স্মিডল। আর ঠাট্টা করে হোয়াইট স্ট্যাগকে বলে ওর হেড কোয়ার্টার। সব সময়েই ওর সঙ্গে থাকে জার্মান ব্রয়ার। ইংরেজী আর রুশ দুটো ভাষাই ও বলতে পারে নির্ভুল। শ্রান্তি নেই স্মিডলের। সরল-ভাবেই ভেবে নিয়েছে রিশতার যে ওর ব্যাপারটাই আমেরিকানদের একমাত্র ধ্যান। কিন্তু আসলে স্টেডিয়ামের ব্যাপারটা স্মিডলের নানান রকমের পরিকল্পনার ভিতরে একটি। জেনারেল হয়েস যখন ওকে জিজ্ঞেস করল যে ও একই সঙ্গে অনেক চুলোয় কাঠি দিচ্ছে কি না, জাবরে স্মিডল বলল:

আসল কথা হচ্ছে কিছু একটা করা। একটা "ভোলকস্পলিজি" উড়িয়ে দেয়ার চাইতে একজন তুরিনগিয়ান মন্ত্রীকে দলে ভিড়ানোটা বড় কথা হতে পারে কিন্তু যখন যেটারই সম্ভবনা দেখা দেয় আমি সমানভাবেই তা পছন্দ করে থাকি। জার্মানগুলোকে সব সময়েই স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে এ সব বাজে কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সাংবাদিকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় স্মিডলের কর্মক্ষমতা আর উদ্‌ভাবনী শক্তি দেখে। অন্যান্য অনেক কিছু কাজের ভিতরেও সে তার সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের কাজে অবহেলা করে না। আর প্রায় প্রত্যেক দিনই লম্বা লম্বা তারবার্তা পাঠায়। কেননা ও বলে:

একটা ছোট্ট বীজ খুঁজে বের কর, দেখবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাঁচশো কথার ডালপালা মেলে বেড়ে উঠবে।

যেমন ধরা যাক যদি কোনো জার্মান কোনো কারণে সোবিয়েত এলাকা থেকে ওবেরওয়াল্ডে আসে, তক্ষুনি স্মিডল চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখে পাঠাবে "দলে দলে লোকের লাল-নরক ত্যাগ" নাম দিয়ে।

বড়ো এক গ্লাস কির্শ্চ শেষ করে আবার স্মিডল কিনেলকে খোঁচাতে শুরু করল:

জায়গাটা বড্ড ঝিমানো। তোমার ছেলেছোকরাদের সঙ্গে আলাপ করে দেখলাম। ওরা বড্ড মিইয়ে পড়েছে। ভুলে যায় যে পাশেই লালগুলো রয়েছে।

লালগুলোর নড়াচড়ার তো কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।—প্রত্যুত্তরে বলল ক্যাপটেন,—আসুন আর একটু খাওয়া যাক।

ক্রুদ্ধ লাল চোখের দৃষ্টি মেলে স্মিডল ঘরটার চারদিকে তাকাল:

তুমি বলছ ওদের নড়াচড়ার কোনো সাড়া পাচ্ছ না? তুমি নিজেও মিইয়ে পড়েছ ক্যাপটেন। তাকিয়ে দেখ—ওখানে একটা লোক চুপচাপ বসে ত্যুরেস ডয়েশল্যান্ড পড়ছে। একথা যদি একবার জেনারেল হয়েস শুনতে পান তো জীবনে কোনোদিনই আর তোমার পক্ষে মেজর হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

হয়তো নিডারওয়াল্ডের কেউ হবে,—বলল দো-ভাষী ব্রয়ার।—গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসছি আমি স্থানীয় কাউকে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি।—পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে জানাল ব্রয়ার,—লোকটা হচ্ছে নিডারওয়ালডের ভূতপূর্ব মেয়র, লাল কার্ল। হোয়াইট স্ট্যাগের কর্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে।

জ্বলে উঠল স্মিডল:

চমৎকার! হোয়াইট স্ট্যাগে বসে লাল কার্ল পিক-এর বক্তৃতা পড়ছে আর এদিকে ক্যাপটেন কিনেল জেনি পাওয়েলের নিতম্বের চিন্তায় মশগুল। সরাই-খানার কর্ত্রী যে লাল নয় তা কেমন করে জানলে? যদি তাই হয়ে থাকে সে, তাহলে নিশ্চয়ই ওরা সব খবরাখবর ভালো করেই জানে। কাল যদি রুশরা রাইন বরাবর অভিযান শুরু করে দেয় তাতেও আমি আশ্চর্য হব না।

বোধহয় ও বনের ভিতর দিয়ে এসেছে।—বলল ক্যাপটেন।—বনটা ঘন। তাছাড়া জার্মানদের ঠ্যাংগুলোও লম্বা লম্বা কিন্তু যখন এসেই পড়েছে এখানে তখন আমাদের একটু আলাপ করতে হবে বৈকি। ঢের সময় আছে। আসুন আর একটু খাওয়া যাক।

ঝাপসা চোখ মেলে যে টেবিলটায় লাল লোকটি বসে পিক-এর বক্তৃতা পড়ছিল সেদিকে তাকাল। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। হয়তো একটু বেশি মাত্রায়ই পান করে ফেলেছে ভেবে নিদারুণ বিরক্তির সঙ্গে আর এক গ্লাস খালি করে ফেলল।

কার্ল উপরে—আনার ঘরে। বনের পথ দিয়ে আসতে আসতে কি বলবে আনাকে সে কথা ভেবে রেখেছিল। রাজী করাবে আনাকে ওকে বিয়ে করতে। অনির্দিষ্ট কাল কিছু আর অপেক্ষা করে থাকতে পারে না ওরা। কমিউনিস্টরা চায় না আমেরিকানদের সঙ্গে কোনো রকমের কোনো মিটমাট করে নিতে। আর ইতিমধ্যে বয়েস বেড়ে চলেছে। মনে মনে এমন একটা বক্তৃতার মহড়া দিয়ে এসে ছিল যেটা ওর মনে হয়েছিল খুবই মনে ধরবে আনার। কিন্তু এখন শুধু নীরবে তাকিয়ে রইল আনার মুখের দিকে। কি সে বস্তু যাতে ওর মাথার ভিতরটা গোলমাল হয়ে গেল? নিশ্চয়ই কম কড়া এক গ্লাশ মোজেলওয়েইন মদের জন্যে নয়। হয়তো এর কারণ এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত ও পায়নি আনাকে কাছে। কিংবা হয়তো এও হতে পারে যে আইন এড়িয়ে এসেছে বলে ও একটু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ ও সোফার উপরে আনার পাশে বসে পড়ে আনাকে চুমু খেতে শুরু করে দিল। ইতিপূর্বে কোনোদিনও আর ও এমন কাজ করেনি। অনুভব করল আনা যে ওকে তুলে দেয়া দরকার। বলল: যাও কার্ল, ঐ চেয়ার-টার উপরে গিয়ে বস।—কিন্তু এ কথা বলতে বলতে সেও পালটা ওকে চুমু খেতে শুরু করে দিল।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। আনার মনে হল এই বেশে এক্ষুনি দরজা খুলে দেয়া যায় না।

জলদি খোল।

পুলিস কর্মচারী রোসেন এসে ঘরে ঢুকল। আনার দিকে না তাকিয়েই কার্লকে লক্ষ্য করে বলে উঠল:

পাশ দেখান আপনার।

নোংরা কুকুর, মনে মনে গাল পেড়ে উঠল কার্ল। মনে পড়ল রোসেন যখন হিটলারজুগেন্ডে ছিল আর চিৎকার করে বলত জার্মানরা ভারত অভিমুখে অভিযান শুরু করেছে।

পাশ নেই আমার,—প্রত্যুত্তরে বলল কার্ল।

কার্লকে ধরে নিয়ে চলে গেল রোসেন। চুলের কাঁটাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগল আনা।

কঠিন লোক স্মিডল: আধ লিটার কিশর্চ গিলেও চলে গেল না বা ঘুমিয়ে পড়ে ভুলে গেল না ব্যাপারটা। বসে বসে ভাবতে লাগল কি করে শায়েস্তা করতে হবে লাল কার্লকে।

কতদিন ধরে আপনি কমিউনিস্ট হয়েছেন?

ঈশ্বর রক্ষা করুন,—প্রত্যুত্তরে বলল কার্ল, কোনোদিনই আমি কমিউনিস্ট হই নি। আমি ভাস্কর। দুটো পদকও পেয়েছি তার জন্যে।

ও বলে গেল কেমন করে হঠাৎ ও মেয়র হয়েছিল। কমিউনিস্টরা আমেরি-কানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চায় না এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ এখন ওর বিয়েথা করে পরিবার নিয়ে বসবাস করার সময় এসেছে।

খুবই বিপদে পড়েছেন আপনি,—বলল স্মিডল,—জার্মান পুলিস বলেছে আমাকে যে আপনি বিনা পাশেই এসে ঢুকে পড়েছেন এখানে। তাছাড়া আপনার কাছে অস্ত্রও ছিল।

ঈশ্বর সাক্ষী, কোনো অস্ত্রই ছিল না আমার কাছে।

একখানা ছোরা পাওয়া গেছে আপনার সঙ্গে।

হেসে উঠল কার্ল......

ওটা একটা বুড়ো সৈনিকের ছুরি। আমি সেটার একটা বাঁট তৈরি করেছি। খোদাই-করা, একটু শিল্প-কর্ম।

বাঁট সম্পর্কে যা খুশি আপনার বলতে পারেন কিন্তু তার একটা ফলাও আছে। ওরকম খোদাই-করা জিনিস দিয়ে অনায়াসেই একটা লোককে সাবাড় করে দেয়া যায়।

দুহাতে মুখ ঢাকল কার্ল—পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে যে ওর কর্ম এবার শেষ। স্টলহেলমের সম্পর্কিত কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার দরুণ প্রতিশোধ নেবে এবার সাইডলিৎস।

জার্মান পুলিসের কোনো কাজের ভিতরে কখনো আমরা নাক গলাই না। কিন্তু আমার কিছু জানাশোনা লোক আছে এখানে। আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতে পারি আমি।—বলল স্মিডল।

পুলিসের বড়কর্তার ঘরে গিয়ে ঢুকল স্মিডল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল:

লোকটা লাল কার্ল নয়, বোবা কার্ল। আমার মনে হয় ওকে ছেড়ে দিতে পারেন। দু' দিন বাদে পাখি আপনা থেকেই উড়ে এসে আমাদের জালে পড়বে।

কার্লের কাছে ফিরে এসে বলল:

আপনাকে আমি যা পরামর্শ দিচ্ছি শুনুন: এখানে এসে বসবাস করুন।

কেউ আপনার কোনো অনিষ্ট করবে না। সেদিক থেকে আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে। আমরা আমেরিকানরা যখন কাউকে প্রতিশ্রুতি দেই সে সম্পূর্ণ নিরাপদ জানবেন। আপনাকে একটা বিবৃতি সহি করে দিতে হবে যে আপনি লালদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছেন। আপনি মেয়র ছিলেন, আর রুশ ডান্ডা যে কি চিজ তা নিজের গায়ে পরখ করে দেখার সুযোগ হয়েছিল আপনার।

মিথ্যে বলতে যাব কেন?—চিৎকার করে বলে উঠল কার্ল,—কেউ আমার কোনো ক্ষতি করে নি। তাছাড়া আমি পালিয়েও আসিনি ওখান থেকে।

সে সব আমার বিচার্য নয়।—কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল স্মিডল,—হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এখানে। তাছাড়া আমি একজন সাংবাদিক, সৈনিক নই। ওরা রিপোর্টে যা লিখেছে তা শুনে দুঃখ হল আমার তাই। ওরা চাইছে আপনাকে কয়েদ করতে। তাই আমি কথা বললাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু আপনার যদি জেলে যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

স্মিডল ফিরে এল হোয়াইট স্ট্যাগ রেস্তোঁরায়। মেজরের সঙ্গে বসে আর এক পাত্র টানল তারপর বলল:

আমি ফিরে চললাম আমার কার্লের কাছে। বোধহয় এতক্ষণে মিইয়ে এসেছে।

ভোর নাগাদ স্মিডলের তৈরি-করা বিবৃতিতে সহি দিল কার্ল তারপর ছাড়া পেল।

ঠান্ডা জলে স্নান করে বেশ তাজা হাসিখুশি চেহারায় বেরিয়ে পড়ল কিনেলের খোঁজে। মাথায় ভেজা তোয়ালে জড়িয়ে ক্যাপটেন পড়েছিল বিছানায়। বিদ্রূপ করে খেঁকিয়ে উঠল স্মিডল:

বোধহয় আমার চাইতে বেশি মদ খাওনি তুমি। অতটা মিইয়ে পড়ো না, ক্যাপটেন। মনে রেখ পাশেই লালগুলো রয়েছে। ভালো কথা, লালদের কথা বলতে মনে পড়ল, বার্লিন যাচ্ছি আমরা, পথে নিডারওয়াল্ডে ঢু মেরে যাব।

ধড়মড় করে উঠে বসল ক্যাপটেন। কিন্তু পরক্ষণেই গা ঘুলিয়ে ওঠায় আবার শুয়ে পড়ল।

ভিতরে ঢুকতে দেবে না ওরা। কে জানে? আমি একজন নিরীহ সাংবাদিক, সামরিক লোক তো নই। আমি চাই একবার নিডারওয়াল্ড দেখতে। কয়েকজন জার্মান অভিযোগ করেছে যে আজকাল জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে ওখানে। হয়তো তারা একটু অতিরঞ্জিতও করতে পারে। সত্যিকারের খবর দিতে চাই আমি।

আমি বলছি, কিছুতেই ওরা আপনাকে ঢুকতে দেবে না।

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল স্মিডল।

আমাকে কি কাঁচ ছেলে পেয়েছ? ওরা অবশ্য আমাদের ঢুকতে দেবে না এ কথা ঠিক। কথা বলে দেখব আমি ওদের সঙ্গে। লেখার মতো কিছু মালমশলা তো পাওয়া যাবে। তাছাড়া আজ আমার হাতে কোনো কাজ নেই। খানিকটা সময়ও তো কাটানো যাবে।

কোনো রকমের ফ্যাসাদে পড়ে যেতে পারেন হয়তো। আইন মেনে চলা

উচিত আমাদের।

একটি মাত্র আইনই আছে আমাদের যেটা আবশ্য-পালনীয়। আর মনে হচ্ছে যেটার কথা তুমি ভুলে বসে আছ। সেটা হচ্ছে: লালদের শান্তিতে থাকতে না দেয়া। একটু গা-ঝাড়া দাও ক্যাপটেন। কির্শ চাই আর একটু?

দুটো গ্লাসে মদ ঢালল স্মিডল। কঁকিয়ে উঠল কিনেল:

আমার জন্যে নয়। গন্ধে আমার পেট মুচড়ে উঠছে।

দো-ভাষী ব্রয়ারের মনে হল স্মিডলের পরিকল্পনাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। ভিসা ছাড়া কোন কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন লোক সদর রাস্তা দিয়ে নিডারওয়াল্ডে যাবার কথা কল্পনা করতে পারে? কিন্তু সে জানে যে তার কাজ হচ্ছে হুকুম তামিল করা মাত্র। নাৎসীদের অধীনে ও কাজ করত সংবাদবিভাগে। যখন ওকে তারা রুশদের উদ্দেশ্যে লেখা আজেবাজে ইস্তাহার অনুবাদ করে দিতে বলত, ও অনুবাদ করে দিত সেগুলো—হুকুম হচ্ছে, হুকুম।

স্মিডলের গাড়ি যখন অটোবান ছাড়িয়ে নিডারওয়াল্ডের পথে মোড় নিল, রুশরা ওদের কাগজপত্র দেখতে চাইল। বহুক্ষণ ধরে স্মিডল তার পকেট হাতড়াল তারপর নাকের ভিতর দিয়ে একটা খুশির আওয়াজ ছেড়ে বুস্টার্স ক্লাবের একটা সভ্য-কার্ড বের করে দিল।

মাতাল হয়ে পড়েছে,—দারুণ ভয় পেয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবল ব্রয়ার,—আগে আমার সেটা লক্ষ্য পড়ে নি কেন? কাল রাত থেকেই আর ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নি।

ভুল করেছেন আপনি। যেটা দেখানো দরকার সেটা অন্য কিছু।

আবার হেসে উঠল স্মিডল:

অন্য অনেক কিছুই আছে আমার কাছে। যেমন ধরুন প্রেস-কার্ড। আমি ট্রানজক এজেন্সির প্রতিনিধি। জানেন না আপনি? বেশ, বিশ্বাস করছি আপনার কথা। অনেক কিছুই আছে যা আপনি জানেন না। আমাকে আপনাদের কর্তার কাছে নিয়ে চলুন।

কেন এসব শুরু করলেন?—বিড়বিড় করে বলে উঠল ব্রয়ার।

তুমিও ঝিমিয়ে পড়েছ ব্রয়ার। ক্যাপটেন কিনেলের মতো তোমারও একটা ভেজা তোয়ালে মাথায় জড়াবার দরকার আছে না কি?

একটা ছোট্ট বাড়িতে নিয়ে গেল ওদের। প্রথম ঘরটায় একটি সৈনিক বসে টাইপ করছে। আর দুজনে বসে দাবা খেলছে। টেবিলের উপরের কাগজপত্রের দিকে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করল স্মিডল। সৈনিকটি কোনো কথা না বলে কাগজপত্রগুলো ড্রয়ারের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে দিল। স্মিডল একটা কনুইয়ের গুঁতো দিল ব্রয়ারের গায়ে:

দেখলে? যে সব রেজিস্টার করা গাড়ি যাচ্ছে সেগুলোর তালিকা লুকিয়ে ফেলল লোকটা আমার কাছ থেকে।

আমাদের বার্লিনে চলে যাওয়াটাই কি ভালো ছিল না? সারারাত জেগেছেন আপনি। একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার আপনার।

তুমি যে এতটা ক্ষীণজীবী তা আমার জানা ছিল না ব্রয়ার। তোমার কোনো

রসবোধ নেই। সব সময়েই মানুষ কেবল কাজ করেই যেতো পারে না। খানিকটা অবসরবিনোদনের দরকার হয়। বরং কর্তাটির নামটা কি তা জেনে নেয়া দরকার।

ও ঘরে যান আপনি দয়া করে,—পাশের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে অবশেষে বলল সৈনিকটি।

স্মিডল দেখল একজন রুশ মেজর, মধ্যবয়সী, গম্ভীর রুক্ষ মুখ। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে স্মিডলকে খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে রুশ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন:

কি চাই আপনাদের ?

আমাদের গাড়িটা একটু খারাপ হয়ে পড়েছে। কার্বোরেটারে কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। এই সুযোগে আমি নিডারওয়ালডে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে নিতে চাইছিলাম। কিন্তু আপনার লোকেরা আমাকে এনে হাজির করেছে এখানে। আমি একজন সাংবাদিক। রুশদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই আমরা। অবশ্য তার প্রাথমিক শর্ত হল সংবাদ সরবরাহের অবাধ লেনদেন।

রুশ ভদ্রলোকটির মুখের উপর দিয়ে হালকা একটু হাসির আভা খেলে গেল:

আমি জানতাম না মেজর যে আপনিও আবার সাংবাদিক। কিন্তু যদি তাই-ই হয়ে থাকেন তবে আইনকানুন জানা উচিত ছিল আপনার। কন্ট্রোল কমিশনের ভিসা নেই যখন আপনার কাছে, আপনাকে সোজা বার্লিনের পথই ধরতে হবে। আপনার সোফারকে গাড়ি মেরামত করতে সাহায্য করার জন্যে আমি লোক পাঠাচ্ছি। আর যদি আপনি শ্রান্ত হয়ে পড়েই থাকেন তবে ওরা আপনাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে, গাড়ি মেরামত হওয়া পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম করতে পারেন।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন ভদ্রলোক। আগের ভাগেই বেরিয়ে এল ব্রয়ার। ব্যাপারটা এমন ভালোভাবে চুকে যেতে ও খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্মিডল। মুখটা দেখতে বিশ্রী, যেমন কঠিন তেমনি রুক্ষ—ভাবল স্মিডল মনে মনে চুলগুলো পর্যন্ত রুক্ষ কর্কশ। মাথাটা সাদা। হয়তো লোকটা একটু নরম। কিন্তু না আমরণ ওরা গোঁড়াই থেকে যাবে। বেরিয়ে যেতে যেতে বলল স্মিডল:

গাড়িটার জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিতে পারব। কিন্তু কে বলেছে আপনাকে যে আমি সেনাবাহিনীতে মেজর ছিলাম ?

রুশ ভদ্রলোকটি কোনো জবাব দিল না।

গাড়িতে উঠেই স্মিডল ঘুমিয়ে পড়ল। এতক্ষণে অন্তত বার্লিনের পথে চলেছে বলে মনের আনন্দে ঝিমোতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল স্মিডল। নাকের ডগাটা ঘষল তারপর উচ্চ হাসির ধমকে ফেটে পড়ল:

আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি লাল কার্ল তার জিনিসপত্র আর অস্থাবর

সম্পত্তি খুইয়ে বুক ফেটে মরে যাচ্ছে। এ-ই ওঠ ব্রয়ার। যদি ঘুমিয়ে থাক তবে বড়ো একটা সৌভাগ্য হারিয়ে বসতে পার—অন্তত এক চুমুক কিশ্চ্ তো বটেই।

পিছনের পকেট থেকে ফ্লাস্কটা টেনে বের করল স্মিডল। তারপর খানিকটা খেয়ে ব্রয়ারের হাতে দিল।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে তুরিনগিয়ান মন্ত্রীর সঙ্গে নিডারওয়ালডের ভূতপূর্ব মেয়রের তুলনা হয় না। কিন্তু শুধু যে রুইকাতলা ধরবে তাও আশা করতে পার না। চুনোপুঁটিও মাছ বটে। রুশ মেজরটা একটা খুনে। আমার আগামী প্রবন্ধে ওর সম্পর্কে লিখছি আমি। ওর নামটা টুকে নিয়েছ তো?

মনে রাখা খুবই সহজ। ছোট্ট নাম: মেজর আলপার।

চুয়ান্ন

যদিও আলপারের অনাতিথেয়তার বিরুদ্ধে প্রচুর নিন্দাবাদ করল স্মিডল, তবুও তার বন্ধুবান্ধব ও অধস্তন কর্মচারীদের কাছে সে একটা দারুণ বুদ্ধিমান লোক বলেই গণ্য হয়ে উঠল। সীমান্তবর্তী সোবিয়েত ফৌজী-ঘাঁটির ক্ষুদ্র সেনা-বাহিনীর জীবন যে খুব সুসহ ছিল, তা নয়। যখন-তখন ক্যাপটেন কিনেলের ও বন-পুলিসের লোকেরা সীমান্তে নানারকমের প্ররোচনামূলক ঘটনার সৃষ্টি করত। একমাস আগেও আমেরিকানরা বন-অঞ্চলে গুলি চালিয়ে দুজন জার্মানকে হত্যা করে। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে ছুটে ঘটনাস্থলে পেঁছান মেজর আলপার। আর শুধু তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যেই ঘটনাটা একটা খণ্ড-যুদ্ধে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

সোবিয়েত সৈনিকেরা পরিবার-পরিজনহারা বাড়ির জন্যে উন্মুখ। অনেকে ছুটিতে যায় নি বহুদিন। কেমন করে ওদের মিষ্টি কথায় খুশী রাখতে হয় তা জানেন ওসিপ আলপার। চুলগুলো সব পেকে গেছে। চোখের দৃষ্টি ছিল কঠিন; অভিজ্ঞতা ও সহিষ্ণুতার এক নতুন ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে সেই দৃষ্টির মধ্যে। শুধু যখন সেই সব লোকের কথা ভাবেন যারা আবার নতুন একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে তখন তাঁর দৃষ্টি হয়ে ওঠে কঠোর আর অনমনীয়।

ওসিপের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। বহুদিন আগে ঠাট্টা করে বলত রায়া যে এক বছর আগেও যদি কোনো দোকানী মেয়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট কিনে থাকে তবুও তাকে ঠিক চিনতে পারে ওসিপ। ঐ ফিটফাট চেহারার সাংবাদিকটিকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন সেই মেজরকে, জার্মান বন্দীনিবাস থেকে সোবিয়েত সৈন্যদের মুক্ত-করা লোকদের স্বদেশে পাঠাবার সময়ে যে এসেছিল ওঁর কাছে। সে ঘটনা ঘটেছিল পাঁচ বছর আগে, বিজয়োৎসবের দিনে। স্মিডলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার পরে বিকভকে বললেন ওসিপ:

একে বেহায়া তার উপরে মাতাল। কেন ঢুকতে দিলে ওকে এখানে? মাতালের আড্ডাখানা নয় এটা।

ভুলে যাননি ওসিপ কি কথা বলছিল স্মিডল নিগ্রোদের সম্পর্কে। এমন কি সে-সব দিনেও আমেরিকানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করত। আর ঘৃণা করত রুশদের। মিনাইয়েভ তার একটা চিঠিতে লিখেছিল যে, যে-বদমায়েশটা ওর কোটের ভিতরে কাগজটা সেলাই করে দিয়েছিল সে নাকি বলেছে যে ওসিপের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। সে কি তবে এই স্মিডল? সত্যিই কি ওরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে, জীবনকে পঙ্গু করে দিতে সমর্থ হবে?

সেদিন লেপ্‌টেন্যাণ্ট দরোখফ তার মেয়ের ফটো দেখিয়েছিল ওকে। সুন্দর মেয়েটি। সব বিষয়ে সবার চাইতে বেশি নম্বর পেয়ে উঠেছে পঞ্চম শ্রেণীতে। আলেংকাও হয়তো এতদিনে পঞ্চম শ্রেণীতেই উঠত, কিংবা ষষ্ঠ শ্রেণীতে। স্মিডলের মতো গুণ্ডারা চায় দরোখফের মেয়েকে খুন করতে। এখনও ভদ্র

আমেরিকানদের চৈতন্য হওয়া উচিত। অবশ্য যদি ওদের আক্রমণ করার দুঃসাহস হয়ই, তবে উচিত শিক্ষা ওরা পাবে—এ কথা ঠিক, তা জলেই হোক আর ডাঙগায়ই হোক। ওর লোকদের দিকে তাকালেই সেটা ভালো করে বোঝা যায়—সতর্ক, শিক্ষার দিক থেকে একান্ত যত্নবান, প্রত্যেকটি লোকই ঐ বিপদ সম্পর্কে সচেতন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ধরা দেবে না ওরা। কিন্তু যুদ্ধটাই একটা ভয়ংকর বিপর্যয়। এ চিন্তাই কোনো লোকের মনে আসতে পারে না যে আবার যুদ্ধ শুরু হতে পারে। ভাবতেই পারে না যে একদল পাগল আবার ওদের এত পরিশ্রমে গড়ে তোলা শহর, কারখানা প্রভৃতি ধ্বংস করে দিতে পারে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিতে পারে সমস্ত দেশটাকে, পারে লক্ষ লক্ষ চমৎকার মানুষকে হত্যা করতে। দরোখফকেই ধরা যাক না কেন। এখন চমৎকার করে ও তার জন্মভূমি কাশিনের বর্ণনা করল ঠিক যেন একটা উপন্যাস। কোনো লেখকই এর চাইতে ভালো বর্ণনা করতে পারে না। আর ভেবে দেখ, কোনো স্মিডল এসে ওকে হত্যা করল! ওর মুখটা কি বীভৎস, ঐ লোকটার। যে কোনো লোকেরই মনে হবে যে সারা জীবনের মধ্যে একটা দিনের জন্যেও অন্যের ক্ষতি করা ছাড়া কোনো একটা ভালো কাজ করেনি।

বসন্তকালে ছুটি পেল ওসিপ। দিশেহারা হয়ে পড়ল। জানে না কার কাছে যাবে। কেউ নেই ওর সংসারে।......যারা ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে, ট্রেনের ভিতরে তারা হাসিঠাট্টা করছে, হাসছে, বাড়ির কথা গল্প করছে। প্রত্যেকেই অধৈর্য হয়ে উঠেছে কতক্ষণে তারা গিয়ে স্ত্রী, বাপ-মা বা প্রেমিকার সঙ্গে মিলতে পারবে। তরুণ এক লেপটেন্যাণ্ট ঘুমের ভিতরে বিড়বিড় বকে চলেছে: 'মাশা! আঃ মাশা!' ব্রেস্টলিটভস্কে এসে যখন পৌঁছাল মানসিক প্রশান্তি ফিরে এল ওসিপের—লোকজন কথা বলছে রুশভাষায়, সব কিছুই চেনা, জানা—ঐ তরুণী মেয়েটির মুখ, ঐ স্লোগান, ঐ চড়ুই পাখিটা, রেল স্টেশনের ঐ খাবারের দোকানের বারকোশ। নিজেকেই নিজে ভর্ৎসনা করল ওসিপ: কেমন করে এ কথা ভেবেছিল যে কার কাছে যাবে সে?—যাবে তার নিজের লোকদের কাছে নিশ্চয়ই।

ওসিপ গেল কিয়েভে, খুঁজে বের করল তার আগের সহকর্মীদের

ঐ মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ একবার,—বলল ইয়াশচেংকো। যুদ্ধের আগের দিনের তৈরি মূর্তিগুলোর কথা মনে পড়লে হাসি পায়। মানেরই এত পার্থক্য হয়েছে এখন।

পরম আগ্রহের সঙ্গে শোনে ওসিপ। যেন ওগুলো ওর নিজেরই ব্যাপার। ইগনাতুক মারা গেছে শুনে ওর দুঃখ হল। চমৎকার কারিগর ছিল সে! খুশী হয়ে উঠল কোরোৎকভের পদোন্নতি হয়েছে শুনে। কলেজিয়ামের সভ্য, চারটি-খানি কথা নয়। তাছাড়া ঠিক উপযুক্তই হয়েছে। ওর উদ্যমশীলতার তুলনা নেই।

আর পাঁচজনার মতো করে বাঁচার এক অতুৎগ্র কামনা অনুভব করে মনে মনে। অতীতের স্মৃতির ভিতরে নিজেকে তাই রাখে ডুবিয়ে। স্যুটকেস থেকে একটা পুরনো স্যুট বের করল—একটু আঁটোসাঁটো, কিন্তু কাজ চলার মতো..............

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ও ঘুরে বেড়ায় কিয়েভময়। আনন্দের সঙ্গে মিশে যায় ওর ভাঙাচোরা জীবনের ব্যথাবেদনা। আবার গড়ে উঠছে ওর নিজের শহর, ফিরে আসছে জীবন, চলেছে এগিয়ে বৃদ্ধির পথে। এই শহরেই ও শেষবার ঘুরে বেড়িয়েছে রায়াকে পাশে নিয়ে। একটু প্রণয়-কলহ হয়েছিল সে-দিন দুজনার মধ্যে। হঠাৎ রায়া বলে উঠেছিল:

তার চেয়ে বরং এখান থেকে দেখ কী চমৎকার দৃশ্য।

কী চমৎকার রাস্তা তৈরি করেছে! আর ঐ মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চটাই কী সুন্দর! কিন্তু কী মর্মান্তিক যে রায়ার চোখে তা পড়ল না। চিরদিন ও নিপারকেই ভালোবাসে সবচাইতে বেশি। অনেক অনেক কচি কচি ছেলেমেয়ে খেলা করছে বাগানে। শিশুর মেলা আর পাখির কলকূজনভরা এই পার্ক আর এই বাগানটা চিরদিনই কিয়েভের গর্ব—এখানে এই ধুলোবালির উপরে খেলা করত আলেংকা। ক্রেশচাতিক-এর পথের আলোগুলো কী সুন্দর। পাকা রাস্তাগুলো চওড়া। তাছাড়া পথের পাশে ওরা পুতেছে বাদাম গাছ, কী ভালোই না হয়েছে। ওগুলো ছাড়া ঠিক আগের মতো হত না কিছুতেই। যদিও দোকান নেই, নেই কোনো বাড়িঘর, তবুও লোকজন ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। কী অদ্ভুতভাবেই না কিয়েভ-বাসীরা ভালোবাসে ক্রেশচাতিককে। ওর মনে পড়ে মা বলতেন:

ক্রেশচাতিক-এ যাচ্ছি আমি,—যেন তিনি যাচ্ছেন কোনো উৎসবে। হিটলারের চেলাচামুণ্ডারা চেয়েছিল সব কিছুই ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু বেঁচে আছে কিয়েভ, গড়ে উঠছে আরো সুন্দর হয়ে। সোবিয়েত জনগণ সত্যিই শক্তিশালী। যেখানে অন্য কেউ হলে ছেড়ে দেয় সেখানে তারা শুরু করে নতুন করে গড়তে। প্রতিদিন কাগজে কাগজে খবর বেরোচ্ছে, আমেরিকানরা প্রস্তুতি চালিয়েছে—গড়ছে ঘাঁটি, বোমা। এক কথায় নিদারুণ ত্রাস। কিন্তু এখানে লোক শান্ত। ওরা কাজ করে তারপর সন্ধ্যায় ক্রেশচাতিক-এ বেড়িয়ে বেড়ায়, হাসে। ওদের আস্থা আছে স্তালিনের উপরে, জনগণের উপরে। এটা চোখে পড়ে না আমেরিকানদের। কিংবা হয়তো দেখতেই চায় না। তবুও ওদের একটা দূতা-বাস আছে এখানে। ওরা ঘুরে বেড়ায়, চোখ মেলে দেখে। একটা রাস্তা ধরে খানিকটা হাঁটলে, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বললেই জানতে পারবে যে ওদের থাবা গোটানো উচিত। কিন্তু তবুও যদি ওরা কোনো কিছুর চেষ্টা করে তবে তাদের উপযুক্ত স্থানেই দাঁড় করিয়ে দেয়া যাবে। ওর আশা ক্রেশচাতিক শিগগিরই পুনর্গঠনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কী চমৎকারই না হবে রাস্তাটা!

এক মেঘাচ্ছন্ন বাদলা দিনে ও গেল বেবিয়াইয়ার-এ। প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল যেখানে ওর মা আর আল্যাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গাটা আর একবার দেখে আসে। সীমাহীন লুকিয়ানোভকার বুক বেয়ে চলতে চলতে ভাবতে লাগল বৃদ্ধা হান্না আর ছোট্ট আল্যা চলেছিল এই পথ ধরেই—আল্যা ছিল এত ছোট যে বুঝতেই পারেনি কোথায় সে চলেছে।

বেবিয়াইয়ার-এর সাদা বালুর উপরে বহুক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ওর মায়ের কথা, মেয়ের কথা আর রায়ার কথা। এই ভাবনা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় দূর অতীতে আর ওকে উদ্দীপিত করে তোলে। অন্তরে অন্তরে

অনুভব করে রায়ার বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গের কথা।

যেদিন সুখী ছিল অনুভব করতে পারত না সুখ কি বস্তু। মামুলিভাবেই ধরে নিয়েছিল যে ওর আছে প্রেমময়ী স্ত্রী আর একটি কন্যা। রায়াকে হারাবার পরেই ও অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে পারল ওর ভালোবাসার শক্তির কথা। ক্যাপটেন চুমাকভ-এর স্ত্রী মারা যায় উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে যে শহরে গিয়েছিল স্থান ত্যাগ করে সেখানে। এক বছর আগে একটু ইতস্তত করে সসংকোচে বলেছিল ওসিপকে:

আমি ভাবছি বিয়ে করব।

খুবই খুশী হয়ে উঠেছিল ওসিপ। বলেছিল, খুবই ভালো কথা। একা একা থাকা ভারি শক্ত। এতদিনে চুমাকভের ঘর হয়েছে, ছেলেপুলে হয়েছে। কিন্তু ওসিপ নিজে আবার নতুন করে সংসার গড়বার কথা ভাবতে পারে না। ওর ইউনিফর্মের পকেটে পকেটে ঘোরে রায়ার ফটো। ফটোটা পাঠাবার সময়ে লিখেছিল রায়া:

ভেবো না আমি দেখতে ঐ ফটোটার মতোই। ওটা হচ্ছে ফটোগ্রাফারের কারচুপি। তোমার কাছে আমি চিরদিন সেই একই রকমের আছি যেমন ছিলাম কিয়েভে।

ফটোখানার দিকে তাকাল ওসিপ। রায়ার চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। দীর্ঘপক্ষ্ম পল্লবদুটি যেন কেঁপে উঠল। যেন সে ফিসফিস করে বলে উঠল:

কিচ্ছু বোঝ না তুমি, বোকা।

সত্যি ভালোবাসা যে কি তা সত্যি বুঝত না ও। কিন্তু এখন আর কিছুই করবার নেই ওর। আর কোনো রায়া আসবে না ওর জীবনে। কিন্তু ওর আছে বন্ধুবান্ধব, আছে কমরেড, আছে বিরাট দায়িত্ব আর আছে এক মহান দেশ। তাছাড়া রায়া রয়েছে ওর সঙ্গে। কোনোদিনও সে ওকে ছেড়ে যাবে না।

সন্ধ্যের দিকে কেমন যেন মনটা খারাপ লাগতে লাগল। ইচ্ছে হল কারুর সঙ্গে কথা বলে। মনে পড়ল ইয়াশচেভেংকোকে কথা দিয়েছে যাবে তার ওখানে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, না, আজ নয়। গেলে পরেই ইয়াশেংকা শুরু করে দেবে উৎপাদনের আলোচনা। কিন্তু ও চায় শুনতে তার অন্তরের অন্তরতম কথা। ভরোবিয়েভকে দেখে আসবে একবার। সে বারবার করে অনুরোধ করেছে ওকে যেতে। আর যাই হোক, তিন-তিনটে বছর দুজনে লড়েছে এক সঙ্গে। দুজনার স্মৃতিই এক।

ভরোবিয়েভের কথা যখনই মনে হয়, নিজের অজ্ঞাতেই ওসিপ বলে ফেলে "লেপ্‌টেন্যান্ট"। কিন্তু বহুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে ভরোবিয়েভ সেনা-বাহিনী থেকে আর কাজ করছে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়। রাস্তাটা আর বাড়িটার কথা মনে আছে ওসিপের, কিন্তু ফ্লাটের নম্বর কত তা কিছুতেই মনে করতে পারল না। বাড়ির দরজায় বড় বড় লম্বা মোচওয়ালা একটি বেঁটে লোক দাঁড়িয়ে।

বলতে পারেন কোন ফ্লাটে ভরোবিয়েভ—আলেকজান্দার আন্দ্রিয়েভিচ—থাকেন ?

—ওসিপ জিজ্ঞেস করল লোকটিকে।

ডান দিকের দ্বিতীয় দরজায়,—থুতু ফেলে গোফওয়ালা লোকটি বিশ্রী মুখ করে জবাব দিল,—সিগারেট আছে কি আপনার কাছে একটা?

পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে আনল ওসিপ—প্যাকেটটা খালি।

দুঃখিত, একটাও নেই।

অন্যের জন্যে কখনো কিছুই থাকে না আপনার। প্যালেস্টাইনে চলে যান না কেন? এখন তো আপনাদের নিজেদের রাষ্ট্র হয়েছে।

হঠাৎ কথাটার মানে বুঝে উঠতে পারল না ওসিপ, জিজ্ঞেস করল:

কি বললেন? তবে রে বদমায়েশ!......কিন্তু গোঁফওয়ালা লোকটা ততক্ষণে হাওয়া।

যখন ওসিপ এল, ভরোবিয়েভ তখন মেয়েকে আঁক কষতে শেখাচ্ছিল। দুজনে দুজনকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল তারপর অতীতের স্মৃতির ভিতরে ডুবে গেল। মেয়েটি অতিথির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর চিন্তিত মুখে বলল:

আমি নিজে নিজে করতে পারছি না বাবা।

এখন আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারব না। দেখছ না কে এসেছে? এমন অতিথি তো আর রোজ রোজ আসে না।

ওসিপ হাসল:

দেখি আমি একটু চেষ্টা করে মাশেংকা।—ভ্রূ কোঁচকাল ওসিপ:

শক্ত......পঞ্চম শ্রেণী? ও হো, গণিতবিশারদ......হয়েছে! ষোলোকে তিন দিয়ে গুণ কর, হ্যাঁ তিনঘণ্টা, তারপর ভাগ কর চার দিয়ে—চারটা জলের ট্যাংক আছে। বারো কলসি......তাহলেই তুমি পেয়ে যাচ্ছ।

চমৎকার বাচ্চাটি, ভাবল ওসিপ। আলেংকাও এতদিনে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ত। ভরোবিয়েভের কাছে আসার বুদ্ধি করে কী ভালোই না হয়েছে। দেখলেই মনে হয় ওর জীবন কি সুখী, সংগঠিত—চমৎকার একটি বউ, মাশেংকা, জানালায় ফুলের বাহার আর মনোমতো একটি কাজ—

ভরোবিয়েভের স্ত্রী হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল চেহারা, চঞ্চল। রাতের খাবার তৈরি করতে করতে বলছিল:

আপনি আসবেন আগে যদি জানতাম তবে কিছু পিঠে তৈরি করে রাখতাম।

ওর কথায় কিয়েভের কোমল টান। ওসিপের মুখে তৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসিটি লেগেই রয়েছে। খেতে খেতে দরাজ গলায় হেসে উঠল ভরোবিয়েভ:

না, একশো গ্রাম* চালাতে হবে আমাদের। তারপরে আর একশো—কারণ আমাদের আবার দেখা হয়েছে। এটুকু তেমন কিছু বেশি নয়......কান্তরনায়ার কথা মনে আছে তোমার, সেই আমি যখন শীতে জমে গিয়েছিলাম তুমি পুরো একটা গ্লাশ দিয়েছিল আমাকে?

ওরা গল্প করতে লাগল বিগত যুদ্ধের দিনের কথা। স্তালিনগ্রাদের পাহাড়, মিনাইয়েভ, জুরাবিন, শাপোভালভ, লিনা, যারা বেঁচে আছে আর মরে গেছে,

* সেনাবাহিনীর ভদকার বরাদ্দ।

এল্‌ব-এর সেই দীর্ঘ পথ, সেদিনের সেই আনন্দ, ব্যর্থতা, উত্তেজনা, আশা। শুনতে শুনতে ভরোবিয়েভের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল। গোটা যুদ্ধের কালটা চেলিয়াবিনস্ক-এর একটা কারখানায় কাজ করেছে সে আর কাটিয়েছে দিন স্বামীর সংক্ষিপ্ত চিঠি নিয়ে। এখন এই মুহূর্তে ওসিপের মুখে গল্প শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গেল নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে: ঐ সব দুর্ভোগ দুর্বিপাকের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছে ভরোবিয়েভ কিন্তু তবুও এসেছে ফিরে।

শুতে গেল মাশেংকা। ভরোবিয়েভ বলতে শুরু করল নিজের কথা তার কারখানার কথা: নতুন একটা শপ, আর নতুন কী চমৎকার একটা মেশিন! খুশী হয়ে উঠল ওসিপ। খুশী হয়ে উঠল তার বন্ধুর জীবন এমন সুন্দরভাবে কাটছে বলে, খুশী হয়ে উঠল পঞ্চম শ্রেণীতে এমন শক্ত অংক করায় বলে। অন্যের সুখ দেখে ওর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। ও হাসল, হাসিঠাট্টা করল আর যে জানে না ওর জীবনের কথা, এই মুহূর্তে ওকে দেখলে বলত লোকটা কি সুখী।

ওসিপও বলল সামরিক নির্দেশের কথা, জার্মানির জীবনযাত্রার কথা, আর আমেরিকানদের কথা।

মিনাইয়েভের ব্যাপারটা কাগজে পড়ে আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম।—বলল ভরোভিয়েভ,—কল্পনা করাও শক্ত—প্রকাশ্যে দিনের বেলায় কি না করল সব ....গুন্ডার দল!

মুচকি হাসল ওসিপ:

এতদিনে ওদের আমি চিনেছি। মিলিটারি পুলিসের ছোট্ট একটা ব্যাটেলিয়ান আছে আমাদের কাছাকাছি। খাঁটি গুন্ডা ওগুলো—ঠিক নামই দিয়েছ তুমি। প্রত্যেক দিন কিছু না-কিছু একটা নোংরা শয়তানি করবেই করবে।

তোমার কি মনে হয় সত্যি সত্যিই ওরা যুদ্ধ করতে চায়?

চায় ঠিকই, কিন্তু সাহস করছে না। জার্মানদের দেখেই বুঝতে পারছি দুনিয়ার সবকিছুই কেমন বদলে গেছে। লোকে হয়তো ভাববে যে হিটলার ওদের মনকে যতখানি বিকৃত করে দিয়েছে এমন বুঝি আর হয় না। কিন্তু নিডারওয়ালডের দিকে তাকিয়ে দেখ। ছোট্ট একটা শহর, নেই কোনো শিল্প কারখানা, দোকান-পসার, সরকারী কর্মচারী, কারিগর। কিন্তু ওখানকার মানুষের মতো মানুষ কোথাও তুমি আশা করতে পার না। কিন্তু তরুণরা কি চমৎকার হয়েই না গড়ে উঠছে। তারা চায় কাজ করতে, চায় জার্মানির গৌরব ফিরিয়ে আনতে, চায় নতুনভাবে নতুন জীবন গড়ে তুলতে। অবশ্য, পুরনো যুগের লোকদের মগজের ভিতরে এখনো প্রচুর নোংরামো রয়ে গেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমেরিকান রেডিও লেগেই আছে ওদের পেছনে কিন্তু ওরা হাসে আর বলে:

আমাদের ভাগের লড়াই আমরা লড়েছি ঢের, এখন আমেরিকানদের যদি অত গরজ থাকে লড়ুক তারা নিজেরাই।

ভাবতে পার কি দারুণ পরিবর্তন—আর কি না মাত্র পাঁচ বছরের ভিতরে।

তাছাড়া অন্যান্য দেশের তো কথাই নেই। গত শরৎকালে ফ্রান্স থেকে একজন জার্মান ফিরে এল নিডারওয়ালডে। প্রথমে ও ছিল বন্দী, তারপর ওখানেই থেকে গেল। নেহাত সাধারণ লোক, একজন ছুতোর মিস্ত্রি। সে বলল, ফ্রান্স আর আমেরিকানদের সহ্য করতে পারছে না। এতদূর পর্যন্ত হয়ে উঠেছে। ভাবি আমেরিকানদের হুঁস হবে, গুন্ডা বদমায়েশদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর যা-ই হোক গুণী লোক ওরা, মগজ আছে—তা যদি না থাকত—

না থাকলে আমরাই সেটা ঢুকিয়ে দেব! আমাদের সঙ্গে লাগতে এসেছিল বলে জার্মানরা নিশ্চয়ই অনুতপ্ত। সোজাসুজি বলে দেয়া উচিত আমেরিকানদের: ওসব বোমাটোম্মার কথা বন্ধ কর! আমাদের এখানকার সমস্ত মেহনতী মানুষের এই কথা। যেমন খুশী তোমাদের তেমন থাক, কিন্তু আমাদের পিছনে লাগতে এস না। এ কথাটা বুঝতে পারবে না, ওরা কি এত মূর্খ? কেউ ওদের আঘাত করতে চায় না, কিন্তু যদি ওরা কিছু শুরু করেই তবে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না আমাদের—স্থলপথে, জলপথে, আকাশ পথে আমরা গিয়ে হাজির হব।

সেটাই তো হয়েছে বিপদ। ওরা কিছুতেই এ চিন্তা ছাড়বে না, তাছাড়া বেশ কিছু গুন্ডা বদমায়েস আছে ওদের দেশে। ওদের অফিসাররা প্রায়ই আসে আমার কাছে। একবার একজন সাংবাদিকও এসেছিল। কর্নেল সার্দ্কভের কাছে শুনেছিলাম যে, পরে সে নাকি একটা প্রবন্ধও লিখেছিল। আমার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছে আমাকে "নর-ঘাতক" বলে, আর লিখেছে সোবিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা আমেরিকানদের উপস্থিতির জন্যে নাকি পাগল হয়ে উঠেছে। ঠিক হিটলারের মতো। সে-ও আশা করেছিল সোবিয়েতবাসীরা তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাবে।

হঠাৎ দোরের পথে দেখা লোকটির কথা মনে পড়ে একটু ক্লিষ্ট হাসি ফুটে উঠল ওসিপের মুখে:

তোমাদের বাড়িতে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার—জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমার ঘর কোথায়। কিন্তু আমি চলতে শুরু করতেই পেছন থেকে সে চেঁচিয়ে বলেছিল আমাকে প্যালেস্টাইনে চলে যেতে। তার মানে কি বুঝেছ?

পাজি কোথাকার! বোধহয় কোপালেংকো। বেঁটে লোকটা, বড় বড় গোঁফ?

মাথা নাড়ল ওসিপ। তখনো সে তার নিজের চিন্তার সূত্র ধরেই ভেবে চলেছে:

না, কিন্তু ভেবে দেখ কাকে সে কি কথা বলল। আমি রয়েছি সীমান্তে, পাশেই রয়েছে আমেরিকানরা। আর ও আমাকে বলল কিনা আমেরিকান উপনিবেশে চলে যেতে।

ও নিয়ে মনখারাপ ক'রো না। আমি তো বলছি তোমাকে লোকটা আস্ত বদমায়েস। বাড়ির সবলোক জানে ওকে। ও এখানেই ছিল জার্মানদের তাঁবেদার হয়ে। একটা পুরনো জিনিসের দোকান খুলেছিল। ও যে কি চিজ তা এ-থেকেই বোঝা যায়। পয়সা পেলে যে-কারোর সঙ্গেই ও ভিড়ে পড়তে পারে। কিন্তু ওর মতো কটা লোক আছে? মাত্র কয়েক শো। সমগ্র জনশক্তির

কাছে সে কতটুকু। সমুদ্রের কাছে এক ফোঁটা। মনে আছে তোমার পাকুল-এর কাছে যে মেয়রটা ধরা পড়েছিল, কোপলেংকোও ঠিক তারই মতো।

দারুণ কষ্ট হল ভরোবিয়েভের স্ত্রীর মনে। জানে ওর স্বামী মেজরের অন্তরঙ্গ, জানে ওসিপ তার স্ত্রী-কন্যা-পরিবার হারিয়েছে যুদ্ধের সময়ে, আর আজ কি না ঐ কোপালেংকোর এত বড়ো দুঃসাহস ওকে অপমান করে! তাও আবার যখন সে এসেছে ওদের সঙ্গে দেখা করতে তখন! এক কাপ চা ঢেলে বাড়িয়ে দিল ওসিপের সামনে।

খান—ওটা একটা বদ লোক। আমাদের সম্পর্কেও যা-তা কথা বলে—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যি কতখানি যে আনন্দ হয়েছে আমার, ওসিপ নৌমোভিচ, তা আপনি ধারণাও করতে পারবেন না। সাশার মুখে আমি আপনার সব কিছুই শুনেছি। যদি আপনি কিছু মনে না করেন তো আমার ইচ্ছে আপনি যদি এসে আমাদের সঙ্গে থাকেন তবে ভারি খুশী হব। ঘর অবশ্য বেশি নেই তবুও মাশেংকা আমাদের কাছেই না হয় শোবে। ঘরটা ছোট্ট তাছাড়া আপনাকে দেখা-শোনা করার মতো কেউ একজন থাকল।

আপনাদের ছোট্ট মেয়েটি ভারি চমৎকার। দেখুন আপনাদের কাছে এসে কি শান্তিই না পেলাম। দারুণ উপকার হল আমার। আপনার নিমন্ত্রণের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে, নাস্তাসিয়া আইভানোনা। কিন্তু আমার আসা হবে না—আত্মীয়-স্বজন রয়েছে—এক কাকা তাছাড়া ভাগ্নীরা। তোমরাও কিয়েভ-এরই বাসিন্দে তাই না সাশকো?

না, আমার জন্মস্থান বাখমাচ, কিন্তু বিশ বছর আছি কিয়েভ-এ।

আমি জন্মেছি এখানে, এই কিয়েভ-এ। পোদোল জেলায়। এখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আমার মেয়ের জন্মও হয়েছিল এখানে। আর এখানেই ওরা আমার মাকে আর আল্যাকে মেরে ফেলে—আমার সমগ্র জীবন কিয়েভ-এর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। সবে শত্রুকবলমুক্ত সেই ভয়ংকর দিনে দেখেছি আমি কিয়েভকে। আমি যে কতখানি সুখী আজ তা কল্পনাও করতে পারবে না! রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে যেন নিজের চোখ দুটোকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি না। কত কী-ই না করা হয়েছে মাত্র এই পাঁচ বছরের ভিতরে! নতুন মানুষ হয়ে ফিরে যাব আমি আমার কর্মস্থানে। নিজের জন্মভূমিতে ফিরে-আসা মানুষের কাছে মস্ত বড়ো জিনিস।

রাত দুটোয় ওসিপ বিদায় নিল ভরোবিয়েভদের ওখান থেকে। গিয়ে উঠল একটা হোটেলে। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ওর কোথাও—শুধু পাছে ওদের অসুবিধেয় ফেলতে হয় তাই এড়িয়ে গেল।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে হেঁটে চলেছে ওসিপ। আবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল বেব্যিইয়ার-এর বিস্তীর্ণ বালুকারাশি, গোলাপী রঙের যে উটটা ওর ভাই এনেছিল পারী থেকে, আলেংকার জন্যে, নাস্তাসিয়া আইভানোভনার হৃদ্যতাভরা মৃদু হাসি। হঠাৎ ও চমকে উঠল:

এই সেই পথের মোড় যেখান থেকে ও বিদায় নিয়েছিল রায়ার কাছ থেকে। সেটাও ছিল মে মাস। আর ভেবেছিল ওসিপ যে ওদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে শুধু

মাসখানেকের জন্যে। প্রিয়তম রায়া আমার!—দু'চোখের কম্পিত আঁখিপল্লব নিয়ে হঠাৎ ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল রায়ার মূর্তি। যেন ওর কানে কানে ফিস-ফিস করে বলে উঠল:

কিচ্ছু বুঝবে না তুমি কোনোদিন।

সব কিছুই বোঝে সে এখন: ভালোবাসা, মাতৃভূমি, জীবন—দুটো নির্জন পথের চৌমাথার উপরে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ওসিপ। মাথার উপরে বিস্তৃত বাদাম গাছের ডালে ডালে আকাশ-প্রদীপের মতো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল। এক সুমহান মানব-প্রেমে ওসিপের মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল।

ছুটি থেকে ফিরে এসে ওসিপ অন্যদের কাছে বলল তার ধারণার কথা:

দেশটা দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। যেমন ধর, উৎপাদনের অংকগুলো, ঠিক যেন কবিতা—। পুনর্গঠিত হচ্ছে কিয়েভ। ইতিমধ্যেই অনেকটা হয়ে গেছে। তাছাড়া ক্রেশচাতিকের পরিকল্পনাটা দেখে এসেছি—যেন একটা ছবি। সর্বত্রই লোকের ভিড়। পথ চলা ভার। যা কিছু চাই সবই পাবে দোকানে। লোকে বলে দাম আরো কমে যাচ্ছে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো অঢেল! বাচ্চাগুলোর দিকে আমি তাকিয়ে থাকতাম—না, এ দেশ কেউ-ই জয় করতে পারবে না।

ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কার্ল চলে এল নিডারওয়ালডে। সবচাইতে বিশ্রী দিনও কেটে গেছে ওর জীবনে। সেদিন পর্যন্ত ওর ধারণা ছিল যুদ্ধের চাইতে ভয়ংকর বীভৎস আর কিছুই নেই। তিউনিসে কেটেছে খুবই খারাপভাবে, সব চাইতে দুর্ভোগের দিন গেছে মিনস্ক-এ। কিন্তু তখন ও পালিয়ে যায়নি। কিন্তু কেমন করে ও সই করল ঐ কাগজটায়? কেউ ওর গায়ে হাত পর্যন্ত দেয়নি, শুধু ওকে ভয় দেখাল আর অমনি কিনা ভীরু কাপুরুষের মতো আচরণ করে বসল। ঐ সাংবাদিকটা নিশ্চয়ই একটা দুঁদে বজ্জাত। লোকটার চোখ দুটো শয়তানিভরা। এই মুহূর্তে মনভুলানি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, পরক্ষণেই আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। মদের পিপের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল লোকটা গা থেকে। ওর রাজি হওয়া উচিত হয়নি। আনা বলেছিল ও যেখানে নিয়ে যেতে চায় সেখানে যেতেই রাজী আছে সে। রোসেন যখন ওকে নিতে এল জীবনে এই প্রথম সে ওকে তুমি বলল। পাদ্রীর কাছে না গেলেও ওরা যেন এখন ঠিক বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। নিতান্ত বেকুবের মতো কাজ করে বসেছে ও। ঐ শয়তানগুলোর সঙ্গে নিশ্চয়ই কেউ আর বাস করতে পারে না। ও সই করুক চাই না-ই করুক সাইডলিৎজ কোনোদিনই ওকে ক্ষমা করবে না। আবার ওরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। শিগগিরই আবার "জিগ হেইল!" বলে গলা ফাটাতে শুরু করে দিল বলে। ঐ অভিশপ্ত কাগজটায় সই করে ও সব কূল হারাল। আমেরিকানটা বলেছে যে যদি ও নিডারওয়ালডে চলে যায় তবে সমস্ত ব্যাপারটা ওরা কাগজে ছাপিয়ে দেবে আর লালগুলো ওকে ধরে জেলে পুরবে। ঠিকই করবে তারা কারণ ও মিথ্যা জিনিসে নাম সই করেছে। ওর বাঁচার আর কোনো পথই নেই।

নিজের কারখানায় গেল কার্ল। যন্ত্রপাতির দিকে তাকাল। বুঝতে পারল যে ওর শেষ। কোনোদিনও আর ও পারবে না কাজ করতে, পারবে না দেখা করতে আনার সঙ্গে। বিশ্বাস করবে না কেউ-ই যে ওকে জোর করিয়ে সই করিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রথমে ওর মনে হল বার্গোমাস্টার শুলৎসের কাছে যায়। গিয়ে বলে:

আমাকে জেলে দাও, তবু আমি ওবারওয়ালডে যাব না।—পরে ভাবল শুলৎস তরুণ, অসমসাহসী। হয়তো বলে বসবে:

সই দেওয়ার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল তোমার।

অবশেষে রুশ মেজরের কথা মনে পড়ল ওর। বার্গোমাস্টার থাকা কালে তার কাছে যেত ও পরামর্শ নেবার জন্যে। শান্ত প্রকৃতির মানুষ মেজর, মানুষের সঙ্গে সব সময়েই মিষ্টি ব্যবহার করেন। হয়তো তাঁর ঘরে স্ত্রীপুত্রও আছে। নিশ্চয়ই তিনি বুঝবেন কার্লের অবস্থা।

মেজর আলপারের কাছে বুকের বোঝা হালকা করে ফেলল কার্ল বহু পরিমাণে। অবশ্য এটা বোঝে ও যে, ছাড়পত্র ছাড়া যাওয়া ওর উচিত হয়নি। কিন্তু একান্তভাবে বাধ্য হয়ে পড়েছিল ও ওবারওয়ালডে যেতে। ওর বয়েস এখন বত্রিশ বছর, কিন্তু প্রেমে পড়েছে ঠিক যেন অল্পবয়সী ছোকরাদের মতো। তাই, না গিয়ে পারেনি, ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকমের। ও সাধারণ মানুষ—বীরপুরুষ নয়। যুদ্ধের সময়ে ও যে বীর বনে গিয়েছিল এ-কথা অবিশ্যি ঠিক, কিন্তু তার জন্যে ও নিজে মোটেই অপরাধী নয়। ওর মানসিক অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তাই যে-কথা নাকি আর দশজনে ভাবত মনে মনে, সে-কথা ও বলে ফেলেছিল গলা ছেড়ে। কোনোদিনই ও কাপুরুষ ছিল না, কিন্তু কি করে যে ঐ নোংরা কাগজটায় নাম সই করে দিতে পারল কিছুতেই সে তা ভেবে উঠতে পারছে না। রোসেন যখন কথাবার্তা বলছিল ও অবিচলিতই ছিল সব সময়ে। কিন্তু তারপর ঐ আমেরিকান সাংবাদিকটা ব্যাপারটায় হাত লাগাল। মনে হয় লোকটা দারুণ ধূর্ত। কার্লের ভয় হল যে ওরা ওকে জেলে পুরে দেবে আর দীর্ঘ দুটো বছরের ভিতরে আর আনাকে দেখতে পাবে না। আর ঠিক সেইদিনই কি না আনা নিডারওয়ালডে এসে বাস করবে বলে সম্মতি জানাল। আর—হ্যাঁ ও সই করে দিল। আমেরিকানটা বলেছিল যে ব্যাপারটা সামান্য একটা নিয়মরক্ষা মাত্র, কিন্তু মনে হয় লোকটা এক নম্বরের পাজী। কাগজে না ছাপিয়ে ছাড়বেই না ও কিছুতে।

নাম সই দেয়া উচিত হয়নি আপনার,—বলল ওসিপ,—ওরা আপনাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। ছুরির ব্যাপারটা সত্যিই জঘন্য। লোকটা কি রকম দেখতে, ঐ আমেরিকান সাংবাদিকটি?

মাঝারি গোছের চেহারা। ধূসর চুল, লাল তামার মতো মুখ।

মৃদু হাসল ওসিপ:

ঘটনার পরে এখানে এসেছিল সে। লোকটা গুপ্তচর বিভাগের লোক, আমি চিনি ওকে।

কি করতে বলেন আমাকে এখন, হের মেজর? ওদের হাতে গিয়ে পড়ার

চাইতে এখানে জেলে বাস করব তা-ও ভালো।

আপনার প্রেমিকাটিকে বলে দিন যে ছাড়পত্র যোগাড় করুক। আমাদের দিকের যা সে-সম্পর্কে আমি সাহায্য করব। ভাববেন না; কেউ-ই আপনাকে ত্যাগ করবে না।

দরদ-ভরা মৃদু হাসি ফুটে উঠল ওসিপের মুখে আর কার্লের মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এক হপ্তা পরে আনা চলে এল নিডারওয়ালডে।

আমি ভাবতাম কমিউনিস্টরা আমেরিকানদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে চায় না, আর এরই জন্যে যত গোলমাল,—আনার কাছে বলল কার্ল,—কিন্তু আসলে আমেরিকানরাই চায় না ওদের সঙ্গে কোনো রফায় আসতে। ঐ সাংবাদিকের মতো পাজী লোক রয়েছে ওদের ভিতরে। ঈশ্বর রক্ষে করুন, কেউ যেন ওদের ছায়াটিও না মাড়ায়। ওদের চালাকি আমি বুঝে গেছি এখন। বাবা বলতেন:

কার্ল বোঝে একটু দেরিতে, কিন্তু একবার যখন বুঝে যায় তখন আর ভোলে না।

এখন কেউ যদি বলে লাল কার্ল, জবাবে আমি বলব: ঠিক কথা, আমি লাল, অস্বীকার করব না সে-কথা। বরং তাতে আমি গর্ববোধই করছি। কারণ আমি চাই কাজ করতে আর আমার আনার সঙ্গে বাস করতে। আর যুদ্ধ চাই না আমি। জাহান্নামে যাক ওরা আর ওদের ঐ নোংরা কাগজপত্র।

কার্ল চলে যেতে অন্যের সুখে সুখী হয়ে আর একবার হাসল ওসিপ। পকেট থেকে রায়ার ফটোটা বের করে দেখল, তারপর কাজ করতে বসে গেল।

পঞ্চান্ন

"নিরুদ্দেশ" মানে, কী বলতে চাও তুমি?—দারুণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল স্মিডল,—একজন স্থপতি কিছু আর তোমার ইজেরের বোতামটি নয় যে হাওয়া হয়ে গেল। আমাকে কি অতই নিরেট পেয়েছ যে ও-কথা বিশ্বাস করব? ও কেটে পড়েছে, আর গিয়ে যোগ দিয়েছে ঐ লালগুলোর সঙ্গে, আসল ব্যাপারটা হল গিয়ে তাই! কিন্তু আমিও ছাড়ব না ঠিক ধরে ফেলব—

নীরবে চোখের জল মোছে হিলদা। আজ চার দিন কুর্ট নিরুদ্দেশ। সেদিন সন্ধ্যেয় যখন খেতে এল না, প্রথমটায় ভাবল হয়তো গেছে সে তার কোনো এক মেয়েমানুষের কাছে, তাই অত আর মাথা ঘামাল না। সেদিন সন্ধ্যেয় সে তার ফরাসী প্রণয়ীর কাছে যাবার ব্যবস্থা করল। আর খুশী হয়ে উঠল এই ভেবে যে ঠিক সময় মতোই গিয়ে পৌঁছতে পারবে—ওর দেরি করে যাওয়াটাকে ঘৃণা করে গস্তোঁ। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় গিয়ে হাজির হল। কিন্তু গস্তোঁ এক মর্মান্তিক সংবাদ দিয়ে ওকে অভিনন্দিত করল যে সে বদলী হয়ে যাচ্ছে ব্রুশেলস-এ। দুঃখিত হওয়ার ভানটুকুও করল না সে। অধিকন্তু বলল যে এখানকার চাইতে ব্রুশেলস ঢের বেশি স্ফূর্তির জায়গা: একটা শহরের মতো শহর, এখানকার মতো এমন পাথরের স্তূপ নয়। রুমালে চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ির পথে পা বাড়াল। গস্তোঁকে হারাল হিলদা—হারাল ওর জীবনের ভালোবাসা। আর কেউ আসবে না ওর জীবনে কোনোদিন—প্রতিদিন বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। তখনো বাড়ি ফেরেনি কুর্ট। মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল হিলদা: বিরক্তিকর ব্যাপার। এদিক ওদিক যা-ই কিছু করে বেড়াক না কেন রাত্রে বাড়িতেই ঘুমোয় হিলদা। কিন্তু পরদিন ভোরেও এল না কুর্ট। এতক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়ল। চলে গেল স্থপতিদের আফিসে। গিয়ে শুনল যে রিশতার আগের দিন সন্ধ্যে ছটায় কাজ করে চলে গেছে এখন পর্যন্ত আর কাজে ফিরে আসেনি। প্রায় মূর্ছা পড়ার উপক্রম হল হিলদার। ওর কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে বসবাস করতে যায়নি তো? নিশ্চয়ই স্মিডল ওকে গায়েব করেছে। আগের হপ্তায় দুজানর ভিতরে একটু কড়া বাদানুবাদ হয়েছিল। ওকে বলেছিল কুর্ট যে আমেরিকানরা জবরদস্তি করছে খুবই কিন্তু কিছুতেই রাজী হবে না। নিজের প্রাণটার মূল্য একটু বেশিই ওর কাছে। ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ংকর! গতকালের চোখের জল বুঝি বা এতক্ষণে লজ্জা দিতে শুরু করল ওকে। ক'দিনই বা চেনে ও গস্তোঁকে? বড়ো জোর দু মাস। আর কুর্টের সঙ্গে বাস করছে সতেরো বছর। দশ বছর পর্যন্ত একান্ত বিশ্বস্ত ছিল ও কুর্টের কাছে। একটা চুমো পর্যন্ত খায়নি আর কাউকে। আর এ দুদিনের আলাপ-পরিচয় নয়, সে ওর স্বামী। তাকে ছাড়া ওর কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু এটা শুধু ওর নিজের ব্যাপার নয়—বেচারা কুর্ট! ও ভালোবাসে তাকে, একমাত্র তাকেই সে ভালোবেসেছে জীবনে। কোথায় যেতে পারে সে? এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলল হিলদা, থানায়

গেল, সমস্ত হাসপাতাল খুঁজে দেখল। কেউ কোনো খবর দিতে পারল না। তারপর স্মিডল এসে যখন হম্বিতম্বি শুরু করে দিল ওর উপরে, তখন ভাবল:

যদিও লোকটা একনম্বর বদমায়েশ তবুও এতটা ভান করা সম্ভব নয়। হয়তো ওকে গায়েব করেনি স্মিডল। তবে কি লালরা সন্ধান পেল কিছুর?

দিন পনেরো পরে কুর্টের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কে এক শ্রীমতী শিলারকে লেখা একখানা চিঠি পেল হিলদা। তাতে লিখেছে কুর্ট যে বুধবারের বদলে বৃহস্পতিবার আসছে সে। হিলদা বুঝল যে নিশ্চয়ই সে ওর রক্ষিতা। সে হয়তো জানতে পারে ওর খবরাখবর।

হিলদা লোটিকে দেখতে পেল অর্ধনগ্ন অবস্থায়, যদিও ও গিয়েছিল তার কাছে বিকেলে। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোটি গাল পাড়তে শুরু করে দিল:

বটে, তুই তাহলে ঐ শুয়োরটার বৌ? আমি হিংসে করি না তোকে। কি বলছিস ও নিরুদ্দেশ হয়েছে? ওর জন্যে এতটুকুও দুঃখ হয় না আমার, হয় নিজের জন্যে। হয়তো ভাবছিস ওর কাছ থেকে ভালো ভালো সব জিনিসপত্তর আদায় করে নিয়েছি আমি। আমার সায়াটার দিকে তাকিয়ে দেখ, সর্বাঙ্গ ছেঁড়া। শেষ হয়ে গেছি আমি। আর তোর ঐ আদরের ভাতার কি না আমার যথাসর্বস্ব, তিন তিন শো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে। বলে বেড়ায় ও ভাস্কর, কিন্তু আমার কাছে যদি জিজ্ঞেস কর তো বলব ও একটা মামুলি জোচ্চোর ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটু শান্ত হলে পরে লোটি বলল:

প্রত্যেক বুধবার বুধবার ও আসত এখানে। কিন্তু আগে থেকে কোনো খবর-পত্র না দিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হল সোমবার। জঘন্য চালাকি। একটা ভারি বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে পারতাম আমি। এসে যত রাজ্যের আজে-বাজে কথা বলতে শুরু করে দিল। কিন্তু তা কিছু না, আসলে লোকটার মোটেই বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আগে আগে বলত আমার কাছে যে, ও চায় বিপজ্জনকভাবে বাঁচতে। কারণ ও নাকি একজন খাঁটি জার্মান। ভেবে দেখ এ-সব আবোল-তাবোল কথা শুনে কেমন লাগত আমার! দু দুটো বোন মারা গেল ড্রেসডেনের রাস্তায় বিমান-হামলায়। বিশ্বাস কর ও যখন ঐ সব কথা বলতো আরম্ভ করত হাতের কাছে যা পেতাম ছুঁড়ে মারতাম ওর গায়ে। আধ বোতল সুগন্ধী চিপার পর্যন্ত ঢেলে পড়ে গেল আমার—

বলছ যে ও সোমবার এসেছিল। সোমবার থেকেই ও নিরুদ্দেশ—সাত তারিখ থেকে।

আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেল, ছুঁচোটা! এসে বলল ওকে একটা মোটা টাকা শোধ করতে হবে কিন্তু হাতে আছে পূর্বাঞ্চলের টাকা। টাকাটা ভাঙিয়ে লোকসান দিতে রাজী নয়, ওর এক বন্ধু বলেছে কাল টাকাটা ভাঙিয়ে এনে দেবে। আর ইতিমধ্যে আমার হাতে যা আছে তাই যদি ওকে দিয়ে দেই! বোকার মতো আমি বিশ্বাস করলাম ওর কথায়। হয়তো ভাবছ আমার মনটা নীচ? যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখ, বোকা বলেই আমি আজ পথের ভিখারী। লোকটার জন্যে দুঃখ হয়েছিল আমার—। বলে গেছে আসবে বুধবার,

যেমন আসে। কিন্তু আর এল না। টাকাটাও গেল আমার।

হঠাৎ হিলদা রেগে উঠল:

হুঁসিয়ার হয়ে কথা বল! আমার স্বামী একজন ভাস্কর। লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করে। এই তুচ্ছ টাকা কটা যদি নিয়েই থাকে তোমার কাছ থেকে ধার হিসেবে, তো নিয়েছে ওর মন মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে বলেই। এখন বুঝতে পারছি তোমাদের মতো জীবের পেছনে কত টাকাই না ও নষ্ট করেছে।

তুচ্ছ ধার?—শিরশিরে গলায় চিৎকার করে উঠল লোটি—তুচ্ছ ধার তো টাকাটা ফেলে দিলেই পারিস সুপারিশ করনেওয়ালী কুত্তী! সে-বেলা নেই কেমন? ঐ হতভাগা বুড়ো রক্তচোষাটা যা সব দিয়েছে আমাকে তা হল গে এই, নে।

কাঠের সোল-ওয়ালা সস্তা দামের এক জোড়া জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের উপরে। রণে ভঙ্গ দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলে এল হিলদা।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল এতক্ষণে যে স্মিডলের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যেই গা ঢাকা দিয়েছে কুর্ট। কিন্তু ওকে বলেনি কেন সে তার এই মতলব সম্পর্কে? আর যা-ই হোক ও নিজেই কি পরামর্শ দেয়নি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে—যখন সে রুশিয়ায় ছিল ওর জন্যে অপেক্ষা করেছিল হিলদা। পঁয়তাল্লিশ সালে যখন তার রোজগার-পত্তর ছিল না, ওর ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে, সৈনিকদের কাছ থেকে টিনের খাবার, কফির প্যাকেট ইত্যাদি মেগে এনে খাইয়েছে তাকে। আর যাবার বেলায় ওর কাছ থেকে বিদায়টুকু পর্যন্ত না নিয়ে চলে গেল।

রিশতার কোথায় আছে জানার জন্যে আবার একদিন এল স্মিডল। সে-দিন ও ছিল মাতাল অবস্থায় আর চাল-চলন চাষাড়ে। হিলদা রেগে গিয়ে দু-কথা শুনিয়ে দিতেই ওর গালের উপরে এক চড় বসিয়ে দিল স্মিডল। ওর প্রণয়ীরা কখনো-সখনো যদি ওকে মারে তো হজম করে যায় হিলদা। পুরুষেরা অনেকে আচমকা তাদের অন্তরাবেগ প্রকাশ করে বসে। কখনো কখনো প্রকৃত আবেগ ওদের উন্দাম করে তোলে। কিন্তু অনেক দিন আগেই ভুলে গেছে হিলদা যে স্মিডল ছিল ওর প্রণয়ী। তাই সে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্মিডলের উপরে যে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্মিডল বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

এক মাস কেটে গেল। কুর্টের কোনো সাড়া নেই। হিলদা ঠিক করল রোজগার করতে হবে, নইলে মরতে হবে উপোস করে। পশ্চিমাঞ্চলে চেষ্টা করল কাজ যোগাড় করতে, কিন্তু পেল না। তারপর গেল লালদের কাছে। হেড অফিসের জেনারেল স্টোরে ওকে নিয়ে নিল দোকান-কর্মচারী হিসেবে। ওখানে খাজাঞ্চি ক্লাউটের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অবশ্য গাস্তোঁ বা হামবুর্গের সেই ইংরেজটির সঙ্গে ওর তুলনাই হয় না, কিন্তু মনকে ভোলাল যে ও নিজেও তো এখন আর কচিটি নেই, তাছাড়া স্বামীও ছেড়ে চলে গেছে সুতরাং অত খুঁত-খুঁত করার আর কোনো মানে হয় না।

ব্যাপারটার হালে পানি পেল না স্মিডল। স্থপতিটা দু হাজার মার্ক নিয়েছে অগ্রিম হিসেবে, আর এখন ভেগে গিয়ে জুটেছে লালগুলোর সঙ্গে। উপহাস করছে ওকে। এই হতভাগা চ্যাংড়াটা কিভাবে ওকে ধাপ্পা দিয়েছে শুনলে কি

বলবেন কর্নেল রবার্টস ?

নাৎসী গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে রিশতারের যোগাযোগের সংবাদটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবে, ভাবল স্মিডল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করল।

স্থপতিটি যদি সৎ লোকই হয়ে থাকে তবে ? এ-ও তো হতে পারে যে লালরা ওকে গ্রেফতার করে রেখে দিয়েছে ? অন্যথায়, যদি ও ভোল পালটেই থাকে তবে যা-ই কিছু ছাপিয়ে দিক না কেন স্মিডল, তাতে এসে যাবে না কিছু।

দু-মাস ধরে স্মিডল স্টেডিয়ামে একটা দুর্ঘটনা ঘটাবার মতলব ভেঁজে এসেছে। উচ্চাঙ্গের জুয়াখেলা হত ওটা। কোনো লাল অফিসারকে ঘুষ দিলেই হয়তো ভালো হত। কিন্তু যদি বড় একটা কিছুর পরিকল্পনা চোখের সামনে না থাকে তবে ঐটুকুতেই বেশি দিন চলে না। নিশ্চয়ই ওর ভাগ্য খারাপ,—মনে মনে ভাবল স্মিডল,—আর এটা শুরু হয়েছে সেই নিগ্রোটার ফাঁসীর দড়ি থেকে। গত বছর এক হপ্তায় ও যতটা সাফল্য লাভ করেছিল, গত তিন মাসে তার চাইতেও ঢের কম লাভ করেছে। ভাগ্য যদি একবার খারাপ হতে শুরু করে তবে সেটা লেগে থাকে আঠার মতো। তার রকমসকমও জানা আছে ওর: রাত্রে যদি পোকার খেলে একশো ডলার হেরে যায় তবে সকাল বেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে যাবে নির্ঘাত। দুর্ভাগ্যের পালা চলেছে এখন, আর এটা হল তারই একটা।

যখন ওবারওয়ালডে ফিরে এল স্মিডল, ওকে এমন শুকনো গম্ভীর দেখাচ্ছিল যে ক্যাপটেন কিনেল দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল:

অসুস্থ নাকি আপনি, অসুখ করেছে ?

ও, হতে পারে! কির্শ খেতে আসিনি আমি, এসেছি দরকারী কথা আলোচনা করতে। লাল কার্লের ব্যাপার কি ? শুনলাম সে নাকি তোমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে ?

অবাক হয়ে গেল ক্যাপটেন:

জানেন না আপনি ? পরশু দিনের লালদের কাগজে বেরিয়েছে ব্যাপারটা। এ-নিয়ে তারা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে তুলেছে। আপনাকেও জড়িয়েছে তার ভিতরে। কাগজটা বের করছি দাঁড়ান—

চটে উঠল স্মিডল:

তুমি জানলে যে সে কেটে পড়েছে, কেন তবে তার নাম সই-করা বিবৃতিটা কাগজে ছাপিয়ে দিলে না ? বার্লিনে বসে সব কিছুর উপরে তো আমি আর নজর রাখতে পারি না। এতটুকু কাজ দিয়েও তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। জেনারেল হয়েসের কাছে রিপোর্ট করছি আমি তোমার নামে, দাঁড়াও। আর সেই হোটেলওয়ালা মেয়েমানুষটার কি হল, ওকে অন্তত হাজতে পুরেছ তো ? কি হে ? কথা বলছ না কেন ?

তাকে যে গ্রেফতার করতে হবে তা আমি জানতাম না।

কোথায় সে ? তার ঘরে আছে ?

কিনেলের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। অতি কষ্টে শুধু এইটুকু বলতে পারল:

সে-ও নিডারওয়ালডে।

ভয় করছিল এক্ষুনি স্মিডল তার সমস্ত গালাগালগুলো ওর উপর বর্ষণ শুরু করে দেবে, কিন্তু তার বদলে হঠাৎ স্মিডল বোকার মতো গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল:

চমৎকার! শোনো ক্যাপটেন, এক্ষুনি আমাকে হুইস্কি বা অন্তত তোমার ঐ নোংরা কির্শ-ই খানিকটা দাও।

মনটাকে হালকা করার জন্যে রাক্ষসের মতো হুইস্কি খেতে শুরু করল স্মিডল কিন্তু ঘুরেফিরে নিগ্রোর ফাঁসীর দড়িটার কথা ওর মনের ভিতরে জেগে উঠতে লাগল। দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল কিনেল— এখনো সবচাইতে খারাপ খবরটা জানে না স্মিডল। কী বলবে সে ওকে? চিরদিনই স্মিডল বেসামাল। কিন্তু আজ এমন অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে যে হয় সে মদ খেয়ে খেয়ে বুঁদ হয়ে যাবে, নয়তো তার চাইতেও খারাপ কিছু করে বসবে।

গোটা সন্ধ্যেটা কার্ল কিনেল সাইডলিৎজের সঙ্গে বসে পরামর্শ করেছে কেমন করে উলফের ব্যাপারটার ব্যবস্থা করবে। সত্যিই জঘন্য ব্যাপার। পুলিস-বাহিনীর সঙ্গে এক ব্যাটেলিয়ন সামরিক পুলিসও রয়েছে শহরে। ততদিন সব কিছু বেশ ভালোভাবেই চলেছিল। কিন্তু এখন হঠাৎ ঐ নগণ্য লোকটা তুমুল কান্ড বাধিয়ে বসল। সাইডলিৎজ স্বভাবতই সমস্ত দোষটা চাপাল আমেরিকানদের ঘাড়ে। রেড কার্ল একটা সুচতুর জানোয়ার বিশেষ। ওর মতো লোককে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখলেই গুলি করে মারা উচিত। কিন্তু কেন ওর সঙ্গে সন্দেহজনক কাজকর্ম করতে যাওয়া? আনা সুপরিচিত। স্পায়ার্স ছিল একজন সম্মানিত ভদ্রলোক। তাই লোকে তার বিধবাকে বিশ্বাস করত, হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিল কিনেল। বলল, সমস্ত ব্যাপারটার কানাকড়ি মূল্যও নেই, তাছাড়া সাইডলিৎজ একটা মারাত্মক ভুলকে সমর্থন করার চেষ্টা করছে: এ সীমান্ত শহরে ওরা একটা কমিউনিস্টকে বসবাস করতে দিয়েছে, ফেডারেল রিপাবলিকের নিরাপত্তার প্রশ্ন-জড়িত কারখানায় দিয়েছে কাজ করতে। আর তার চাইতেও বড় কথা কিনা—সে লোকটা সভাসমিতি করছে, বক্তৃতা দিচ্ছে। কোথায় আছে ওরা—আমেরিকান এলাকায় না লাল এলাকায়?

এখন যদি ওকে আমরা গ্রেফতার করি—আবার বলল সাইডলিৎজ,—তবে কারখানায় ধর্মঘট হয়ে যাবে। শ্রমিকরা উলফের কথা শোনে।

কানে আঙুল দিল কিনেল: আবার উলফ! পাগল করে দেবে লোককে দেখছি। যে-কোনো কথাই আলোচনা শুরু হোক না কেন, উলফের কথা এসে পড়বেই পড়বে—উলফ এই বলেছে, উলফ প্রতিবাদ করেছে, উলফ এটা পছন্দ করে না। যদি আটচল্লিশটা রাজ্যকেই লালদের ঢুকিয়ে দেয়া একটা বদমায়েশের কথা হিসেব করে চলতে হয় তো চমৎকার ব্যাপার! কিন্তু তবুও ক্যাপটেন উলফকে গ্রেফতার করতে সাহস করল না। সত্যি সত্যি একটা ধর্মঘট হয়ে যেতে পারে তাহলে, আর ওকেই তখন জবাবদিহি করতে হবে তার জন্যে।

এক বছর আগে মিউনিক থেকে ওবারওয়ালডে এসেছে উলফ। পেশায় সে একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি। বেয়ার কেমিক্যাল কারখানায় কাজ দেয়া হল ওকে। ওর

অতীত জীবন সম্পর্কে অনেক গুজবই চালু আছে: কেউ বলে ও ছিল রুশিয়ায় বন্দী, আবার কেউ বলে যুদ্ধের আগে ও পালিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু উলফ নিজে বলেছে উনিশশো আটচল্লিশ সালে নাৎসীরা ওকে গ্রেফতার করে, তারপর সাত বছর ছিল বন্দীনিবাসে।

ধূর্ত হাসি হেসে পুলিস কর্মচারী রোসেন জিজ্ঞেস করেছিল ওকে:

চুটিয়ে চোরাকারবার করেছিলে বুঝি?

আমি কমিউনিস্ট,—শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল উলফ, জানেন না আপনি?

পরে রোসেন রেগে গিয়ে বলেছিল:

কী দারুণ হঠকারিতা লোকটার! যেন বলল, আমি কী সুন্দর, দেখতে পারছ না?

উলফের চেহারা দেখতে ক্ষীণ দুর্বল কিন্তু ইচ্ছেশক্তি লোহায় গড়া। বলত, "তিল তিল করে মৃত্যুর শিবির" থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে নাৎসীদের ফাঁসীর সময়ে যাতে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে শুধু এই জন্যেই। ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে কেন ও লাল এলাকায় চলে যায় না, প্রত্যুত্তরে বলল যে ওকে ছাড়াই তাদের চলবে। কিন্তু এখানকার লোকেরা চায় ওকে। সীমান্তের এ ব্যাপারটা দু দিনের, জার্মানি আবার এক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম শ্রমিকেরা ওকে বিশ্বাস করত না। কিন্তু ও একজন ভালো কমরেড, তাই শীঘ্রই তারা মেনে নিল ওকে। ও যখন বন সরকারের সমালোচনা করত তারা বলত:

তোমার কথা ঠিক, কিন্তু রুশরাও কিছু আর ভালো নয় আমেরিকানদের চাইতে। তুমি শুধু এক দিক দেখছ, কেউ-ই যুদ্ধ চায় না—এমন কি ট্রুম্যানও না। বনের লোকগুলো ভালো নয় সত্য, কিন্তু দেখো ওরা কিছু একটা ব্যবস্থা করবে।

দুটো ঘটনায় শ্রমিকদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। কার্ল ব্রিনারের ঘটনা 'নিডারওয়ালডের জাইতুঙ'-এ প্রকাশ হওয়ার পরে ওবারওয়ালডের লোকদের কী ধারণা হয়েছে সে-কথা চেপে গেল না সাইডলিৎজ ক্যাপটেনের কাছে। অনেক লোক চেনে কার্লকে। যদিও সাইডলিৎজ বলে ওকে লাল কার্ল, পুরানো শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে ওর কথা শুনে: ব্রিনার হোয়াইট স্ট্যাগে বসে অনেক দিন বলেছে যে লালদের সে একটু ভয় করে। খবরের কাগজে ঐ কাহিনী পড়ে সবাই বুঝতে পারল যে হিটলার জুগেন্ড-এর রোসেন আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে একটা রহস্যজনক খেলা খেলছে। এর ভিতরে সাইডলিৎজও আছে। কেউ কেউ বলল: আবার কি আমাদের সত্যি সত্যিই জোর করে রুশ তুষারে জমিয়ে মারবে আর প্রাণ দেব কিসের জন্যে তা কেউ জানবে না? তারপর বেয়ার প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হিলডারিং-এর আসায় শ্রমিকদের ধারণাটা আরো দৃঢ়মূল হয়ে উঠল। অনেক বছর ওর কোনো খোঁজখবর শোনা যায়নি। গুজব রটেছিল যে ওকে গ্রেফতার করে বাড়িতেই নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। ফিরে এল মিউনিক থেকে। বেশ তাজা হাসিখুশি চেহারা। কারখানাটা দেখল ঘুরে ঘুরে তারপর দেখা করল প্রবীণ শ্রমিকদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। তাদের বলল:

সমস্ত খাঁটি জার্মানদের সঙ্গে মিলে তোমরা কাজ করছ পশ্চিম ইউরোপে লাল আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা শক্তিকে দৃঢ় করে তুলতে।

বহুদিন থেকেই বলে আসছে উলফ যে এই কারখানায় যুদ্ধের জন্যে কাজ চলেছে। কিন্তু কেউ তখন ওর কথা বিশ্বাস করত না। এখন হিলডারিং-এর কথায় সেটা সমর্থিত হল। সাইডলিৎজ ডিরেক্টরের কথাটা বলল না ক্যাপটেন কিনেলের কাছে: বরং লাল কার্লকে নিয়ে যে ঐ সব বেকুবি শুরু করে দিয়েছে সেই স্মিডলকেই খোঁচানো যাবে এসব দিয়ে।

শ্রমিকদের এক সভায় বক্তৃতা দিল উলফ।

আমেরিকানদের চালচলন এমন যে এটা যেন তাদের নিজেদের বাড়িঘর। আমরা শুনতে পাই বন-এ একটা সরকার আছে। কিন্তু ব্রিনারকে কে কুৎসা প্রচারের ভয় দেখিয়েছিল? একজন আমেরিকান। অবশ্য রোসেনের মতো কালকের নাৎসীরা কাজ করছে আমেরিকানদের সঙ্গে। জার্মানি বিধ্বস্ত, কিন্তু আমাদের কাজ করানো হচ্ছে জার্মানিকে গড়ে তোলার জন্যে নয়, বরং যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুও ধ্বংস করার জন্যে। হিলডারিংয়ের জন্যে তাতে আসবে মুনাফা। যুদ্ধের দিনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করেছে সে, কিন্তু তাতেও তার আশা মেটেনি। কিন্তু আমাদের দিক থেকে এর মানে কি? আমরা কি মরতে যাব এই জন্যেই যে আমেরিকানরা রুশ সমাজব্যবস্থা পছন্দ করে না? ওদের যদি যুদ্ধ করার অতই আগ্রহ, আমাদের বাদ দিয়ে যাক না ওরা এগিয়ে।

ওর বক্তৃতা শুধু যে শ্রমিকেরাই সমর্থন করল তাই নয়। সারা শহরে মুখে মুখে ফিরতে লাগল। শেষের কথাটা বার বার করে বলতে লাগল সবাই: আমাদের বাদ দিয়ে। এমন কি ফ্রাউ সাইডলিৎজ তার স্বামীর কাছে বলল:

পাজীটার কথাগুলো কিন্তু মোটামুটি ঠিক। দারুণ ভুগেছিলাম আমরা লালগুলোর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করেছিলাম। এক আমাদের পরিবারেরই মারা গেছে তিনজন। এখন করুক যুদ্ধ আমেরিকানরা। আর সবচাইতে ভালো, যদি আমাদের বাদ দিয়ে ওরা যুদ্ধ করে।

এই শেষের দিকের ঘটনাগুলোর কথা জানে না স্মিডল। কিনেল চেষ্টা করেছিল বলতে। কিন্তু যতবার চেষ্টা করেছে ততবারই স্মিডল থামিয়ে দিয়েছে ওকে: এই লাল-তাড়ানো বেকুবটার কথা না শুনেও মানুষের মাথাখারাপ হওয়ার মতো ঢের জিনিস আছে। আধ-বোতল হুইস্কি টানার পরে একটু তাজা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ল স্মিডল। টাউনহলে গিয়ে দেখল দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে: আমাদের বাদ দিয়ে!

একটা ভয়ংকর ব্যাপার হয়তো সহ্য করতে হত কিনেলকে। অবশেষে মরিয়া হয়েই বলে উঠল কিনেল:

আপনি তো আমার কথা শুনছেন না—এসব হচ্ছে উলফের কীর্তি।

সাইডলিৎজ আর পুলিস কর্মচারী রোসেনের কাছে যা যা শুনেছিল বলল সে স্মিডলের কাছে।

আর ঐ শয়তানটা কিনা এখনো বহালতবিয়তে আছে?—গর্জে উঠল স্মিডল।

ক্যাপটেনের বুকের বোঝা হালকা হয়ে গেল—কি ভাগ্যি স্মিডল এসে পড়েছে!

অবশ্য ও একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে কিন্তু কিনেলের অভ্যেস হয়ে গেছে ওকে। লোকে বলে দখনে লোকেরা খুব ভদ্র, বিনয়ী। একটু বাচাল। কিন্তু এমন গোঁয়ার সে আর আগে কখনো দেখেনি। অবশ্য সেটা তেমন বড় কথা নয়। গলাবাজী করে আর কিছু ওকে মেরে ফেলতে পারবে না। স্মিডল পরামর্শ দিয়েছে উলফকে গ্রেফতার করতে। সুতরাং যদি কিছু ঘটে তো ও বলতে পারবে যে এটা স্মিডলের কাজ।

সাইডলিৎজের ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল সব কিছু। যেই মাত্র শ্রমিকরা শুনল যে উলফ গ্রেফতার হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওরা হাত বন্ধ করে দিল। তোলপাড় করে তুলল স্মিডল। টেলিফোন করল, গাল পাড়ল উলফকে, কিনেলকে, নিগ্রোর ফাঁসীর দড়িটাকে অভিশাপ দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সন্ধ্যের দিকে দারুণ শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসল ট্রানজকের জন্যে প্রবন্ধ লিখতে। কেননা গত পাঁচ দিন ধরে ও কিছুই পাঠায়নি। কিন্তু লিখবে ও দেখাবে যে উলফ শিক্ষা পেয়েছে মস্কোতে। শুরু করল স্মিডল:

রুশ এলাকা থেকে প্রচারকরা এসে ঢোকে পশ্চিম জার্মানির পুনর্গঠনের কাজ ধ্বংস করে দেবার জন্যে, কিন্তু তাদের সে-প্রচেষ্টা বৃথা।......

কলম রেখে দিল স্মিডল, চিন্তাধারাটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আসছে—হয়তো উত্তেজনার জন্যে নয়তো হুইস্কির জন্যেই। একটা গোলমাল শুনতে পেয়ে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল—একদল শ্রমিকের মিছিল আওয়াজ তুলতে তুলতে চলেছে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে: আমাদের বাদ দিয়ে! আমাদের বাদ দিয়ে।

দারুণ রেগে গিয়ে স্মিডল একটা ছাইদান ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর। ফোন করল কিনেলকে:

পুলিস কোথায়? সব কিছুর একটা সীমা আছে! ভোরের আগেই তোমার খতম হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি বলে দাও রোসেনকে ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে। মিঠে হাতের ব্যাপার নয়—এটা কিনডারগার্টেন নয়।

জানালা থেকে দেখতে পেল স্মিডল, পুলিস লাঠি-পেটা করছে মজুরদের। একটি বুড়ো মজুর সরবে না কিছুতেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছে:

আমাদের বাদ দিয়ে! ততক্ষণে একটা পুলিস এসে লাঠি দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারল। বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়ল পথের উপরে। হোঁতকা চেহারার পুলিসটা সঙ্গে সঙ্গেই ওর কোটের কলারটা ধরে টেনে তুলল। বিদ্রূপের চাপা হাসি হেসে উঠল স্মিডল: কি মজা, ছিল একটা মানুষ, আর এখন হয়ে গেল পুতুল—। ওর আশা হল যে পুলিসটা নিশ্চয়ই খুব জোরে মেরেছে লাঠিটা। বদমায়েশটা চ্যাঁচাচ্ছিল: আমাদের বাদ দিয়ে! ওকে ছাড়াই চলবে ওদের। বিনা বাধায় সোজা স্বর্গে চলে যাক ব্যাটা।

টেবিলে ফিরে গিয়ে স্মিডল তার কলমটা হাতে তুলে নিয়ে লিখতে লাগল:

প্রত্যেক দিন জার্মান জনসাধারণ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে যেদিন সেই চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে তারা থাকবে আমাদেরই সঙ্গে।

ছাপ্পান্ন

সাবল'র প্যারীতে ফিরে আসার পর পাঁচ মাস কেটে গেছে। আশ্বস্ত অনুভব করছে লো—এমন ঘাবড়ে দিয়েছে ওকে নিভেল যে আর ট্যাঁ-ফু টুকুও বেরোচ্ছে না বাছাধনের মুখ থেকে। কিন্তু দুঃখের কথা হল এই যে প্রাগে ট্রানজকের কোনো প্রতিনিধি নেই। রবার্টস তো বার বার করে বলছে এই কথা। সে-দিন আবারও বলল:

সবচাইতে দরকারী জায়গাটাই আপনি খালি ফেলে রেখেছেন। ওয়ারশ থেকে গ্রেসন জানিয়েছে যে ওখানকার কাজকর্ম বেশ ভালোভাবেই চলেছে—একটা শক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছে সে ওখানে। কির্কও বৃথা বসে নেই। গত মাসে দুটো লালকে হত্যা করা হয়েছে হাঙ্গেরিতে। বরার্টস যে বলেছে যে দু-একটা চটকদার খুনখারাবির চাইতে কর্মী গড়ে তোলার দিকে বেশি নজর দেয়া দরকার, কথাটা ঠিক। তবুও ট্রানজকের কাজ-কর্মে খুশীই হয়েছে সে। কিন্তু তা বলে প্রাগে কোনো লোক না থাকার কোনো অজুহাত নেই। লো বারণ করে দিয়েছে কস্টারকে যেন চেকদের বিরুদ্ধে কিছু না লেখে—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে দরকার কি আছে? প্রাগ হচ্ছে দুনিয়ার ভিতরে একটা আস্ত নরক এ-কথা আমেরিকানদের কানে তুলে দেয়াটা কাজের কথা নয়। আগেই তো বলা হয়েছে সে-কথা। তার চেয়ে বরং একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাক সেখানে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে লোক নেই। রবার্টস বলছে জেনকিনের কথা, কিন্তু জেনকিন নেহাত কাঁচা। সবেমাত্র কর্নেলের অধীনে কাজ শুরু করেছে। এখনো ভালো করে একটা চিঠিরও মুসাবিদা করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গেই লালগুলো ধরে ফেলবে যে কি-জাতীয় সাংবাদিক সে। ও-ভাবে করলে অনায়াসেই যে-কেউ গোটা ট্রানজক ধ্বংস করে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ ভেবে লো ঠিক করল স্মিডলকে বলবে বার্লিন ছেড়ে মাসখানেকের জন্যে প্রাগে যেতে। জার্মানিতে ট্রানজকের প্রতিনিধি আছে চারজন, তাছাড়া কস্টার এক বছর যা করেছে প্রাগে, ছেলেটা এক মাসে তা করবে। সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত, বেশি মদ খায় না, মেয়েমানুষের পিছনে ছোটে না, চায় না নিজেকে জাহির করতে।

সিনেটরের চিঠি পেয়ে একটু বিরক্ত হয়ে উঠল স্মিডল। ও নিজের কাজ পছন্দ করে: রুশ এলাকায় অনুপ্রবেশ, জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা, সাধারণ গোলমালকে বিরাট করে তোলা, আর নির্বিচারে যারা ওর আদেশ পালন করে চলে সেই শাসক গোষ্ঠীর কাছে দাস্যভার। উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ আর উত্তেজনাময় জীবন-যাপন করে স্মিডল—লো যেমনটি ভাবে, মোটেই তেমন ব্রহ্মচারীর মতো জীবন কাটায় না। প্রচুর মদ খায়, ঘন ঘন রক্ষিতা বদল করে আর দু হাতে পয়সা ওড়ায়। বিগত ঘটনার কথা মনে করে মনে মনে হাসে স্মিডল: ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে গেছে, ক্যাপটেন কিনেলকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে—মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে

ওর নেব্রাস্কায় সিদ্ধ হোক গে এখন! শহরের অধিকর্তা সাইডলিৎজের আমরা তোমরা ভাব কেটে গেছে—বুঝতে পেরেছে সে যে জার্মানদের আলাদা সেনাবাহিনী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাও উচিত নয়। ওদের যদি নিজেদের রেজিমেন্ট পরিচালনা করতে দেয়া হয় তো সেইটুকুই ঢের, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সর্বোপরি একটি অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর দেখা পেয়েছে স্মিডল এখানে। জ্যাকসনের রিতার মতোই সুন্দরী কিন্তু তার চাইতে বয়েস কম, আর বোকাও একটু কম। সেটি হল সাইডলিৎজের মেয়ে, নাক-খাঁদা মিৎসি। প্রথমে ভয় হয়েছিল ওর যে সাইডলিৎজের সঙ্গে সদ্ভাব হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু মিৎসি অভয় দিল ওকে:

বাবাকে চেন না তুমি। তিনি দারুণ আত্মাভিমানী কিন্তু তোমাকে একজন বিরাট কেউ-কেটা বলে শ্রদ্ধা করেন।

জার্মানি ছেড়ে যেতে তাই ওর দুঃখ হল মনে মনে, কিন্তু সিনেটরের কথাই ঠিক। লাল অধিকৃত এলাকার ভিতরে চেকোস্লোভাকিয়াই এখন খুব প্রয়োজনীয় অঞ্চল। কস্টারের গলাবাজি তার কামড়ের চাইতে ঢের বেশি খারাপ। ওর কলম খুবই ধারালো, কিন্তু উপযুক্ত দক্ষতা নেই।

লো লিখল ওকে যে যাওয়ার পথে যেন মিউনিক হয়ে যায়। কারণ জেইদা রয়েছে ওখানে। যে-সব 'জেহাদী' অবশিষ্ট আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দিক থেকে সাহায্য করতে পারবে সে। জেইদা সম্পর্কে স্মিডলের ধারণা যে লোকটা হয় দারুণ বদমায়েশ নয়তো নেহাত হাঁদা—কোনো বুদ্ধিমান লোক কিছুতেই কস্টারকে বিশ্বাস করতে পারে না। তবুও ঠিক করল মিউনিক হয়েই যাবে। কারণ ওর পথ থেকে তেমন দূরেও নয়, তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে প্রাগ যাচ্ছে সে-দিক থেকে হয়তো কিছু দরকারী খবরাখবরও মিলতে পারে জেইদার কাছ থেকে।

জেইদাকে খুঁজে বের করা সহজ ব্যাপার নয়, পাছে কেউ ওর পিঠের উপরে একটি গুলি চালিয়ে দেয় সেই ভয়ে অনবরতই সে তার ঠিকানা আর পাশপোর্ট বদল করে চলেছে। ওর সাঙ্গপাঙ্গদের দলও খুবই কম: একটি স্লোভাক পুরুত, একটি হাঙ্গেরিয়ান,—কোনো শ্রোতা পেলেই তাকে শুনিয়ে দেয় যে সে একজন ডেপুটি ছিল। একজন পোল,—জার্মানদের আমলে সে একটা খবরের কাগজ প্রকাশ করত। আর পাকা চুল ও লম্বা গোঁফওয়ালা এক ইউক্রেনিয়ান। ওরা মিলত এসে মেনারের কেকের দোকানে। ঘরটা এত ছোট যে একটু নড়তে চড়তে গেলেই হয় চীনামাটির ফুলদানী উলটে পড়বে নয়তো ক্রিম-কেকগুলো চ্যাপটা হয়ে যাবে। ওখানে বসে খুব গরম গরম বক্তৃতা ঝাড়ত জেইদা। বলত যে ইয়োরোপের মুক্তি নির্ভর করছে সঙ্ঘ বন্ধুদের উপরে। কিন্তু আমেরিকানরা হচ্ছে আদর্শবাদী এমন কি খানিকটা কৃপণও। তাছাড়া ওরা কেউ তেমন চালাক চতুরও নয়। সপ্তাহে একবার করে চেকদের উদ্দেশ্যে "লাল-অত্যাচারের" অবসান ঘটানোর আহ্বান জানিয়ে বেতার বক্তৃতা দেয় জেইদা। বলে খুব উল্লসিত কণ্ঠে কিন্তু নিদারুণ হতাশায় মনটা দমে যায়, আর নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করে কেন এমনি একটা বিশ্রী সময়ে জন্মেছে। যদি পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাত তবে

লিখতে পারত রঙ্গ-মঞ্চের অভিনয় আর ভিয়েনার ফ্যাশান সম্পর্কে। সে-কালে রাজদ্রোহ ছিল একটা আলাদা ব্যাপার—তার জন্যে কেউ আর তোমার গলার স্কার্ফ চেপে ধরত না। ওর হয়তো থাকত একটা আরামদায়ক ফ্ল্যাট, একটি স্ত্রী, কফি-খানায় বসে গাল-গল্প চালাতে পারত সেদিন কে জিতবে—ইংরেজ না বুয়োররা। কিন্তু তার বদলে কিনা ওকে মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে মরতে হচ্ছে আর যাপন করতে হচ্ছে কুত্তার জীবন। বাস্তবিক পক্ষে ও হচ্ছে উচ্চাভিলাষের বলি। নাৎসীদের আসার পরে কেন ও গোপন সংগঠনে যোগ দিয়েছিল ? এখন বুঝতে পারছে যে সেটা ছিল একটা অবাস্তব ভাববিলাস এমন কি তার চাইতেও খারাপ—বেকুবি। আর যা-ই হোক জার্মানদের অধীনেও তো মানুষ বসবাস করেছে। অবশ্য গেস্তাপোরা যখন ওর উপরে থাবা বিস্তার করেছিল তখন বাধ্য হয়েই ও নীতি স্বীকার করেছিল। লালেরা ওকে দানব বলতে পারে কিন্তু ও একজন সাধারণ মানুষ। যেন ও নিজের আনন্দের জন্যেই লোকদের বিপদে ফেলেছিল—সেটা হয়েছিল অবস্থার গতিকে। মনে আছে ও যখন রুজিককার ছেলেকে জার্মানদের হাতে ধরিয়ে দেয় আর তারা তাকে মেরে ফেলে গুলি করে—কী দারুণ মন খারাপই না হয়েছিল ওর। কেন ওরা করল এ-কাজ ? ও চাইছিল একটা উদারপন্থী সরকার। আর আজ কিনা এই হতচ্ছাড়া মিউনিকে এসে ওকে বাসা বাঁধতে হয়েছে। নেই কোনো পরিবার, নেই এমন একটি লোক যার কাছ থেকে ও পেতে পারে একটু দরদ, একটু সমবেদনা। হাঙ্গেরিয়ানদের জন্যে এতটুকুও মাথাব্যথা নেই ওর, ও চেয়েছিল একটি শান্ত জীবন। কিন্তু তার বদলে ওকে কিনা আজ উঁচু মহলের রাজনীতির ঘোলা জলে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। নিদারুণ ক্লান্তিকর।

অনেক করে খোঁজাখুঁজি করে জেইদার সন্ধান পেল স্মিডল। জেইদা জানাল যে রাত্রে সে মেনারের কেকের দোকানে থাকবে। স্মিডল সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে তার ধারণাই ঠিক—জেইদা হচ্ছে একটি গ্যাস-ভরা ফানুস। নিজেকে একটা দারুণ রাজনীতির কেউকেটা হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করল স্মিডলের কাছে। বলল দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমস্ত দেশত্যাগীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা। তারপর জোর দিল ওর নিজের কাজের ধারার বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে।

দূরে থেকে গালাগাল দেয়াটা খুবই নিরাপদ, তাই না ?—ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠল স্মিডল।—এখন খোলাখুলিই কথা বলা যাক। টাকা কি করেছেন না করেছেন সে-সব আমি জিজ্ঞেস করতে চাই না। ইতিহাস সম্পর্কে আমার আদৌ কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু আমাকে সোজাসুজি বলুন দেখি,—'জেহাদীদের' ভিতরে আপনার চাইতে বিশ্বস্ত কেউ আর আছে কিনা ?

যদিও কস্টারের সঙ্গে কাজকারবারের ভিতর দিয়ে জানতে পেরেছে জেইদা যে আমেরিকান লোকগুলো অত্যন্ত অভদ্র তবুও মনে মনে আঘাত পেল ও। কিন্তু চেপে গেল সেটা।

সব কথা আমি কস্টারকে বলিনি। বুড়ো হোবজার পেছনেই লেগেছিল সে। মানুষের মতো মানুষ ছিল অতীতে, কিন্তু এখন নামে আছে মাত্র। টোপ হিসেবে সে আপনার কাজে লাগতে পারে। তা বলে বেশ কিছু লোক নেবে এটা। কিন্তু

প্রকৃত কাজের জন্যে অন্য ধরনের লোক চাই আপনার। কাজের লোক হিসেবে আপনারা আমাকে বেছে নিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে জানাতে আপত্তি নেই আমার যে জেনারেল দৌবেক-এর আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ভালো কথা, তিনি পরিষ্কার ইংরেজি বলতে পারেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন লন্ডনে। কাল সকালে যদি আপনি আসেন এখানে, ধরুন এই দশটা নাগাত তবে আর কিছু নাম আমি দিতে পারি আপনাকে। আমাকে একটু ভেবে নিতে হবে।

সমস্ত রাতভর চিন্তা করল জেইদা—অবিশ্যি জেহাদিদের সম্পর্কে নয়, চিন্তা করল তার নিজের দুঃখভরা জীবনের সম্পর্কে। দেয়ালের ওপাশে শিমিৎ তার নাদুস-নুদুস বৌকে নিয়ে শুয়ে আছে। ও ছিল ঝটিকাবাহিনীর সৈনিক। বোধহয় অনেক রুশ ও পোলদের ফাঁসী দিয়েছে। হয়তো অধিকৃত অঞ্চলে প্রচুর জুলুম চালিয়েছে এক সময়ে। সে-সব সম্পর্কে ওকে যদি অভিযুক্ত করা হয় তবে সে বলবে যে যুদ্ধ অনেকদিন হল শেষ হয়ে গেছে। এখন ও কুইসিসানো কাফেতে পিয়ানো বাজায়। কেউ আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। ও ঘুম থেকে ওঠে রাত দুটোয়, ওর স্ত্রী কাফি আর রোল এনে দেয় ওকে খেতে। ও জানে, যে-ঘরটায় বাস করছে সেটা ওর নিজের। সেখানে ও কালও বাস করবে, করবে আগামী বছরও। আর জেইদা নিজে কিনা জিপসীদের মতো আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাধ্য হয়ে। কোথায় ন্যায়বিচার? নাৎসীদের বিরুদ্ধে ও লড়ল আর লালগুলো কি না চাইছে ওকে গুলি করতে। ওকে জোর করে বাধ্য করা হয়েছিল গেস্তাপোর হয়ে কাজ করতে—হাসির ব্যাপার নয়। সর্বসাকুল্যে মোটে জনা-কুড়ি লোককে ও ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লালদের কিছুতেই বোঝাতে পারবে না তা: ওরা কিছুতেই কোনো যুক্তি মানবে না। তাই না ও আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ করল আর সত্যি করেই চাইছিল তাদের হয়ে কাজ করতে। রুজিচকাকে যে সরিয়ে দিয়েছে সেটা তো স্বাভাবিক, কারণ সে অনেক কিছুই জানত ওর সম্পর্কে। কিন্তু সেটা কেন মনমতো হল না আমেরিকানদের? কস্টারের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল ওর কাছে। কিন্তু সে তো দূরের কথা, জঘন্য ব্যবহার করেছে সে ওর সঙ্গে। ও নিজে একজন উচ্চ-শিক্ষিত লোক, ওকে কিনা লেকচার ঝাড়ত সেই অশিক্ষিত মূর্খটা। যে লোক জীবনে শনিগ্রহের নামটাও শোনেনি। হাস্যকর! কিন্তু না, এই সব বর্বরদের হাতের মুঠোর ভিতরে থাকাটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়। নিজের জীবন বিপন্ন করছে ও আর কি ব্যবহারটাই করছে ওরা ওর সঙ্গে! এখানে এই মিউনিকে ইচ্ছে করলে ও ভদ্র কাপড়চোপড় কিনতে পারে—প্রাগের মতো নয়—কিন্তু টাকা কোথায়? স্মিডলও যে কস্টারের চাইতে ভালো, তা মনে হয় না। টাকার কথা তুলল কেন? নির্বোধ! স্মিডলকে যদি ও জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয় তবে? ফ্রেইম্যানের সঙ্গে যদি ওকে যোগাযোগ না করিয়ে দেয় ও তবে কোনো কিছুই করতে পারবে না স্মিডল প্রাগে গিয়ে।

তারপর ওর মনে হল যে, অন্ততপক্ষে স্মিডলকে লাগিয়ে দেয়া যাক ফ্রেই-ম্যানের পেছনে। যদি না ওরা প্রাগের ব্যাপারট্যাপার সব কিছু ঘুলিয়ে তোলে.

তো ও, জেইদা, এখানেই খ‍ুঁটি গাড়বে। তাছাড়া বিচার বলেও তো কিছ‍ু একটা জিনিস থাকতে পারে। ধরা পড়ুক ওরা, বিচার হোক, ফাঁসী যাক। কেনই-বা ও একা একা দ‍ুর্ভোগ ভুগে মরবে? ভালোই হয় আমেরিকানটা যদি দোবেককে প্যাঁচ কষতে যায়। ঢের পাশ কাটিয়ে চলেছে লোকটা। অন্যদের ভিতরে ও নাম দেবে ডাঃ স‍্ভেৎনিককার, ইঞ্জিনিয়ার ফ্রাইসেক, অধ্যাপক ভালার। যখন জেইদা গিয়ে প্রস্তাব করেছিল ওদের কাছে তখন এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন মজা দেখা যাক, এবার ওরা কি বলে। আমেরিকানটা হয়তো জিজ্ঞেস করবে পরিচয় হিসেবে জেইদার নামটা ব্যবহার করতে পারে কি না। গেস্তাপোর ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজগ‍ুলো ঢের চ্যাঁচামেচি করেছে বটে, কিন্তু ওর বিশ্বাস কোনো ভদ্র-লোকই সে-কথা বিশ্বাস করেনি। লোক হয়তো ধরে নিয়েছে যে ওদের সঙ্গে একমত না হওয়ায় কমিউনিস্টরা ওরা গায়ে কাদা ছিটিয়েছে। ও বলবে স্মিডলকে যে সে ওর নাম ব্যবহার করতে পারে। হয়তো স্মিডল কস্টারের চাইতে একট‍ু কম বর্বর। এক হাজার মার্ক চাইবে ওর কাছে জেইদা। আমেরিকানদের পক্ষে সেটা তেমন কিছ‍ুই নয়। কিন্তু ও তাহলে একট‍ু ভদ্র পোশাকআশাক করে নিতে পারে। আর যা-ই হোক ও তো আর একজন মাম‍ুলি আশ্রয়প্রার্থী নয়। এক দিক থেকে দেখতে গেলে ও চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে।

পরদিন সকালে জেইদা বলল স্মিডলকে:

প্রথম গিয়ে আপনি দেখা করবেন ফ্রেইম্যানের সঙ্গে। লোকটা সম্প‍ূর্ণ বিশ্বস্ত। সে-ই হচ্ছে সংগঠনের প্রাণ। তাছাড়া এই একটা ছোট তালিকা।

স্মিডল ট‍ুকে নিল, তারপর আনন্দে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। এক কাপ কফি খাওয়ার পরে যেন হঠাৎ বলছে এমনিভাবেই জেইদা বলল:

কাল আপনি টাকার কথা তুলেছিলেন। সে টাকা বহ‍ুদিন আগেই খরচ হয়ে গেছে। ফ্রেইম্যানের কাছে জিজ্ঞেস করলেও জানতে পারবেন সে-কথা। এখানে দার‍ুণ কষ্টের মধ্যে আছি আমি। আমাকে অন্তত হাজার খানেক মার্ক দিতে হবে আপনাকে। নইলে কিছ‍ুতেই আর চালাতে পারছি না।

টাকাকড়ির ব্যাপারে স্মিডলের মনটা খ‍ুব নীচ নয়, কিন্তু জার্মানিতে এ-ধরনের ভিক্ষ‍ুকদের সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। নিদার‍ুণ বিরক্তির সঙ্গে মনে হল ওর যে ইউরোপীয়ানরা বোধহয় ঠিক করেছে যে আমেরিকানদের ঘাড়ে বসে খাবে। জেইদার চেহারাটা ভালো লাগেনি ওর: ঐ বো-টাই, কোটের কলারের উপরে স্কার্ফ কুঁতকুঁতে পানসে চোখ। লোকটা নিশ্চয়ই ভীষণ পাজি।

আপনার ভাগের অংশ পেয়ে গেছেন আপনি, ব্যস।—খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল স্মিডল।—আপনি ভাবেন ব‍ুঝি যে এমনি পরগাছার অভাব আছে কিছ‍ু আমাদের? রেডিও থেকে আপনি টাকা পান, পান না? যে-কোনো রকমেই হোক আমাদের ঘাড়ে বসেই তো খাচ্ছেন। আমার নিজের পকেট থেকে আমি একশো টাকা দিচ্ছি আপনাকে, কিন্তু একটা শর্তে—আর কখনো চাইবেন না। আপনার কফির দামটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, এখন চলে যেতে পারেন আপনি।

জেইদার দার‍ুণ ইচ্ছে হল যে বলে, তুই একটা পায়াভারি হারামজাদা, তার বদলে নোটটা তার জীর্ণ মানি-ব্যাগের ভিতরে প‍ুরে ফেলতে ফেলতে বলল:

আমার সঙ্গে অন্য সুরে কথা বললেই ভালো করতেন, তা সে যাকগে—আদব-কায়দার দিক থেকে বাহ্যিক ভদ্রতার চাইতে বাস্তবতারই আপনি পক্ষপাতী। কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাই বলিনি আমি আপনার কাছে এখনো। লালদের সঙ্গে কাজ করে এমন একজন বিখ্যাত লোক আমাদের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। রুদে প্রাভোতে দেখবেন আপনি তার নাম। সবাই চেনে তাকে। কিন্তু মনে রাখবেন তিনি খুব গোপনতা অবলম্বন করে থাকেন। ফ্রেইম্যান বা অন্য কারুর কাছেই বলবেন না তাঁর কথা। ওরা জানে না যে তিনি আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। একমাত্র আমিই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। যখন আর কেউ থাকবে না আপনি বলবেন, 'এক জেহাদীর একটা লাল খাতা আছে'—এটাই হল সাংকেতিক কথা। প্রার্থনা করি আপনি সফল হোন।

জেইদা ভাবল একশো মার্ক দিয়ে এক জোড়া ধূসর রঙের ট্রাউজার আর একটা সার্ট কিনবে। কিন্তু তার বদলে ঘরে গিয়ে পরবর্তী বেতার ভাষণের জন্যে বক্তৃতা লিখতে বসল। লিখল অতীতের প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা। যে-সব অধ্যাপকরা লাল-জুলুমের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছেন তাঁদের গাল পাড়ল। তারপর সাধারণ খানা খেয়ে নিল। সন্ধ্যেয় প্রতিদিনের মতো, যেমন খায় ঠিক করল তেমনি খাবে মেনারের কেকের দোকানে: ইউক্রেনিয়ার লোকটি চাইছিল নিখিল ইয়োরোপীয় সম্মেলন ডাকার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে আর হাঙ্গেরিয়ার লোকটিকে বলতে হবে যে বেতার স্টেশনে যে মাইনে দিয়ে থাকে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। একটা যুক্ত প্রতিবাদ করা দরকার ওদের। কিন্তু তার চাইতেও আর একটা কথা মনে পড়ল ওর, আর চলে গেল লুৎসির কাছে। পথে যেতে যেতে এক বোতল মদ কিনে নিল।

ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল লুৎসি। বলল সে আর একজন বন্ধুকে কথা দিয়েছে তার সঙ্গে সিনেমায় যাবে বলে। পঞ্চাশ মার্ক জেইদা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল:

এক জোড়া মোজা কিনে নিও।

কারণে অকারণে সব সময়েই হাসছে লুৎসি। তাতে জেইদার মনে খানিকটা প্রশান্তি ফিরে এল। সেই চটচটে মিষ্টি মদ খেতে লাগল আর ক্রমেই ওর চেতনা এল ঘোলাটে হয়ে। ওর মনে হল ও যেন রয়েছে প্রাগে, ঘটেনি কোনো কিছুই—গেস্তাপো নেই, নেই জেহাদীরা, নেই পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার। সুন্দরী লিদা যাকে ও একবার বিয়ে করবে বলে মনস্থ করেছিল, সে রয়েছে ওর পাশে। অলস হাতে লুৎসিকে জড়িয়ে ধরে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে কোথায় আছে ভেবে অবাক হয়ে গেল। ঘুমন্ত লুৎসির দিকে চোখ পড়তেই মনে পড়ে গেল সব কথা। দুঃখ হল ওকে পঞ্চাশটা মার্ক দিয়ে দিয়েছে বলে। কুড়ি মার্ক দিলেই ঢের হত। এখন এত কম আছে যে ট্রাউজারের কথা এখন ভাবনার বাইরে। হঠাৎ ওর কল্পনার চক্ষে ভেসে উঠল; স্মিডল যেন প্রোজাককার কাছে গিয়ে বলছে, "এক জেহাদীর একটা লাল খাতা আছে।" খুব চমৎকার বুদ্ধি করা গেছে। ও জানে যে প্রোজাককা ওকে ছেড়ে দেবে না। বিচার হবে। দারুণ ক্ষেপে যাবে আমেরিকানটা। কিন্তু তাতে ওর

নিজের আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের স্বার্থ রক্ষা হবে। ও যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে ঐ লাল-মুখো লোকটাকে যখন জেলখানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন ওর চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে।

এ কথা ভেবে আর হাসি চেপে রাখতে পারল না জেইদা। হো হো করে হেসে উঠল। লুৎসির ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পেয়ে পার্টিশনের দেয়ালটার দিকে ইশারা করে বলে উঠল:

চুপ কর! পাশের লোকগুলো ভারি খারাপ। ওরা কি যে বলবে না বলবে তা ভগবানই জানেন।

মনে মনে দারুণ খুশী হয়ে উঠেছে জেইদা। খেলাচ্ছলে ওকে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল:

রাগ করো না লক্ষ্মী মেয়ে। ভারি মজার একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু সেটা কি, এখন আর মনে নেই।

রুডলফ ভিগলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত নিদারুণ দুরবস্থায় দিন কেটেছে রিশতারের। স্মিডলের হাত থেকে এড়াবার জন্যে প্রথমে চেষ্টা করেছিল কোয়েনিগসবের্গ-এর অধিবাসী হিসেবে জোহান স্যাকস নামে পাসপোর্ট ও ভিসা করিয়ে ইংরেজ এলাকায় গিয়ে বাস করতে। তার জন্যে লোটির কাছ থেকে আনা টাকার দুশো মার্ক দিয়ে দিল। হিলদার বাবা থাকতেন হ্যামবুর্গে। তাঁর কাছে গিয়ে বলল রিশতার যে হিলদার খুব অসুখ। কিন্তু সে চায় না সে কথা তার বাবাকে জানাতে। একটা অস্ত্রোপচার একান্ত দরকার, কিন্তু টাকা নেই ওর হাতে। এমন গভীর আবেগের সঙ্গে সে হিলদার কথা বলতে লাগল যে তার চোখে জল এসে গেল—নিজের জন্যে দুঃখে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল সে। ওর শ্বশুর ওকে দিল আটশো মার্ক। আবার আসবে বলে রিশতার কেটে পড়ল চিরদিনের মতো।

ও চেষ্টা করল কাজ জুটিয়ে নিতে। টাই বিক্রি করল, বিক্রি করল স্যালভেশন আর্মির ঠিকানা লেখা খাম, রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে ফিরল বিজ্ঞাপনের ইস্তাহার। অভাব অনটন আর ভয়ে দিন কাটতে লাগল ওর। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা, এই বুঝি ওকে ধরে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দেয় যে কেন ও লালদের জন্যে কাজ করেছে।

একদিন দারুণ শ্রান্ত হয়ে শীতে কাঁপছিল, তখন ছোট একটা বিয়ারের দোকানে দেখা হল ওর বিনাইকের সঙ্গে। ওর সঙ্গে একই রেজিমেণ্টে ছিল বিনাইক। রিশতার যখন বিয়ার খেতে খেতে গাল পাড়ছিল, বিনাইক বলল:

ঠিকই বলছ তুমি, ব্যাপারটা সত্যিই দমে যাবার মতো সন্দেহ নেই। কিন্তু মাথা খারাপ করে তো কোনো লাভ নেই। কর্পোরাল ভিগলকে মনে আছে তোমার? আরে সেই যে ছোকরা ফেলডভেবেল ইংগেলের কাছ থেকে যে হাঁসটা ঠকিয়ে নিয়েছিল।

নিশ্চয়ই মনে আছে তাকে। আমরা যখন অবরোধের ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছিলাম তখন ওকে বাঁচাই আমি।

সে তোমাকে সাহায্য করবেখন। দারুণ দারুণ সব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওর। সে আমাকে বলেছিল ফ্রাংকফুর্টে চলে আসতে। কিন্তু আমার পরিবার রয়েছে—তাছাড়া এখন আমার পক্ষে কারখানা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আজকাল কোনো খদ্দেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তুমি যদি গিয়ে ভিগলের সঙ্গে দেখা কর তবে সঙ্গে সঙ্গেই সে তোমাকে একটা কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। যাওয়ার ভাড়াটা আমি নগদ দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। হাজার হোক দু দুটো বছর আমরা লড়েছি তো এক সঙ্গে। সেটা কিছু আর চাট্টিখানি কথা নয়।

ফ্রংকফুর্টে যাওয়া আমার দ্বারা হবে না—প্রত্যুত্তরে বলল রিশতার।—বার্লিনে

যে আমেরিকানটার সঙ্গে আমার গোলমাল হয়ে গেছে তার সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যায় তবে আমাকে সে কেটে টুকরো করে ফেলবে। ভীষণ লোক সে। পূব অঞ্চলে কাজ করেছি বলে আমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছে।

হেসে উঠল বিনাইক।

ভিগলকে যদি গিয়ে একবার ধরতে পার তবে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে বলছি আমি বিশ্বাস কর অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তার। মেজর রাম্‌কে মনে আছে তোমার? আঠারো জন ইংরেজ বন্দীকে গুলি করে মারার জন্যে জেলে পচছিল সে। তার বৌটা তো আর একটু হলে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলছিল আর কি। ভিগল বলল, একটু বলে দেখবে সে ওর জন্যে। পনেরো দিন পরে মেজরের বৌ আহত শূকরীর মতে চিঁচিঁ করে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এসে বলল যে রাম্‌ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এসে ওর প্রেমিকের চোঁয়াল ভেঙে দিয়েছে ঘুষি মেরে। একটি কথা যদি বলে দেয় ভিগল তবে কেউ আর তোমার চুলের ডগাটুকুও ছুঁতে পারবে না।

কিন্তু কি করে সে, ঐ ভিগল? সে কি আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছে?

কোনো প্রয়োজন নেই তার। দোকান আছে। বীজ বিক্রি করে আর ডাচ বাল্‌ব। আমাকে বলেছিল যে ওর কাছে নানান জাতের হায়াসিন্থ রয়েছে।

মনে মনে গাল পাড়ল রিশতার। তবুও তার ঠিকানাটা টুকে নিল।

কিছুদিন পরে সে ঠিক করল, ভিগলের কাছেই যাবে। ইচ্ছে করলে স্মিডল হ্যামবুর্গেও ওকে খুঁজে বের করতে পারে। এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াও ভালো।

সন্ধ্যের সময়ে রিশতার গিয়ে পৌঁছাল ফ্রাংকফুর্ট-এ। অতি কষ্টে খুঁজে বের করল ভিগলের আস্তানা। শহরতলির একটা ছোট্ট বাড়িতে বাস করত ভিগল। প্রথমে ওকে চিনতে পারল না ভিগল। আর একটু হলে ওর মুখের উপরেই দোরটা বন্ধ করে দিয়েছিল আর কি। কিন্তু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল: কুর্ট!

সে সন্ধ্যেটা দুজনে যুদ্ধের দিনের স্মৃতি মন্থন করে কাটিয়ে দিল। ওদের কথা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলল ভিগলের বৌ। তারপর রিশতারকে নিয়ে গেল ভিগল স্নানের ঘরে। এক জোড়া সুন্দর সিল্কের পাজামা বের করে দিল ওকে পরতে:

কাল সব কিছুরই ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে। কিন্তু সব প্রথম কথা হচ্ছে ভালো করে একটু বিশ্রাম করে নাও।

পরিষ্কার নীল জলে গা ডুবিয়ে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল রিশতার। ওর মনে হল যেন ফিরে এসেছে বাড়ি। পাশের রান্নাঘরে হিলদা ধোয়ামোছা করছে। হঠাৎ রেগে গিয়ে মনে মনে বলে উঠল: বুড়ী কুত্তী! ভিগল যদি ওকে একটা কাজ খুঁজে দেয় তবে সুন্দরী দেখে একটি মেয়েমানুষ রেখে দেবে। হিলদা ওর নাড়িনক্ষত্র জানে। বিগত জীবনের উপরে ঘৃণা ধরে গেছে ওর।

পরদিন সকালে ভিগল ওকে নিয়ে গেল শহরের ভিতরে।

আমাকে চিনে ফেলতে পারে,—ভয়ে ভয়ে বলে উঠল রিশতার।

বাজে ব'কো না। মেজর শ্যুরকে দেখা করছেন তোমার সঙ্গে। আর তারপর কোনো আমেরিকানই আর তোমাকে ছ্যুঁতে পারবে না। লালদের জন্যে একটা স্কুলবাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলে তুমি, কি হয়েছে তাতে? যদি তুমি খোদ একজন লাল কমান্ডরও হতে তাতেও এসে যেত না কিছ্যু, কিছ্যুই করতে পারত না তোমার। শ্যুরকের একটা কথার যে কি দাম তা জান না তুমি।

রিশতার ঠিক করল, সব কথা খ্যুলে বলবে শ্যুরকের কাছে: কেমন করে ও ব্যথাই চেষ্টা করেছিল স্থপতিদের গোপন সংগঠনে ভেড়াতে। কেমন করে স্মিডল চাইছিল ও স্টেডিয়াম তৈরি কর্যুক। এক কথায়, সব কিছ্যু। ও করলও তাই। মনোযোগ দিয়ে ওর সব কথা শ্যুনে বলল শ্যুরকে:

স্মিডল সম্পর্কে অতটা অতিরঞ্জিত গ্যুর্যুত্ব দেবার দরকার নেই। অবশ্য লোকটা খ্যুবই উৎসাহী কিন্তু আসলে কল্পনাবিলাসী। আমেরিকানরা চায় 'মাইন রিডে'র নিয়মকান্যুন চালচলন জার্মানিতে রপ্তানি করতে। ওটার উপরে তেমন গ্যুর্যুত্ব দিও না। অধিকৃত এলাকার অভিজ্ঞতা আছে তোমার। হয়তো মনে মনে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে দেখেছ কারা বেশি খারাপ—আমেরিকানরা না র্যুশরা।

না। আমেরিকানরা খারাপ, কিন্তু র্যুশরা অসম্ভব। তিন বছরের উপর লড়েছি র্যুশিয়ায়, চিনি ওদের আমি। তারপরে আমি কাজও করেছি র্যুশ এলাকায়। ও, খ্যুব ভালো ব্যবহারই আমি পেয়েছি ওদের কাছ থেকে। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো অভিযোগই নেই ওদের বির্যুদ্ধে। তব্যুও আমেরিকানদের হাতে গ্যুলি খেয়ে মরব তাও ভালো তব্যু কমিউনিস্টদের কাছ থেকে সোনার মেডেল চাই না।

ম্যুচকি হাসল শ্যুরকে:

কী চমৎকারই-না ব্যুঝতে পারছি আমি তোমাকে! আমিও লড়েছি ইস্টার্ন ফ্রন্টে। কিন্তু আমেরিকানদের গ্যুলিও তেমন লোভনীয় কিছ্যু নয়। যা-ই হোক, ভয় করার মতো কিছ্যুই নেই তোমার। জেনারেল হয়েস আর প্যুলিস উভয়কেই জানিয়ে দিয়েছি আমি। তুমি যে লালদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছ তাতে সবাই খ্যুশী। এটা যদি নেহাত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারই হত তবে এতক্ষণে আমরা আলোচনা শেষ করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু অন্য একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই তোমার সঙ্গে। ভিগল তোমার সম্পর্কে স্যুপারিশ করে বলেছেন যে তুমি একটি ব্যুদ্ধিমান লোক, তাছাড়া খাঁটি জার্মান। যে সব বাড়ি তুমি তৈরি করেছিলে তার কথা মনে আছে আমার। আসলে, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই সব খবরই আমি পেয়েছি তোমার সম্পর্কে। আচ্ছা শোন হের রিশতার, আমাদের আশেপাশে কি সব ঘটে যাচ্ছে বল তো? কঠিন অবস্থা আমাদের। জার্মানি আবার জার্মানি হয়ে উঠ্যুক তা চাও কি তুমি?

এমন গভীর আবেগের সঙ্গে বলল শ্যুরকে যে রিশতার অন্যুভব করল আবার যেন ওর ভিতরে ফিরে এসেছে যৌবনের তেজ, উন্মাদনা। ভুলে গেছে ওর ভয়, নৈতিক গোঁজামিল, ওর সন্দেহ। আবার যেন ও সেই উনিশশো চল্লিশ সালের

সেই রিশতারে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে যে নাকি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করত:

আমরা ঝড়!

এর জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আমি।—প্রত্যুত্তরে বলল রিশতার,—আমার দিক থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের বাইশে জুন আর শেষ হয়েছিল তিরগার্টেনে।

ভিগল সাবধান করে দিয়েছিল শুরকেকে যে রিশতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, ভয় পেয়েছে দারুণ আর কি করতে হবে না হবে কিছুই বোঝে না। শুরকে তার জন্যে দোষ দিল না স্থপতিকে। কারণ তিন বছর বন্দীজীবন কাটিয়ে এসেছে সে রুশদের হাতে। অফিসার ইউনিয়ানের আবেদনে সহি করেছে, প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে বুঝতে পেরেছে জার্মানির অপরাধ, নিন্দা করেছে নাৎসীবাদের। তখন মনকে বোঝাত যে এটা হচ্ছে নিছক কৌশল মাত্র, সাধারণ গাঢাকা দেয়ার ব্যাপার। সবই হচ্ছে অদৃষ্ট, অভিশপ্ত বিধিলিপি। জার্মানিতে ফিরে আসার আগে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল যে ওর আন্তরিক আগ্রহ আছে নতুন রিপাবলিক গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করতে। পরে বন্ধুদের কাছে হাসতে হাসতে বলেছিল: গোপন অবস্থায় আমাকে আমার কার্যসূচী বদলাতে হল। ফ্রোইডরিশস্ট্রেসিতে যখন ট্রেনে উঠলাম তখন আমি প্রায় একজন মার্কসবাদী। কিন্তু দশ মিনিট পরে যখন জু স্টেশনে নামলাম আমি তখন একজন ডিমোক্রাট, বা যেমন বলতে শিখিয়েছে আমাদের—একজন ধনতন্ত্রের চর।

শুরকে প্রথমে দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছে গেল ব্যাভেরিয়ায়। পরে চলে এল ফ্রাংকফুর্টে। এখানে এসে গঠন করল "সৈনিক সংঘ"। এখানে এসে শুনল কি অবস্থায় ওর ছেলে মারা গেছে ফ্রান্সে পার্টিজানদের গুলিতে। দুঃখে হতাশায় মারা গেল ওর স্ত্রী নিঃসঙ্গ অবস্থায়। সর্বত্র দেখতে পেল ধ্বংস-স্তূপ। মাঝে মাঝে মনে হত ওর নিজের জীবনটাও যেন একটা বোমা-বিদ্ধস্ত বাড়ি। রিশতারের মনের বিচলিত অবস্থা বুঝতে পারল শুরকে। আর তাই জানত যে সে ওকে এনে দিতে পারবে নতুন মনোবল, অর্জন করতে পারবে ওর বিশ্বাস আর পারবে ওকে কাজ লাগাতে। তীক্ষ্ন সন্ধানী অথচ সমবেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওকে। যেন ওর সমস্ত পাপ ধুয়েমুছে নিচ্ছে। সত্যিই ওকে দেখাচ্ছিল যেন একজন বৃদ্ধ পুরোহিত, তেমনি পাকা চুল, গভীর নীল চোখ, তেমনি পাতলা—প্রায় বোঝা যায় না এমন ঠোঁট।

একজন জার্মান যেমন করে আর এক জনের সঙ্গে কথা বলে তেমনিভাবেই কথা বলছি আমি তোমার সঙ্গে। এখন ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে সব দোষ ফুয়েরারের কাঁধে চাপান। মানুষ অমনিই। আজ যদি ফুয়েরার জিততেন, সবাই তাকে মহাপুরুষ বলত। আজ একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝে ফেলেছে যে পশ্চিমী শক্তিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে রুশ আক্রমণ ঠিক হয়নি। ঠিকই বলেছ তুমি, যদি লালদের আর আমেরিকার মধ্যে কাউকে বেছে নিতে হয় তবে আমরা আমেরিকাকেই বেছে নেব। হিটলার এটা বুঝতে পারেন নি। ফলে আমরা যুদ্ধে হেরে গেলাম। জার্মানির শত্রুরা হাত মিলাল। ওরা খুশি-মতো হুকুম চালাল আমাদের উপরে। কিন্তু সে অবস্থা শেষ হয়ে আসছে।

আমেরিকানরা বুঝতে পেরেছে যে আমাদের বাদ দিয়ে ওরা লালদের ঠেকাতে পারে না। কিন্তু স্মিডল কিছু একটা ব্যতিক্রম নয়। ওরা বিজেতার মনোভাব ছাড়তে পারেনি এখনো। অবশ্য ওদের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া করতেই হবে, তাছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সেটাও সম্ভব একমাত্র সমানে সমানে। আমি জানি হের রিশতার, তুমি একজন প্রতিভাবান স্থপতি। অন্য যে কোনো সময় হলে তুমি আমাদের দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্যে কাজ করতে পারতে। কিন্তু বল দেখি আমাকে, যেখানে জার্মানির অস্তিত্ব নেই সেখানে কেউ কি বাড়ি তৈরি করতে পারে কখনো? মন দিয়ে শোন আমার কথা, অনেক কিছুই নির্ভর করছে তোমার উপরে। দেশকে বাঁচাবার অন্যতম একজনার ভূমিকা তুমি গ্রহণ করতে পার—একজন বীরের ভূমিকা। সমস্ত জার্মান জাতিকে বলবে তুমি যে আমরা ন্যায় বিচার চাই, আমরা আমেরিকানদের ভাড়াটে গুন্ডা হতে পারব না।

আমেরিকানরা তো আগেভাগেই আমাকে শেষ করে ফেলতে চাইছে,—বাধা দিয়ে বলে উঠল রিশতার।

ওরা তোমার চুলের ডগাটুকুও ছুঁতো সাহস করবে না। আমি যা বলছি তা ভালো করে বুঝেশুনেই বলছি। কাল খবরের কাগজগুলো তোমার আগমনের সংবাদ ঘোষণা করবে। মনে রেখ—তোমার একটা খ্যাতি আছে। তুমি থেকে এসেছ লাল-এলাকায়, তুমি ভূতপূর্ব সেনাবাহিনীর লোক। তাছাড়া যেটা বিশেষ করে বড় কথা সেটা হচ্ছে এই যে তুমি কোনোকালে নাৎসী দলে নাম লেখাওনি। জেনারেল গ্যাবলারের ছেলের মুখে শুনেছি তুমি তার বাবার বন্ধু ছিলে। হিটলারের প্রাণনাশের চেষ্টা করার পরে শেষ হয়ে গেছে জেনারেল। ষড়যন্ত্রকারীরা ভুল করেছিল কি ঠিক করেছিল সে সম্পর্কে এখন আমি কোনো মতামত প্রকাশ করতে যাচ্ছি না, কিন্তু গ্যাবলার ছিল একজন চমৎকার সৈনিক, একজন খাঁটি জার্মান। তার স্মৃতি ভুলে যাবে না কখনো। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সেরা ছেলেরা তোমার আশেপাশে এসে জমা হবে।

নির্বাক হয়ে গেল রিশতার। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বলল:

কোনোদিন আমি রাজনীতির ধার ধারি নি। তাছাড়া যে কাজ আপনি নিজে আমার চাইতে ঢের ভালোভাবে করতে পারেন, সে কাজের কেন ভার আমাকে দিতে চাইছেন তা বুঝলাম না।

আমার অতীত জীবনই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভুল স্বীকার করতে চাই না আমি—সেটা অপমানকর। অবশ্য এ কথা ঠিক যে নাৎসী দলের উপরে আমি অনেক বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু মিউনিকের ট্রাইবুনাল খালাস দিল আমাকে। এমনকি ঐ ভাড়াটে পা-চাটাগুলো পর্যন্ত আমার দেশপ্রেমকে অপরাধ বলে ব্যস্ত করতে সাহস পেল না। কিন্তু তবুও আমি মুক্ত নই। আমি যা ভাবি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। তাছাড়া সৈনিক সংঘের দায়িত্ব রয়েছে আমারই হাতে। ওটা একটা অ-রাজনৈতিক সংগঠন। এর সভাপতি হিসেবে রোজই আমাকে আমেরিকানদের সঙ্গে কাজকারবার দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়। ভাবতে পারবে না কি যে নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে বাস

করছি আমরা! একটা সময় ছিল যখন জেনারেল হয়েস আমাদের বাক্যবাগীশ অফিসারদের চাইতে ভালো ব্যবহার করত। সময় এসেছে এখন জার্মানদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তাদের যে জার্মানি লুক্সেমবুর্গ বা মোনাকো মাত্র নয়। তুমি একজন খ্যাতিমান স্থপতি, রাজনীতি নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, সত্যিকারের জার্মান সংস্কৃতির প্রতিনিধি। দেশের গৌরবের দিন তুমি দেখেছ, দেখেছ মর্মান্তিক দুঃখের দিনও। লালদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রয়েছে তোমার আর এখন দেখছ আমেরিকানদের। তোমাকে আওয়াজ তুলতে হবে। পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো আজ দেউলে। একটা নতুন দল গড়ে তুলতে হবে—সত্যিকারের জনগণের পার্টি, যে পার্টি দাবি করবে আমেরিকানদের কাছে যে যদি তোমরা জার্মানির জন্মগত অধিকার না স্বীকার করতে চাও অন্তত তার সমকক্ষতার অধিকারটুকুর স্বীকৃতি দাও।

আর আপনি কি মনে করেন এ-রকমের একটা দল গড়ে তোলা নিষিদ্ধ করে দেবে না ওরা?

নিশ্চয়ই না। এটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল নয়। আমাদের একান্ত প্রয়োজন ওদের। ভেবে দেখো একবার: ওরা চায় জার্মান সৈন্যেরা লালদের হাত থেকে ওদের বাঁচাক। আর ওদিকে কি না জার্মান সেনাপতিরা এখনো পচে মরছে জেলখানায়! একমাত্র লুক্সেমবুর্গ জেলেই আমাদের কতজন যোদ্ধা বন্ধু ধুঁকে মরছে! এ কি অসহ্য নয়? আসল যেটা দরকার সেটা শুধু অন্যায়ভাবে যে-সব ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র জার্মান বাহিনীকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার। ঢের বলাকওয়া হয়েছে, অত্যাচার উৎপীড়নের কথা! লালদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করলাম সেটা ছিল গৃহযুদ্ধ, আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা দাঁড়াইনি। এখন আমেরিকানরা চায় লালদের হটিয়ে দিতে। নিশ্চিত জেনে রেখো ওরাই 'অত্যাচার উৎপীড়নের' অভিযোগ তুলে নেবে আমাদের উপর থেকে। নুর্নবুর্গ প্রহসন যতদিন পর্যন্ত না বাতিল করে দেয় ততদিন আলাপ-আলোচনা চালাবার কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। এখন দেখ কতদূর কি করতে পার তুমি। জার্মানিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর। তোমাকে শুধু সমস্ত সৎ জার্মানদের ডেকে বলতে হবে তোমার কথা, তাহলেই নতুন পার্টি বিদেশীদের বাধ্য করবে জাতির আকাঙ্ক্ষাকে সমীহ করে চলতে। তুমি বলেছিলে জার্মানির জন্যে তুমি মরতে প্রস্তুত। না, হের রিশতার জার্মানির জন্যে বাঁচতেই হবে তোমাকে!

শুরকে উঠে দাঁড়াল। তারপর রিশতারের কাছে এগিয়ে এসে ওকে আলিঙ্গন করল। চোখে জল এল রিশতারের। বুঝতে পারল কত বড় গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে ওর উপরে।

যখন সে ভিগলের শান্ত ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এল, এসেই কাজ নিয়ে বসল। একটা আবেগপূর্ণ আবেদনপত্র লিখে ফেলল। তার ভিতরে ঢেলে দিল তার দীর্ঘ দিনের বেদনাময় অভিজ্ঞতা, তার শংকা, ক্রোধ আর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ওটা পড়ার পরে ভিগল বলল:

এ-যেন থিয়োডোর কুর্নারের গানের মতো শোনাচ্ছে।—তারপর সে পান্ডু-

লিপিটা নিয়ে চলে গেল।

যখন ফিরে এল, দেখল হতাশ হয়ে বসে রয়েছে রিশতার। ওকে চাঙগা করে তোলার জন্যে এক বোতল 'কুমেন' বের করে আনল ভিগল।

শুরেককে কথা দিয়েছি, আমি কথা দিয়ে কখনো কথার খেলাপ করি না।— প্রথম গ্লাস খাওয়ার পরে বলল রিশতার।—কিন্তু আমি জানি যে আমিও গেছি শেষ হয়ে। স্মিডলের সঙ্গে প্রথমটায় শুরু হয়েছিল যেন কবিতা, কিন্তু শেষ হল স্টেডিয়ামে। কাল শুরেকে বলবে যে আমাকে আমেরিকান হেড কোয়ার্টারটা উড়িয়ে দিতে হবে। বাস্তবিক, আমার পক্ষে এখন সবই এক-ই কথা। সব কিছুই উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছি আমি—আমি তো এখন হয়ে দাঁড়িয়েছি একটা জুয়াড়ী।

এক ঘণ্টা পরে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল:

আমরা যখন মিনস্কের অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসি তখন আমি বাঁচিয়ে ছিলাম তোমাকে। আর তার বদলে তুমি আমার সর্বনাশ করে দিলে। মনে আছে তোমার কেমন করে তুমি বসে পড়ে চিৎকার করছিলে যে এক ইঞ্চিও তুমি আর পেছু হটবে না? তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসতে হল আমাকে। কটা-চুল কার্ল যখন মারা পড়ে তখন। মনে আছে তোমার? সেই কুয়োর পাড়ে পড়ে থেকে রক্তবমি করছিল। হ্যাঁ, আমি তোমাকে টেনে বের করে নিয়ে এসে-ছিলাম। আর আজ তুমি চাইছ আমি যাতে ইঁদুরের মতো মরি।

মাথাখারাপ হয়ে গেছে তোমার, কুর্ট? একবার ভেবে দেখ দেখি যখন এখানে এসে উঠেছিলে তখন তোমার কি হাল হয়েছিল। একটা ভিখারীর মতো চেহারা ছিল তোমার। এমনকি নিজের নামটা পর্যন্ত ভাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলে। আর আজ সবাই তোমাকে স্থপতি কুর্ট রিশতার বলে চেনে।

ওঃ, থাম! সত্যি কথা, আমার ভিখারীর হাল হয়েছিল। কিন্তু এখন আমার চেহারা হয়েছে জলে-ডোবা মানুষের মতো। তুমিই আমাকে এক-গলা কাদার ভিতরে ডুবিয়ে দিয়েছ। আজ আর আমি একজন স্থপতি নই, আমি একটা জুয়াড়ী মাত্র। ইতিহাস সৃষ্টি করে করে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছি। আমি চাই এখন একটু পালকের বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে। ঐ পচা গোবর-গোলা আরো খানিকটা দাও তো আমাকে। বীটন যখন মদ খেত তখন তার গোঁফ জোড়া কুঁচকে যেত। মারা গেছে সে দেসনায়। কিন্তু আমরা দুজন বেঁচে গেলাম। ভেবেছিলাম যদি একবার চলে আসতে পারি তবে এই সমস্ত নোংরামির শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল এই শান্তি যুদ্ধের চাইতেও জঘন্য। প্রতিভাবান স্থপতি কুর্ট রিশতার আজ আর বেঁচে নেই। হয়তো সে নতুন 'পার্থেলন' গড়ে তুলতে পারত। তার পরিবর্তে কাল ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে একটা ফটকাবাজ। আর সেখানেই শেষ। এ সম্পর্কে আর একটি কথাও না। তোমার স্ত্রী কোথায়?

তার মায়ের কাছে গেছে, আসবে শিগগিরই। কুর্ট শোন, ও যখন এখানে থাকবে তখন ও-সব নোংরা কথাগুলো ব'লো না। ওর ফিটের অসুখ আছে। এখন তুমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়ে নিতে পারবে তোমার কাছে। এখন আরো খুশী হবে।

অবাক বিস্ময়ে হা করে রইল রিশতার:

এর পরে হয়তো তুমি বলবে যে আমি ভোলকসপলিজির অধিকর্তাকে নিয়ে আসব আমার কাছে! লালদের ওখানে আমি যে কাজ করতে গিয়েছিলাম তা স্রেফ ঐ হিলদার জন্যে। জানি না মাগী কোথায় জন্মেছিল—স্পান্দাও, না স্মোলেন্স্কে! শোন, একটা কথা মনে রেখো এখন থেকে—আমার কোনো স্ত্রী নেই, আমি জুয়াড়ী তাই আমি আবার একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করব. চির বিদায়ের অভিনন্দন হিসেবেই বিয়ে করব ফুয়েরারের মতো। তারপর মরে যাব। এখন আমি একটু ঘুমোতে চাই। তোমার ঐ নোংরা পচা গোবর-গোলা গিলিয়েছ বলেই ঘুমাব।

দারুণ মাথাধরা নিয়ে পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল রিশতারের। কিছুই নেই তার জন্যে। নতুন কাজটায় একবার হাত লাগিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এখানটায়ই যে মনে হচ্ছে যুদ্ধটা যেন শেষ হয়ে যায়নি। মন্দের ভালো যে শুরকের মুঠো তেমন শক্ত নয়। লোটির মতো একটা ছুকরী খুঁজেপেতে নিতে পারে এখন। ভিগল বলেছে যে বার্লিনের চাইতে এখানকার রেস্তোঁরা ভালো। তাছাড়া শুরকের কথাও ঠিক: কাল কিংবা পরশু যখন বোমা পড়বেই, তখন আর বাড়ি তৈরি করে লাভ নেই কিছু। সুতরাং বসে বসে মাথামুণ্ডু লেখা যাক এখন।

শুরকের দিক থেকে রিশতারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাটা যেন একটা নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক দিনই প্রাক্তন সৈনিকদের বলে যে জার্মানিকে আবার নতুন করে কোমর কষে উঠে দাঁড়াতে হবে। ওর গোপন সাহায্যে নাৎসী দলের ছাঁচে অজস্র নতুন পার্টি গজিয়ে উঠছে। একটার তো সভ্যসংখ্যা দশ হাজার। অন্যগুলো তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। একান্ত সযত্নে চেষ্টা করে শুরকে যাতে এইসব দলের কার্যকলাপ জানতে পারে আমেরিকানরা। ফ্রাংকফুর্ট-এর লোকেরা খুব কম সংখ্যকই পড়েছে রিশতারের আবেদন। কিন্তু তার একটা কপি রয়েছে জেনারেল হয়েসের ডেস্কে।

এক সপ্তাহ পরে শুরকে বলল জেনারেলকে:

হয়তো রিশতারের ইস্তাহারটা পড়েছেন আপনি? মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ওটা একটা মূল্যবান দলিল। আমি অল্পস্বল্প চিনি রিশতারকে। লোকটা প্রথম শ্রেণীর স্থপতি। তাছাড়া রাজনীতির ধার ধারেনি কোনোদিন। সে তো দেখলেই বোঝা যায়: সম্পূর্ণ আনাড়ি ছাড়া ও ধরনের বাজে জিনিস লিখতে পারে না কেউ। প্রথমটায় ভাবলাম, কেন বলছে নতুন একটা পার্টির কথা? তার অস্তিত্ব তো এখন হাওয়ায়। কচি শিশু আর দুগ্ধপোষ্যদের মুখে......। আমার ভয় হচ্ছে বুঝিবা গোপনে গোপনে নাৎসীবাদ আবার পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। রিশতারের মতো লোক শুধু যে রুশদের বিরুদ্ধেই খাপ্পা তা-ই নয়, আমেরিকানদেরও বিরোধী। তাহলেই বুঝতে পারছেন যে জার্মান ডিভিশন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে অফিসারদের বুঝিয়ে রাজী করা কতখানি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার পক্ষে? প্রচুর লোক ইতিমধ্যেই রিশতারের পার্টিতে ভিড়ে গেছে যেমন ধরুন মেজর ভেইসেল। কথা হচ্ছে, সে কোনোদিনই নাৎসীদলে ছিল না। কিন্তু

উর্দির সম্মান বলেও একটা বস্তু আছে। অফিসাররা বলল আমাকে:

জেনারেল হ্যান্স স্পেইডেলের পরিচালনা কী করে আমরা স্বীকার করে নেব যখন তার নিজের ভাই উইলহেলম স্পেইডেল রয়েছে জেলে বন্দী? জানি না আপনি বুঝতে পারছেন কি না যে এই অবস্থায় জার্মানিকে পশ্চিম ইয়োরোপের নিরাপত্তার জন্যে টেনে আনা কতদূর অসম্ভব কাজ।

জেনারেল হয়েস কোনো জবাব না দেয়াই ভালো মনে করলেন। তিনি শুরু করলেন আন্তর্জাতিক সংকটের কথা বিশ্লেষণ করতে: ফরাসীরা এখনো জার্মান সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার বিরোধিতা করছে। সময় হয়েছে এখন ওদের বোঝানো দরকার যে জার্মান ডিভিশন ওদের ভীতির কারণ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে না। পরন্তু জার্মানরা এলব সীমান্ত রক্ষা করতে পারবে। শুরকে যদি একবার পারী থেকে ঘুরে আসে তো ভালো হয়। কারণ ওখানে তো ওর অনেক বন্ধুবান্ধব রয়েছেন। জার্মানিতে তাঁর সুনাম রয়েছে ফরাসী-দরদী হিসেবে।

হঠাৎ শুরকের শিশুসুলভ নিষ্পাপ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হোহো করে হেসে উঠে বললেন জেনারেল:

আমিও ফ্রান্সকে ভালোবাসি। বিশেষ করে রাত্রে, একটু আরাম করার জন্যে। সেখানকার সব কাফে, সংগীত, ফুল......অনেক দিন ছিলেন আপনি ওখানে?

তেতাল্লিশ সাল থেকে।

খুব মজায় দিন কাটিয়েছেন নিশ্চয়ই।

ভুলে যাচ্ছেন জেনারেল যে সেটা ছিল যুদ্ধের সময়,—রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল শুরকে,—ফ্রান্সে আমি লালদের বিরুদ্ধে লড়েছি। তাছাড়া ফ্রান্সে যত ফুল আছে তার চাইতে বেশি আছে লাল।

আটান্ন

ভিগলের সঙ্গে রিশতার এক মত যে ফ্রাংকফুর্টের রেস্তোরাঁগুলো চমৎকার। পুরনো রাইন মদ এমনকি বারগান্ডি পর্যন্ত পেতে পার এখানে। স্কচ টুইডের একটা স্যুট আর কয়েকটা সিলকের সার্টের অর্ডার দিল রিশতার। আর কিনল কেতাদুরস্ত এক জোড়া আমেরিকান জুতা। শহরের মাঝখানের দোকান-পশার-গুলোর অপূর্ব প্রদর্শনী পথিকদের প্রলুব্ধ করে। দাম চড়া। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না এখন রিশতারের, কেননা বেশ কিছু টাকা পেয়েছে সে তার নিজের খরচের জন্যে। শুরকের সঙ্গে আর দেখা করেনি। ভিগল বুঝিয়ে বলল ওকে যে মেজরের মতো আধা "সরকারী" লোকের সঙ্গে বিরোধী দলের প্রেসিডেন্টের দেখা-সাক্ষাৎ করাটা মোটেই বিচক্ষণতার কাজ নয়। আর বলল যে ও নিজে ওদের দুজনার ভিতরে যোগাযোগ রাখার কাজ করবে, কেননা ও রাজ-নীতির সঙ্গে জড়িত নয়। প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবে রিশতার যে ভিগলের সত্যিকারের ভূমিকা কি? স্পষ্টই দেখা যায় যে ঐ বীজের ব্যাপারটি সব ব্যাপারেই সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

ব্যাপারটা অদ্ভুত,—একদিন বলল রিশতার ভিগলের কানে,—'সৈনিক সংঘ' কি করে আমার পার্টির অর্থ সাহায্য করতে পারবে? শুরকের কাছে শুনেছি ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো মাইনেপত্র পান না।

হেসে উঠল ভিগল:

আমেরিকানরা যখন বলে যে তারা অন্য সব জাতের চাইতে চতুর তখন তুমি মুখ বাঁকাতে পার। কিন্তু যখন ওরা বলে যে ওরা সবার চাইতে ধনী তখন 'ইংলিশার হুফ'-এ ভোজ খাওয়াতে পার আমাকে।

রিশতার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চুপ করে গেল। আজকাল ও যথাসম্ভব কম কথা বলতে চেষ্টা করে। এবার হাসার চেষ্টাটুকুও করল না। যদিও ব্যাপারটা কেমন যেন খানিকটা সুড়সুড়িও দিল ওকে: ও গাল দেবে আমেরিকানদের আর তারাই টাকা যোগাবে ওকে!

যদিও মধ্য-ফ্রাংকফুর্ট সুন্দর সুন্দর পোস্টারে, সুবেশ নরনারীর ভিড়ে, আর নতুন নতুন আমেরিকান মোটরে মনে হয় খুবই প্রাণবন্ত, কিন্তু শহরতলীর শ্রমিক অঞ্চল তেমনি নিষ্প্রভ, শ্রীহীন। পোড়া পোড়া কালো ধ্বংসস্তূপ এখনো অপসারিত হয়নি। ছোট ছোট দোকানের জানালাগুলো আবছা অন্ধকার, বাজারের শূন্য থলে হাতে মেয়েরা কেনার আগে অনেকক্ষণ ধরে শালগম, লোনা মাছ ইত্যাদির দরকষাকষি করে। একদিন বেড়াতে বেড়াতে কখন চলে এসেছে রিশতার শহরতলীর রাস্তায়। হঠাৎ রিশতারের খেয়াল হল যে এখানকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হলে পরেও, তাদের বেশবাস পরিচ্ছন্ন। দারিদ্র্য ওদের নোংরা করে তুলতে পারেনি। জার্মান মেয়েরা জানে কি করে ছেঁড়া রিপু করতে হয়। এখানেই হয়তো নিহিত রয়েছে জাতির প্রতিভা।

এদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা কী ভীষণ কঠিন!—কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার পরে মনে মনে ভাবল তরুণ কারিগর এরিক শিলার। ওরা বিলাপ করে, খেদ করে কিন্তু পরিষ্কারভাবে কোনো কিছু ভাবতে ভয় পায়। উনিশশো পয়তাল্লিশ সালে ও ভেবেছিল যে জার্মানির নতুন অধ্যায় শুরু হবে এবার। কারণ পুরনো সব কিছুই পচে গলে গুঁড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, ওরা আবার জোড়াতালি দিয়ে নিয়েছে। কালকের নাৎসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। রিশতারের ইস্তাহারটাই তার প্রমাণ! আবার কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে জার্মান বাহিনীকে গড়ে তোলার। কাল ফোরম্যান ক্রাউজ চিৎকার করছিল যে কোইনিগসবার্গে ওরা পুনরুদ্ধার করবে। যখন নিজে শিলার শ্রমিকদের কাছে বলল আসল কথাটা, জবাবে ওরা বলল যে সে বাড়িয়ে বলছে, গুজবে বিশ্বাস করতে নেই। এ সবকিছুই হচ্ছে প্রচার মাত্র।

এরিকের বয়েস যখন মাত্র এগারো বছর তখন ওর বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সে-রাতের কথা জীবনে ভুলবে না এরিক। ওরা বালিশ ফেঁড়ে, উনুনের ছাই ঘেঁটে, ওর মাকে গালাগাল করে ভয় দেখিয়ে তুমুল কাণ্ড করে তুলল। তারপর সব কিছুই শান্ত, চুপচাপ। প্রতিবেশীরা কেউ আর আসে না ওদের ঘরে। এমন কি সিঁড়িতে দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতি কষ্টে একটা পুতুলের কারখানায় কাজ পেলেন ওর মা। স্কুলে ওকে বলা হল যে ওর বাপের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে ওকে ভালো করে পড়াশুনো করতে হবে। মাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত এরিক যে কি করেছিল ওর বাবা। কিন্তু জবাবে তিনি কিছু বলতেন না। তারপর এল যুদ্ধ। প্রথমে সবাই খুশী। বলত যে বীরের মতোই জার্মানরা নিজেদের দোষস্খালন করেছে। শিগগিরই শান্তি ফিরে আসবে। ওলন্দাজ পনীর, সার্ডিন মাছ আর ভালো ভালো সাবান বরাদ্দ হল রেশন কার্ডে। অন্য ছেলের দলের সঙ্গে মিশে এরিকও চিৎকার করে বেড়াত: ইংল্যান্ড নিপাত যাক!—কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল সব কিছুই বদলে যেতে শুরু করল। কেউ আর গান করে না, আনন্দ করে না, বোমা পড়তে শুরু হল, যে-সব সৈন্যেরা ছুটিতে দেশে আসত তারা বলত রুশিয়া নরক হয়ে উঠেছে। এক দিন ওর মা আর চুপ করে সহ্য করে থাকতে না পেরে বলল এরিককে: তোর বাবা বলতেন নাৎসীরা আমাদের ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন ওরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল? জিজ্ঞেস করল এরিক।

কমিউনিস্ট হওয়ার জন্যে,—কাঁদতে কাঁদতে বললেন মা,—তখনই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি যে কী পরিণতি হবে আমাদের। ওরা নির্যাতন করে মেরে ফেলেছে তাঁকে, শয়তানের দল।

এরিকের বয়েস এখন ষোলো। কাজ করে একটা কারখানায়। ওর ইচ্ছে হল বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, কিন্তু কি যে করবে জানে না। ওর সহকর্মী বন্ধুদের কাছে কথাটা উত্থাপন করার চেষ্টা করতেই কেউ কেউ ভয়ে আঁতকে উঠল, বলল মুখ বুজে থাকতে। অন্যেরা ওকে গুপ্তচর মনে করে সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আবার কেউ কেউ ভাসা ভাসা ভাবে তর্ক করল ওর সঙ্গে, বলল যে তুমি দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার না। রুশরা জার্মানদের

ধ্বংস করার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার দু মাস আগে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়ায় সামরিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেল না এরিক। কিন্তু সেখানে একজন বয়স্ক সৈনিকের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা হল। সে ছিল কমিউনিস্ট। আত্মসমর্পণের সময়ে সবাই যে যা পেল চাদর, তোয়ালে রুমাল ইত্যাদি নিয়ে নিতে লাগল, এরিক এক টুকরো লাল কাপড় জামার হাতায় এঁটে বলল:

এবার সব অন্যরকম হয়ে যাবে।

সেদিনের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা মনে পড়ে একটু তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে। যে কারখানায় ও কাজ করে সেখানে ওরা কমিউনিস্ট আছে মোট আঠারো জন। শ্রমিকেরা ক্বচিৎ কখনো খবরের কাগজ পড়ে। সভা সমিতিতে আসতে চায় না। এরিক যখন ওদের সভায় আসার জন্যে উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করে, ওরা রুক্ষভাবেই প্রত্যাখ্যান করে বলে:

ও-সব প্রচার শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে আর দরকার নেই......। তারা ফোরম্যান ক্রাউজের কথায়ও কান দেয় না। ক্রাউজ যায় সৈনিক সংঘের সভায়। নিদারুণ আতঙ্কের সঙ্গে অল্প দিন আগের কথা স্মরণ করে ওরা বারবার একই কথা বলে:

শুধু যদি আর যুদ্ধ না হয় কোনো দিন তবেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এরিকের বয়েস তেইশ বছর। ও যখন সেনাদলে ছিল তখন ওর মা মারা যান। একা একাই থাকে। বাবার অদৃষ্টের সেই পরিণতির কথা শোনার পর থেকে যে তীব্র আবেগের দহনে ওর অন্তর খাক হয়ে যাচ্ছিল সেই চিন্তায়ই বিভোর হয়ে থাকে দিনরাত। আধা বিস্ময়ে অন্যান্য শ্রমিকরা ওকে পরামর্শ দেয়:

দেখ, রাজনীতি ছেড়ে দেয়াই ভালো। কি পাও ওর ভিতরে?

সন্ধ্যেয় ওরা সবাই যায় বিয়ারের দোকানে বা নাচের মজলিসে। আর ও থাকে তখন বই নিয়ে। চায় যত দূর সম্ভব শিখে নিতে। একটা পার্টি সভায়ও অনুপস্থিত থাকে না এরিক, তাছাড়া বক্তৃতাও দেয়। এরিক শিলার স্বাক্ষর নিয়ে যে দিন ওর লেখা প্রবন্ধ "শান্তির সংগ্রাম" কাগজে বেরুল, শিশুর মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

দেখাবে আনাকে কাগজটা? না, সে হয়তো মনে করবে যে ও জাঁক করছে। গত শরৎকালে আনার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয় টাউন লাইব্রেরিতে। প্রথম দৃষ্টিতে ওর ভালো লাগে আনাকে। কখনো কখনো ও দেখা করতে যায় আনার সঙ্গে, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না নিজের কাছে যে আনা ওকে মুগ্ধ করেছে আর বড্ড বেশি ঘনঘনই মনে পড়ছে তার কথা। শত শত উপন্যাস গিলে শেষ করে ফেললেও প্রেম সম্পর্কে ও অনভিজ্ঞই রয়ে গেছে।

তাছাড়া, কি-ই বা মিল আছে ওদের ভিতরে? আনা হল হিসেবনবীশ, রেইসবের্গের মেয়ে। তিনি ছিলেন নাৎসী দলের সভ্য, আর মারা যান পূর্ব সীমান্তে উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে। শিশুকাল থেকেই শুনে এসেছে আনা যে সমস্ত লালগুলোকে মুছে ফেলতে হবে দুনিয়ার বুক থেকে। আর ফুয়েরারই জার্মানিকে বাঁচিয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আনাকেই তার পঙ্গু মা আর

ছোট ভাইয়ের ভরণ-পোষণ চালাতে হয়। কোনো কাজকর্মই শেখেনি আনা। বেঁচে থাকতে ওর বাপ বলতেন:

তোকে বিয়ে দিয়ে দেব, ব্যাস, তাতেই হবে। প্রথমে ও কাজ নেয় সৈনিকদের শার্ট তৈরি করার একটা কারখানায়। তারপর দরজির দোকানে। সে দোকান উঠে যাওয়া পর্যন্ত তিন বছর কাজ করেছে সেখানে। শুরকে ওকে উদ্ধার করে। তারপর সৈনিক সংঘে কাজ দেয়। ওর সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে তাদের নাম নিয়ে মেজরকে জানায়। মৃত সৈনিক সহকর্মীদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করা শুরকে তার কর্তব্য বলেই মনে করে। রায়কভের 'কমান্ডানটুর'-এর প্রথম দিন থেকেই মনে আছে তার রেইসবের্গের কথা। তাছাড়া মেয়েটিকে ওর খুবই উপযুক্ত বলে মনে হয়। আনার চেহারা ভালো—কৃশাঙ্গী, বিবর্ণ ঘন-নীল দুটি চোখ আর চাল-চলন বেশ গম্ভীর। খুবই ভদ্র ব্যবহার করে ওর সঙ্গে শুরকে। ওর মায়ের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে ভোলে না একটি দিনের তরেও। অল্প ক'দিনের ভিতরেই দেখল যে আনা চলেছে ঠিক ওর মন মতো: কাজ-কর্মের দিক থেকে ভালো, ব্যবহার চমৎকার। মাঝে মাঝে ওর হয়ে সে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে। ওকে বিশ্বাস করে গোপন দলিলপত্র রাখতে দেয়।

যে-মেয়ে কাজ করে সৈনিক সংঘে কেমন করে সে-মেয়েকে ভালোবাসল এরিক? এ-কথা সত্যি যে যখন ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল আনার তখন জানত না এরিক, ও কি কাজ করে। আনা পড়তে ভালোবাসে, তাই বন্ধুত্বের প্রথম দিকে ওদের আলোচনা হত বই নিয়ে। এরিক বলল আনাকে যে সে একজন কমিউনিস্ট। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল আনা, তারপর বলল:

আমার বাবা ছিলেন নাৎসী। তখন আমি নেহাত বাচ্চা, তাই এ-সম্পর্কে ভাবিনি কোনোদিন। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে ওঁরা ভুল করেছিলেন। সেদিন আমি কয়েকজন তরুণ সম্পর্কে লেখা একটা রুশ উপন্যাস পড়েছিলাম, ওরা রুশিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। অবশ্য বইটা একটা উপন্যাস, কিন্তু ওখানে মানুষের ভিতরে ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষই আছে—কিন্তু ঐ ধরনের কাজ-কর্ম ভালো মানুষকেও নিশ্চয়ই পশুর পর্যায় নামিয়ে আনে। তাই মনে হয় না কি তোমার?

মুচকি হাসল এরিক। মনে মনে ভাবল হয়তো ওকে তার নিজের মতে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। বুঝতে পারেনি এরিক যে ইতিমধ্যেই আনা ওর অন্তর জয় করে নিয়েছে। আকুল আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে থাকে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আর দেখা হলে একটি মুহূর্তের জন্যেও আনার মুখের দিক থেকে চোখ দুটোকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। যে বস্তু ওদের পরস্পরকে এমনিভাবে আকর্ষণ করে পরস্পরের কাছে টেনে আনছে সে সম্পর্কে কেউই মুখ ফুটে বলে না কোনো কথা। কিন্তু যে-কেউ ওদের দেখলেই বলবে ওরা দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা।

আনা কোথায় কাজ করে সে-কথা কোনোদিনই জিজ্ঞেস করেনি এরিক। মনেও হয়নি জিজ্ঞেস করার কথা। কিন্তু আনা যখন বলল ওকে তার কাজ সম্পর্কে, শুনে আহত হল এরিক:

আমার কাছে লুকোলেন কেন এ-কথা?

অবাক হয়ে গেল আনা:

লুকোইনি তো। আপনি তো কখনো জিজ্ঞেস করেননি আমাকে।

দুজনার মাঝখানে নেমে এল গভীর নীরবতা। এই প্রথম ওর মনে হল যে ও ভালোবাসে আনাকে। ওকে হারানো ওর পক্ষে ভয়ংকর ব্যাপার, অন্তর মুচড়ে খান খান হয়ে যাবে। অবশেষে হতাশার সুরে বলল:

কেন কাজ করছেন ওখানে? ওটা একটা নাৎসীদের আড্ডা।

জানেন তো আমার মা আর একটি ছোট্ট ভাই আছে। এখন সে স্কুলে যেতে পারছে। অন্তত ভদ্র জামাকাপড় পরাতে পারছি তাকে। আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো খারাপ কাজ করি না। যে-কোনো একটা অফিসের মতোই কাজ করে যাচ্ছি ওখানে। নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করেছেন আপনি। অন্য একটা কাজ খুঁজে নেবার চেষ্টা করব আমি। যে-কোনো কাজ করতেই রাজী আছি। আমি খারাপ হয়ে যাইনি। কিন্তু একটু ধৈর্য ধরুন। আজ যদি আমি বেকার হয়ে যাই তবে মা মরে যাবেন।

পরে আবার যখন দেখা হল ওদের, আনা বলল:

অন্য একটা কাজ খুঁজে নিতেই হবে আমাকে। আর সহ্য করতে পারছি না আমি। প্রথমে ভেবেছিলাম ওরা প্রাক্তন সৈনিকদের সাহায্য করছে। তার ভিতরে দোষের কিছু নেই। সবাই যুদ্ধ করেছে। ফ্রন্টে পাঠাবার সময়ে কেউ তো আর ওদের মত নিয়ে পাঠায়নি। কিন্তু এখন দেখছি আপনার কথাই ঠিক—ওটা সত্যিই একটা নাৎসী-আড্ডা। ওরা চায় আবার সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে আবার যুদ্ধ করতে। জেনে গেছি আমি সব এখন।

ও এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছে যে অসংলগ্নভাবে বলে চলেছে কথা। আর এরিক ওকে বলার জন্যে চাপ দিচ্ছে। অবশেষে আনা বলল:

মেজরের কাছে আমি কতগুলো কাগজ সই করাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। জেনারেল কথা বলছিল তখন। অবিশ্যি আমাকে দেখেই জেনারেল চুপ করে গেল। কিন্তু মেজর শুরুকে বলল তাকে বলে যেতে। হলফ করে বলছি আমি আড়ি পেতে শুনিনি। ওরা আমার সামনেই আলোচনা করতে লাগল। জেনারেল বলল যে সে ল্যান্ডসবের্গ জেল হয়ে আসছে। সেখানে ওর ভাই রয়েছে। ওরা একটা পরিকল্পনা করেছে কিন্তু তার ভাই তাতে রাজী হচ্ছে না। কি নিয়ে ওরা তর্ক করছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। ওরা বলছিল যৌথ সৈন্য পরিচালনার কথা, আর পৃথক পরিচালনার কথা। কিন্তু আসলে যেটা জানতে পারলাম সেটা হল এই যে ওরা একটা বাহিনী গড়ে তুলছে—আবার একটা যুদ্ধ বাধাবে। কী সাংঘাতিক!

এ জেনারেলটি কে?—উত্তেজিত এরিক প্রশ্ন করল।

স্পেইডেল। তারপর সে বলল জেনারেল মহলমানও আসছে শিগগিরই। জেনারেল হল্লিডৎ-এর একটা চিঠি দেখেছি আমি। সে-ও আছে ল্যান্ডসবের্গ জেলে। সে বলে যে রিজার্ভ হাইকমান্ডও গড়তে হবে।

ওর বলা শেষ হতেই নিচুগলায় বলল এরিক:

সবগুলো খবরই খুব মূল্যবান। কিন্তু এগুলো জানাই কি করে। ফলে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে।

মাথা নাড়ল আনা:

আমি কিছুতেই ওখানে আর ফিরে যাচ্ছি না।...শুনলাম অন্ধদের ক্যানটিনে একজন পরিচারিকা নেবে ওরা।

অন্যমনস্কভাবেই বিদায় নিল এরিক। নিজের চিন্তায়ই বিভোর—খবরটা এক্ষুনি ওর কমরেডদের জানিয়ে দিতে হবে।

রেগে আগুন হয়ে উঠল শুরকে:

উইলহেলম স্পেইডেলের সঙ্গে আলোচনার আভাস কার পক্ষে পাওয়া সম্ভব? কেলেঙ্কারীর ব্যাপার! হল্লিডৎ-এর নামও উল্লেখ করেছে, যদিও সে একটি অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহলমান-এর দিক থেকে এটা হওয়া সম্ভব, নিজেকে জাহির করার নেশায় হয়তো বেশি কথা বলে ফেলেছে। কিন্তু তাহলেও একটা দারুণ আঘাত। আমেরিকানরা ভাববে ওরা পিছপা হচ্ছে। হয়েস ব্যাপারটা কিভাবে নেবে তাও ধারণা করতে পারছি! জার্মানিতেও প্রচুর লোককেই যে অত ঘাবড়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সব কাজের জন্যে আগে থেকে ওদের মনকে ভালো করে তৈরি করে নিতে হবে। ফ্রান্স সম্পর্কে একটুও উচ্চবাচ্চ নয়; যাত্রার আগে চমৎকার মাঙ্গলিক বটে......এক্ষুনি একটা প্রতিবাদ প্রকাশ করতে হবে।

শ্রীমতী রেইসবের্গ!—চিৎকার করে ডেকে উঠল শুরকে। লেফট্যানান্ট ভেল এসে জানাল যে আজ তিন দিন শ্রীমতী রেইসনবের্গ কাজে আসছে না। হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শহরে ফ্লুর আক্রমণ হচ্ছে খুব।

এরিক কারখানায় কাগজটা নিয়ে যেতে শ্রমিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যি। আবার কি ওদের যুদ্ধ করতে হবে? নোংরা ব্যাপার! এসব কি বানানো কথা? না। বানানো হলে কেউ নাম তারিখ উল্লেখ করতে সাহস করত না। গোটা কারখানাটা উত্তেজনায় গমগম করে উঠল। পুরুষ শ্রমিকরা চিৎকার করে উঠল: ওরা যুদ্ধ করুক গে আমাদের বাদ দিয়ে! ফোরম্যান ক্রাউজ এরিকের কাছে এসে ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলল:

বাপের মতোই মৃত্যু আছে তোর কপালে। বুঝলি?

টেলিফোনে ঘর্মাক্ত কলেবর সাংবাদিকেরা চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে:

ল্যান্ডসবের্গ বন্দীশালায় আলাপ-আলোচনা...জেনারেল স্পেইডেল...গেস্তাপো-দের ভিতর থেকে...রিজার্ভ হাই কম্যান্ড...জেনারেল হয়েসের সরাসরি প্রত্যাখ্যান...

বহু দূর দূর থেকে ভেসে আসছে স্টেনোগ্রাফারদের ক্ষীণ কণ্ঠ:

কোন জেনারেল? বানান করে বলুন।

চিন্তিত মুখে বোদিয়ের বলল নিয়েলের কাছে:

সাধারণ ফরাসী-দেশবাসীর আত্মসংযম সম্পর্কে তুমি একটু বেশি গুরুত্ব আরোপ করছ। ভয় হচ্ছে আমার যে ঐ ধারণাটাই না সব কিছু ছাপিয়ে বড়

হয়ে ওঠে।—প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলল না নিয়েল। জেনারেল হয়েস ভালো যোদ্ধা হতে পারে কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সে একটি আস্ত বর্বর—গোঁয়ার। 'নোম অ্যান্ড রোন' কারখানায় কাজ বন্ধ হয়ে গেল। একটা বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে গিভো চিৎকার করে বলে চলেছে:

ওরা চায় এস-এসদের দিয়ে আমাদের পরিচালনা করতে।

মুচকি হেসে কাগজটা রেখে দিলেন ডাঃ ক্লিলভ:

সবাই ওরা এক গোয়ালের গরু। জেলখানা চষে বের করতে গেলেও বেশ একটু কঠিন অবস্থার ভিতরেই পড়তে হবে আমেরিকানদের।

এরিকের ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যেয় আনার কাছে যাবে। কিন্তু ও মত বদলাল। ভয়, পাছে আনা বিপদে পড়ে ওর জন্যে। অবস্থা খুবই থমথমে। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা জিতবে এ-কথা ঠিক। রয়েছে রুশিয়া, রয়েছে চীন, ওর নিজের দেশ জার্মানিও রয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য পক্ষই হচ্ছে দেশের প্রভু। যে-কথা বলছিল ক্রাউজ সে-সম্পর্কে সে ভালো করেই জানে। হয়তো এরিক গ্রেফতার হতে পারে। নয়তো গুলি করতে পারে ওকে পিছন থেকে। নিজের কাজের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণাই আছে ওর। কিন্তু আনার জীবনে দুর্ভোগ কেনই-বা ডেকে আনবে ও? অন্য কাউকে ভালোবেসে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে আনা। ঠিক করল চিঠি লিখে জানাবে আনাকে। কিন্তু যেটা লিখল সেটা খুবই কড়া হয়ে গেল। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার লিখতে আরম্ভ করল:

প্রিয় আনা—মনে হয় আমাদের আর দেখাসাক্ষাৎ না হওয়া ভালো। এক-দিন তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে যে আমার রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপরে আমি খুব বেশি গুরুত্ব দেই কি না। প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ প্রচুর।' সে-দিনের আমার জবাবটা তেমন জোরালো হয়নি। জীবনে কখনো আমি এটা ছাড়তে পারব না। একবার একটা গল্পে পড়েছিলাম যে একটি মেয়ে নদীর জলের ভিতরে তাকিয়ে চাঁদকে জিজ্ঞেস করেছিল তার ভাগ্যে কি আছে বলে দিতে। চাঁদ বলেছিল: 'খুব শিগগিরই একটি লোক এসে তোমাকে ডাকবে আর তুমি তার সঙ্গে চলে যাবে। কিন্তু সে শুধু দুঃখই এনে দেবে তোমার জীবনে। সে ছেড়ে চলে যাবে তোমাকে আর তুমি অমনি হয়ে যাবে—নদীর জলের ভিতরে তাকিয়ে দেখ।' জলের ভিতরে তাকিয়ে মেয়েটি দেখল পলিত কেশ একটি বৃদ্ধার ছবি। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লোক এসে ডাকল মেয়েটিকে আর মেয়েটি অমনি চলে গেল তার সঙ্গে। জানি এটা নেহাতই একটা রোমান্টিক গল্প। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন যে এই কথাটাই আমার মনে এল তা বলতে পারব না। আমি এইটুকুই বলতে চাই তোমাকে যে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার মনে এতটুকুও ভুল ধারণা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের দেশের জনসাধারণ জয়যুক্ত হবে। কিন্তু খুব বড় রকমের আত্মবলি দিতে হবে। যদি আমরা এমনিভাবে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ করতে থাকি তবে বিচ্ছেদটা সহ্য করা দুজনের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া তোমার উপরেও সন্দেহ জাগতে পারে ওদের। তার চাইতে এখন থেকেই ছাড়াছাড়ি হওয়া ভালো। 'সংঘের' কাজ যেটার উপরে

তোমার নিজেরও বিরক্তি ধরে গিয়েছিল সেটা যে তুমি ছেড়ে দিয়েছ তাতে আমি খুবই আনন্দিত। রাজনীতি থেকে দূরে থেকে তুমি শান্তিতে বাস করতে পারবে। চিরদিন আমার মনে থাকবে তোমার কথা। আর বিশ্বাস কর, শুধু তোমার সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করেই আমি বলছি: বিদায় আনা!

পরদিন ভোরে কারখানায় যাবার পথে নিজের হাতেই নিয়ে গেল চিঠিটা। সমস্ত দিন আর ভাবল না আনার কথা। কমরেডদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে আর কাজের ভিতরে ডুব দিয়ে কাটিয়ে দিল সমস্ত দিন। কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে দাঁতের যন্ত্রণার মতো এক তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যথায় ওর অন্তর মুচড়ে যেতে লাগল। আলো না জ্বেলেই বিছানার উপর বসে পড়ল। দু হাতে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে ছোট্ট ঘুলঘুলির পথে ঠাণ্ডা গোল চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।......হয়তো কাল এই চাঁদের আলোর জন্যেই আনাকে লিখেছিল ঐ নদী আর মেয়েটির কাহিনী। একটুও ভাবেনি ও এ-কথা। এ-সব জিনিস নেহাতই বাজে। কিন্তু আসলে যে কথাটা বলেছে সেটা সত্যি: কেন ও বিপদে ফেলবে আনাকে? ও চায় ওর সুখ। কেন? কথাটা উচ্চারণ করতে এতটুকুও ভয় পাবার কিছু নেই ওর: ও ভালো-বাসে আনাকে।

দরজার কড়া নড়ে উঠল। চমকে উঠল এরিক। হয়তো ওকে গ্রেফতার করতে এসেছে ওরা।

ঘরে এসে ঢুকল আনা। হাতদুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা। নীরবে মুখো-মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে বহুক্ষণ। অবশেষে আনা বলল:

চিঠিতে আমার কাহিনীই লিখেছিলে তুমি। এই যে চাঁদ আর এই সেই মেয়েটি। একদিন তুমি আমাকে আর না ভালোবাসতে পার, দুঃখ দিতে পার আমাকে, কিছু যায় আসে না আমার, আমি তোমারই অনুগামিনী হব।

ওকে চুমু খেল এরিক। হঠাৎ এক অদ্ভুত আনন্দে ওর অন্তর ভরপুর হয়ে উঠল। পাগলের মতো হাসতে হাসতে আবোল-তাবোল বকতে বকতে আর চুমু খেতে খেতে ওকে নিয়ে ঘরময় ঘুরতে শুরু করে দিল।

চাঁদ ডুবে গেছে বহুক্ষণ। ভোরের ম্লান আলো এসে খুলে দিল ওদের হাতের বাঁধন। এরিক বলল:

শেষ পর্যন্ত হয়তো কাহিনীটা অন্য রকমই হয়ে দাঁড়াবে। কোনোদিনই তোমার উপরে আমার ভালোবাসা স্তিমিত হবে না। আর আমরা জয়যুক্ত হব। সুখী হব।

উনষাট

মেজর শুরেকে কাজ করত আবেৎস-এর সঙ্গে আর সে-ই কিনা আসছে পারীতে—এ-খবর শুনে দারুণ চটে গেল নিয়েল। এর চাইতে বেকুবির কাজ আর কিছু হতে পারে না। ওরা এখানে চেষ্টা করছে তেতো বড়ির গায়ে চিনির প্রলেপ লাগাতে, ফরাসীদের কাছে বলছে যে ওয়েরমেক্‌ট্‌-কে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো প্রশ্নই নেই। নতুন জার্মান ডিভিশন হবে ইউরোপীয় বাহিনীরই অঙ্গ বিশেষ। আর যে সব লোক হিটলারের সঙ্গে কোনো রকমের আপোস-রফা করেনি তাদের দ্বারাই গঠন করা হবে অফিসার-কোর। আর ঠিক এ-সময়েই কিনা জেনারেল হয়েস পাঠাচ্ছেন এমন একজন প্রাক্তন নাৎসীকে, অবরোধের সময়ে যে বেশ নাম কিনেছিল। এ-রকম অবস্থায় লোকে কাজ করে কি করে? ওয়াশিংটনে নির্দেশ চেয়ে পাঠাল নিয়েল। ওদের জবাব পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কর্নেল ডোনোভন জানাল যে শুরেকে যাচ্ছে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে। আমেরিকান কর্তৃপক্ষ বা বন-সরকার কারুর সঙ্গেই ওর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ওর যাওয়াটা খুবই কার্যকরী হবে। ফরাসীরা এ-কথা ভেবে ভুল করছে যে তাদের ভিত্তিহীন প্রতিবাদের উপরে আমেরিকানরা বুঝি কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতেই জার্মান বাহিনী গঠন করার প্রশ্নের মীমাংসা করে ফেলতে হবে। শুরেকে সৈনিক সংঘের সভাপতি। তার পারী ভ্রমণ জার্মান ও ফরাসী উভয় দেশের মানুষের চোখের সামনে এটাই তুলে ধরবে যে তাদের মন থেকে কতকগুলো সেকেলে কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমী নিরাপত্তার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা চিন্তা করার সময় এসছে।

নিয়েল বুঝল, প্রতিবাদ বৃথা। ও এতটা বিচলিত হয়ে পড়ল যে সার্ৎরের নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতেও উপস্থিত হল না। যদিও কথা দিয়েছিল উপস্থিত থাকবে বলে। তার বদলে ড্রেসিং-গাউন পরে নিজের সংগ্রহের ভিতরেই সান্ত্বনা খুঁজতে লাগল। "ডাইরেক্টোয়ার" শাসনকালের একটা নস্যিদানী নিয়ে বহুক্ষণ ধরে দেখতে লাগল: ষাঁড়ের রূপ ধরে জুপিটার সুন্দরী ইউরোপকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। নির্বোধ কল্পনা, একটা ষাঁড় কখনো একটি তরুণী মেয়ের চিত্ত জয় করতে পারে! পুরাকালের গ্রীকরা কোথা থেকে এসব আজগুবি কল্পনা পেল? অবশ্য যদিও এটা ক্ষণেকের রূপ পরিবর্তন। আজ এই মুহূর্তে আমেরিকানরাও ষাঁড়ের ভূমিকাই গ্রহণ করেছে। ব্যাপারটা মোটেই তেমন সুখকর নয়। ঘটনাচক্রে ওকে আজ শুরেকেকে অভ্যর্থনা করতে হবে।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দরীর সঙ্গে এক দেবতারই মিলন হবে, আর সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে হেসে উঠবে ইউরোপ।

সকালে শুরেকে এসে পৌঁছাল পারীতে। বাতাস গরম। শুরু হয়ে গেছে পারীর অকাল বসন্ত। অবাক বিস্ময়ে শহরটার দিকে তাকাল শুরেকে। এতটুকুও বদলায়নি। জীর্ণ ঘরবাড়িগুলো তেমনি দাঁড়িয়ে, তেমনি কাফের ভিতরে

পরিচারিকারা টেবিল সাজিয়ে চলেছে। ভায়োলেট ফুলের ছোট ছোট থোকাগুলো বিছিয়ে নিয়ে তেমনি বসে রয়েছে ফুলওয়ালীরা। সাত বছর আসেনি শুরকে এখানে। ভয়ংকর কটা বছর। জার্মানি ভেঙে পড়েছে। পুরানো ইউরোপের অস্তিত্ব আর নেই। রুশ আর আমেরিকানরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। গোটা দুনিয়াটা আর একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি করে চলেছে। আলোচনা করছে পরমাণু বোমা সম্পর্কে, আসন্ন বিপর্যয়ের জল্পনা-কল্পনা করে। কিন্তু এখানে ওরা বসে বসে পাপোসের ধুলো ঝাড়ছে, কুকুরকে বেড়িয়ে নিয়ে আসছে, যেন কোথাও কোনো কিছুই ঘটেনি।

হঠাৎ মনে হল, কতই না বুড়িয়ে গেছে ও। পরিচিতেরা বলে: 'এতটুকুও বদলান নি আপনি। এখনো যুবকের মতোই আপনার উদ্যম।' বাজে কথা! সাত বছর আগে জীবনের প্রারম্ভে সে পারী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা স্তালিনগ্রাদের পরে। বুঝতে পেরেছিল যে বিপদ গভীর, কিন্তু এ-কথা আদৌ বিশ্বাস হয়নি যে যুদ্ধে হেরে যাবে। ওর জীবনের গতিপথ দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল: ফুয়েরার বলত, আর ও বিশ্বাস করত ফুয়েরারকে। ওর ছেলে আছে একটি, তাই জানে যে শুরকে বংশ বেঁচে থাকবে। সে সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে ওর ব্যবহার ছিল বাপ-ছেলের মতো—কখনো পিঠ চাপড়ে আদর করত, কখনো বকুনি লাগাত, আবার কখনো শাস্তি দিত। ভগ্ন-হৃদয় মানুষের মতোই সে ফিরে এসেছে এই শহরে। ওর পক্ষে ভান করা, কপট আচরণ করা, নিজের অতীতকে দু পায়ে দলেপিষে যাওয়া যে কী কঠিন সে সম্পর্কে এতটুকুও সন্দেহের ছায়াপাত হবে না কারও মনে। বন্দী অবস্থার ভিতর দিয়ে কেমন করে বেঁচে ফিরে এসেছে তা নিজেও জানে না। সে কি শুধু ওর অতীতের বিশ্বাসের যেটুকু ছিটে-ফোঁটা অবশিষ্ট আছে তারই বলে, না নিছক দৈহিক জীবনীশক্তির জোরেই। ওর আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল ভেঙে গেছে। জার্মানরা ফরাসীদের চাইতে যে উন্নত নয় সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাদেরই মতো ওরাও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেদের। একে অন্যকে জব্দ করছে। প্রত্যেকেই ভাবছে একমাত্র নিজের গা-বাঁচাবার কথা। দেখা যাচ্ছে আদর্শবাদ ব্যাপারটা হচ্ছে একটা বিলাসিতার বস্তু। ভাগ্যের বরপুত্র যারা তারাই আদর্শ-বাদ নিয়ে বিলাসিতা করতে পারে। শুরকে আঁকড়ে ধরে আছে, নতুন প্রাণের সঞ্চার করছে অফিসারদের মধ্যে, দর কষাকষি করছে হয়েস-এর সঙ্গে। আর এখন এসেছে পারীতে। তবুও ইচ্ছে করলে ও সবকিছু ছেড়েছুড়ে দিতে পারে, পারে তামাকের কারখানা খুলতে বা এমনকি নিজের খুলি উড়িয়ে দিতে। কেন করে না তা? ইচ্ছে-শক্তির জোরে, না নিষ্ক্রিয়তার আলস্যে? এখনো অনেক লোক আছে ওকে বিশ্বাস করে। একটা যান্ত্রিক পুতুলের মতো তাই ওর আর থামার উপায় নেই। ও চলেছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে, দাবি করে প্রতারণা করে। কিন্তু ওর নিজের জীবনের আর এতটুকু অস্তিত্বও নেই। সেটা এখন অতীত ইতিহাসের পাতা মাত্র।

হোটেলে এসে শুরকে অনেকক্ষণ ধরে ভালো করে গা রগড়ে রগড়ে স্নান করল। যেন সে ভ্রমণজনিত গায়ের ধুলো ময়লাই তুলে ফেলছে না, তুলে ফেলছে

গা থেকে বয়সের বোঝা।

শুরকের সঙ্গে ভোজে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা যায় ভাবতে লাগল পিনো। মেজরের সঙ্গে দেখা করাটা এড়িয়ে যেতে পারল না সে। গড়িমসি করছে ফনু মালৎজ। বলছে যে আবহাওয়া অনুকূল নয়। সেনাবাহিনীর প্রশ্নটা আগে ঠিক করে নিতে হবে। তাছাড়া, অন্যদিকে নিয়েল চাপ দিচ্ছে ওর উপরে। সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে নিদারুণ কঠিন। ঐ সাধারণ ফরাসী লোকটা খাঁটি না হতে পারে কিন্তু তার মামুলি জ্ঞানগম্যি আছে। এটমবোমার চাইতেও ওর ভয় বেশি নতুন একটা ওয়েরমেক্‌ট-এর। পঁচিশ বছরের ভিতরে দু-দুটো আক্রমণ —হাসির কথা তো নয়। সবাই তো আর ওর মতো ভাগ্যবান নয়। অনেকেই ধ্বংস হয়ে গেছে। সর্বশেষ সংবাদটা নেহাত গো-বেচারা লোকদেরও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। শুরকের কথা ভালো করেই মনে আছে ফ্রান্সের। নিজে পিনো ব্যক্তি-গত মান-অপমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, কিন্তু লোক আছে—যারা ভোলে নি সে সব ব্যাপার। কমিউনিস্টরা যদি একবার গন্ধ পায় যে শুরকে এসেছে, ওরা হল্লা শুরু করে দেবে। জার্মানরা যদি অন্য কাউকে পাঠাত তো ভালো হত। কিন্তু যখন এসেছেই শুরকে তখন পিনোকে দেখা করতেই হবে ওর সঙ্গে। সৈন্য পরিচালনার প্রশ্ন আলোচনা করুকগে সামরিক লোকেরা শুরকের সঙ্গে। ও আলোচনা করবে এটা-ওটা-সেটা সম্পর্কে। গত আলোচনায় জার্মান বাহিনীর সংগঠন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে ওদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আসলে কি। বোঁদিয়েরকে আমন্ত্রণ করতে হবে। ও-ই হচ্ছে একটা লোক যার চোখে ঠুলি পরানো নেই। ফাবরকেও ডাকা দরকার। কিন্তু আসবে কি সে? সে-ই হচ্ছে ঠিক শুরকের জুড়িদার। দুজন বুঝবে দুজনকে। বিনীতভাবেই সে অভ্যর্থনা করবে শুরকেকে, কিন্তু গাম্ভীর্য বজায় রেখে। এসব অবস্থায় ভাবপ্রবণতার স্থান নেই। যা খুশি বলে বলুক জেনারেল হয়েস কিন্তু শুরকে ফরাসীদের লুটেপুটে নিয়েছে। সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু সেটা ভুলে যাওয়াও বোকামো হবে।

প্রথমে বলল ফাবর্‌ যে সে আসবে। পরে ফোন করে জানাল ওকে রেহাই দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল। ওকে শুরকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল পিনো।

মঁশিয়ে ফাবর্‌ 'এক্সপোর্তাত্যর রেয়ুনি' প্রতিষ্ঠানের ডিরেকটার।

আর প্রতিরোধ আন্দোলনের একজন বীর।—যোগ করে দিল বোঁদিয়ের।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হয়েছি মঁশিয়ে ফাবর্‌,—বিনীত হাসি হেসে বলল শুরকে।

শুরু হল আলোচনা। আবহাওয়া স্পষ্টতই শান্ত। যদিও শুরকে সাধ্য-মতো আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে ফরাসী ভদ্রলোকদের তার স্বমতে আনতে। বলল সে বলশেভিক বন্দীত্বের কঠোরতার কথা—সেই শীত আর আদিম অবস্থা সম্পর্কে, আর তাদের প্রচারের কথা। ফ্রান্স সম্পর্কে খুব প্রশংসা করে বলতে লাগল:

আমি একজন পুরানো সৈনিক। কিন্তু আবার পারী চোখে দেখে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রায় কেঁদেই ফেলছিলাম আর একটু হলে। আপনাদের

রাজধানীটা যে অক্ষত রয়েছে এটা সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই একটা আশীর্বাদ।

মনে মনে হাসল পিনো: কে ওকে এমন বিনয় শেখাল? বলশেভিকরা না কি? না বেদিয়েরের মজার গল্প না শ্যাম্পেন কোনো কিছুতেই পরিবেশটাকে জীবন্ত করে তুলতে পারল না। লাঞ্চ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়ে বেদিয়ের যে বিষয়টার অবতারণা করল তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠল শুরকে:

একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্যে আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমরা যখন প্রতিবেশী, তখন সময় হয়েছে এখন আমাদের পুনর্মিলন ঘটার। কিন্তু জার্মান বাহিনী গঠন সম্পর্কে ফরাসীরা বিশেষ করেই একটু সন্দিগ্ধ। আপনি এটা নিজেই হয়তো বুঝতে পারবেন মেজর যে ইতিহাসের বহু অধ্যায় কলমের এক খোঁচায় নাকচ করে দেয়া যায় না। ইউরোপীয় বাহিনী গঠন করার প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। ঐ ভিত্তিতেই আমরা একটা রফায় আসতে পারি।

আমি বুঝি আপনার কথা—প্রত্যুত্তরে বলল শুরকে।—জার্মানরা সৈনিক হিসেবে ভালো কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে অপদার্থ। ইতিহাসের যে অধ্যায়-গুলোর কথা আপনি উল্লেখ করলেন সেগুলো হচ্ছে আমাদের ভুলের ঘটনাপঞ্জী। তারই খেসারত এখন আমরা দিয়ে চলেছি আর এ-কথা হলফ করে বলতে পারি যে খেসারতটা বড্ড বেশিই দিতে হয়েছে। এ যে কি জিনিস ফ্রান্সের কাছে তা অজ্ঞাত। এটা নিন্দেও নয়—প্রশংসাও নয়। আমি শুধু যা ঘটনা তাই-ই বলে যাচ্ছি। আবার বলছি আমি ফরাসীদের অবিশ্বাসের কারণ ভালো করেই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার মনে হয় সময় এসেছে আমাদের এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার—কোনো জাতিই অতীত আঁকড়ে থেকে বাঁচতে পারে না। ইউরোপীয় বাহিনী গড়ার প্রস্তাবকে আমি সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু ইঁট না হলে বাড়ি তৈরি করা কেমন করে সম্ভব? এমন কি লুক্সেমবুর্গেরও রয়েছে তার নিজস্ব বাহিনী। শুধু কি জার্মানির বেলায়ই আপনারা সে-অধিকার অস্বীকার করবেন?

লুক্সেমবুর্গ তো আর কারোর নিরাপত্তার পথে ভীতিস্বরূপ নয়।

আপনারা কি মনে করেন যে জার্মান বাহিনী একমাত্র লালদের ছাড়া আর কারোর ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে?

নাক ঝাড়ল পিনো, তারপর বলল:

ঠিক এই মুহূর্তেই যে তা নয়......কিন্তু গভর্নমেন্ট বদলায়। মানুষও...। এখন আর যৌবন বয়েস নেই। মনে পড়ে কী আনন্দের সঙ্গেই না আমরা স্ট্রেসমানের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিন বছর পরে হিনডেনবুর্গের আমলে সুর সম্পূর্ণ পালটে গেল।

প্রিয় মঁশিয়ে পিনো, অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের কথা বলতেই আমি পছন্দ করি—প্রত্যুত্তরে একটু কড়া সুরেই বলে উঠল শুরকে,—কিন্তু যখন আপনি লোকোর্নোর কথাটা টেনে এনেছেন, তখন বলছি যে ও কথাটা তখনো ছিল। স্ট্রেসিমান বলেছিলেন যে রুশরা যদি পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে তবে ঢাল-তলোয়ারহীন জার্মানির পক্ষে ওদের গতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কথাটা যেন কালকে বলা হয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাদের—

রুশদের ঠেকিয়ে রাখার দিক থেকে কিসের উপরে নির্ভর করেন আপনারা? আপনারা কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে বোমা দিয়েই তা সম্ভব?

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ফাবর। বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠল:

না, বোমার উপরে নয়, আমাদের আর আমাদের মিত্রশক্তির উপরে।

ফরাসী সৈন্যদের উৎকর্ষকে আমি ছোট করে দেখছি না। কিন্তু আপনারা যদি এ-কথা ভেবে থাকেন যে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করেছিল এই কারণেই যে তার লড়বার মতো সাহস ছিল না তবে সেটা মোটেই বিজ্ঞোচিত নয়। আমি কূট-নীতিক নই। একজন সাদামাঠা সৈনিক মাত্র। তাই অকপটেই বলছি আমি... আমি জানি যে জার্মান অধিকারের সময়ে সমস্ত সৎ ফরাসীই ঘৃণা করত আমাদের। মশিয়ে ফাবর, যে-সব বীর ফরাসীরা আমাদের প্রতিরোধ করেছিল তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। আপনি জানেন পরে আমি রাশিয়ায় যাই। দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে আমাদের বাহিনীর পশ্চাদভাগ রক্ষা করতে হয়েছে আমাকে পার্টিজানদের আক্রমণ থেকে। এ-ধরনের কোনো অভিজ্ঞতাই লাভ করি নাই আমি ফ্রান্সে এটা কেন হল? এ জন্যে নিশ্চয়ই নয় যে রুশরা বেশি সাহসী...কিন্তু আপনারা আপনাদের সামরিক কার্যকলাপ বাড়াতে পারেন নি এই কারণেই, মশিয়ে ফাবর, যে আপনারা আশঙ্কা করে ছিলেন, আর ঠিক আশঙ্কা করেছিলেন, যে যদি আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রস্তুতির আগেই আক্রমণ চালান তবে কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। এ-সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত যে উনিশশো চল্লিশ সালের আত্মসমর্পণকে বিচার করতে হবে এদিক থেকে নয় যে, আপনাদের ট্যাংক ছিল মাত্র কয়েকটা, বিচার করতে হবে এ-দিক থেকেই যে আপনাদের দেশে কমিউনিস্টের সংখ্যা ছিল ঢের বেশি। তোরের পার্টিকে পিছনে রেখে যুদ্ধ করাটা খুবই শক্ত, তাই না?

চুপ করে রইল ফাবর। শুরকের সঙ্গে সে একমত কিন্তু সেটা স্বীকার করতে চায় না। বেদিয়েরই জবাব দিল:

আপনার কথা খুবই সত্যি। আমারও মনে হয় অনেক কিছুই আমাদের ঢেলে সাজতে হবে। সারা অববাহিকা এমন কি স্ট্রাসবার্গ—লাল ভীতির কাছে তা কতই না অকিঞ্চিৎকর! কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না মশিয়ে শুরকে, আর সেটা হল এই যে কেন আপনি ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের পরিকল্পনাটা পছন্দ করেন না?

ব্যক্তিগতভাবে আমি পছন্দ করি। কিন্তু জাতির মনোভাবকে তো আর গণ্য না করে কেউ চলতে পারে না। মনোবলের দিক থেকে জার্মানরা গোলাবিধ্বস্ত। বার্লিন বিধ্বস্ত এটা খুব একটা ভয়ংকর কথা নয়, ভয়ংকর কথা হচ্ছে এই যে ঐ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপের রাস্তার একদিকে আপনারা, অন্যদিকে রয়েছে রুশরা। মানুষকে উদ্বুদ্ধ না করে তাকে এ আশ্বাস না দিয়ে যে, আছে সেনাবিভাগের সম্মান চিহ্ন, আছে গান, পতাকা—আছে গোটা একটা সেনাবাহিনী, কেউ আর তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠাতে পারে না।

সেনাবাহিনীর উপরেই একটু বেশি জোর দিচ্ছেন বলেই কি মনে হয় না আপনার?—জিজ্ঞেস করল পিনো।—ব্যক্তিগত দিক থেকে এ-সম্পর্কে আপনার

আকর্ষণ আছে সেটা বুঝি। কিন্তু আপনি তো আর শুধু একজন সৈনিকই নন, রাজনীতিকও বটেন। এ-কথা কি মনে হয় না আপনার যে ভাঙাচোরা সেনা-বাহিনীর চাইতে জার্মানির পক্ষে ইউরোপের অস্ত্রশালা হয়ে ওঠাই ভালো?

যদি জার্মান বাহিনী না থাকে তবে ঐ অস্ত্রশালা দু দিনেই পড়বে গিয়ে লালদের হাতে। কে রক্ষা করবে তখন? আমেরিকার যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামের উপরে আমার উচ্চ ধারণা আছে কিন্তু তাদের সৈন্যের উপরে আমার তেমন একটা বড় শ্রদ্ধা নেই। সাহস আছে তাদের কিন্তু তাদের সামরিক ঐতিহ্য নেই, নেই শৃংখলা, নেই দৃঢ়তা। তাছাড়া ঔপনিবেশিক যুদ্ধ কখনো বীর সৃষ্টি করে না। তাছাড়া, মিচিগান-এর বাসিন্দের কাছে এলব-এর সীমারেখা বা রাইনের সীমা-রেখাও যা জার্মানদের কাছে ক্যামেরুনরাও তাই।

জার্মানরা লড়বে এ কথা সত্যিই কি বিশ্বাস করেন আপনি?—জিজ্ঞেস করল ফাবর।

হ্যাঁ। লড়বে এই জন্যেই যে তারা যুদ্ধে হেরে গেছে, হারিয়েছে তাদের রাষ্ট্র, তারা আজ অসুখী। যে সব অঞ্চলে ব্রেসল, স্টেটিন সুদেতেনল্যাণ্ডের বাস্তুহারারা বসবাস করছে—প্রায়ই আমি সে সব অঞ্চল দেখতে যাই। যখন আমি ওদের জিজ্ঞেস করি যে অস্ত্র হাতে লড়াই করে তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে চায় কি না, জবাবে তারা বলে যে অবিলম্বেই তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর শুধু একা ওরাই নয়............ঝটিকা বাহিনীর সৈনিক ও অফিসারেরা, প্যারাস্যুট বাহিনী, বিমান বাহিনী, যে সব লোক রুশিয়ায় ছিল, এস-এস দল। অবশ্য এদের ভিতরে কিছু সংখ্যক পাজি বদমায়েশ যে নেই তা নয়, কিন্তু বেশিরভাগই সৎ আর সাহসী। লালদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সবাই ওরা মৃত্যু বরণ করতেও পিছপা নয়। ওরাই হচ্ছে সেই লোক যারা ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করবে।

বলতে বলতে ক্ষণেকের জন্যে থামল শুরকে। রেশমী রুমালটা দিয়ে কপালটা মুছে নিল তারপর এক ঢোক জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করল:

বেছে নিতে হবে আপনাদের। জার্মান বাহিনী গড়তে যদি আজ আপনারা সম্মত না হন তবে তার মানে হচ্ছে বলশেভিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। অতীতে যা হবার হয়ে গেছে। আমরা চাই আপনাদের জন্যে লড়তে। জার্মানি আজ প্রবীণ সৈনিকের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আপনাদের সামনে—

পিনো অবাক হয়ে দেখল যে ফাবর উঠে দাঁড়াল তারপর শুরকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরল। লোকটা কি সত্যি-সত্যিই এত দূর ভাব-প্রাণ হয়ে পড়েছে?—ভাবল মনে মনে। ফাবর বলতে লাগল:

আপনার সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ ব্যাপার নয় আমার পক্ষে—আমাদের মাঝখানে প্রচুর রক্তের ব্যবধান গড়ে উঠেছে। কিন্তু লালগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে আমি খোদ শয়তানের সঙ্গেও সমঝওতা করতে পারি। আপনারা যদি চল্লিশ ডিভিশন সৈন গড়ে তুলতে পারেন তবে সর্বপ্রথম আমিই আওয়াজ তুলব: জার্মান বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!

আর একবার সশব্দে নাক ঝেড়ে কিনো বলল:

আমার এখনো মনে হয় যে একটা ইউরোপীয় বাহিনী যার অংশ মাত্র হবে জার্মান ডিভিশনগুলি, সেটাই হচ্ছে সবচাইতে ভালো সমাধান।

বেদিয়ের অনুভব করল যে এখন তারও কিছু একটা বলা দরকার। একটা ভুল করে ফেলা সহজ। বিষয়টা জটিল তাই প্রয়োজন আছে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করার। সে তার গ্লাস তুলে ধরল:

আমরা সৈনিক নই। যে বিষয়টা সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যাপার সে সম্পর্কে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু আমাদের অনুভূতি আছে, আছে আদর্শ। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরে হের শুরকের সঙ্গে আনন্দপূর্ণ কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে আমি বিশেষ করে খুবই সুখী হলাম। জার্মান জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যে কথা তিনি বললেন সেটা গভীরভাবে আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। বিচলিত করে তুলেছে। যাঁরা কাল আমাদের শত্রু ছিলেন আর আজ আমাদের মিত্র হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি শুভ কামনা করছি।

হোটেলে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল শুরকে। ওর মনে হল যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আবার ওকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, হয়েছে নিজেকে বিনয়ী করে তুলতে। কিন্তু অতীতের সে শক্তি আর ওর নেই। এমনকি নিজেকে নিজে গুলি করার সাধ্যও ওর নেই—কমিউনিস্টরা তাহলে এটাকে মূলধন করে কাজে লাগাবে। কেননা কেউই বিশ্বাস করবে না এ কথা যে শুরকে শুধু এই জন্যেই আত্মহত্যা করতে পারে যে তার ক্লান্তি এসে গেছে দাড়ি কামাতে, বিনয়ী হয়ে পড়েছে বলে, সংগঠন করার.........কী অসম্ভব রকমের অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কি লজ্জাকর অসম্ভব ব্যাপার!

সন্ধ্যায় বেদিয়ের নিয়েলের কাছে বলল শুরকের সঙ্গে লাঞ্চের সময়ের কথাবার্তার বিষয়। একটু ভ্রূ কোঁচকাল নিয়েল:

স্বভাবতই আমি অন্য কাউকে পছন্দ করতাম। যাহোক, শুরকে যে বুদ্ধিমানের মতো হিসেব করে চলতে পারছে সেটা খুবই ভালো কথা।......ফাবরয়ের কথা ঠিকও হতে পারে। ওকে চিনি আমি। আবেগের ঝোঁকে চলে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে ওর অন্তর মস্তিস্কের চাইতে বেশি দূরদর্শী হয়ে ওঠে। মনে হয় শুরকেকে সুযোগ দেয়া দরকার ফরাসী জনমতের সামনে তার যুক্তি উপস্থিত করার।

ভাবছেন না যে কমিউনিস্টরা এটাকে তাহলে তাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে?

হেসে উঠল নিয়েল:

ওদের নিয়ে বড্ডো মাথাঘামান আপনি। যা কিছু পেলেই ওরা তা ব্যবহার করে থাকে। ওদের হৈ হল্লা করার মতো কিছু খোরাক দিতে যদি ভয় করতাম তবে কালই আমি নিউইয়র্কে ফিরে যেতাম। কিন্তু আমি চাই না আপনাদের ছেড়ে যেতে, বা পারী পরিত্যাগ করে চলে যেতে কিংবা প্রত্নদ্রব্য-বিক্রেতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে;—এখনও অনেক নস্যিদানী পাওয়া যাবে তাদের কাছে।

পরদিন নিয়েল ফোন করল নিভেলকে: শুরকের কাছে একটা লেখা চেয়ে পাঠালে সেটা ট্রানজকের কাজে আসত। না, রাজনৈতিক প্রবন্ধ হলে পাঠকরা চটে যেতে পারে। খানিকটা স্মৃতিকথার মতো। আর যা-ই হোক না কেন লোকটা খুব চটকদার। না, আর ফ্রান্সের কার্যকলাপের উপরে অবশ্য নয়। রুশিয়ার যুদ্ধ, বন্দী অবস্থার বছরগুলো, লাল এলাকা, এসবের উপরে। পশ্চিমী নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে তার মতামত দিয়ে শেষ করতে পারে অবশ্য।

শুরকের সঙ্গে দেখা করতে যেতে মনে মনে নিদারুণ বিরক্তি অনুভব করল নিভেল—যে দিনগুলোর স্মৃতি ও ভুলে থাকতে চায়, সেই দিনগুলোর স্মৃতিই জাগিয়ে তুলছে ওর মনে। কী অভিশপ্ত পেশা! কিছুদিন থেকে মনে মনে নিদারুণ হতাশা অনুভব করছে নিভেল। উত্যক্ত করে তুলেছে ওকে লো তার দৈনন্দিন প্রশ্ন, গালাগাল, বিজ্ঞপ্তি আর বেকুবের মতো কর্মপন্থার নির্দেশ পাঠিয়ে পাঠিয়ে। আর সব চাইতে সেরা ঘটনা হল এই যে সিনেটর ট্রানজক এজেন্সির আর্থিক হিসেবনিকেশ পরীক্ষার জন্য একজন তদারককারীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ওর জামাইকে ও একটা মামুলি কর্মচারীর পর্যায় টেনে নামিয়ে এনেছে। ক্রমেই বেশি করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে নিভেল ট্রানজকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা। কবিতা লেখার পরিবর্তে ও-কে কিনা করতে হচ্ছে যত সব রকমের বিস্বাদ বিরক্তিকর কাজ। আর এখন কিনা ওকে হাজরি দিতে হবে গিয়ে শুরকের কাছে—সেদিন পর্যন্ত যে নাকি ছিল পারীর বুকে একটি ক্ষুদে গেয়েবলস স্বরূপ।

সেই সাবেকী ধরনের হোটেলে যেখানে শুরকে বাসা নিয়েছে তারই নির্জন ঠান্ডা লাউঞ্জে নিভেলের সঙ্গে দেখা করল শুরকে। হুইস্কির হুকুম দিল শুরকে। আলোচনা করল ওরা প্রবন্ধ সম্পর্কে। তারপরই নেমে এল নীরবতা।

আপনার সেই বেদনাময় কঠোর অভিজ্ঞতার পরেও তেমন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি চেহারার দিক থেকে,—বলল নিভেল।—অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে।

মায়েরা কোনোকালেই বদলায় না, প্রত্যুত্তরে বলল শুরকে।

আবার নেমে এল নীরবতা। পাশের ঘরে কে যেন পিয়ানোয় সা-রে-গা-মা সাধছে। একটু কেঁপে উঠল নিভেল।—বড্ডো ঠান্ডা। আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন না কি?

হঠাৎ শুরকে বলে উঠল:

তাহলে এখন আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছেন? ওদের পছন্দ করেন কি না সে কথা অবশ্য আমি জিজ্ঞেস করছি না। আপনার কবিতা মনে আছে আমার আর খুব ভালোই বুঝি ওগুলো। আমিও ওদের হয়ে কাজ করছি।

শুরকের অন্তরঙ্গতা নিভেলের ক্ষতস্থান স্পর্শ করল। প্রত্যুত্তরে বলল:

সত্যি কথা বলছি আপনাকে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যখন আমি আপনাদের হয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম তখনো মনের দিক থেকে সুখী ছিলাম না।

স্বাভাবিক—মুচকি হাসল শুরকে।—সেটা কি আমি বুঝি না মনে করেন? এইভাবে পারীতে ফিরে আসা খুব সহজ ব্যাপার নয় আমার পক্ষে। কিন্তু সেটা

প্রশ্ন নয়। সবাই আমরা প্রতারিত, সবাই-ই অনুভব করছি যে নোংরা কাদার ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে আমাদের। সেইটাই হচ্ছে আসল কথা। আপনার কথা বলছি না আমি—আপনার রয়েছে কবিতা। এ কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম কিন্তু আপনার লেখা কোনো বই খুঁজে পেলাম না। হালে কোনো বই প্রকাশ করেন নি?

লিখছি কিছু একটা,—একটু জোর করে খুশির ভাব টেনে এনে বলল নিভেল। তারপর তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পারীতে ওর অবস্থানকাল বাড়িয়ে দিল শুরকে। সব রকমের লোক চায় ওর সঙ্গে দেখা করতে—ডেপুটিরা, সামরিক বিভাগের লোকজন, সাংবাদিক। ট্রানজক বিজ্ঞাপন দিল যে শুরকের স্মৃতির একমাত্র স্বত্বাধিকারী তারাই। ল্যোরোর-এর সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে শুরকে বলল:

জার্মান বাহিনীর ভিতরে কিছু কিছু বদ লোক ছিল। কিন্তু অন্যদিকে আজ সবাই বুঝতে পেরেছে যে নরম চামড়ার দস্তানা পরে কিছু আর লালদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না।

যুদ্ধের প্রাক্কালে পারীতে শুরকের ক্রিয়াকলাপ, বার্থে, পিনো, আর গেস্তাপোর সঙ্গে তার যোগাযোগ ইত্যাদির পুনরুল্লেখ করে লুমানিতে একটা প্রবন্ধ বের হল। প্রবন্ধটা এই বলে শেষ করেছে:

ফরাসী জনগণ কিছুতেই কখনও ফাশিস্তদের সঙ্গে আপোস রফা করবে না। ময়দানেক আর অস্‌উইজ-এর খুনীরা আবার স্বাধীনভাবে পারীতে আনা-গোনা শুরু করে দিয়েছে আর তারা পাচ্ছে কূটনীতিকের মর্যাদা। দূর হয়ে যাও শুরকে ফ্রান্স থেকে!

প্রবন্ধটা পড়ে হাসি পেল শুরকের। এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারলে তার চাইতে আর কোনো কিছুতেই বেশি খুশী হ'ত না ও। এখনো অগণ্য কমিউনিস্ট রয়েছে এখানে। জার্মানরা তাদের কাজ সুসম্পূর্ণ করতে পারেনি সে সময়ে। গেস্তাপোর কথাটা তোলার কোনো দরকার ছিল না। কোনো দিনই ও তাদের মধ্যে কাজ করেনি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে শুরকে যে গেস্তাপোরা ওদের কাজ সমাধা করতে পারেনি।

এক অবসর-সন্ধ্যায় একটা 'বাচ' কনসার্টে গেল শুরকে। গথিক ক্যাথিড্রালের গম্বুজগুলো থেকে যে গুরুগম্ভীর সঙ্গীত উদ্‌গত হয় তা শুনতে শুনতে ও ভুলে যায় সব কিছু, ভুলে যায় চিন্তা ভাবনা, দুঃখ।

বিরতির সময়ে হলঘরে এসে দাঁড়াল শুরকে। একজন সাংবাদিক এগিয়ে এল ওর কাছে। খানিক পরেই মরজগতে ফিরে এল। তারপর প্রশ্নের জবাব দিতে শুরু করল। বেশ জোরে জোরেই বলল যাতে চলন্ত লোকেরা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে শোনে।

কী যুদ্ধই না হয়েছে রুশিয়ায় তা ধারণাও করতে পারবেন না আপনারা! লালগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল—

দীর্ঘাঙ্গী একটি সুন্দরী তরুণী এগিয়ে এল ওর সামনে। চেনা মুখ, ভাবল শুরকে। কোনো একটা সংবর্ধনা সভায় নিশ্চয়ই দেখেছে ওকে।

আপনিই কি মেজর শ্যরকে?—জিজ্ঞেস করল তরুণী।

বিনীত হাসি হাসল শ্যরকে। এতক্ষণে স্মরণ হয়েছে মহিলাটি কে।

আপনার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় আমি আন্তরিক সুখী মাদাম বার্থে।

শ্যরকের কথা মনে আছে মাদোর। ফ্রান্স হচ্ছে একটা ছাগলের মতো। যেখানেই বেঁধে দাও সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাস খাবে, বলেছিল শ্যরকে। কী আফসোস যে লোকটা '৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্যারীতে ছিল না।

তীব্র দৃষ্টিতে মাদো শ্যরকের মুখের দিকে তাকাল। একদল কৌতূহলী দর্শক ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে।

আপনি রুশ শিশুদের হত্যা করেছেন বলছেন? তবে এই নিন এক ফরাসী নারীর উপহার।

শ্যরকের গালের উপরে একটা চড় কশিয়ে দিল মাদো। গোয়েন্দা বিভাগের যে সব চর শ্যরকের সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাদোর উপরে। তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এতক্ষণে ঘণ্টা বেজে উঠেছে। দর্শকেরা হলের ভিতরে চলে গেল কনসার্ট শুনতে। গুরুগম্ভীর সংগীত ধ্বনি জেগে উঠল হলের ভিতর থেকে। কিন্তু শ্যরকের কানে তা এসে পৌঁছাল না।

গোয়েন্দারা ফিরে এল!

ওর বিবৃতি নিচ্ছে ওরা। আপনার গাড়ি ডেকে পাঠিয়েছি। বিশ্রাম নেওয়া দরকার আপনার।

হ্যাঁ একটু বিশ্রাম দরকার—প্রত্যুত্তরে মৃদু কণ্ঠে বলল শ্যরকে।

ষাট

ঘড়িকার ফ্রান্তিসেক ক্রিস্তেক, যাকে তার মাক্যুইর কমরেডরা ডাকত 'চেক' বলে, সে আজ সাতাশ বছর ধরে বাস করছে ফ্রান্সে। তরুণ বয়সে এসেছিল পারীতে দু-চারদিন পরে আবার বাবা-মার কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু এই নতুন দেশের জীবন খুবই ভালো লেগে গেল ওর। তাই এক ঘড়িকারের কাছে তিন বছর শিক্ষানবিশী করার পরে নিজেই দোকান খুলল। আর এক বিয়ে করল এক ফরাসী মহিলাকে। উনিশশো তেত্রিশে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন আর কোনো ছেলেপুলেও যখন নেই তাই মাঝে মাঝে ও ভাবত দেশে ফিরে যাবার কথা। কিন্তু অনেকদিন আগেই ওর বাবা-মা মারা গেছেন, বন্ধুবান্ধবেরা ভুলে গেছে ওর কথা তাই মনে ভয়, দেশে ফিরে গেলে পাছে তাকে ভিন্‌দেশী বলে মনে করে।

সমস্ত কিছুর সঙ্গেই আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে,—মনে মনে বলল,—আমি কথা বলি ফরাসী ভাষায়, এমন কি স্বপ্ন পর্যন্ত দেখি ফরাসীতে।

জার্মানরা যখন চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করছে ও দূতাবাসে গিয়ে জানাল যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ও লড়তে চায়। কন্সাল ওর নাম লিখে নিয়ে কথা দিল ওকে যে সময়মতো খবর দেবে ওকে। এক হপ্তা পরে ফ্রান্তিসেক কাগজে পড়ল যে ইংরেজ আর ফরাসীরা হিটলারের সঙ্গে আপোসরফায় এসেছে। ওর পড়শীরা খুবই খুশী যে আর যুদ্ধ বাধবে না। কিন্তু ফ্রান্তিসেক ঘরে দোর দিয়ে গাল পাড়তে লাগল।

তা সত্ত্বেও এক বছর পরে যখন যুদ্ধ বাধল, ফ্রান্তিসেক স্বেচ্ছায় গিয়ে যোগ দিল ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে। তার অফিসারকে বলল:

আপনারা চেকদের রক্ষা করতে চাইলেন না, কিন্তু চেকবাসী আমি, আমি চাই ফ্রান্সকে রক্ষা করতে।

তোমার সাহায্য ছাড়াও বেশ চলে যাবে আমাদের।—অবজ্ঞার সুরে জবাব দিল অফিসার। প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে ফ্রান্তিসেকের: স্বভাবতই, ওর সাহায্য ছাড়াই চলেছে ওদের, সম্পূর্ণ সৈন্য ছাড়াই চলে গেছে ওদের। কেননা আগে থেকেই ওরা মনঃস্থির করেছিল যুদ্ধ করবে না বলে।

ওর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে মাক্যুইর কমরেডদের মনে প্রভাব বিস্তার করে-ছিল ফ্রান্তিসেক। পার্টিজানরা যখন বন্দীদের মুক্ত করার জন্যে একটা জেলখানা অবরোধ করেছিল, ফ্রান্তিসেক ভূমিকা নিয়েছিল গেস্তাপো কর্মচারীর আর বহুক্ষণ ধরে আলাপ করেছিল সান্ত্রীটার সঙ্গে। পরে ও বলেছিল:

গাধাটা জিজ্ঞেস করেছিল আমার কথায় টান রয়েছে কেন, আমি কি ভিয়েনার অধিবাসী? বললাম, ওর গর্বিত হওয়া উচিত, কারণ আমি খোদ ফুয়েরারের দেশের লোক। আমার খুড়োর নাম শিখেলগ্রুবের।

যুদ্ধের পরে ফ্রান্তিসেকের ইচ্ছে হল প্রাগে ফিরে যায়। কিন্তু যখন সময়

এল তখনো ও রয়েই গেল। মনে মনে বলল, দেখাই যাক না ঘটনার গতি কোন দিকে মোড় নেয়। মোড় নিল অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই। এক রাত্রে ওর দোরের ঘণ্টা বেজে উঠল আর বেজেই চলল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। পুলিশ ওর ড্রয়ার খালি করে ফেলেছে, বালিশ ফেঁড়ে ফেলেছে। থানায় নিয়ে গিয়ে ওকে বলা হল যে ওকে দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তারপর ঘুমজাড়ানো চোখে ক্রুদ্ধ পুলিশ কর্মচারী বলল:

অনেক দুষ্কর্ম করার চেষ্টা করছেন আপনি।

ঠিক কথা,—প্রত্যুত্তরে বলল ফ্রান্তিসেক,—আপনার চোখে আমি দোষীই নিশ্চয়ই। প্রথমত দোষী এই জন্যে যে আমি আপনাদের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে আপনারা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। দ্বিতীয়ত আমি ছিলাম একজন পার্টিজান আর তৃতীয়ত আমি চেক—আমাদের এমন একটা সরকার আছে যেটা আদৌ আপনাদের খুশী করতে পারেনি। সুতরাং বিপজ্জনক অপরাধী ফ্রান্তিসেককে নির্বাসিত করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

প্রাগে পোঁছালে ওকে জিজ্ঞেস করল:

শহরটাকে আর চেনা যায় না বলেই বোধহয় মনে হচ্ছে আপনার? বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ও জানে না জবাবে কি বলবে। কারণ অতীতের প্রাগ কেমন ছিল আদৌ মনে নেই ওর। নিজেকেই নিজে এই বলে উপহাস করল:

স্মিহভের বাসিন্দে মঁসিয়ে ফ্রান্তিসেক যেন বার্গেণ্ডি বিয়ার বা পিলসেন মদ।

কিন্তু ছ'মাস যেতে না যেতেই এতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগল ফ্রান্তিসেক যেন সে কোনোদিন প্রাগ ছেড়ে কোথাও যায় নি। শুধু যখন মাদোকে প্রাগের দৃশ্য আঁকা পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছিল সেই সময়টায় কয়েক ঘণ্টার জন্যে যেন ও অতীতকে ফিরে পেল। তারপর সে চলে যেত একজন বন্ধুর কাছে, দুনিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে করত আলাপ-আলোচনা, আনন্দ করত যে জীবন আবার সুশৃংখল হয়ে আসছে, গাল পাড়ত ট্রুম্যানকে আর লন্ডন-প্রবাসী দেশত্যাগী-দের উদ্দেশ্যে। এসব আলোচনা যখন করত, করত "দারে দোকানে" বসে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ফ্রান্তিসেকের জীবনে আর কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটেনি। সমস্ত নারীকেই সুন্দরী ভাবার জন্যে এক বোতল মদ শেষ করাই যথেষ্ট ছিল ওর পক্ষে, কিন্তু ভোরে উঠে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানাত এই জন্যেই যে সে ঐ প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পেরেছে। যখন তরুণী বিধবা কভেতা এলিনেকোভার সঙ্গে ওর পরিচয় হল তখন ওর বয়েস আটচল্লিশ বছর। ভাবল প্রেমে পড়ার দিক থেকে ও নেহাতই অনাক্রম্য। এক বন্ধুর বাড়িতে দেখা হয়েছিল কভেতার সঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গেই ভালো লেগে গেল তাকে। ও বলতে লাগল পারীর কথা, মাক্যুইর কথা—যা ও কদাচিৎ বলে থাকে কারুর কাছে। কিন্তু ও চাইল ওর মনের উপরে ছাপ ফেলতে। তারপর নীরবে তাকে সঙ্গে করে বাড়ি পোঁছে দিয়ে এল। সেই সন্ধ্যা থেকেই

হল সূচনা। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, বলব-বলব করে কিন্তু মনের কথা বলবার সাহস পায় না ফ্রান্তিসেক। চমৎকার ব্যাপার!—মনে মনে ভাবল। প্রৌঢ় বয়েসে এসে পৌঁছে গেছে, এতদিনে ঘরসংসার পেতে বসে খাওয়া উচিত ছিল তবুও কিনা এখনো মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে।

একটা রেস্তোরাঁয় কাপড়চোপড় রাখার ঘরের পরিচারিকার কাজ করে কভেতা। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সের হাসিখুশি সহৃদয় মহিলা। ফ্রান্তিসেকের মনোযোগ ওর উপরে আকৃষ্ট হয়েছে দেখে খুবই গর্ব অনুভব করে মনে মনে। ওর পড়শীরা বলে একটা কেউকেটা লোক ফ্রান্তিসেক—ছিল পার্টিজান, তাছাড়া ওকে ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপার নিয়ে কাগজে কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু ভাবতেই পারে না কভেতা যে ফ্রান্তিসেক সত্যি সত্যিই আকৃষ্ট হয়েছে ওর উপরে। পারীতে নিশ্চয়ই কত ভালো ভালো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। তাছাড়া ও একটু মজা করছে মাত্র। ওকে প্রেমে পড়াবে তারপর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কিছুতেই ওর প্রেমে পড়বে না কভেতা। ওরও একটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে।

প্রতিদিন দেখাসাক্ষাৎ করে চলেছে ফ্রান্তিসেক ওর সঙ্গে কিন্তু ওদের পূর্বরাগ তেমন এগোচ্ছে না। ওর ইচ্ছে হয় মনের কথা ভেঙে বলে, কিন্তু সাধারণত আলোচনা হয় রাজনীতি নিয়ে: রুশদের প্রশংসা করে, মার্শাল প্লান যে পরাধীনতার নামান্তর তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, নিন্দে করে টিটোকে। কভেতা খবরের কাগজ পড়ে না তাই এসব বিষয় তেমন ওর মাথায় ঢোকে না। কখনো কখনো অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে ফ্রান্তিসেক:

কিচ্ছু জানো না তুমি! লোকে ভাববে তোমার দেশে যা সব ঘটছে সে সব ব্যাপারে তোমার আদৌ কোনো আকর্ষণ নেই।

প্রত্যুত্তরে রাগ করে কভেতা বলে:

আজীবন আমি এখানে বাস করছি। কোনোদিন বিদেশে যাই নি। তাছাড়া খবরের কাগজ পড়তে বিরক্তি ধরে আমার।

বিরক্তি ও অনুরাগের মিশ্রিত দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে তাকায় ফ্রান্তিসেক। যেন বলতে চায়:

তুমি এখানে আছ জানলে অনেক আগেই চলে আসতাম।

পরিবর্তে ও শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আবার রুজিচকার হত্যার পেছনে আমেরিকান চক্রান্তের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করতে লাগল।

একদিন ও বলল কভেতার কাছে:

কুৎসিত বক্তৃতা দিচ্ছে জেইদা মিউনিক রেডিও থেকে। গেস্তাপোর লোকদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে আমেরিকানরা, ভাব একবার!

ওর কথায় কভেতার ভাবান্তর দেখে অবাক হয়ে গেল ফ্রান্তিসেক:

কি বলছেন আপনি?—চেঁচিয়ে উঠল কভেতা,—জেইদা একজন কমিউনিস্ট। 'রুদে প্রাভো'তে লেখেন তিনি। আমি চিনি তাঁকে। রোজই তিনি আমাদের রেস্তোরাঁয় খেতেন।

ফ্রান্তিসেক বলল ওকে যে জেইদা শত্রুর গুপ্তচর এটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

প্রায় ছ'মাস আগে সে পালিয়ে চলে গেছে। সমস্ত কাগজেই সে খবর বেরিয়েছিল। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে সবারই খবরের কাগজ পড়া দরকার, নইলে দুনিয়ায় কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে তা জানতে পারা যায় না। কভোতার কানে ওর একটি কথাও প্রবেশ করছিল না। ও নিজের চিন্তায়ই বিভোর হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ও চিন্তা করতে লাগল। ফ্রান্তিসেক বা তার খবরের কাগজ পড়ার প্রয়োজনীয়তার কথা নয়, ভাবতে লাগল যে ব্রিফ-কেসটা জেইদা ওর কাছে দিয়েছিল সেটার কথা। যদিও ফ্রান্তিসেক ওর রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীনতার কথা নিয়ে ভর্ৎসনা করে, তবুও ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে থেকেই ও ভাবতে শুরু করেছে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা আগের চাইতে ঢের ভালো। তাছাড়া আমেরিকানদের কেউ ডেকে আনে নি যে প্রাগে এসে তারা চক্রান্তমূলক কাজকর্ম শুরু করে। তাই যখন বিফ্র-কেসটা রাখতে দিয়ে জেইদা বলল ওকে যে এটা একটা আমেরিকান দালালের জিনিস—রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের, সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল কভেতা। জেইদা ওকে সাবধান করে দিয়েছিল যে ও যেন এইটুকুই মাত্র বলে যে কে যেন ব্রিফ-কেসটা ভুলে পোশাক-ঘরে ফেলে রেখে গেছে। আর কিছু নয়। কি কারণ আছে জেইদাকে বিশ্বাস না করার? হের জন যখন বেঁচেছিল প্রায়ই বলত: ‘প্রত্যেকেই কিছু আর জেইদার মতো সাহসী হয় না। আমিও জার্মানবিরোধী, কিন্তু কি করি আমি? মজার মজার সব গল্প বলি ওদের সম্পর্কে'। আর এখন কি না বেরিয়ে পড়ল যে জেইদা গেস্তাপোর হয়ে কাজ করত। বোধহয়, ওকেও সে একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের ভিতরে জড়িয়ে থাকবে? এ কথা সত্যি যে ওকে জেরা করার জন্যে ডাকেনি কোনো দিন। সুতরাং হয়তো ব্যাপারটা চুকেবুকে গেছে। হয়তো ওর কথা ভুলেই গেছে ওরা। ঢের দরকারী জিনিস আছে ওদের ভাববার। দুশ্চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তবুও কি ওর গিয়ে কথাটা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া ভালো নয়? কে জানে, হয়তো কোনো নোংরা চক্রান্তই বা আছে এর পেছনে? ওর মতো একটা বদমায়েশ লোকের পক্ষে ইচ্ছে করেই মিথ্যা একটা জাল পেতে রাখা খুবই সম্ভব। হ্যাঁ, কিন্তু তখন তো ওরা ওকেই দায়ী করবে। যদি বলে ও জেইদার কথা বিশ্বাস করেছিল তবে ওরা উপহাস করবে ওকে। তবুও ঢের বেশি বুদ্ধিমান লোকও তো ওর চক্রান্তে জেলে ঢুকছে। ওরা জিজ্ঞেস করবে গত ছ'মাসের মধ্যেও এ কথা জানায় নি কেন? কেউই ওকে চেনে না, ওরা বলবে ও নিজেও জেইদার কুকর্মের সাথী। না, ও যাবে না কিছুতেই। ও চায় বাঁচতে। হঠাৎ ওর মনে হল:

ধর যদি ফ্রান্তিসেক ওকে বিয়ে করতে চায়? কী চমৎকারই না হয় তাহলে! ভোরের দিকে শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার ব্রিফ-কেসটার কথা মনে পড়তেই মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। আর কিছু না হোক ব্যাপারটা ওর বিবেককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়াটাও বোকামো হবে। কি করা উচিত ওর এখন? সারাদিন এই কথাটাই চিন্তা করতে লাগল। নম্বর দিতে ভুল হচ্ছিল। একটি

মহিলাকে এনে দিল একটা পুরুষের ওভার কোট। খদ্দেররা বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যেয় এল ফ্রান্তিসেক। এসেই শুরু করল চীনের কথা। ত্যার কথা ওর কানে ঢুকছে না।

কি হয়েছে তোমার, কভেতা? হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়নি নিশ্চয়ই? যা আবহাওয়া তাতে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়।

আর সহ্য করতে পারল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল কভেতা। ভয়ে ভয়ে ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ফ্রান্তিসেক। শেষ পর্যন্ত ব্রিফ কেস ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল ওর কাছে।

নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বলবে,—বলল ফ্রান্তিসেক,—নিশ্চয়ই এটা আমেরিকানদের চোরাগোপ্তা কাজ। এক্ষুনি তোমাকে যেতে হবে কভেতা। ওরা রাত্রেও কাজ করে।

ভয় করছে আমার ফ্রান্তিসেক—কাঁদতে কাঁদতে বলল কভেতা—ওরা বলবে আমিও ওর চক্রান্তের ভিতরে ছিলাম। দুনিয়ায় আমি একা, কেউ নেই এমন যে আমার হয়ে দু-কথা বলবে। এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে আসতে পারতে......

কী বলব আমি ওদের? ওরা তো জিজ্ঞেস করবে কেন আমি এসেছি তোমার সঙ্গে।

বলবে তুমি আমার প্রণয়ী—এত মৃদু কণ্ঠে বলল কভেতা যে খুবই অস্পষ্ট-ভাবে শুনতে পেল ও।

বেশ, ভালো কথা—উঠে দাঁড়িয়ে বলল ফ্রান্তিসেক—চল যাই।

দেখা গেল কভেতা যেমন আশা করেছিল তার চাইতে অনেক সহজেই মিটে গেল। অবশ্য এ কথা ঠিক ওকে বলে দেওয়া হল আরো অনুসন্ধানের জন্যে দরকার মতো ওকে ডাকা হতে পারে, কিন্তু খুবই ভদ্র ব্যবহার করল তারা ওর সঙ্গে। এমন কি ধন্যবাদ দিল পর্যন্ত। শুধু শেষের দিকে ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করল:

এত দেরি করে ফেললেন কেন আমাদের কাছে আসতে?

চুপ করে রইল কভেতা। ওর হয়ে ফ্রান্তিসেক জবাব দিল:

ও জানত না যে জেইদা ধরা পড়ে গেছে। সে সময়ে অসুখে ভুগছিল তাই খবরের কাগজ পড়ে নি। মাত্র কাল আমি ওকে জেইদার মিউনিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে বলছিলাম। আমাকেও ডাকতে পারেন আপনারা—আমার নাম ক্রিস্তেক ফ্রান্তিসেক, পার্টি সভ্য। ফরাসী দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছি।

পরম হৃদ্যতার সঙ্গে ক্যাপটেন করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে। আর কভেতা বুঝল মনে মনে—ব্যাপারটা ভালই হল শেষ পর্যন্ত।

ভ্যাপসা গরম রাত। চমৎকার ইলসেগুঁড়ি পড়ছে। বসন্ত আসতে এখন পুরো একটা মাস,—ভাবল ফ্রান্তিসেক, কিন্তু আবহাওয়া ঠিক বসন্তকালেরই মতো। স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ও কভেতোর মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল:

এখন দেখলে তো, প্রত্যেকেরই খবরের কাগজ পড়া দরকার। নইলে কি ঘটতে পারে।

যখন ওরা কভেতার বাড়িতে এসে পৌঁছাল, কভেতা ওকে ধন্যাবাদ জানাল,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল না। যদিও ইলশেগুঁড়ি, তখন দস্তুরমতো বর্ষায় রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

আচ্ছা কভেতা, আমি যদি তোমার ঘরে আসতে চাই তবে কি তুমি তাড়িয়ে দেবে আমাকে?

সিঁড়িতে কথা ব'লো না—প্রত্যুত্তরে ফিসফিস করে বলল কভেতা,—পাশের ঘরের লোকেরা শুনতে পাবে।

প্রবল উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাতড়ে ফিরল দরজা খুলতে গিয়ে। তারপর ঘরের ভিতরে ঢুকেই দু হাতে ফ্রান্তিসেককে জড়িয়ে ধরে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে গেল।

এক হপ্তা পরে প্রাগের সবাই শুনল যে ইঞ্জিনিয়ার কারেল হোবজা ছাড়া পেয়েছে। প্রমাণ হয়ে গেছে যে সে নির্দোষ। কোনো একজন প্রভাবশালী লোকের মিথ্যা অভিযোগের দরুণই ওকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন জানা গেছে যে সে লোকটা আমেরিকান গুপ্তচর। সঠিক ব্যাপারটা কেউই জানে না। ফ্রান্তিসেক ঘটনাটা বলল কভেতার কাছে আর বাপান্ত করতে লাগল আমেরিকানদের।

খুব ভাল হয়েছে যে ভদ্রলোক মুক্তি পেয়েছেন,—প্রশান্ত কণ্ঠে বলে উঠল কভেতা। কিন্তু এ কথা ঘুনাক্ষরেও তার মনে আসেনি যে তার সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে।

হোবজা মুক্তি পেয়েছে শুনে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ল স্মিডল। বহুদিন আগে কস্টার ওকে লিখে জানিয়েছিল যে জেহাদীদের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ হোবজাই হচ্ছে সৎ লোক। যদিও লোকটা বাক্যবাগীশ, হাতেকলমে কাজ করার চাইতে মার্শালের নীতি আওড়ানোটাই পছন্দ করে বেশি, তবুও সে লাল-গুলোকে ঘৃণা করে। ওর ছেলেকে বন্দী করার জন্যে কিছুতেই সে তাদের ক্ষমা করতে পারে না। স্মিডল দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল প্রাগে। মুহূর্তে বুঝতে পারল সে যে ওর কাজ করার সুযোগ নেই এখানে—জায়গাটা বার্লিনের মতো নয়। না কস্টার, না জেইদা কাউকেও বিশ্বাস করে না। একটা হাওয়ায় ভরা ফানুস, আর একটা বদমায়েশ। বুড়ো হোবজার সঙ্গে দেখা করতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে খবর পেল যে তার ছেলেকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। খুবই সম্ভব বুড়ো হয়তো কস্টারের সঙ্গের ব্যাপারট্যাপার কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছে। যে কেউই এসব ব্যাপারে কেটে পড়তে পারে। ফেইমানকে খুঁজে বের করল স্মিডল। বেঁটে চেহারা, টেকো মাথা ছোটখাটো মানুষটি। অতীত রহস্যাবৃত, তাই জেইদাও সাহস করেনি ওকে কস্টারের সামনে এনে হাজির করতে। ফ্রেইমান চতুর, বলল যে জেইদা সম্পর্কে জানাজানি হয়ে যাবার পরে এখানে কাজকর্ম করা খুবই শক্ত হয়ে পড়েছে। ছোটখাটো দু-একটা কাজকর্ম হয়তো করা সম্ভব কিন্তু টাকার দরকার খুব বেশি। কোনো কথাই বের করতে পারল না স্মিডল ওর কাছ থেকে। টাকাটা জলে দেয়া হচ্ছে মনে করেও ওকে একশো ডলার দিল

স্মিডল। এখন যাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে তারা হল জেনারেল দোবেক বা প্রজাসকা। অবিশ্যি ব্যাপারটা ভাগ্যপরীক্ষারই সামিল। ওর কাছ থেকে হাজার মার্ক আদায় করার জন্যেই হয়তো জেইদা এটা তৈরি করে বলেছে। মনে হয় প্রোজাককাকে দিয়েই শুরু করা ভালো—জেনারেল হয়তো সংকোচ বোধ করতে পারে। প্রোজাককার জন্যে একটা সাংকেতিক কথা আছে। তাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে যে জেইদা মিথ্যে করে বলেছে কি না। তাছাড়া বিদেশী সাংবাদিকের পক্ষে সামরিক বিভাগের কারুর সঙ্গে দেখা করার চাইতে প্রচার বিভাগের কারো সঙ্গে দেখা করা সহজ। প্রোজাককাকেই আগে দেখবে।

স্মিডল গাড়ি করে ছুটে গেল দূতাবাসে। ওয়াশিংটনে লো-কে একটা সাংকেতিক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিল এই বলে যে স্থানীয়ভাবে মূল্যবান কতগুলি কাজে হাত দিচ্ছে। আরো সুদূর-প্রসারী কাজকর্ম শুরু করাটা নির্ভর করছে কোনো একজন বিখ্যাত রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলাফলের উপরে। আর সেটাও অদূর ভবিষ্যতেই হতে যাচ্ছে।

টেলিগ্রাম করার পরে স্মিডল এক গ্লাস হুইস্কি খেয়ে নিয়ে সেক্রেটারির কাছে বলল:

আমার শোবার ঘরে নিশ্চয়ই একটা মাইক্রোফোন রয়েছে। শুধু ফ্রন্টে ছাড়া জীবনে কোনোদিনও অন্য লোকের সঙ্গে এক ঘরে বাস করি নি আমি। কিন্তু ওখানে সবাইকেই কাঠের সারির মতো পড়ে থাকতে হয়। জানি না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলি কি না। বিশ্বাস করুন, এখানে আসার পর একটা রাতও আমার ভালোভাবে কাটেনি। বড়জোর একটু বেড়াল-ঘুম ঘুমই, তার বেশি আর ভরসা পাই না। এ ধরনের নোংরা সরকার আর কতকাল কায়েম থাকবে?

যে মুহূর্তে বুড়ো হোবজা শুনলেন যে তার ছেলে মুক্তি পেয়েছে অমনি ছুটে গেলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। দু বছর আগে ছেলেকে লিখেছিলেন যে তিনি আর তার মুখদর্শন করতে চান না। কিন্তু আজ সে কথা ভাবতেও হাসি পায়। এবার হয়তো দুজন দুজনকে বুঝতো পারবে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে মেলামেশার মানেটা যে কি সেটা হয়তো বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে কার্ল। ও ছিল শিশুর মতো সরল—বিশ্বাসী। অবশ্য কমিউনিস্টরা যা বলে তা শুনতে খুবই ভালো, কিন্তু কার্যত ব্যাপারটা অন্য রকমের। তাছাড়া কমিউনিস্টদের বেলায়ই যে ব্যাপারটা ঐ রকমের তা নয়। নিজেও তিনি ছিলেন শিশুরই মতো; তিনিও শুনতেন আমেরিকান আহ্বান আর বিশ্বাসও করেছিলেন যে সত্যি সত্যিই ওরা চেকদের সাহায্য করতে আগ্রহশীল। কিন্তু তার পিছনে রয়েছে কুৎসিত চক্রান্ত। ওদের কর্মপদ্ধতির তো কথাই নেই সুদেতন জার্মানদের কি না ওরা চেকদের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে। কস্টার তো একটা খাঁটি গুণ্ডার সর্দার। মনে আছে, ঐ ধরনের লোক দেখেছেন তিনি সিনেমার পর্দায়। একটা গুণ্ডা সর্দারের পক্ষেই সম্ভব জেইদাকে দিয়ে রুজিৎস্কাকে হত্যা করানো। জেইদা যে কমিউ-নিস্টদের প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল সে ব্যাপারটার মানে বুঝতে পারেন তিনি। নিজেও তিনি ওকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে করেছিলেন। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি শুনতে পেয়েছেন যে ও গেস্তাপোর হয়ে কাজ করেছে, তার

পর কোনো সৎ লোকের পক্ষেই আর ওর সঙ্গে করমর্দন করা সম্ভব নয়। তবুও আমেরিকানরা ওকে শুধু যে আশ্রয়ই দিয়েছে তা-ই নয়—ওদের পক্ষ হয়ে রেডিও মারফত বক্তৃতা দেয়। ন্যক্কারজনক ব্যাপার! এক কথায়, দুটোর কোনো-টাকেই বেছে নেবার কোনো প্রশ্নই নেই। রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিত। কার্ল মুক্তি পেয়েছে এটাই হচ্ছে এখন আসল কথা। এবার ও আবার ফিরে গিয়ে নিজের কাজে যোগ দিতে পারবে। তিনি, বৃদ্ধ হোবজা, যাবেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো শিগগিরই বিয়ে করবে কার্ল। লোকে বলে সে নাকি ডাঃ পিসেকের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সর্বত্র যায়। আসবে নাতি......

বাবাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এল কার্ল। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল দুজনে। যে মুহূর্তে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল—কারণ খুবই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছেন তিনি—জুলিয়াস হোবজা জিজ্ঞেস করলেন:

কেমন কাটল জেলখানায়? খুবই খারাপ?

কার্ল হাসল:

জেলখানাটা কোনো দিনই যে মনোরম হয় তা তো মনে হয় না আমার।

অবাঞ্ছিত স্মৃতির পুনরুল্লেখ করে পাছে ওকে ব্যথা দিয়ে ফেলেন ভেবে জুলিয়াস পারিবারিক খবরাখবর বলতে শুরু করে দিলেন ওর কাছে:

ভ্যাকলাভ খুড়োর গেঁটেবাত এতটা বেড়েছে যে এখন আর কাজও করতে পারে না। আর ভ্লাস্তা বিয়ে করতে যাচ্ছে ব্রনোর একটা চাষাড়ে লোককে।

তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছ? ওরা কি তোমাকে কাজ দেবে, না দেবে না?

ডিরেক্টর হিসেবেই আমি আমার আগের কাজে ফিরে যাচ্ছি।

আমার মনে হয় না যে তোমার যাওয়া ঠিক হবে। তুমি একজন ইঞ্জিনিয়র, ডিরেক্টরের কাজ দিয়ে দরকার নেই তোমার। কেন এ সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে যাচ্ছ? বোধহয় এবার ভালো করেই বুঝতে পেরেছ যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যত কম মেলামেশা করা যায় ততই ভাল।

আজই আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে পার্টিতেও আমাকে পুনর্বহাল করা হবে। ব্যক্তিগত দুর্ভোগের জন্যে কিছু আর আমার বিশ্বাস বদলে যাচ্ছে না।

আগুন হয়ে উঠলেন জুলিয়াস হোবজা।

তাহলে কি তুমি ভাব যে কোনো কারণ থাকুক আর না-ই থাকুক, নির্দোষ লোককে ধরে ধরে জেলে পুরতে হবে?

না, এটা অন্যায় সন্দেহ নেই। যদিও দুনিয়া জোড়া যা সব চলেছে তার তুলনায় এটা বলতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু কি করে এটা ঘটল বলছি শোন। জেইদার নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? এখন তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মিউনিকে পালিয়ে গেছে আর সেখানে গিয়ে আমেরিকানদের হয়ে কাজ করছে। সে আমার ব্রিফ-কেসটা চুরি করে তার ভিতরে গোয়েন্দাগিরির রিপোর্ট ঢুকিয়ে রেখে দেয়। খুব চতুরতার সঙ্গেই কাজটা করেছিল, জালও করেছিল খুবই নিপুণভাবে; তারপর বুদ্ধি করে ঢুকিয়ে রেখেছিল আমার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে। যতদূর শুনেছি একটি স্ত্রীলোক এসে জানিয়েছে যে জেইদা ব্রিফ-

কেসটা তার হাতে দেয়। দেখলে তো কি নোংরা চক্রান্ত ছিল এর ভিতরে? হেন কাজ নেই যা আমেরিকানরা করতে না পারে।

আমেরিকান নীতিকে তীব্রভাবে গাল দিতে লাগল কার্ল। কিন্তু একটি বর্ণও হোবজার কানে ঢুকছে না। দু হাতের মধ্যে মুখ রেখে বাঁকা হয়ে বসে, ভাবতে লাগলেন তিনি মানুষের নীচতার কথা। আর এত বড়ো দুঃসাহস জেইদার যে সে কিনা ও'র কাছে এসে বলেছিল যে রুজিৎস্কা মিথ্যে করে কার্লের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। ব্যাটা বদমায়েশ! ওরা ও'কেও ফাঁদে ফেলার চেষ্টায় ছিল। এতদিনে ওদের চক্রান্ত বুঝতে পেরেছেন তিনি। যদি কস্টারের কথা বলেন তবে খুশী হয়ে উঠবে কার্ল, ওর কথার সত্যতাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু ও তখন জিদ করবে যে সে—জুলিয়াস গিয়ে সব ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করে। আর তাতে করে একটা প্রভেদ সৃষ্টি করে তোলে। না কমিউনিস্ট, না আমেরিকান কারোর উপরেই ওর কোনো সহানুভূতি নেই। তাহলে ওদের চরকায়ই বা তেল দিতে যাওয়া কেন? সওয়াল-জবাব, তদন্ত, রাজনৈতিক মামলামোকর্দমা এ সব সম্পর্কে চিরদিনই ওর একটা দারুণ ভীতি আছে। তাছাড়া ওর বাপ 'জেহাদী' দলে ছিল এটা জানাজানি হয়ে গেলে কার্লের ক্ষতি হতে পারে। কেউ-ই জানে না এ কথা। দলত্যাগ করে পালিয়ে গেছে জেইদা, কস্টারও চলে গেছে—বোধহয় ভয় পেয়ে কেটে পড়েছে। তাছাড়া জোচ্চোর ফ্রেইমানটা চোরা-কারবারে এমনই জড়িয়ে পড়েছে যে মুখ খুলতে সাহস করবে না। না, কথাটা চেপেই যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, কার্ল মোটেই এ সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অভিযোগ করছে না। ছ মাস দুর্ভোগ ভুগল আর তার জন্যে দায়ী করছে কি না শুধু আমেরিকানদের? ওর বাপ ওকে সহনশীলতা আর মনুষ্যত্বের আদর্শে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে এসেছে চিরদিন, আর ও কি না হয়ে উঠল একটা গোঁড়া আদর্শবাদী। এমন ছেলে নিয়ে সুখ নেই।

কার্লকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন:

প্রাণভরে যত খুশি গাল পাড়তে পার আমেরিকানদের তাতে চেহারাটা একই থেকে যায়। আমি আমেরিকায় যাই নি কোনোদিন। জানিও না সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে। দাঁড়াও, বলতে দাও আমাকে......জেইদার বিষয়ে আমি একমত তোমার সঙ্গে। বদমায়েশটা ছিল ছদ্মবেশী। তোমার বন্ধুরাও ওকে ভালো লোক বলেই ধরে নিয়েছিল। তাছাড়া আমেরিকানরা যে ওকে বেতার বক্তৃতা দিতে দেয় সেটাও ন্যক্কারজনক ব্যাপার সন্দেহ নেই। থাম, শেষ হয় নি আমার কথা। আমেরিকানদের হয়ে ওকালতি করতে চাই না আমি, কিন্তু তুমি ওকালতি করছ কমিউনিস্টদের পক্ষে। একটা নির্দোষ লোককে যে ওরা জেলে পুরে রাখল, সে কথাটা তোমার গায়েই লাগছে না। চেচাঁমেচি করে আমার মুখ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা বৃথা—সোজা কথা বলব আমি—এটা মাশারিকের নীতির পরিপন্থী। এটা অমানুষিক। এই ভিতের উপরে তুমি একটা নৈতিক সমাজ গড়ে তুলতে পার না।

এর জন্যে দায়ী আমেরিকানরা আর যে বদমায়েশগুলো তাদের হয়ে কাজ

করে, তারা। শুরু হয় কানাঘুষার ভিতর দিয়ে—এটা খারাপ, ওটা ভালো নয় —তারপর শেষ হয় রুজিৎস্কার হত্যার ভিতর দিয়ে।

রাগে জ্বলে উঠলেন জুনিয়াস হোবজা:

মুখ সামলে কথা বলবে! যখন তুমি জেলে ছিলে আমার বুক ফেটে রক্ত ঝরত। কিন্তু এখন আর এতটুকু মমতাও নেই আমার তোমার উপরে। ঠিক উপযুক্ত প্রতিফলই পেয়েছিলে তুমি। ঠিক একটা নাৎসীর মতোই তোমার কথা-বার্তা। নাৎসীরাই একমাত্র চেঁচিয়ে বেড়াত এই কথা বলে যে যারা তাদের সঙ্গে নয় তারাই বদমায়েশ। আজ থেকে আমার কোনো ছেলে নেই......

রাগে গরগর করতে করতে ফিরে চলে গেলেন হোবজা। বাড়িতে পেঁছেই তিনি আবার ধাতস্থ হয়ে উঠলেন। যন্ত্রণা ভোগ করে ফিরে এসেছে কার্ল। ওর স্নায়ুর উপরে চাপ পড়েছে প্রচণ্ড। আর তিনি কিনা কতকগুলো গালাগাল দিয়ে এলেন ওকে। খুবই অন্যায় হয়েছে। এতটা রেগে যাওয়ার কারণ কি ছিল ওঁর? বোধহয় রেগে গিয়েছিলেন নিজের উপরেই—কস্টারকে বিশ্বাস করেছিলেন বলে। আর সে রাগটা ঝাড়লেন কার্লের উপরে। কী ভয়ংকর ব্যাপার, কিছুতেই সত্যি কথাটা বলতে পারলেন না তিনি কার্লের কাছে। সব সময়েই এটা একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়াবে দুজনার ভিতরে। না, আবার তিনি খেই হারিয়ে ফেলছেন............যাই হোক না কেন, কোন্ ধরনের সরকার আছে ওদের সেটা কি খুবই একটা বড়ো কথা? তার চাইতে ঢের বেশি বড়ো কথা ওর কাছে এটাই যে তাঁর ছেলে সৎ, সাহসী, প্রতিভাবান, আর তবুও কি না তিনি ঝগড়া করলেন তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে? ঐ কস্টার লোকটা যদি আবার সাহস করে এখানে আসতে চায় তবে দশজনার সামনে তিনি তাকে অপমান করে ছাড়বেন। কিন্তু তিনি তো প্রকাশ্যে ওকে নিন্দা করতে পারেন নি। উনিশ শতকের লোক তিনি। হ্যাঁ, ভালো কথা, কার্লের সম্পর্কে কি করবেন?

ভারাক্রান্ত মনে বহুক্ষণ ধরে অস্থিরভাবে ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে আর মাঝে মাঝে থেমে থেমে জল খাচ্ছেন। অবশেষে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে বড় বড় অক্ষরে দ্রুত লিখে চললেন:

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি আমি। মে মাসে আমার পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হবে। এক পুরুষ আগের মানুষ আমি। প্রায়ই ভুল করে বসি, হঠাৎ না ভেবেচিন্তে একটা কাজ করে ফেলি, একথা সত্যি কিন্তু চিরদিনই আমি আমার স্বদেশের উন্নতির কামনা করে এসেছি। এখন আমার একমাত্র কাম্য হচ্ছে তোমাকে সুখী দেখা। যে ব্যাপারটা আমাদের দুজনকে আলাদা করে রাখছে সে সম্পর্কে আর কোনোদিনও আমরা আলোচনা করব না। রাগের মাথায় যে সব কথা বলেছি সে সব ভুলে যাও। তোমার মাথাটাও বাচ্চা ছেলের মতোই গরম আর তাই বোকার মতো কাজ করে ফেল। আমার উপরে যদি রাগ না করে থাক, কাল এসে আমার সঙ্গে খাবে। এক বোতল মোরাভিয়ান মদ সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিলাম এই আশায় যে একদিন হয়তো এমন সৌভাগ্য হবে যে আমি আমার কার্লের সঙ্গে বসে একত্রে খেতে পাব।

জ্যোৎস্নাভরা রূপোলী রাত। কভেতার সঙ্গে জেটির পথ ধরে হেঁটে চলেছে ফ্রান্তিসেক। দূরে পাহাড়ের মাথায় হ্রাদেৎসানিকে মনে হয় যেন হাওয়ায় ভাসা একখানা হালকা মেঘ। ভেসে আসছে ভেজা মাটি আর বসন্তের গন্ধ। একটা ঘড়িতে বেজে উঠল দুপুর রাতের ঘণ্টা।

ভাব দেখি ফ্রান্তিসেক,—বলে উঠল কভেতা—এই গম্বুজটা কতকালের আর ঐ ঘড়িটাই-বা কতদিনের। বোধহয় আমার ঠাকুমা যখন নেহাত বাচ্চা—সেই ফ্রান্‌জ-জোসেফের আমলে কি তারও আগে, কোন রাজার আমল তখন আমি জানি না, তখন এমনি করেই বাজতা এটা। সব কিছুই বদলে গেছে। আগে লোকে বলত, সু-প্রভাত! এখন বলে, শ্রমের প্রতি সম্মান! কিন্তু ঐ ঘড়িটার কাছে সবই এক। ওটা জানে শুধু দিনে চব্বিশটা ঘণ্টা—তার বেশিও না, কমও না। তুমি কি কর্‌ না কর তাতো কিছুই যায় আসে না।

কী দার্শনিক তুমি,—মৃদু হেসে বলল ফ্রান্তিসেক,—কিন্তু ঘণ্টাগুলো ভিন্ন হতে পারে। আমাদের সেনাদলে একটি ফরাসী মহিলা ছিলেন, মাদো—তার কথা আগেই আমি বলেছি তোমার কাছে। তিনি বলেছিলেন আমাকে যে একটি ঘণ্টা তাঁর সমস্ত জীবন পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আটচল্লিশ বছর আমি বেঁচে এসেছি। সেটাকে যদি তুমি ঘণ্টার হিসেবে কষতে চাও, তো মাত্র বারোটা বাজার পনেরো মিনিট আগে দেখা হয়েছে আমার তোমার সঙ্গে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যেন তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জীবনে কোনো কিছুই ছিল না আমার। বুঝলে? জাতির জীবনেও ঠিক তাই। এতদিনে তার লক্ষ্যপথে এসে পেঁছেছে।

আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আবার যুদ্ধ হবে?—জিজ্ঞেস করল কভেতা।

আবার হাসল ফ্রান্তিসেক:

আমি ঘড়ির মিস্ত্রি,—ভবিষ্যৎ বক্তা নই। তবে এইটুকুই মাত্র বলতে পারি যে ওরা কিছুই করতে পারবে না আমাদের। এখন দুপুর রাত। তার মানে, আর পাঁচ ঘণ্টা পরেই দিনের আলো ফুটে উঠবে। সবাই বোঝে এ কথা। যদি কেউ রেডিও মারফত ঘোষণা করে যে পাঁচ ঘণ্টা পরে রাত হবে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না। বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে..........যদিও দুঃখের কথা যে ঘড়িটা গোটা এক মিনিট ফাস্ট চলছে। শহরের ঘড়ির পক্ষে সেটা খুব ভালো ব্যাপার নয়।

একষট্টি

মস্কো থেকে ফিরে আসার পরে যাদের সঙ্গে দেখা করেছিল সাবল্ঁ, বিমূঢ় হয়ে পড়ল তারা ওর নীরব হয়ে যাওয়ায়। বোঁদিয়েরের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে ওকে বোঝাতে পেরেছে: লোকটা চটে গিয়েছিল আর চলছিল ঝোঁকের মাথায়। এত দিনে বুঝতে পেরেছে যে মস্কোর দলে ভিড়ে পড়াটা খুবই বেকুবি হত। কয়েক সপ্তাহ দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটাবার পরে ভরসা পেল নিভেল, বোঁদিয়েরের কাছে বলল:

সাবল্ঁকে ভাববিলাসী ভাবাটা ভুল হয়েছিল আপনার। আমার আগাম-দেয়া টাকাটা যে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেটা শুধু দুর্নামের ভয়ে। এ-কথা ভুলব না আমি যে বলামাত্রই ও টাকাটা নিয়েছিল। স্যাংকোপাঞ্জার মতোই ওর টাকার খাঁই।

লোর কাছে লিখে জানাল যে সাবল্ঁকে বেশ আচ্ছা করে ভয় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন যদিওবা কিছু লেখে তবে সেটা ট্রানজক সম্পর্কে লিখবে না, সেটা হয়তো লিখবে নিগ্রো টমটম-এর প্রগতিশীল চরিত্র সম্পর্কে কিংবা অস্কার ওয়াইল্ডের দলে ঠেলে দেয়া স্যাংফোর দুর্ভোগ নিয়ে। খুশী হয়ে সিনেটর ঘোঁতঘোঁত করে উঠল। কিন্তু ফরাসী জাতটাকে কেন মোরগের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে? মোরগ হল লড়ুয়ে পাখি। তাইতো মোরগের লড়াই দক্ষিণ অঞ্চলে হত জনপ্রিয়। সাবল্ঁ বড়জোর একটা খাসি-মোরগ।

লুসি ভাবল যে-সব ব্যাপার ঘটে গেল তারই জন্যে দমে গেছে সাবল্ঁ। এক-ঘরে হয়ে পড়ার কঠিন আঘাত পেয়েছে মনে মনে। কি যে করবে কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছে না। যদিও বলেছে ওকে যে ও লিখছে, কিন্তু যখনই ওর পড়ার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছে হয় কুকুরটাকে নিয়ে খেলছে নয়তো শীর্ণ পাতাবাহার গাছটায় জল দিচ্ছে বা কথার ধাঁধা সমাধান করছে। অবশ্য যদিও সে তার স্বামীকে ভালো করেই চেনে তবুও এবার ভুল হয়েছে ওর। কেননা সত্যি সত্যিই লিখছে সাবল্ঁ। যে গভীর পরিবর্তন এসেছে ওর জীবনে তারই হিসেবনিকেশ করছিল। ধীরে ধীরে কাজ করে চলছিল ওর মন। আর এ-ক্ষণেই ও যা দেখেছে, অনুভব করেছে সেগুলো আপনা থেকে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ও ঘর ছেড়ে বৃষ্টির ভিতরে শহরতলীর বিষণ্ণ পথে পায়চারী করে ফিরত। অথবা কোনো একটা ছোট্ট কাফেতে বসে চুপচাপ শুনত লরি-ড্রাইভারের জীবনযাত্রার খরচ, আমেরিকান, আর বিশ্রী আবহাওয়ার উদ্দেশ্যে গাল পেড়ে চলেছে। রাত্রে যখন লুসি আর মাদেলিন ঘুমিয়ে পড়ত ও তখন দারুণভাবে লিখে চলত। কিন্তু দিনের বেলায় ওর নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি, ফ্রান্সের পরিণতি আর বর্তমান শতাব্দীর পরিণতির চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকত। প্রাগে থাকতে যে চিঠিটা লিখেছিল বা যে প্রবন্ধটা প্রকাশ করার জন্যে গত শরৎকালে ও বৃথাই ঘুরে মরেছিল এখন ওগুলো নিজের কাছেই মনে হচ্ছে ছেলেমানুষি। ব্যাপারটা শুধু ট্রানজকের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। কেন

সিনেটর লো, ফরাসী দূতাবাস "ফ্রাঁ তিরুর"র শমং, বেদিয়ের আর রহস্যময় রবার্টস—এরা একজোট হয়েছে? যে-কথা নাকি উল্লেখ করেছে লা মঁদ-এর স্টাফ রিপোর্টার! যে-বস্তু ওদরে বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ করেছে তা হচ্ছে ঘৃণা, মূর্খতা, আর পাশবিক ভীতি। ওরা মিথ্যা প্রচার করে, ভয় দেখায়, মনোভাবকে ঘুলিয়ে তোলে। এরাই বাধা দিয়েছে ওকে এজেন্সির মুখোস খুলে দিতে আর কাদা ছিটিয়েছে ওর গায়ে। মানুষ যাতে না শান্তিতে বাস করতে পারে তার জন্যে হেন কর্ম নেই যা করতে ওরা নিবৃত্ত হবে। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই সব লুটেরা লোভী ব্যবসায়ী যাদের ও দেখেছিল আমেরিকায়, যারা নির্যাতন করে নিগ্রোদের শিকাগোয়, সেই সব ভাড়াটে বাচাল অক্ষম সাংবাদিক যারা এককালে হিটলারের স্তুতি গান করত আর আজ নিয়েলের চাটুকারী করছে। নানা বর্ণের পোশাকে সমস্ত যুদ্ধবাজরা যারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে রুশিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে, মস্কোর পার্কে পার্কে শিশুদের হত্যা করতে, মিনস্কের ঘর-বাড়িগুলোকে ধ্বংস করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে, ডাক্তার ক্রিলভের কণ্ঠরোধ করতে—তারাই আবার সংগে সংগে চাইছে নিজেদের দেশের মানুষদের এমনভাবে শৃংখলিত করতে, যাতে আর কোনোদিন ধর্মঘট হবে না, উঠবে না কোনো দাবি-দাওয়ার আওয়াজ, এমনকি আশার লেশটুকুও যাতে না ফুটে উঠতে পারে।

এরই ভিতর দিয়ে বইটির পরিকল্পনা মূর্ত হয়ে উঠল আর সাবলং রাত্রে রাত্রে এমন কি কোনো কোনো দিন ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত লিখে চলল। লেখার ভিতরে এমনভাবে ডুবে গেল যে তার এই লেখার পরিকল্পনার কথা স্ত্রীর কাছেও বলল না। এক রাতে লুসি ঘুম ভেঙে জেগে উঠে পড়ার ঘরে আলো দেখতে পেয়ে ব্যাপার কি দেখার জন্যে এগিয়ে গেল। দেখল সাবলং টাইপ করে চলেছে। অবাক হয়ে গেল সে, বহুদিন হয়ে গেল ও তো লেখেনি কিছু।

লিখছ?

আমার বইটা শেষ করছি।—শূন্য দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সংগে পাইপটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল।

মস্কোর উপরে?

না, সব কিছুর উপর, বিশেষ করে শান্তির উপরে। মাফ কর, এখন কথা বলতে পারছি না তোমার সংগে। একটা খুব কঠিন অধ্যায়ের মাঝামাঝি এসেছি।

বিছানায় ফিরে গিয়ে লুসি অঝোরে কাঁদতে লাগল: এমন একটা বড় জিনিস যখন ওর কাছে লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই তখন স্বামী আর ওকে ভালোবাসে না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো স্ত্রীলোক এসেছে ওর জীবনে। সাবলং টাইপ করে চলেছে। লিখছিল, সময় এসেছে সেই ভয়ংকর চক্রান্তের এবার মুখোস খুলে দিতে হবে—মৃত্যুর চক্রান্তের।

কে ছাপবে বইটা বলে মনে কর?—পরদিন জিজ্ঞেস করল লুসি।

কেউ না।

গারদকে ফোন করে দেখ না কেন? কমিউনিস্টরা হয়তো ছাপতে পারে।

তাহলেই সবাই বলবে ওটা কমিউনিস্ট বই। যারা বিশ্বাস করেই বসে আছে তাদের আরো বেশি করে বিশ্বাস করাতে গিয়ে লাভ কি? মস্কো যাবার আগে

আমি নিজে কিভাবে ভাবতাম নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে? আমিও বিশ্বাস করতাম রুশেরা চায় আমাদের আক্রমণ করতে। প্রচুর লোক ঠিক এমনিভাবেই বিশ্বাস করে। তাই তাদের জন্যেই আমি বইটা লিখেছি। নিজেই আমি এটা ছাপব। অবাক হয়ে যেও না। সব কিছু ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কাল লোক এসে আমার লাইব্রেরিটা নিয়ে যাবে। তাতেই ছাপার খরচ ঢের কুলিয়ে যাবে।

অকারণে সাবলঁ একটা নতুন আলোর সেড তৈরি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল, পুরনো খবরের কাগজ বাছাই করল। পরিষ্কার করল তামাকের পাইপটা। লুসি ভাবল ও লেখার পরে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু আসলে ও তখন ভাবছিল একটা নতুন অধ্যায়ের কথা। আলোকিত জানালার পথ দিয়ে পথচারী যেমন করে দেখে তেমনি করেই ও বলবে সোবিয়েত মানুষদের কথা। একথা লিখবে না যে ওরা বিদেশী সাংবাদিকদের ভালোভাবে সংবর্ধনা করে কি করে না, বা মস্কোর ফ্যাসান মার্জিত কি না, লিখবে আসল যেটা কথা সেই সম্পর্কে: যে মস্কোর উপরে দাঁড়িয়ে কেউ ওরা বোমা নিয়ে আস্ফালন করে না। কারণ তার হাত আর মন অন্য কাজে ব্যাপৃত।

প্রথমে বসন্তের এক প্রাতে হঠাৎ যখন ভোরের সূর্যালোক ওর নিরানন্দ ঘর-খানার ভিতরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আলোয় আলোয় প্লাবিত করে তুলল ঠিক সেই মুহূর্তে সাবলঁ তার বইয়ের শেষ কথাটি লিখল। সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে ছুটল মুদ্রাকরের কাছে। পথে যেতে যেতে হৈ-হুল্লোড়-করা স্কুলের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসল আপন মনে, হাসল কূজনরত কবুতরগুলোর দিকে তাকিয়ে, আর উষ্ণ হাওয়ার স্পর্শে জেগে-ওঠা পারীকে দেখে।

পুরনো এক বোতল শমবাঁতি মদ নিয়ে খোস মেজাজে বাড়ি ফিরে এল। মাদেলিন বাড়ি নেই। চলে গেছে মদোঁতে এক মাসীর কাছে। সাবলঁ আর লুসি দুজনে মিলে লাঞ্চ খেল, পান করল বইটার উদ্দেশ্যে।

জানি তুমি আমার একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু—বলল সাবলঁ,—আরো অনেক পরীক্ষা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে আমাদের অদৃষ্টে। এ-বইটার জন্যে ওরা আমাকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু তুমি তো জান, আমি বাধ্য হয়েছি বইটা লিখতে।

তার জন্যে তোমার মতোই আমি আনন্দিত। হয়তো আরো বেশি।

একটু বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে লুসির মুখের দিকে তাকাল সাবলঁ। উঠে এসে দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল লুসি:

সে-দিন কোনো কথা বলতে চাইনি আমি। কিন্তু আজ বলতে পারি। জান, যে-দিন তুমি এজেন্সির পক্ষ থেকে যেতে রাজী হলে মনে মনে দারুণ অসুখী হয়ে উঠেছিলাম আমি। অবশ্য তোমার চাইতে আমি এ-সব ব্যাপার অনেক কম বুঝি এটা ঠিক। কিন্তু কেমন যেন আমার মনে ভয় হল তোমার জন্যে......, নিজের আদর্শ নিয়েই চল তুমি সব সময়ে—তুমি ছিলে নিগ্রোদের পক্ষে, ছিলে ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে, ছিলে প্রতিরোধ আন্দোলনে। স্কুলে-পড়া মেয়ের মতো আমি তোমার প্রশংসায় মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু যখন নিভেল এল, কেমন যেন এক নিদারুণ অস্বস্তিতে আমার বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু এখন সে-সব চুকে-বুকে গেছে। আবার আমি আমার নিজের সাবলঁকে ফিরে পেয়েছি—আমার সেই

সত্যকার সাবলঁকে......মাপ করো, আমি তেমন গুছিয়ে বলতে পারিনি। কিন্তু এ আমার গভীর অনুভূতি.........

অবাক বিস্ময়ে লুসির মুখের দিকে তাকাল সাবলঁ। এত বছর দুজনে এক সঙ্গে রয়েছে তবুও সাবলঁ ওকে চিনতে পারেনি। মানে, কি দিয়ে গড়া ও! না, নিশ্চয়ই ওকে চেনে না সাবলঁ। দেখেছে ওকে সে স্পেনের ঘটনার পরে, দেখেছে প্রতিরোধ আন্দোলনের ভিতরে, কিন্তু এ-সম্পর্কে এতটুকুও ভাবেনি সে কোনোদিন। হঠাৎ ওর মনে পড়ল মিনস্কের সেই স্থপতিকে আর অবাক হয়ে ভাবল কী অপূর্বই না তার স্ত্রীটি। হয়তো সেও তাঁকে চেনে না মোটেই! মানুষ যেন বনে বাস করে......সব কিছু সম্পর্কেই সে ভাবে, শুধু ভাবে না যা নাকি একান্ত কাছের, একান্ত নিকটতম। কী মতিভ্রম!

শোনে লুসি, মণি আমার। আজকের দিনটা জীবনে কখনো আমি ভুলব না —এ ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি তারিখটা। আর এটা যে আমি আমার বইটা শেষ করেছি তারই জন্যে তা নয়, এই জন্যেই যে আজ আমি প্রথম তোমকে আবিষ্কার করলাম।

আবার হাসিখুশী মিশুক হয়ে উঠল সাবলঁ। ফোন করল গারদকে। মেয়েকে নিয়ে গেল অপেরায়, কামুর একটা নাটক সম্পর্কে আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিল। সংবাদটা কে যেন পেঁাছে দিল বেদিয়ের কাছে যে সাবলঁ তার খোলার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আছে খুবই খোসমেজাজে।

জানতাম আমি, ও কাটিয়ে উঠবে ও-সব—মন্তব্য করল বেদিয়ের।

লা ফিগারোতে পড়ল সাবলঁ যে 'পশ্চিমীদের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে বক্তৃতা দেবে নিভেল। লুসির কাছে বলল সাবলঁ:

আমি যাব। শুনতে চাই বদমায়েসটার পশ্চিমীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী বলবার আছে। নিশ্চয়ই প্রাগে ভাড়াটে খুনীদের আমদানী সম্পর্কে কিছু বলবে না।

তোমার না যাওয়াই ভালো। লোকে হয়তো ভাববে তুমি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছ।

না, কেউ-ই ভাববে না সে-কথা। পেছনের দিকে কোথাও গিয়ে চুপ করে বসে থাকব। তারপর যদি সুযোগ পাই তো শিস দেব। আমার শিস দেয়া তো শোনোনি কোনোদিন। খুব ভালো শিস দিতে পারি আমি। কিন্তু শুনতেই হবে আমাকে ওরা কি বলে এখন।

প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে ছিল না নিভেলের। কিন্তু বেদিয়ের আলোচনা করল ওর সঙ্গে। বলল যে ছাত্রেরা শান্তি-আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে চলেছে। নিভেল যদি তার উচ্চ পদমর্যাদার উপরে দাঁড়িয়ে সস্তা সাংবাদিক মতবাদ দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিমী আত্মরক্ষার সমস্যাটাকে তুলে ধরে তবে ভালো হয়। পাছে বেদিয়ের চটে যায় তাই শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেল নিভেল। কারণ অদূর ভবিষ্যতে কি আছে তা কেউ-ই বলতে পারে না। যদি তেমন কোনো জরুরি অবস্থা আসে তখন বেদিয়েরই হচ্ছে একমাত্র লোক যে কবি হিসেবে ওকে একটা ভালো মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

এখনো নিভেল রোজ ভোরে উঠে রুদে পিরামিডে এজেন্সির অফিসে যায়।

কিন্তু ওর কাজকর্মের সমস্ত উৎসাহ নিভে গেছে। ও মর্মে মর্মে অনুভব করেছে যে লো-কে সন্তুষ্ট করার কোনো উপায় নেই। কটা-চুলো সিনেটরটা যদি মরত এখন! নিভেলের সমস্ত আশা-ভরসা এখন কেবল ঐ উত্তরাধিকারের উপরেই কেন্দ্রীভূত। যাই হোক বয়েস হয়েছে সাতষট্টি বছর। তা ছাড়া ডাক্তারদের অভিমত যে ওঁর রক্তের চাপ সাংঘাতিক রকমের বেশি। কিন্তু তবুও মনে হয় যেন লোকটার বেড়ালের হাড়।

তুচ্ছ নীচতাকে ঘৃণা করে নিভেল। মেরী দিনরাত কাটায় নীচ শ্রেণীর বাবরি চুল-ওয়ালা লোকগুলোর সঙ্গে, যারা নিজেদের মনে করে এক-একটা বড়-প্রতিভা, কিন্তু কেউ চিনল না তাদের। এসে শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে মেরী:

ক্রাউথার একজন অসামান্য প্রতিভাবান লোক, কিন্তু কেউ তার আঁকা ছবি কেনে না। ওর জন্যে আমি একটা স্টুডিও ভাড়া করেছি। আমাকে এক লাখ ফ্রাঁ দাও তো।

তবুও ওকে নিভেল ঘাড় ধরে দূর করে দিতে পারে না ঘর থেকে। কারণ তা যদি করে তবে ওর উত্তরাধিকারের আশা সঙ্গে সঙ্গেই খতম। সুতরাং মুখেচোখে নিদারুণ বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে টাকাটা ছুড়ে দেয় ওর দিকে।

– শুরকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে ওর অন্তর আরো গভীরভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। জার্মান লোকটার সেই কথাটা "আমাদের সবাইকেই যেন কাদার ভিতর দিয়ে ছেচড়ে টেনে নিয়ে চলেছে" যেন সব সময়েই ওর বুকের ভিতরে দাপাদাপি করে ফিরছে। ও ঘৃণা করে শুরককে। একটা পরাজিত নাৎসীর সঙ্গে মেলামেশা করতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ওর অন্তরাত্মা কিন্তু মনে মনে এ-কথাও স্বীকার করে যে ঐ বর্বর পশুটার কথাই ঠিক: নিভেল সত্যি সত্যি নিজেকেই নিজে অত্যন্ত অশুচি মনে করে।

যাই কিছু চিন্তা করুক না কেন নিভেল সেগুলো বারবার ঘুরেফিরে আসতে থাকে ওর মনে. আর ক্ষীণতম আবেগের জাবর কেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে। অতীতের সেই যশ, মান খ্যাতিভরা সুখের দিনে ও পারত পানোৎসবে আর প্রণয়-ঘটিত ব্যাপারে নিজেকে আত্মহারা করে ভুলিয়ে রাখতে। কিন্তু এখন দিনের পর দিন নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা নিয়ে ভাবতে থাকে। ওর ডায়রীতে লিখে রেখেছে·

"অনেক উভচর প্রাণী আছে যারা বিভিন্ন পরিবেশের ভিতরে বাস করতে পারে। লামার্টিনের একটা মোহ ছিল রাজনীতি সম্পর্কে। কিন্তু আমি অন্য ধাতের মানুষ। রাজনীতি জোর করে আমার উপরে চেপে বসেছে। আমি ভালোবাসি কথা। আমি ভালোবাসি কথার অন্তর্নিহিত সুরের সামঞ্জস্য। তবুও কিনা আমাকে বাধ্য হয়ে লিখতে হচ্ছে মামুলি প্রবন্ধ, বক্তৃতা দিতে হচ্ছে মুদি ব্যাপারীদের কাছে। যে-কোনো ভাবাবেগই অন্তরকে বিকল করে তোলে। এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য যে সৌন্দর্য আর গতি এ দুই অতুলনীয়। চিরদিনই আমি অলস অনুসন্ধিৎসা আর আত্মগরিমায় বিপথে পরিচালিত হয়ে এসেছি। যেমন আমার একটা বই আঁদ্রে জিদের ভালো লাগবে কি লাগবে না তাই নিয়ে যখন মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় ভেবে ভেবে মরেছি বা পলিন যখন বলেছে "চুমু খাওয়ার

চাইতে তুমি কথা বল অনেক ভালো।” এ-সব কিছুই ফেনা। আমার ভিতরে যা কিছু খাঁটি তা নিহিত রয়েছে দূর অতীতে—শৈশবের সে গোলাপী কুয়াশার অন্তরালে। এক মা তার হৃষ্ট-পুষ্ট শিশুকে স্নান করাচ্ছে—তার সর্বাঙ্গ সাবানের ফেনায় ঢাকা—দেখাচ্ছে যেন একটি দেব-শিশু। সেই মা কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল যে সেই নিষ্পাপ শিশু একদিন ট্রানজকের ডিরেক্টর হবে আর ঐ শূরকে বলবে তার কাছে যে “আমরা সবাই অনুভব করছি যেন আমাদের কাদার ভিতর দিয়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।” যদি কোথাও মুক্তি থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আবার শৈশবে ফিরে যাওয়া।

এ-ধরনের চিন্তা কিন্তু নিভেলকে তার বক্তৃতা তৈরির দিক থেকে নিবৃত্ত করল না। যে বক্তৃতার ভিতরে সে একটা প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে সবচাইতে মূল্যবান যে বস্তু—মানবিক সম্মান—তাই আজ বিপন্ন। সভ্যতায় প্রাচীন যে সব দেশ তাদের উপরেই আজ ভার পড়েছে লাল কালাপাহাড়দের হাত থেকে দুনিয়াকে বাঁচানোর। চিন্তাশীল মানুষ, কবি ও যে-সমস্ত লোকের চিন্তা দুইয়ে দুইয়ে চারের ঊর্ধ্বে কমিউনিস্টরা তাদের বিপন্ন করে তুলেছে। শতোব্রিয়াঁ, গাঁকুব ও বের্গসঁর উদ্ধৃতি দেয়ার পরে ও চলে গেল উত্তর অতলান্তিক চুক্তির বিশ্লেষণে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন প্রশান্ত মানুষদের বলিষ্ঠ একতাই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে সক্ষম। নতুন দুনিয়ার মহান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর ইউরোপীয় তরুণদের দুর্জয় সাহস-ই লালদের এই দ্রুত অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে, আর যে-সব উন্মাদ আজ আমাদের এই সভ্যতার প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত তাদের ধূলিসাৎ করে দিতে।

এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে “লিবার্তে” নামে একটা সংগঠন। সভাপতির আসনে অধ্যাপক রিশা। বক্তাকে আহ্বান করার আগে সভাপতি বললেন যে তিনি কোনো রাজনীতিজ্ঞ নন। তিনি শুধু একজন খ্যাতিমান কবিকে উপস্থিত শ্রোতৃদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সম্মত হয়েই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কেননা এমন সমস্ত সমস্যা এসে হাজির হয়েছে যে কোনো চিন্তাশীল মানুষই তা উপেক্ষা করতে পারে না। সেই সব সমস্যার ভিতরে একটা হচ্ছে পশ্চিমী প্রচার সংগঠন যা-নাকি আমাদের সুন্দরতম ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রথম সারিতে আসন গ্রহণ করেছে বেদিয়ের। নিজের উপস্থিতির দ্বারা নিভেলের বক্তব্যের বিষয়-বস্তুর উপরে গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে একটা বিরক্তিকর সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে এসে হাজির হয়েছে। লোক সমাবেশ পাঁচমেশালী। চটপটে সুবেশা নারী, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত, প্রবীণা কুমারী, কোনো বক্তৃতা সভায়ই যারা কখনো গরহাজির হন না। তাছাড়া সাংবাদিক আর কয়েক শো ছাত্র। দরজায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারণ গুজব যে কমিউনিস্টরা নাকি সভা পণ্ড করে দেয়ার চেষ্টা করতে পারে।

শিষ্টাচার-সম্মতভাবেই এগিয়ে চলেছে সব কিছু। ঈষৎ ভাঙা ভাঙা গলায় দীর্ঘ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে চলেছে নিভেল। পাতা ওল্টাবার সময়ে থেমে থেমে এক এক ঢোক করে জল খাচ্ছে আর রেশমী রুমাল দিয়ে কপাল মুছছে। থেকে থেকে এখান ওখান থেকে জেগে উঠছে হাততালির শব্দ। অধ্যাপক রিশা

মাথা নেড়ে নেড়ে ফাংকো মতিঅ্যাক, বা রাসেল বা নিভেলের বক্তব্যের সায় দিচ্ছিলেন। শুধু সাবলং ছাড়া আর সবাই খানিকটা বিরক্তি বোধ করছে। হলের পিছনের দিকের একটা আসনে বসে অধীর অস্থিরতায় চঞ্চলভাবে মাথা নেড়ে চলেছে।

বক্তৃতার শেষে নিভেল বলল:

আপাত-দৃষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর এই মহান আবিষ্কারকে মনে হবে যেন আমরা 'প্যানডোরার বাক্স' নিয়ে নাড়াচাড়া করছি আর নতুন দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা যেন সমগ্র মানবতাকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাই নয়। কমিউনিস্টদের প্রচার আর রাস্তার লোকদের কুৎসিত ভয়কে আমাদের ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে। যাদের বিবেক বলে কোনো বস্তুর বালাই নেই, শুধু তারাই এ কথা অস্বীকার করতে পারে যে মস্কো আজ সমগ্র দুনিয়াকে প্রাচ্য বস্তুবাদের দাসত্বে শৃংখলিত করতে চায় না। আমরা দুহাত তুলে বিজ্ঞানকে আশীর্বাদ করতে পারি—কমিউনিস্ট আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে এমন কোনো কিছু যদি দুনিয়ার থেকে থাকে তবে তা হচ্ছে এটম বোমার ভীতি; এই ভীতি শুভংকরী।

ওর শেষ কথাটা উচ্চারণের সংগে সংগে নিদারুণ বিরক্তিতে অধ্যাপক রিশা কপালে ভ্রূ তুলে তাকালেন। আর অস্থির কম্পিত হাতে সামনের এক টুকরা কাগজ ধরে টানতে শুরু করে দিলেন। অবশ্য কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। করতালি-ধ্বনির ভিতর দিয়ে নেমে এল নিভেল। আর অধ্যাপক রিশা মনে মনে ভাবতে লাগলেন: হয়তো আমি খুবই বেশি রকমের খুঁতখুঁতে। আজ-কালকার দিনে মামুলি সাংবাদিক বুলি-টুলিগুলো এড়িয়ে চলা কষ্ট।

তিনি বক্তাকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছেন ঠিক এমনি সময়ে হলের ভিড়ের ভিতর থেকে জেগে উঠল উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ:

আমি কিছু বলতে চাই।

বলল সাবলং।

বক্তৃতার আগে নিভেলের সংগে কথা হয়েছিল রিশার যে এ-সম্পর্কে আলোচনায় হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে তাছাড়া সভার নিছক তত্ত্বমূলক আলোচনার চরিত্রও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সাবলংর অনুরোধ রিশাকে এক সংকটজনক পরিস্থিতির ভিতরে ফেলে দিল। কোনো কমিউনিস্ট নেই এখানে বা কোনো সাময়িক বাক্যবাগীশ। লোকটি খ্যাতিমান। ওকে যদি বলতে না দেয়া হয় তবে তাকে, মানে রিশাকে বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করবে সবাই। বলবে পক্ষপাতদুষ্ট, তুচ্ছ রাজনৈতিক ঝগড়ার প্রশ্রয়দাতা।

বলতে দেয়া হোক!—বহুকণ্ঠে জেগে উঠছে দাবি। এমন কি জেগে উঠছে করতালির শব্দ। গোটা সভাটাই যেন প্রাণ-চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। সভাপতির কাছে একটা চেয়ারে এসে বসল নিভেল। সাবলং মঞ্চে উঠে দাঁড়াল।

বহুদিন পরে আমি এই ধরনের সভায় উপস্থিত হয়েছি,—বলতে শুরু করল সাবলং।—একখানা বই লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি। হয়তো এখানে বলার

জন্যে অনুরোধ করার প্রয়োজন হত না আমার কারণ আমার যে বইটা শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে সেটার ভিতরেই আণবিক বোমা ও আণবিক বোমার হাত থেকে কেমন করে আমরা রক্ষা পেতে পারি সে-সম্পর্কে আমি যা ভাবি তা বলেছি। তবুও বলতে দেবার জন্যে আমি অনুরোধ করেছি এই জন্যেই যে না হলে শ্রোতারা বক্তৃতাটা বা বক্তা সম্পর্কে সত্যি কথা না জেনেই ফিরে চলে যাবেন।

মুহূর্তের জন্যে নিভেলের মুখের মাংসপেশী সিঁটিয়ে গিয়ে মুখখানা বিশ্রী-ভাবে বিকৃত হয়ে উঠল। হলের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল: ঢের হয়েছে ক্ষ্যামা দিন! অন্যেরা চুপ করাবার জন্যে শিস দিয়ে উঠল। অধ্যাপক রিশাঁ বললেন:

মঁসিয়ে সাবলঁকে যখন আমি বলতে অনুমতি দিয়েছি, তখন আমি সভাস্থ সকলকে অনুরোধ করব যেন একটু আগেই মঁসিয়ে নিভেল তাঁর বক্তৃতায় যে-কথা সুন্দরভাবে বলেছেন আমাদের সেই পাশ্চাত্ত্যের ঐতিহ্য-সম্মত শিষ্টাচারের সঙ্গে শান্ত হয়েই সবাই তাঁর বক্তব্য শোনেন। আর অন্য দিকেও আমি মঁসিয়ে সাবলঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এটা রাজনৈতিক সভা নয়, আর মঁসিয়ে নিভেল নিছক সাংস্কৃতিক ও মানবিক দিক থেকেই পাশ্চাত্ত্য প্রচার সংগঠন সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন।

বক্তা যে-দিক থেকে বলেছেন সেই একই দিক থেকেই আমিও বলব।—মুচকি হেসে বলল সাবলঁ। মঁসিয়ে নিভেলের পরিচয় দেবার সময়ে একটা কথা বলতে ভুলে গেছেন সভাপতি মহাশয় যে উনি ট্রানিজক এসেন্সির ইউরোপীয় শাখার ডিরেক্টর। তাঁর নিজের পদাধিকার বলে মঁসিয়ে নিভেল এক বছর আগে রুশদের আক্রমণ-প্রস্তুতি বর্ণনা করার জন্যে আমার কাছে মস্কো যাবার প্রস্তাব করেন। কেন আমি তখন তাঁর কথায় রাজী হয়েছিলাম সে-কথা আজ আমি আপনাদের কাছে খুলে বলতে চাই। সে-সময়ে আজ যেমন আপনারা শুনলেন তেমনি বহু বক্তৃতা-সভায় আমি উপস্থিত থেকেছি। 'লা ফিগারো'ও পড়তাম মাঝে মাঝে ও কাগজে মঁসিয়ে নিভেলের প্রবন্ধ ছাপা হয়ে থাকে। আমিও বিশ্বাস করতাম যে রুশরা সত্যি সত্যিই আমাদের আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে আর তাই আমাদের নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে। অনভিজ্ঞ তরুণ নই আমি। কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে আপনাদের ভিতরে তরুণ নন এমন অনেক লোক আছেন, তাঁরাও এমনিই ভেবে থাকেন। চোদ্দ বছরের একটি মেয়ের তুলনায় চুয়াল্লিশ বছরের এক প্রৌঢ় সাংবাদিককে ভুল বোঝানো ঢের শক্ত। কিন্তু সেটাও ক্ষমতা সাপেক্ষ আর সে-দিক থেকে মঁসিয়ে নিভেল আর তাঁর সহকর্মীরা ওস্তাদ। তাই বক্তার পক্ষ থেকে আমি গেলাম মস্কোয়। যখন ফিরে এলাম, কোনো কোনো সংবাদপত্র প্রচার করল যে রুশদের কাছে আমি আত্মবিক্রয় করে ফেলেছি, আমি কমিউনিস্ট হয়ে গেছি। কথাটা মোটেই সত্যি নয়। রুশদের কাছ থেকে কোনো কিছুই আমি গ্রহণ করিনি। এ-কথা সত্যি যে মস্কোতে ওরা আমাকে খাইয়েছে, আর খুব খারাপও খাওয়ায়নি। কিন্তু তার দাম আমি দিয়েছি, যে টাকা আমি পেয়েছিলাম আর পরে শোধও করে দিয়েছি মঁসিয়ে নিভেলের কাছ থেকে সেই টাকায়। আমি কমিউনিস্ট হয়ে যাইনি—অন্য আদর্শে গড়ে উঠেছি আমি। কিন্তু সব

কিছু না হলেও অনেক কিছুই যা আমি নিজের চোখে দেখেছি তা আমার ভালো লেগেছে। বহু উদাহরণের ভিতরে এখানে আমি একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি—আমি ওদের আঁকা ছবি পছন্দ করি না। আমি ভালোবাসি মানে, সিসনে, রেনোর ছবি, যাদের ওরা 'ফর্মালিজম'-এর অভিযোগে বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু কি এসে যায় তাতে? এখানে আমরা চিত্রাংকন নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। যদি তার জন্য আসতাম তবে কারও বক্তৃতায় পরমাণু-বোমার নামও শুনতাম না। রুশিয়ায় আমি এমন মানুষ দেখে এসেছি যারা সাচ্চা, হ্যাঁ, মানে এখানকার, ইংলন্ড বা আমেরিকার মানুষের চাইতে বেশি সৎ। অনেক দোষ আছে ওদের। তার মধ্যে কিছু কিছু হয়তো স্বীকার করে, আবার অন্যগুলিও স্বীকার করে না। এটাও একটা বিষয় যে-সম্পর্কে লোকে তর্ক তুলতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহের কোনোই অবকাশ নেই—রুশরা যুদ্ধ চায় না। বক্তা যা আমাদের শুনিয়েছেন সেই প্যান্ডোরার ঝাঁপি নিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছেই নেই তাদের। কেন তবে আমরা প্রতারিত হতে যাচ্ছি? কেন শোনানো হয় আমাদের যে রুশরা আমাদের আক্রমণ করার মতলব আঁটছে? কে তবে সত্যি সত্যি যুদ্ধের মতলব ভাঁজছে? ভীতি আর ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে কারা মুনাফা উশুল করছে? যে এটম বোমা মস্কোর চাইতে প্যারীর পক্ষে ঢের বেশি মারাত্মক রকমের বিপজ্জনক কে সেই এটম বোমার প্রশস্তি গাইছে? আগেই বলেছি আপনাদের যে এ-সম্পর্কে আমি একখানা বই লিখেছি। বইটার নাম হচ্ছে "মৃত্যুর চক্রান্ত"। তার ভিতরে আমি লিখেছি যে কি করে এক দল আমেরিকান আর যাদের তারা ভাড়া করেছে, ভয় দেখিয়ে দলে টেনেছে, সেই সব অবিবেকী কাণ্ডজ্ঞানহীনের দল মিলে গোটা দুনিয়াটাকে একটা ভয়ংকর ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে............

চিৎকার, শিস, হাততালির শব্দে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠল। গন্ডগোল থামাবার জন্যে অধ্যাপক রিশা হাত দিয়ে টেবিল বাজালেন কিন্তু শ্রোতারা শান্ত হল না। ধৈর্য ধরে সাবলঁ গোলমাল থামার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল সাবলঁ যেন বলতে চায়: এ-সব ব্যাপারে আমার করবার কিছুই নেই। সাংস্কৃতিক সংগঠন সম্পর্কে আমি একটা বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু যদি সেটা মার্সেইনের কোনো বারের প্রাক-নির্বাচনী সভার হট্ট-গোলে পরিণত হয়ে ওঠে, তবে সেটার জন্যে আমি দায়ী নই। অবশেষে গোল-মাল থামলে পরে অধ্যাপক রিশা বললেন:

আমি আবার মঁসিয়ে সাবলঁকে বলছি তিনি যেন এমন কোনো প্ররোচনা-মূলক আলোচনার অবতারণা না করেন যাতে এ-সভায় অশোভন কোনো পরি-স্থিতির উদ্ভব হয়।

আবার বলতে শুরু করল সাবলঁ:

যে-সব কথা আমি বলতে চাই আপনাদের কাছে সে-সব কথা তো আমি বলতে পারছি না। যদি আপনারা জানতে চান তবে সে-সব আমার বইতে পাবেন। কিন্তু একটা কথা এখানে প্রকাশ্যভাবে বলা একান্ত প্রয়োজন মনে করি, আর সে-কথাটা হচ্ছে খোদ বক্তা আর যে প্রতিষ্ঠানের তিনি পুরোভাগে অবস্থিত তারই

সম্পর্কে।

নিভেল উঠে দাঁড়াল:

এই সভামঞ্চের কুৎসাজীবী মেছুনীদের বাজারে পরিণত হয়ে ওঠা উচিত নয়।

হতাশ দৃষ্টিতে হলঘরের চারদিকে একবার তাকালেন তারপর আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে যাবার দোরের দিকে পা বাড়ালেন। বেদিয়ের, ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত আরো জনা-দশেক লোক তাঁরই অনুগমন করল। মঞ্চের উপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে সাবলঁ। বলুন, বলে যান!—আওয়াজে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠল। বহু লোক যারা কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে তারা নিভেল সম্পর্কে সাবলঁ কি বলতে চায় তা শোনার জন্য আগ্রহশীল। রাজনৈতিক বিরোধিতার চাইতে ঔৎসুক্য প্রবল হয়ে উঠল। শুধুমাত্র একটি আওয়াজ জেগে উঠল—"ঢের হয়েছে, থামুন!" কিন্তু, "বলুন বলে যান।"—বহু কণ্ঠের চিৎকারে সে আওয়াজ ডুবে গেল। নিভেল বুঝতে পারছে যে ওর চলে যাওয়াই এখন সব চাইতে ভালো, কিন্তু কিছুতেই মঞ্চের উপর থেকে নেমে যেতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত হলের ভিতর দিয়েই চলতে শুরু করল। অনুভব করছে নিভেল যে সবার দৃষ্টি ওর উপরে। "আমাদের সকলকেই কাদার ভিতরে টেনে নাবানো হচ্ছে" কথাটা হঠাৎ ওর মনের ভিতরে চমক দিয়ে উঠল। জোর করে একটু হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু তাতে শুধু মুখখানাকে বিকৃত করে তুলে মুখের উপরে জমে রইল।

আবার বলতে শুরু করল সাবলঁ:

বক্তা একজন কবি। ভালো কি মন্দ সেটা মতের প্রশ্ন। কিন্তু যেটা ঘটনা তা হচ্ছে এই যে উনি জার্মানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। আর জার্মানরা যখন কড়া চাপে পড়ে গেল তখন উনি পালিয়ে যান সুইজারল্যাণ্ডে। আর সেখান থেকে পাড়ি দেন আমেরিকায়। ওর শ্বশুর, সিনেটর লো দক্ষিণ অঞ্চলের তুলাকর। যুদ্ধবাজ দলের তিনি একটি চাঁই। তিনিই ট্রানজক সংগঠিত করেন আর তার ভার অর্পণ করেন নিভেলের হাতে। ভাববেন না এটা একটা মামুলি সংবাদ-প্রতিষ্ঠান মাত্র। এরা রুশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে এদের প্রতিনিধি পাঠায় ঘরে আগুন দিতে আর নরহত্যা সংগঠিত করতে। ট্রানজকের প্রাগের প্রতিনিধি, সাংবাদিক কস্টার বলেছে আমাকে যে সে কিছু লোক দিয়ে এক ধরনের 'জেহাদী' দল গড়ে তুলেছে যারা হত্যা করে কমিউনিস্টদের। বক্তা যখন প্যাণ্ডোরার ঝাঁপি সম্পর্কে বক্তৃতা না দেন বা কবিতা না লেখেন তখন এটাই হচ্ছে তাঁর পেশা। উনি হচ্ছেন আমেরিকার নরঘাতক সম্প্রদায়ের ইউরোপীয় শাখার ডাইরেক্টর। বলুন তো নিভেল ফরাসী জনসাধারণ যে-দিন আপনার মনিবদের দেওয়ালের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবে সে-দিন কোথায় পালিয়ে যাবেন?

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ল নিভেল। তারপর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল:

চোপরাও!

হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল দর্শকদের ভিতরে। কে যেন আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিল। যারা সাবলঁর সমর্থনে হাততালি দিচ্ছিল পুলিশ ছুটে গেল তাদের দিকে। ততক্ষণে নিভেল হাওয়া হয়ে গেছে।

হল ছেড়ে বেরিয়ে এল সাবলং। রাস্তার মোড়ে এসে দেখে একটা লোককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে পুলিশ। তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে তবুও চিৎকার করে বলছে:

বেশ বলেছে, সাবলং!

পুলিশরা ওকে নিয়ে একটা কালো গাড়িতে তুলল। গাল পেড়ে উঠল সাবলং:

এই ওদের স্বাধীনতা! বোধহয় লোকটা কমিউনিস্ট......আমি যেমন বুঝেছি তেমনি বলেছি। কমিউনিস্টদের সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু ওরা সাহসী, আমি ওদের অভিবাদন জানাই......

এমনভাবে একটা চিঠির মুশাবিদা করল স্মিডল যাতে কোনো ক্রমেই ও না ফেঁসে যায়। জোৎস্কাকে লিখল যে দুটো দেশের মধ্যে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক যোগা-যোগ যাতে উন্নততর হয়ে ওঠে সে-বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। জবাব এল সঙ্গে সঙ্গেই: প্রোজাৎস্কা রাজী হয়েছেন আগামী শুক্রবার বেলা এগারোটায় দেখা করবেন ওর সঙ্গে বার্তা-মন্ত্রীদপ্তরে। জেইদা ধাপ্পা দিয়েছে কি না সে-সম্পর্কে কি করে নিশ্চিত হওয়া যায় তা নিয়ে মনে মনে অনেক গবেষণা করল স্মিডল। ঠিক করল প্রোজাৎস্কাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দুর্বৃত্ত-সংগঠন আজাদ-জেহাদীর কার্যকলাপের কথা। সঙ্গে সঙ্গে নিন্দা করবে সন্ত্রাসবাদীদের, তারপর কথায় কথায় বলবে যে ও চেক ভাষা শিখতে শুরু করেছে। আর অল্প কয়েকটি ভাষা যা নাকি ও মনে রাখতে পেরেছে তা দিয়ে কয়েকটি অদ্ভুত অদ্ভুত বাক্য তৈরি করেছে, যেমন "ডাক্তারটির একটি নকল নাক আছে" বা "জেহাদীর একটা লাল আপেল আছে"। হয় প্রোজাৎস্কা বুঝতে পারবে যে সে এখন আসল কথাবার্তা শুরু করতে পারবে, বা জেইদা যদি মিছে কথা বলে থাকে তবে কথাটার দিকে ওর কোনো নজরই আসবে না। তখন আদৌ কোনো বিপদের ঝুঁকি আসবে না স্মিডলের উপরে। তাছাড়া এটা পরীক্ষা করে দেখার মতো ব্যাপার। কারণ প্রোজাৎস্কা তো আর জেইদা নয়, দূতাবাসের জনৈক সেক্রেটারির মতে একটা কেউকেটা লোক।

আগের দিন দূতাবাসের মারফত লো-র একটা চিঠি পেয়েছে স্মিডল। তাতে সিনেটর তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ করে লিখেছে যে সে হয়তো শিগগিরই মিসিসিপিতে ফিরে যেতে পারে। থমথমে অবস্থার জন্যেই বাধ্য হয়ে এখনো তাঁকে ওয়াশিংটনে থাকতে হচ্ছে: অনেকগুলো মোর্চায় লড়তে হচ্ছে একক-ভাবে—তোষণকারীদের বিরুদ্ধে, যাদের প্রায় শেষ করে এনেছিলাম আমরা; নিঃসম্পর্ক-পন্থীদের বিরুদ্ধে, যারা আবার মাথা তুলতে শুরু করেছে; আর এশিয়ায় কার্যরত পার্টিজানদের বিরুদ্ধে, যদিও সংখ্যায় তারা খুবই কম। রবার্টসের মতো হ্যারিম্যানও মনে করে যে পরাক্রমের নীতি গ্রহণ করা একান্ত দরকার আর ইউরোপকেই কার্য পরিচালনার সুদূর ঘাঁটি হিসেবে ধরে নিয়েই এগোনো দরকার। এই বিরাট বাহিনীর ভিতরে ট্রানজক শুধু একটা রেজিমেন্ট মাত্র। কিন্তু এর কাজকর্ম খুবই সন্তোষজনক। রবার্টস বলে যে পররাষ্ট্র-বিভাগের সাহায্য ছাড়াই আমরা বেশিরভাগ দূতাবাসের চাইতে ঢের বেশি কাজ করেছি। কিন্তু আমাদের এই সাফল্য নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। লালগুলোকে দেখে মনে হয় না যে ওরা খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। পরন্তু তাদের কাজকর্ম বেড়ে চলেছে সর্বত্রই। তাছাড়া আমি যে শুধু ইউরোপের কথাই বলছি তা-ই নয়, ইউরোপ তো সম্পূর্ণই একটা নোংরা জায়গা হয়ে উঠেছে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত পদে পদে ওদের চক্রান্তের ভিতরে গিয়ে পড়তে হচ্ছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন। বিশ্বাস কর চাই না কর, জ্যাকসনে পর্যন্ত বদমায়েসগুলো ক্লার্কের মামলা চালাবার জন্যে একটা গোপন কমিটি গড়ে তুলেছে! ছোট রিচমন্ডের কাছ থেকে সব খবরা-খবর পাচ্ছি আমি। চমৎকার লড়ে যাচ্ছে ও লালগুলোর বিরুদ্ধে। এখন চেষ্টা করছে দলের গোদাটাকে খুঁজে বের করতে। এখানকার সমস্ত খবরা-খবর সম্পর্কে তুমি কতখানি যে ব্যাকুল থাক তা বুঝতে পেরে যা কিছু ভালো আর মন্দ সব খবরই তোমাকে জানালাম। যদিও তুমি খুবই কঠিন আর দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে বহু দূর দেশে রয়েছ এখন। একটা কথা তোমাকে বলতে চাই বাছা, একমাত্র তোমার হাতেই আমি ট্রানজকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যেতে পারি। সর্বশক্তিমান প্রভু আমাকে তাঁর কোলে টেনে নেবার পরেও যাতে তোমার পক্ষে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় তার সাধ্যমত সমস্ত বিলিব্যবস্থা আমি করে রেখে যাব। এ সম্পর্কে এখন আর আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, যদিও চিঠিটা পাঠাচ্ছি কূটনৈতিক ব্যাগের মারফত। আশা করি শীঘ্রই তুমি জ্যাকসনে ফিরে আসবে। তখন, আমার নিজের ছেলে থাকলে যেমন হত তেমনি তোমার সঙ্গে বসে সুখ-দুঃখের আলোচনা আর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা দুটো একই সঙ্গে করা যাবে। ভগবান যদি আমাকে আর একটা কি দুটো বছর বাঁচিয়ে রাখেন তবে হয়তো কিছু হাসিল করতে পারব বলে আশা রাখি, আর রবার্টসের ভাষায় বলতে গেলে তখন গোপন সন্ধানের বদলে সামরিক পর্যবেক্ষণের পর্যায় এসে যাব।

চিঠিটা পড়ে একটা পরিতৃপ্তির ভাব জেগে উঠল স্মিডলের মনে। মৃত্যুর পরে ওকে যখন ট্রানজকের পরিচালনার ভার দিতে মনস্থ করেছে তখন সত্যি সত্যিই সেনেটর বিশ্বাস করে ওকে। নিভেলের মতো কোনো লোকের হাতে এ-কাজের ভার দেয়া যায় না এটা তো স্বাভাবিক। ভগবানকে ধন্যবাদ, স্মিডল ফরাসী নয় বা ও কবিতাও লেখে না। কিন্তু 'সামরিক পর্যবেক্ষণ' বলতে কি কথা ভাবছে লো মনে মনে? বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ না এশিয়ার কথা ইঙ্গিত করছে? ছোট রিচমন্ডের কাছে চিঠি লিখতে হবে ওকে। সাহসী ছেলে, কিন্তু অনভিজ্ঞ। ক্লার্ক ছাড়াও কয়েক ডজন সন্দেহজনক চরিত্রের লোক আছে জ্যাকসনে। ওদের ভিতরে একটু ধর্মভয় ঢুকিয়ে দিলে ক্ষতি নেই কিছু।

লো-র চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল স্মিডল। তারপর দূতাবাসের সেক্রেটারির কাছে প্রস্তাব করল "স্লিভোভিৎসা" ডেরমাউথ আর লেবুর-রস দিয়ে নতুন ধরনের একটা ককটেইল পরখ করে দেখার।

এই পানীয়টার নাম দিয়েছি আমি "প্রাগের বসন্ত"। কাল দেখা করছি আমি প্রোজাৎস্কার সঙ্গে। চেষ্টা করছি আমরা দুই দেশের ভিতরের সম্পার্ক উন্নততর করে তোলার। মন্দ নয়, কি বল?

উচ্চ হাসির গমকে ফেটে পড়ল স্মিডল। সেক্রেটারি ওর উচ্চ হাসির কারণ বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু 'প্রাগ-বসন্তে'র তৃতীয় গ্লাসের পরে সেও হেসে উঠল। তারপর জবাবে বলল:

না, মোটেই মন্দ নয়!

শিষ্টাচার সম্মতভাবেই প্রোজেৎস্কা অভ্যর্থনা করল স্মিডলকে। আর ওর

প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল সঙ্গে সঙ্গেই। স্মিডল যখন বলল "জেহাদীর একটা আপেল আছে" প্রোজাৎস্কার হাবভাবের কোনো পরিবর্তন এল না। শুধু বলল স্মিডলের উচ্চারণ বেশ ভালো। সঙ্গে সঙ্গে স্মিডল তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

হোটেলে ফিরে এসে বহুক্ষণ ধরে ভীষণভাবে গাল পাড়তে লাগল জেইদার উদ্দেশ্যে। শুয়োরের বাচ্চা! ব্যাটাকে নিজের পকেট থেকে একশো মার্ক দিল স্মিডল, আর ও কিনা ধাপ্পা দিল স্মিডলকে। ভাগ্যি ভালো যে ও নিজেকে ধরা দেয়নি। দৌবেককে না ঘাটানোই ভালো। জার্মানিতে ফিরে যাক আগে একবার, গিয়ে প্রথম কাজ হবে ওর জেনারেল-হয়েসকে বলে জেইদাকে গ্রেফতার করানো। তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার সময় এসেছে যে ও গেস্তাপোদের হয়ে কাজ করেছিল...। ফ্রেইমানের কাছ থেকে কিছুটা বের করে নিতে হবে ওকে। ওর কাছ থেকে বেশি কিছু যে আশা করা যেতে পারে তা নয়, অবশ্যি ইচ্ছে করলে হয়তো ওরা কাউকে উড়িয়ে দিতে পারে এই এলাকার। খালি হাতে সিনেটরের কাছে যেতে পারবে না ও কিছুতেই। কস্টারের বেকুবি, এই বদমায়েসটা কিনা আগাম টাকা খাইয়ে রেখেছে। এ-সব কাজের ভালো পন্থা হচ্ছে কাজের ফলাফল দেখে টাকা ছাড়া।

খানিকটা মাথা ঠাণ্ডা হলে পরে ও খেয়ে নিল তারপর চলল ফ্রেইমানের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে আলোচনা করল আর আলোচনাটা তেমন সুখকরও নয়। ফ্রেইমান বলল যে, টাকা ছাড়া সে কিছুই করতে পারবে না। বুদিভিৎসির জেলার পার্টি সেক্রেটারিকে উড়িয়ে দেয়ার একটা সুযোগ আছে, কিন্তু কাজটা খুবই জটিল। শুরুতেই অন্তত বিশ হাজার ডলারের দরকার। তা ছাড়া একজন অফিসার আছে যে প্রায় নিমরাজী হয়েছে সামরিক বিমানঘাঁটি ইত্যাদি সম্পর্কে খবর সরবরাহ করতে, কিন্তু সে বলেছে যে ওর পরিবার আছে একটা যাদের ওকে প্রতিপালন করতে হয়। তার মনঃস্থির করতে অন্তত পাঁচ-হাজার ডলার দরকার। খুন চড়ে গেল স্মিডলের মাথায়। অপমান করল ফ্রেইমানকে। এমন কি চেষ্টা করল ভয় দেখাতে:

আমরা আমাদের বন্ধুদের পাশে দাঁড়াই, কিন্তু জোচ্চোরদের সঙ্গে ব্যবহারের ধরন আমাদের একটু আলাদা।

ফ্রেইমান বলল যে বিষয়টা একটু ভালো করে ভেবে নিয়ে পরের দিন জবাব দেবে।

সন্ধেটা কাটাল স্মিডল একদল ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে প্রচুরভাবে মদ খেয়ে, আর পরের দিন ঘুম ভাঙল দুনিয়ার প্রতি দারুণ একটা অবজ্ঞার ভাব নিয়ে। শীতল ধারাজলের তলায় বসে বসে ঘোঁতঘোঁত করছে আর হাঁচি দিচ্ছে এমন সময়ে দোরের কড়া বেজে উঠল। পরিচারিকা ভেবে প্রথমে কোনো সাড়া দিল না। আরো জোরে জোরে কড়া বাজতে শুরু করল। বাধ্য হয়েই ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে দরজা খুলে দিল। রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের একজন কর্মকর্তা বিনীতভাবে ওকে জানাল যে সে একটু কথা বলতে চায় ওর সঙ্গে।

কে ফাঁস করে দিল,—চিন্তিত মনে ট্রাউজারটা চড়াতে চড়াতে মনে মনে ভাবল

স্মিডল,—প্রোজাৎস্কা না ফ্রেইমান? প্রোজাৎস্কা নিশ্চয়ই নয়। ঐ বোকা বোকা অর্থহীন কথাটার ভিতরে তেমন সাংঘাতিক কিছুই নেই। তাছাড়া জেহাদীদের ও গুন্ডাদল বলেই উল্লেখ করেছে। ফ্রেইমান হওয়াটাই খুব সম্ভব। শুয়োরের বাচ্চাটা যখন দেখল যে স্মিডলের কাছ থেকে কিছু আর আদায় করা সম্ভব নয়, এখন তাড়াতাড়ি লালদের কাছে গিয়ে গল্প করল ব্যাপারটা নিয়ে। যেদিক থেকেই দেখ না কেন খুবই নোংরা কারবার। অবশ্য এটা ঠিক যে কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ফ্রেইমানের ঘরে যদি লুকানো ডিক্টাফোন থেকে থাকে। কোনো বিশ্বাস নেই বদমায়েশটাকে। কস্টার হয়তো ছিঁটেফোঁটা ওদের দিয়ে বাকি টাকাগুলো পকেটস্থ করেছে নিজেই। এটা আদৌ রাজনীতি নয়, নিছক নোংরামো। ফ্রেইমানের সঙ্গে কথাবার্তা যদি ওরা টুকে নিয়ে থাকে তবে ওর কাজ হবে সটকে পড়া। প্রকৃতই বলেছে ও যে একজন মন্ত্রীর বাবদে পঞ্চাশ হাজার দেবে। মামলা করতে পারে ওর বিরুদ্ধে—বর্বরগুলো। প্রোজাৎস্কার যদি সাংকেতিক কথাটা জানা থেকে থাকে আর সে যদি রিপোর্ট করে তাকে ওর বিরুদ্ধে তবে? ওরা তার কথাই বিশ্বাস করে নেবে। কিংবা ঘুমের ঘোরে নিজেও বলে ফেলতে পারে......। না, সবচাইতে বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে ফ্রেইমান ফাঁস করে দিয়েছে—ব্যাটার চোখ দুটোই ধূর্ত ধূর্ত। ওকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে ভুলই হয়েছে, আতেই ক্ষেপে গেছে লোকটা। ওকে যদি ওরা জেলে পোরে তো যুক্তরাষ্ট্রে ঢিঢি পড়ে যাবে। কিন্তু অবস্থাটা এমন নয় যে চেকরা আজই ধ্বসে পড়েছে। ওরা ওকে জেলে পচিয়ে মারতে পারে। বড়জোর ও একদিন কি এক মাসেই না হয় সহ্য করতে পারল কিন্তু যদি অনেক বছরের জেল দিয়ে দেয় ওকে তবে? তাতে নিশ্চয়ই ও মারা পড়বে। যুদ্ধটা হচ্ছে স্বতন্ত্র ব্যাপার। সবাই একসঙ্গে মিলে যুদ্ধ করতে গেলে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই। কিন্তু এখানে ওরা ওকে জ্যান্ত কবর দেবে। ধীরে ধীরে মৃত্যু।

সাহসী লোক বলে খ্যাতি ছিল স্মিডলের, এমনকি বলত ওকে গোঁয়ার-গোবিন্দ। লো, কস্টারেরা, কর্নেল কলিনস এরা যদি এ সময়ে ওকে দেখত তো অবাক হয়ে যেত যে চেয়ারের কিনারায় বসে স্মিডল ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জুল জুল করে। নিজেই ভাবছে স্মিডল: মজার ব্যাপার। আমি তো হলদে নই, কিন্তু সর্বাঙ্গে ঠান্ডা ঘাম ছাড়ছে আমার। সবচাইতে খরাপ ব্যাপারটা হল অনিশ্চয়তা। কত দূর জেনে ফেলেছে ওরা? সব কিছুই না খানিকটা মাত্র। একটা বিরাট গন্ডলোগের ব্যাপার, আর কেউ নেই আমার যে কি করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় বলে দেয়।

স্মিডলকে দেখে কর্নেল ক্লিৎস্কার মনে হল যে ও অসুস্থ। ওর হাত দুটো কাঁপছে থর থর করে, গলার আওয়াজ এত ক্ষীণ যে ক্লিৎস্কাকে বার বার করে তার প্রশ্নটা আওড়াতে হচ্ছে।

ট্রানজক এজেন্সির প্রাগ সংবাদদাতা কস্টারের সম্পর্কে কি জানেন বলুন আমাকে শুনি।—বললেন কর্নেল।

ফ্রেইমান!—মনে মনে ভাবছে স্মিডল। ওর দেওয়া উচিত ছিল ওকে পাঁচ হাজার......

বেশি দিন এখানে আমি আসিনি, ওসব ব্যাপার জানার সময় নেই আমার। মিঃ প্রোজাৎস্কার সঙ্গে দেখা করেছিলাম......দুটো প্রবন্ধ লিখেছি......

মাফ করুন, আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে কস্টারের কার্যকলাপ সম্পর্কে।

সে কি করছে না করছে তা আমি জানব কি করে? কস্টার একজন বিখ্যাত সাংবাদিক বটে, কিন্তু সে আমার বন্ধু নয়, তার হয়ে জবাবদিহি আমি করতে পারি না।

ভালো কথা তাহলে আমি বলছি আপনাকে এই বিখ্যাত সাংবাদিকটি কি করছিলেন প্রাগে। তিনি খুনেদের একটি সংগঠন গড়ে তুলছিলেন যারা নিজেদের বলে "জেহাদী"।

মুখ খিঁচে ঢোক গিলল স্মিডল। ফ্রেইমানই সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে। তার জন্যেই ওর এই হাল।

ঐ দুর্বৃত্তের দল রুজিৎস্কাকে খুন করেছে, আর আরো অন্য সব কুকাজ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে।—বলে চললেন কর্নেল,—কস্টার আর ভূতপূর্ব গেস্তাপো দলের জেইদা এর নেতৃত্বে। জেইদা যখন ধরা পড়ে গেল সে পালিয়ে গেল ব্যাভেরিয়ায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কস্টারও চলে গেল। আপনি ট্রানজকের সংবাদদাতা হয়েও কিছুই জানেন না এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না, করতে পারি না। আপনি যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসে থাকেন তবে আপনার নিজের স্বার্থেই কস্টার সম্পর্কে কি কি জানেন আপনি, তা বলে দেয়া উচিত।

আমি সত্যি করে বলছি আপনাকে যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি আমি এখানে। আমি চাই আমাদের দুই দেশের মধ্যে আরো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠুক। এ-কথা আমি মিঃ প্রোজাৎস্কাকেও বলেছি। কস্টার খারাপ ব্যবহার করতে পারে, ও লোকটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য লোক নয়। কিন্তু আমি এ-সবের কোনো কিছুই জানি না।

আপনার এই নীরবতাকে আপনিও যে ঐ সব কু-কর্মের সাকরেদ এই হিসেবেই ধরে নেয়া যেতে পারে। আর সেটা আপনার নিজের স্বার্থের অনুকূলে যাবে না। কস্টার এখন বহু দূরে, আর আপনি রয়েছেন এখানে উপস্থিত। ওকে ঢেকে চলার চেষ্টা করা বৃথা। কস্টার নিজেই বলেছে যে সে 'জেহাদী' দল গড়ে তুলেছে। আজকের সমস্ত খবরের কাগজে সে-কথা প্রচারিত হয়েছে—সংবাদ দিচ্ছে পারী থেকে।

তবেই সেরেছে,—ভাবল স্মিডল। নিশ্চয়ই কস্টার এত বেশি মাতাল হয়ে পড়েছিল যে সব কথা উগরে দিয়েছে। ওর মতো একটা নীচ ঘৃণ্য জীবের পক্ষে খুবই সম্ভব। তাছাড়া, অবশ্য কর্নেলের কথাটাও খুবই ঠিক: কস্টার রয়েছে বহু দূরে আর ওকে, স্মিডলকে দায়ী করা হচ্ছে ওর বদলে। কি বলা উচিত ওর, দোহাই ঈশ্বরের?

আমার কথা শুনুন কস্টারের কার্যকলাপ সম্পর্কে যা কিছু জানেন বলে ফেলুন,—বলল কর্নেল,—আমি আবার বলছি আপনার নিজের ভালোর জন্যেই এটা দরকার।

আমি তো আগেই বলেছি আপনাকে যে কস্টার আমার বন্ধু নয়। কস্টার একটা মাতাল আর হীন চরিত্রের লোক। এ-সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলতে চাই না আমি, কেননা ও আমার দেশের লোক। দশের সামনে কারুর কেচ্ছা-কেলেংকারী জাহির করে দেয়াটা আর মোটেই সুখের ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি বলেন কস্টার নিজেই স্বীকার করেছে তো সে-কথা স্বতন্ত্র। আমি জানি না কেন এজেন্সির কর্তারা ওর মতো একটা দুবৃত্ত লোককে প্রাগে পাঠালেন। যুক্ত রাষ্ট্রে ওকে সবাই জানে একটা নীতিজ্ঞানহীন বদমায়েস বলে। কিন্তু সিনেটর লো হচ্ছেন শালিনতার প্রতীক। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে তাঁর মতবাদ রক্ষণশীল আর সে জন্যে, যদিও তিনি আমার মনিব, আমার সংগে তর্কও হয়েছে একাধিক বার। কিন্তু তবুও একটা কথা বলবার আছে তাঁর সম্পর্কে—তিনি হচ্ছেন উঁচু দরের নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন লোক, দারুণ শুদ্ধাচারী। দুর্ভাগ্য এই যে তিনি শিশুর মতো সরল। কস্টার তাঁকে প্রতারিত করেছে। এটা কি করে সম্ভব হল আমি বলছি সে-কথা আপনাকে। কস্টারের হাতে একটা মোটা টাকা দেয়া হয়েছিল, প্রাগে এজেন্সির একটা শাখা স্থাপন করার জন্যে। সিনেটর চেয়েছিলেন এখানে একদল কর্মচারী থাকবে যারা আপনাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের খবরাখবর সরবরাহ করতে পারে। এ-সম্পর্কে আমি মিঃ প্রোজাৎস্কার সংগেও আলাপ করেছি। টাকাটা কস্টার তার খেয়ালখুশি মতো খরচ করেছে—কোনো একটা দুর্বৃত্ত দল বা ঐ ধরনের একটা কিছুর পেছনে টাকা যুগিয়েছে। আমি এখানে আসার পরে একটা দুর্বৃত্ত এসে আমার কাছে টাকা দাবি করল, বলল কস্টার ওকে পুরো টাকা দেয়নি। আমি বললাম তাকে যে আমি সাদাসিধে সাংবাদিক তাছাড়া কস্টারকে এজেন্সি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। লোকটার নামও বলতে পারি আমি আপনার কাছে—কি এক ফ্রেইমান তার নাম। এখানে কি উদ্দেশ্যে কাজ করছিল যখন তার ফিরিস্তি দিল শুনে সবাই ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে উঠল। সিনেটর লো লিখেছেন আমাকে যে ওকে পুলিসে চালান দেয়া দরকার। তাই এটা স্বাভাবিক যে ওকে লাথি মেরে দূর করে দেয়া হয়েছে এজেন্সি থেকে। আর আমাকে পাঠিয়েছে এখানে আমাদের বন্ধুত্বের আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্যে।

ওর বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্যে বলল কর্নেল। শুনে প্রথমটায় আপত্তি করল—প্রকাশ্যে সহকর্মীকে নিন্দে করার কোনো অধিকার নেই ওর।

মুচকি হাসল ক্লিৎস্কা:

আপনি কি বলতে চান যে দুর্বৃত্তর দল গঠন করায় আপনি কস্টারের সহকর্মী ?

ভুল শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি আমি,—প্রত্যুত্তরে বলল স্মিডল,—যদি প্রয়োজন হয়, তবে দেব সই।

ফ্রেইম্যানকে খুঁজে পেল না পুলিস। স্মিডল ওকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে এই ভয়ে ও গা-ঢাকা দিল। স্মিডলের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই তাই ওকে সাতদিন হাজতে রেখে পরে বলে দেয়া হল যে তাকে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে বিতাড়িত করা হল।

যতক্ষণে না আমেরিকান সৈন্যদের দেখতে পেল ধাতস্থ হয়ে উঠল না স্মিডল। শেষ হয়ে গেছে ওর দুঃস্বপ্নের দিন! ও মদ খেল, হৈ হল্লা করে বেড়াল, গল্প করল তার ব্যর্থ দুঃসাহসিক কর্মের কথা। যখন শুতে যাচ্ছে তখন 'ইউনাইটেড প্রেসের' সংবাদদাতা এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। আর ওকে দেখাল একখানা চেক সংবাদপত্র যাতে কস্টার সম্পর্কে ও যা কিছু বলেছে সবই প্রকাশিত হয়েছে আর তাতে রয়েছে ওর স্বাক্ষরের প্রতিলিপি।

কাল প্রাগ থেকে এটা বেতারে প্রচারিত করা হয়েছে।—বলল সংবাদদাতা,—ওরা আপনার কণ্ঠস্বরও রেকর্ড করেছে। আমার উপরে আদেশ হয়েছে, আপনি সীমান্ত অতিক্রম করলেই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। আমেরিকায় সবাই ব্যাপারটা জানার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে যে কি অবস্থার ভিতরে পড়ে আপনি বাধ্য হয়েছিলেন লালদের কথাগুলো আওড়াতে।

জবাব দিতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গড়ল স্মিডল। ব্যাপারটা তাহলে চুকে-বুকে যায়নি! নিউইয়র্কে বসে সাধু সাজা খুবই সহজ। যদি একবার লাল-গুলোর হাতে পড়ত তবে বুঝত......কিন্তু ব্যাপারটা কেউ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না।

খুবই ক্লান্ত আমি,—জড়িয়ে জড়িয়ে বলল স্মিডল,—একটা বেয়াড়া সময়ে এসেছেন আপনি দেখা করতে।

সাক্ষাৎকারের ব্যাপার কিছু নয় এটা। আপনি বুঝতে পারছেন না মিঃ স্মিডল, আপনাকে যে কতখানি দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে ভেবে যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা মর্মাহত। আমার মনে হয় বোধহয় আপনি খবরের কাগজ দেখেননি এখন পর্যন্ত। অবিশ্বাস্য ঘটনা সব ঘটতে শুরু করে দিয়েছে। স্টেট ডিপার্ট-মেন্টের নোট পাঠাবার পরে অসংখ্য প্রতিবাদ আসতে শুরু করেছে। ইউ, এন, ও, তো টেলিগ্রামে টেলিগ্রামে বরফ-ঢাকার মতো হয়ে উঠেছে। রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবাদের: হাঙ্গেরির কার্ডিনালের মামলার চাইতে একশো গুণ বেশি। চেকরা যখন বলল যে তারা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে আমেরিকার সবাই তখন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। তারপর এখন আবার, গতকাল প্রাগ রেডিও ঘোষণা করেছে যে আপনি সাবলের অভিযোগই সমর্থন করেছেন।

সাবল—এর ভিতরে সাবল এল কোথা থেকে?

লালগুলো কিনে ফেলেছে সাবলকে। পারীতে সে এই বলে একটা বিবৃতি দিয়েছে যে কস্টার জেহাদীদের সম্পর্কে সব কথা বলেছে তার কাছে। নিশ্চয়ই বানানো কথা। কিন্তু 'কমিনফর্ম' তো উঠে-পড়ে লেগেছে ব্যাপারটা নিয়ে আর লালগুলো তো দারুণ সোরগোল তুলেছে।

দাঁড়ান একটু, কস্টার নিজে কোনো বিবৃতি দেয়নি?

নিশ্চয়ই। সব কিছুই অস্বীকার করেছে সে, এ তো স্বাভাবিক। বলেছে, সাবল মিথ্যে কুৎসা প্রচার করেছে ওর বিরুদ্ধে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল স্মিডল। নিশ্চয়ই কর্নেল ধাপ্পা দিয়েছে ওকে। আর ও কিনা ফাঁদে পড়ে গেল। কোনোদিন ওর পক্ষে এটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না, কারণ শয়তানদের খপ্পরে পড়াটা যে কী বস্তু তা কেউই বুঝবে না।

এভাবে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।—ওর উত্তেজনা লক্ষ্য করে বলল সংবাদদাতা। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই জরুরি। লালগুলো সর্বত্র আপনার নাম ব্যবহার করছে। আজই মস্কো রেডিও বলেছে যে, কস্টার যে গুন্ডাদল গঠন করছিল স্মিডল এ-কথা সমর্থন করেছে। এটা যদি না হত তবে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতাম না আমি। কিন্তু ওরা সত্যি সত্যি কি করেছিল আপনাকে সেটা জানা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। অত্যাচার করেছিল আপনার উপরে বা হয়তো কোনো রাসায়নিক দ্রব্য ইনজেক্ট করেছিল?

বাঁচলাম।—ভাবল স্মিডল মনে মনে। চমৎকার কথা মনে করিয়েছে!

লিখে নিন। চেকা-র একটা কর্মচারী আমার বিবৃতি নিচ্ছেন। যখন দেখল যে ভয় দেখিয়ে কোনো ফল হচ্ছে না, তখন বলল যে আমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। তাছাড়া, হয়তো হতেও পারে—ওরা আমাকে কিছু খেতেও দেয়নি আর ঘুমোতেও দেয়নি। চেকা অফিসার ডাক্তার ডাকার কথা বলল, কিন্তু আমি অস্বীকার করলাম। এক ঘণ্টা পরে ওদের গুন্ডগুলো এল। এসে বলল যে আমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছি আমাকে একটা বলকারী ওষুধ ইনজেক্ট করতে হবে। আমি বাধা দিলাম, ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম। কিন্তু ওরা আমাকে বেঁধে ফেলল তারপর গুন্ডাগুলো কি একটা নোংরা রাসায়নিক দ্রব্য ফুঁড়ে দিল আমার শিরার ভিতরে। প্রায় মরে গেলাম বললেই চলে। বেশি কিছুই আর মনে নেই.........তারপর আমাকে আবার টেনে নিয়ে এল চেকা অফিসারের সামনে। সে কি যেন একটা পড়ল আর আমাকে বলল সেটা আউড়ে যেতে। আমার তখন হতচেতন ভাব। যেদিন আমাকে বের করে দেয় ওদেশ থেকে, মাত্র তার আগের দিন আমার জ্ঞান ফিরে আসে। নিয়েছেন লিখে? এটুকুও যোগ করে নিন: সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জানা উচিত যে এই অমানুষ পশুর দল কত জঘন্য কাজ করতে পারে। ব্যস।.........। এর পর কি অবস্থায় আপনি আমাকে দেখতে পেলেন আর একজন আমেরিকানের সঙ্গে কথা বলতে পেরে কী সুখীই না আমি হয়েছি সে-সম্পর্কে আপনার নিজের ধারণার কথা জুড়ে দিতে পারেন।

বোধহয় কিছুদিন আপনি এখন ছুটিতে কাটাবেন?

দুর্ভাগ্যবশত তা নয়। ট্রানজকের নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে আমি জার্মানিতে গিয়ে কাজ করে যাব। ছুটি উপভোগ করার সময় নয় এটা।

স্মিডল কস্টারকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছে সংবাদটা শুনে দারুণ মুষড়ে পড়ল সিনেটর লো। দুনিয়ায় কি একটাও সৎ লোক থাকতে নেই? স্মিডলের মতো লোকও যদি এ-ধরনের ঘৃণ্য কাজ করতে পারে তো অন্যরা করবে তার আর বেশি কথা কী? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা পাপ, কিন্তু তিনি বড্ড বেশি মাত্রায় ওঁর ধৈর্য পরীক্ষা করে চলেছেন। জব-এর মতো মনে হল নিজেকে। প্রথমে হারাল তার মেয়েকে, আর এখন কিনা যে লোকটাকে নিজের আধ্যাত্মিক সন্তান হিসেবে মনে করত, হারাল তাকে।

পরের দিন ইউনাইটেড প্রেসের তারবার্তা টেলিফোনে জানিয়ে দেয়া হল তাকে আর লো নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়ল স্মিডলের উপরে সন্দেহ জেগেছিল বলে। বেচারা ছেলেটা, কী ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা! স্মিডলকে তার করে দিলেন:

যে যন্ত্রণা ভোগ করলে তুমি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেবে আমাকে যে এই অমঙ্গলের মূল উৎস পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে হবে। তোমার মুক্তিলাভে আমি আনন্দিত। আর ঈশ্বর যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে তাঁর অপার মহিমা থেকে বঞ্চিত করেননি এটাকে তারই নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ কর।

এ-কাজ যে ওরা করতে পারে আসলে আমি আদৌ সে-কথা ভাবতে পারিনি। —সেদিন রাত্রে রবার্টসের কাছে বলল লো,—একটা লোককে অপবাদ দেয়া, তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে কোনো একটা নোংরা রাসয়নিক দ্রব্য ইনজেক্ট করে দেয়া......একটা বীভৎস ব্যাপার! আমরা যদি শুরু না করি তবে ওরা শুরু করে দেবে। আর সেটা তখন আমেরিকার পক্ষে এমনকি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে শতগুণ খারাপ হয়ে দাঁড়াবে। ওদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে আমাদের আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

নিশ্চয়ই,—প্রত্যুত্তরে বলল রবার্টস,—কিন্তু সমস্ত আমেরিকানরা এখনো বোঝে না এ-কথাটা। সিনেট কমিটিতে সামরিক ব্যাপারের উপরে এই সেদিনও বলল সবাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত না জার্মান বাহিনী গড়ে ওঠে ততদিন কিছুই করা সম্ভব নয়। এক দিক থেকে কথাটা সত্যি, কিন্তু জেনারেল হয়েস রিপোর্ট করেছেন যে জার্মানদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন যদি দেরি হয় তবে স্পেইডেল তার জন্যে দায়ী নয়। কিন্তু একটা জিনিস আছে যা না হলে কোনো কিছু শুরু করা মোটেই সম্ভব নয়। আর সেটা হল যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক সংহতি। যদি না আমরা এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি আমেরিকাবাসীকে এ-কথা বোঝাতে পারি যে যুদ্ধ অনিবার্য আর জয় আমাদের সুনিশ্চিত, তবেই আমরা শেষ হয়ে গেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে ভগবান সে-অবস্থায় আমাদের পড়তে দেবেন না। নতুন করে আমাদের আবার ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে......। অবশ্য এ-কথা বলছি না যে "যুদ্ধের জন্যে সবাই প্রস্তুত হও" এ-আওয়াজ তুলব আমরা, কিন্তু আন্দোলনটা হবে যুদ্ধের স্বপক্ষে। তাতে যদি আমাদের শান্তির কথা বলতে হয় তা-ও সই।

তেষট্টি

স্মিডলের সঙ্গে এই একই রেজিমেন্টে ছিল ম্যাকহর্নি। স্মিডল-এর দুর্ভাগ্যের কথা কাগজে পড়ে ভয়ে আঁতকে উঠল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে বিশেষ ধরনের সজ্জিত ল্যাবোরেটরির ভিতরে কেমন করে স্মিডলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল, কেমন করে জল্লাদগুলো ধীরে ধীরে সেই রহস্যজনক রাসায়নিক দ্রব্য মেপে নিল, আর তখন ঐ হতভাগ্য আমেরিকান কেমন করে তার সুদূরের স্বদেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করে বৃথাই চিৎকার করছিল তার পুঙখানুপুঙখ বর্ণনা দিয়ে লিখল খবরের কাগজ। ম্যাকহর্নির সর্বাঙ্গ জুড়ে জেগে উঠল এক ভীতির শিহরণ—এ-ধরনের ভয়ংকর ব্যাপার কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে না!

স্মিডলকে কোনোদিনই সহ্য করতে পারে না ম্যাকহর্নি। ওকে মনে করে আত্মম্ভরী। আড়ালে বলে ওকে তুর্কী মোরগ। একদিন মেজর এল ম্যাকহর্নি-র বাড়িতে। গভীর হৃদ্যতার সঙ্গে দুজনে করমর্দন করল তারপর পান করতে শুরু করল। ম্যাকহর্নি শুরু করল যুদ্ধের দিনের কথা।

সে-সব চুকেবুকে শেষ হয়ে গেছে,—বলল স্মিডল,—শিগগিরই আমরা লালদের প্রচণ্ড মার দিচ্ছি।

ধীরে, অত তাড়াতাড়ি নয়,—প্রত্যুত্তরে বলল ম্যাকহর্নি,—মানুষ একটু নিঃশ্বাস ফেলতে চায়।

মেজর চলে যেতেই ম্যাকহর্নি ওর বাপান্ত করতে শুরু করে দিল:

বেকুবটা আর কিছু পেল না, গেছে রাজনীতি করতে! ও ছাড়াও জোচ্চোর জালিয়াতের অভাব আছে কিছু?

ব্যাপারটা ঘটেছিল বহু দিন আগে। তখনো ম্যাকহর্নি-র ছিল দর্জির ব্যবসা। সেই লাল খদ্দেরটার জন্য—যে চেয়েছিল একটা গোটা কারখানা বা গোটা শহর উড়িয়ে দিতে—তার জন্যে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে ওকে। যদিও ডুবলেট কথা দিয়েছিল ওকে যে কেউ ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না, তবুও প্রায়ই পুলিস এসে হানা দিত ওর দোকানে, আসত গোয়েন্দা কর্মচারীরা, ফটোগ্রাফারের দল। তারা প্রশ্নে প্রশ্নে ওকে উত্যক্ত করে মারত—আসল খদ্দের যারা তারা ভেগে পড়তে লাগল। ফলে বাধ্য হয়েই ওকে লোকসান দিয়ে দোকানটা বেচে দিতে হল। তারপর চাকরি খুঁজে খুঁজে কাটাল অনেক দিন। শেষ পর্যন্ত এক সৎকার-ব্যবস্থাপকের অধীনে একটা চাকরি জুটল। কাজটার উপরে ওর অসীম ঘৃণা—মৃতদেহ নিয়ে কারবার করার চাইতে নিগ্রোদের স্যুট—এমনকি লালদের স্যুট তৈরি করাও ঢের ভালো। ওকে শুঁকে শুঁকে বেড়াতে হয় কার অসুখ করল, ডাক্তারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হয় যাতে ঠিক সময়ে ওকে ফোন করে খবর দেয়। তারপর ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনদের উপরে চাপিয়ে দিতে হয় বিজ্ঞাপন আর খরচ-খরচার দায়িত্ব। ফলে ম্যাকহর্নি যে বেশিরভাগ সময়

শরাবখানায় গিয়ে পড়ে থাকছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 'যতটুকু পারা যায় মজা লুটে নেয়াই উচিত মানুষের'—স্ত্রীর প্রতিবাদের জবাবে বলে ম্যাকহর্নি। ও জানে যে একটা কাফেটারিয়ার মালিকের সঙ্গে পেগীর একটা সম্পর্ক আছে। এক সময় রাগ হত, ভাবত ঐ নাকের উপরে দাগ-ওয়ালা এক ঠ্যাং ছোট লোকটার বদলে অন্য একটা ভালো লোক বেছে নিতে পারত পেগী। কিন্তু পরে নিজেকে এই বলে বোঝাত যে যাকগে ব্যাপারটায় হয়তো বেশি মজা পায় পেগী—লোকটা অন্তত আন্তরিকভাবেই ব্যবহার করে ওর সঙ্গে—কৃত্রিম রুক্ষতার সঙ্গে নয়। ঈর্ষান্বিত হওয়ার কথা ভাবতেই ওর মনে হয়, অসম্ভব। স্ত্রী ওর কাছে অতীতের স্মারক-চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, যেন যুদ্ধের আগের কারখানায় তৈরি ওর বর্ষাতিটার উপরে মৎস-কন্যার ট্রেডমার্ক।

কোনো কোনো সময়ে কয়েক পাত্র টানার পরেই প্রাণভর গালাগাল করে মিনাইয়েভকে। ঐ ভাঁড়টার জন্যেই দীর্ঘ ছ মাস পর্যন্ত পুলিস একটুও শান্তিতে থাকতে দেয়নি ওকে। আর তারই জন্যে ওকে দোকানটা বিক্রি করে দিয়ে নিতে হল এই নোংরা চাকরিটা। তাছাড়া হায়ারস্টোনের সঙ্গে ঝগড়া করল কেন ও? সেটাও ঐ মিনায়েভের জন্যেই।

ওকে যদি চেয়ারেও বসিয়ে দেয়,—বলত ম্যাকহর্নি,—অন্তত আমি একটা লোক, যার চোখে এক ফোঁটাও জল পড়বে না। যাই হোক, যখন ও কাগজে দেখতে পেল যে রুশটাকে ছেড়ে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে, এতটুকুও রাগ হল না ম্যাকহর্নির। হতে পারে লোকটার কোনো কিছুই উড়িয়ে দেবার মতলব ছিল না, শুধু এসেছিল ম্যাকহর্নির কাছে একটা ঘন-নীল স্যুট আর দুটো ট্রাউজার তৈরি করিয়ে নিতে। কোনটা সত্যি কি করে বুঝবে মানুষ? এমনকি জজসাহেব পর্যন্ত আটমাস ধরে কি করবে বুঝতে না পেরে মাথা খুঁড়ে মরেছে। এ বলছে এক কথা, আর একজনে বলছে আর এক কথা, কিন্তু যখন সবার সব কথা বলা-কওয়া হয়ে গেল, তখন তার ভিতর থেকে বেছে নেয়ার মতো আর কোনো কিছুই রইল না। ফ্রেড ডুবলেটকেই ধর না কেন! স্মিডল-এর কথা মতো ধরাই যাক না কেন যে লালগুলো আমেরিকানদের গিলে ফেলতেই চাইছে, কিন্তু ও নিজে ম্যাকহর্নি ফ্রেডের মতো দুর্বৃত্ত ওকে রক্ষা করবে এটা ঘৃণা করে।

মিনাইয়েভের ঘটনা নয়, ম্যাকহর্নির জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল যেটা সেটা হচ্ছে কাগজের ঐ সংবাদটা যাতে কেমন করে লালগুলো সেই রহস্যময় রাসায়নিক দ্রব্য ইনজেক্ট করে দিয়েছিল স্মিডল-এর গায়ে তারই বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর চাইতে লালগুলো যদি মেজরকে খুনও করে ফেলত তাহলে ও ব্যাপারটাও শান্তভাবেই গ্রহণ করতে পারত। ছেলেমানুষ নয় স্মিডল। সেচ্ছায় সে রাজনীতি বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে। গেছে লালদের ব্যাপারে মাথা গলাতে। আর সেটা হচ্ছে আয়ের একটা পথ—হয় লক্ষ লক্ষ টাকা নয়তো মাথার পিছনে একটি গুলি। কিন্তু মেজরের অদৃষ্টে যা ঘটল সেটা অবিশ্বাস্য। একটা লোককে ধরে টেনে নিয়ে এমন একটা রাসায়নিক দ্রব্য ইনজেক্ট করে দেয়া যাতে লোকটার বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায় ভাবতেও ম্যাকহর্নির মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, কাগজে লিখেছে যে যাকেই এ-দ্রব্য ইনজেক্ট করে দেয়া হয় তাকে তখন যা করতে

বলা হবে সে তাই-ই করবে। আমেরিকান বোমার চাইতেও লালগুলোর এ আবিষ্কার ঢের বেশি পৈশাচিক! ইচ্ছে করলে ওরা ওকে—জিম ম্যাকহার্নিকে দিয়ে বাড়িটার উলটো দিকের ঐ স্কুলের শিশুদের গুলি করাতে পারে কিংবা একটা ব্যাংক উড়িয়ে দেয়াতে পারে, ভাব দেখি একবার। হতে পারে ওরা হায়ারস্টোনকে ঐ ধরনের কিছু একটা হয়তো ইনজেক্ট করে দিয়েছিল। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তারপর হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গেল, কী পড়ছে ভগবানই জানেন, আর কথাবার্তা বলতে শুরু করে দিল এমনভাবে যেন সদ্য মস্কো থেকে ফিরে এসেছে। না, মিনাইয়েভকে ছেড়ে দিয়ে ভুলই করছে ওরা। লোকটাকে দেখে মনে হত সাদাসিধে, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য ছিল একটা শহরই উড়িয়ে দেয়া। জজ-সাহেব-ও ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে পারেননি, কিন্তু এখন সেটা পারে ম্যাকহার্নি: ওরা ওকে ইনজেকশন দিয়ে বলে দিল: উড়িয়ে দাও ওটা! সুতরাং মনে হচ্ছে স্মিডল-এর কথাই ঠিক: যদি লালগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা না যায় তবে ওরাই শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়বে আমেরিকানদের উপরে, আর তাহলেই প্রত্যেকটি মানুষেরই শেষ। এ-কথা সত্যি, যে নোংরা জীবনযাপন করছে ও, খাবারের পয়সার জন্যে নির্ভর করতে হয় কে কখন মরবে তারই উপরে। কিন্তু তবুও যাকে খুশি ওর মনের কথা বলতে পারে প্রকাশ করে, কেউ ওকে আর কোনো কিছু ইনজেক্ট করতে যাচ্ছে না।

সেদিন রাত্রে ও প্রচুর মদ খেল। যখন বাড়ি ফিরে এল তখন কাপড় ছাড়ার অবস্থাও ওর নেই। তবুও চিৎকার করে বলতে লাগল:

লালগুলো যেন এ-কথা না মনে করে যে আমেরিকায় মানুষ নেই। আমরা জার্মানদের হারিয়ে দিয়েছি, রুশদেরও হারিয়ে দেব। যুদ্ধটা নোংরা ব্যাপার। কিন্তু সময় যা এসেছে তাতে মনে হচ্ছে ওটা ছাড়া চলবে না আমাদের।

ওর স্ত্রী ওকে বিছানায় শুইয়ে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ও বলল তাকে:

দেখ, ওরা যেন স্মিডল-এর মতো তোমাকে না ইনজেক্ট করে বসে, তাহলে হয়তো তুমি গিয়ে তোমার ঐ খোঁড়া হাঁদাটাকে ছুরি মেরে বসতে পার।

ওর স্ত্রী আশা করেছিল যে রাত্রে একটা ঘুম দিলেই স্মিডল-এর কথা ভুলে যাবে। কিন্তু পরের দিনটাও গোটাই লালগুলো কী করেছে স্মিডলকে সেই কথা নিয়েই ওর মনটা আচ্ছন্ন হয়ে রইল। এ-কথা সত্যি যে ও গিয়েছিল আইন-জীবী উইনচেলের কাছে। স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে তাঁর। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় কত খরচ পড়বে তা বলে দিল তাঁকে। পরামর্শ দিল একটা ভালো মজবুত কফিনে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু এ-সব কিছুই ও করে গেল যান্ত্রিকভাবে। মনটা নিবদ্ধ রইল অন্য ব্যাপারে। তারপর যখন সন্ধ্যে হল আবার ও মদ খেতে শুরু করে দিল, শুরু করল চিৎকার করতে। এক হপ্তা কেটে গেল কিন্তু তখনো লালদের কথা ঘুরছে ম্যাকহার্নির মাথায়। হঠাৎ একটা কথা ওর মনে চমকে উঠল যে স্মিডল তো প্রথমে ওরা যা বলতে বলেছে তাই-ই বলেছে। কিন্তু পরে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। সুতরাং হায়ারস্টোনও হয়তো আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠে থাকবে। ওর সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেনি বলে নিজেকে নিজে দোষারোপ করল মনে মনে। মেজরের ব্যাপার ওরা যা করল নিশ্চয়ই এর পরে হায়ারস্টোন

আর ওদের হয়ে কথা বলবে না। হায়ারস্টোন চেনে স্মিডলকে, সুতরাং বলতে পারবে না যে এতে ওর মাথাব্যথা নেই। অনেক পেগ হুইস্কি টেনে নিজেকে শক্ত করে চলল সে হায়ারস্টোনের খোঁজে।

পা ফাঁক করে একটা চেয়ারে পা এলিয়ে দিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ঘরের চতুর্দিকে তাকাল। তেমনি রয়েছে বইগুলো সেখানে। তাছাড়া কেন হায়ারস্টোন মজুরের মতো পোশাক পরে? হয়তো ওর আর কোনো জামাকাপড় নেই—হতভাগা শয়তান! চাকরি পাওয়া চারটিখানি কথা নয়। মনে পড়ল হায়ারস্টোন বলেছিল ওকে যে কেমন করে সে দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠিক ওর নিজেরই দশা, উচিত ছিল ওদের কবর দেয়া কিন্তু হায়ারস্টোন চেষ্টা করেছিল কিনা ওদের জীবনবীমা করাতে। মজার ব্যাপার বটে!

কাজকর্ম নেই?—জিজ্ঞেস করল ম্যাকহর্নি।

নিশ্চয়ই আছে। ছ'মাস ধরে একটা কারখানায় কাজ করে আসছি।

অফিসে?

না, কারিগরী দোকানে কাজটা শিখে নিয়েছি।

কী ঘৃণ্য ব্যাপার! সব কিছুই অবিশ্যি অল্প-বিস্তর নোংরা। জান, কেন এসেছি আমি?

না।

স্মিডল-এর ব্যাপারটা পড়েছ?

পড়েছি।

শোন জো। আসার ইচ্ছে ছিল না আমার। তোমার উপরে চটে গিয়েছিলাম আমি। কেন তুমি ডাকনি আমাকে? তারপর মনে হল, আমাদের তো আর মামুলি পরিচয় নয়—গোটা একটা বছর লড়েছি এক সঙ্গে। তাই নিজের মান নিজের পকেটে রেখে দিলাম। ঢের বড়ো জিনিস আছে......মনে আছে তুমি লালদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলে? এখন দেখতে পেলে তো ওদের স্বরূপ?

আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হল এই যে যদি তুমি ঐ সব বাজে কথায় বিশ্বাস করে থাক তবে তোমার মাথাটা পরীক্ষা করিয়ে দেখানো দরকার। স্মিডল কি করছিল? ওকে প্রাগে পাঠানো হয়েছিল মানুষ খুন করাতে। তা-ও কাগজে বেরিয়েছে। যদিও তুমি যে কাগজটা পড়েছ সেটায় নয়। অবাক হওয়ার কিছুই নেই। সেই অতীতে যখন আমরা রুশদের সঙ্গে ছিলাম আমি ভাবতাম:

নাৎসীদের চাইতে কোন অংশে ভালো স্মিডল?

স্মিডল-এর কথা বলিনি আমি। ও কি করছিল না করছিল তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার। আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটা হল এই যে কেমন করে লালগুলো ওকে কি একটা রাসায়নিক দ্রব্য ইনজেক্ট করে দিয়েছিল পড়েছ সে কথা?

কিছুই ইনজেক্ট করেনি ওরা। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই যে ও দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল তাই এখন সেটা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে। নিগ্রোদের ফাঁসী দেয়ার ব্যাপারেই ওর যত বীরত্ব। কিন্তু তোমার জন্যে দুঃখ হয় আমার জিম যে তুমি এই সব বাজে কথা বিশ্বাস করছ। রুশদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের ক্ষেপিয়ে

তোলার একটা সুচিন্তিত চক্রান্ত হচ্ছে এটা। মনে আছে মিনাইয়েভ সম্পর্কে কী বলেছিল ওরা? কেমন করে ও একটা শহর উড়িয়ে দিতে গিয়েছিল বলে বলা হয়েছিল। আর শেষটায় কি না ছেড়ে দিতো বাধ্য হল ওকে।

খুবই খারাপ, দেখছি এখনো তুমি চোখে ঠুলি পরে আছ। আমার জন্যে বৃথা দুঃখ করে লাভ নেই। ন্যাবা-রোগী নই আমি। আমি যাব, গিয়ে লড়ব।

যাও যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে।

আর তুমি লড়বে না?

না।

যদি হুকুম আসে?

একই কথা, আমি যাব না।

লাফিয়ে উঠল ম্যাকহর্নি:

ভেবেছিলাম তুমি আমেরিকান কিন্তু তুমি একটা লাল। ওটা তোমার রক্তে মিশে আছে। তুমি যে কি তা জানিয়ে দেয়াটাই হবে আমার কাজ।

দোরটা খুলে ধরল হায়ারস্টোন:

সে তোমার মর্জি। এখন কেটে পড়।

হায়ারস্টোনের সঙ্গে আলাপ করার পরে আরো বেশি ক্ষেপে গেল ম্যাকহর্নি। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে হায়ারস্টোনের বিরুদ্ধে ও পুলিশে খবর দেয়নি, কারণ ও ঘৃণা করে পুলিশদের। কিন্তু কল্পনায় ও দেখতে পাচ্ছে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। হায়ারস্টোন চেষ্টা করছে পালিয়ে যেতে আর ও নিজের হাতে তাকে গুলি করে মারছে।

যুদ্ধ শুরু হলে প্রথম কাজ হবে লালগুলোকে খতম করা।—স্ত্রীর কাছে বলল ম্যাকহর্নি—হায়ারস্টোনকে ছাতু করে ফেলব আমি।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জিম! কী বলছ ভেবে দেখ! আর একটা যুদ্ধের হাত থেকে ঈশ্বর রক্ষে করুন আমাদের! তা যদি হয় তবে লালরাই প্রথমে বোমা ফেলবে আমাদের উপরে।

যুদ্ধটা সত্যিই নোংরা ব্যাপার—মনে মনে ভাবতে লাগল ম্যাকহর্নি। মনে পড়ে গেল ওর ম্যাগদেবুর্গের ধ্বংসাবশেষের কথা। নিউইয়র্কের উপরে যদি বোমা পড়ে তো সেটা তেমন ভালো ব্যাপার হবে না। জ্যাক মারা পড়েছে! ওর কপালেও সেই অবস্থাই ঘটতে পারে—মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরা এক কথা আর এক তাল লোহা পেটে ঢুকে মরাটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। পেগীর চাইতে এ-কথাটা ভালোই বোঝে ও নিজে। ও নিজেই যুদ্ধ করেছে। কিন্তু লালগুলো যদি কোনো কিছুই না মানে তো লোকে কী আর করতে পারে? যদি জান যে ওরা কাল আক্রমণ করবে তো আজই ওদের আক্রমণ করা উচিত। তাতেই ওদের সহজে ঘায়েল করতে পারা যাবে। স্মিডল একটা দাম্ভিক তুর্কী-মোরগ। কিন্তু ওর কথাটা ঠিক।

একদিন হঠাৎ ম্যাকহর্নির দেখা হয়ে গেল ডুবেলটের সঙ্গে আর দুজনে মিলে ঢুকে পড়ল একটা বারে। স্বভাবতই ম্যাকহর্নি তুলল স্মিডলের কথা।

ওরা ওসব করে থাকে প্রায়ই।—শান্ত কণ্ঠে বলল ডুবেলট।

কুৎসিত ব্যাপার। এর মানে হচ্ছে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল ডুবেলট। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজনে। অবশেষে ডুবেলট বলল:

আমি জানি তোমার সাহস আছে। তাছাড়া বড় কথা হচ্ছে এই যে তুমি খাঁটি আমেরিকান। এন্ডার্সের সঙ্গে গিয়ে একবার আলাপ কর না? তুমি একজন অভিজ্ঞ লোক—একজন ভূতপূর্ব অফিসার। তুমি যদি না যাবে তো কাকে আর আশা করা যায়। আমি জানি তুমি বিশ্বাস কর না আমাকে। ভাব আমি পুলিশের হয়ে কাজ করি। কিন্তু আমি ঐ রক্তচোষাদের ঘৃণা করি। যাই হোক তুমি আমাকে ও সবের থেকে বাইরেরই ধরে নিতে পার। এন্ডার্সের সঙ্গে গিয়ে একবার কথা বল। গোটা কালটাই সে যুদ্ধের ভিতরে কাটিয়েছে, আহত হয়েছে দু-দু বার, এখন-সে বিজ্ঞাপনের জায়গা বেচা-কেনার কাজ করছে। ওর উপার্জন কিছু নেই বললেই চলে, কারণ লোকটা খাঁটি সৎ লোক। ওর ছেলেরাও খুব চমৎকার। কথা বল গিয়ে ওর সঙ্গে। আজকের দিনে একা একা চলার চাইতে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না।

কিছু বলল না ম্যাকহর্নি। বিশ্বাস করল না ডুবেলটের কথা। হয়তো ও পুলিসের কাজ করতে পারে, কিংবা না-ও করতে পারে। কিন্তু কাউকে দেখে যদি পুরোপুরি পুলিশের চর বলে মনে হয় তাহলে ওকেই দেখে। দুর্বৃত্ত তো বটেই লোকটা—কিন্তু ওর কথাটা ঠিক—আজকের দিনে একা একা চলাটা খুব মজার ব্যাপার নয়। বোধহয় সত্যিই ওর এন্ডার্সের সঙ্গে গিয়ে দেখা করাটাই ভালো। লোকে বলে লোকটা গুন্ডা, কিন্তু হ্যাঁ, সাহস আছে বটে ওর। তা নয় হল, কিন্তু কি বলবে ওকে এন্ডার্স? বলবে কি যে লালগুলো পশু? এন্ডার্স না বললেও সে-কথা জানা আছে ওর। তার চাইতেও বরং এলডোরাডোতে গিয়ে দু পাত্র টানা ভালো।

তবুও এক হপ্তা পরে ও গেল এন্ডার্সের সঙ্গে দেখা করতে। এটা ওটা আলোচনা করার পরে এন্ডার্স বলল:

যত সব আজে-বাজে লোককে কবর দিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। অবশ্য তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না। যে-কোনো কাজের মতো এটাও একটা কাজ। আমিও এমন সব বদমায়েসের কাছে বিজ্ঞাপনের জন্যে ঘুরে থাকি যাদের মনে হয় যে কবর দেয়াই উচিত। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু তুমি একজন ক্যাপটেন—চমৎকার একটা মর্যাদার পদ। তাছাচ্ছা যুদ্ধটা যে কি তা-ও জানা আছে তোমার। আর বেশি দিন বসে থাকতে হবে না এখন আর—যে-কোনো দিনই শুরু হয়ে যেতে পারে। এমন কি হয়তো জানবেও না কেউ আগে থেকে।

কেউ জানবে না? তাহলে কংগ্রেস, খবরের কাগজ, রেডিও, সৈন্য-সমাবেশ—এ-সব মিলে তো একটা দারুণ সোরগোল পড়ে যাবে, যাবে না?

কি থেকে বুঝলে যে তৃতীয় মহাযুদ্ধটাও ঠিক আগের আগের যুদ্ধের মতোই হবে? সম্পূর্ণ অন্যভাবেও হতে পারে। হয়তো বলকান রাষ্ট্রগুলোয়, কি কোরিয়ায়, যে-কোনো জরুরি অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে।

অনেক দিন আগে থেকেই তৈরি আছি আমি।

সোজা কথা বল—প্রথম দলের ভিতরেই যেতে রাজী আছ তুমি ?

বেজম্মার দল ! মানুষকে একটু নিশ্বাস ফেলতেও দেবে না !—চিৎকার করে উঠল ম্যাকহর্নি।—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস কর আমাকে যে আমি রাজী আছি কি না তার জবাবে বলব আমি যে আমি একটা লাল নই, কিংবা ইহুদী বা নিগারও নই। আমি শতকরা একশো ভাগ আমেরিকান। যদি দরকার হয় তো এই মুহূর্তেই আমি প্রস্তুত।

গভীর আবেগে এন্ডার্স ওর করমর্দন করল।

পরে নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করল ম্যাকহর্নি যে কেন সে প্রথম দলেই যেতে চায় ? অবশ্য কোনো কিছু পিছিয়ে দেয়াটা বোকামো, তার ফল খারাপই হয়ে থাকে, কিন্তু যদি যুদ্ধ করতেই হয় তবে সবারই তো এক সঙ্গে মিলে দাঁড়ানো দরকার। যদিও শেষ পর্যন্ত কে এক মাস আগে মরল বা পরে মরল তাতে কিছু যায় আসে না। হয়তো খুব ভালোভাবেই কেটে যাবে ওর। মদ খাবে, নাচবে মেয়েদের সঙ্গে, হৈ-হল্লা করবে। যুদ্ধের ব্যাপারে ভালো দিক হল এই যে যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায় প্রাণভরে হৈ-হল্লা করা যায়।

এলডোরাডোতে গেল ম্যাকহর্নি। ওখানে পা-কাটা এক পিয়ানো-বাদক ভোর তিনটে থেকে পিয়ানো বাজায়। প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক দ্বীপে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ও পা হারায়। নিশ্চয়ই ওর সব ব্যাপারে বিরক্তি ধরে গেছে। তাই অত জোরে জোরে ঘাট টিপছে যাতে ফাটিয়ে ফেলতে পারে। ওই ধরনের হৈচৈ শব্দ মন্দ নয়—লোকের ভাবনা-চিন্তা থামিয়ে দেয়। ডাঃ গ্রিন ফোন করে খবর দিয়েছে যে স্মিদ মারা যাচ্ছে। কাল যাবে ও সেখানে—একটা খরচের মোটামুটি ফর্দ দিতে হবে। একটা প্রথম শ্রেণীর সৎকারের ব্যবস্থা হবে। স্মিদ ছিল বড়ো দরের একটা বদমায়েশ লোক। কিন্তু এই মুহূর্তে আর এক গ্লাস হুইস্কি খাবে ও......পা-কাটা পিয়ানো-বাদক "মরণ ভুল" ফিল্মের একটা গান বাজিয়ে চলেছে। গানটা নেহাত বাজে কিন্তু তবুও মজার।

হঠাৎ গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল ম্যাকহর্নি :

খরচপত্রের হিসেব ছাড়াই ওকে কবর দেয়া হবে। পেছনের দিকে বহু দূরে কোনো রকমে একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখা হবে ওকে—হয়তো বা বুলগারিয়ায় কিংবা কোরিয়ায়। সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে পেঁচালো। কিন্তু ও একশো ভাগ আমেরিকান. কিছুতেই ও লালদের খুশিমতো যা কিছু তাই করতে দেবে না। ওদের পিটিয়ে ছাতু করে দেবে।

হঠাৎ পিয়ানো বাদক বাজনা থামিয়ে দিল।

বাজাও, নয় গোল্লায় যাও !—চিৎকার করে উঠল ম্যাকহর্নি,—দশটা হরিণ দেব তোমাকে। আজ আমার পেট ভর্তি লোহার টুকরো।

টাকাটা পিয়ানো-বাদকের দিকে ছুঁড়ে দিল। লোকটি আসন থেকে উঠে এসে টাকাটা কুড়িয়ে নিল তারপর নকল পায়ে থপথপ করে অদ্ভুতভাবে এদিকওদিক ঘুরতে লাগল। ম্যাকহর্নি ইতিমধ্যে গান ধরে দিয়েছে :

"এক গুলিতেই মুণ্ডু ছেঁদা করে
শয্যা নিল কফিন গহ্বরে......"

চৌষট্টি

মোটাসোটা গোলগাল এক পশারিনীর শ্রদ্ধা, অর্থ, আর সৌন্দর্য উপভোগ করছিল রিশতার। সে আবার তার বান্ধবীদের কাছে গোপনে বলত:

এর চাইতে বরং একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে যদি বেছে নিতাম তো ঢের ভালো হত। মোটেই মিতব্যায়ী নয় কুর্ট। কিন্তু অদ্ভুত ধরনের বেপরোয়া লোক, আর আমি হচ্ছি সুস্থির স্বভাবের মানুষ। রিশতার বোঝে যে সে যে কাজ করছে সেটা বিপদসংকুল। এক এক সময়ে পেন্সিল-রুলার সজ্জিত টেবিলটির জন্য তার মন ব্যকুল হয়ে উঠত, ব্যাকুল হয়ে উঠত হিলদার জন্য। নির্জন নিরানন্দ সন্ধ্যেয় বসে বসে 'বার্নিলার ইলাদ্রিয়েতির' পুরনো সংখ্যাগুলোর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হাই তুলত। কিন্তু আজ সে নিজেকে বুঝিয়েছে যে ও হচ্ছে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। আর কেবল নিজেকেই নয় এ-কথা সে বুঝিয়েছে তার ঐ পসারিনীকে আর সেইসব হতভাগাকে যারা যোগ দিয়েছিল তার প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল লেবার রাইখ পার্টিতে। সভায় রিশতার অর্থহীন নির্বোধ বক্তৃতা দেয়, আবেগভরা কণ্ঠে আবেদন করে রুশদের উপরে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে, হৃত অঞ্চল ফিরিয়ে দেবার জন্য আর আমেরিকানদের উপরে চাপ দিতে যাতে তারা জার্মানিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ওর দলের লোকেরা হচ্ছে ভূতপূর্ব নাৎসী। কেউ কেউ ছিল এস. এস, বাহিনীর লোক। শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা করতো করতে অতীতের ধারণাগুলোর আমদানী করে। এমনকি হুবহু সে-কালের কথাবার্তাগুলো পর্যন্ত। গাল পাড়ে "দো-আঁসলাদের, আর বিত্তবানদের।" পুনরুক্তি করে পরলোকগত মারাবউটের বাণী—"মৃত্যুর কাছে বাগদত্ত বর্তমান পুরুষ" সম্পর্কে, আর 'অতীত ও ভবিষ্যতে'র এক ও অনন্য জার্মানি সম্পর্কে। সভার শেষে পায়ে হেঁটে চলে যায় রিশতার। যখন স্থির নিশ্চিত হয় যে কাউকে আর ধারে-কাছে দেখা যাচ্ছে না, ও সুট্ করে কোনো একটা নাইট ক্লাবে গিয়ে ঢোকে। সেখানে জ্যাজ বাজনা আর নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে ভুলে যায় ওর সেই আজব উদ্দেশ্যের কথা।

ওর পার্টির ইস্তাহার লিখে ফেলল রিশতার। ইচ্ছে ছিল ওটা শুরকের হাতে দেয়। কিন্তু মেজর তখন পারীতে, তাই ওটার সমস্ত দায়িত্বই নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিল। পনরো দিন পরে ভিগল বলল ওকে যে মেজর ফিরে এসে-ছেন। তিনি ওর ইস্তাহারটা পড়ে খুবই খুশী হয়েছেন ওর উপরে। রিশতারের মনে হল এতদিনে ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তাই ওর দলে যোগ দেয়া একজন ভূতপূর্ব লেফটেন্যান্টের উপরে তম্বি করে বলল:

দয়া করে স্মরণ রাখবেন যে আমি সভাপতি।

রিশতার যখন খবর পেল যে আমেরিকানরা ন্যাশন্যাল-লেবার রাইখ পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে আর পুলিশের উপরে হুকুম জারী করেছে যে ও ফ্রাংকফুর্টে কি করত না করত তার খোঁজখবর নিতে, ও ভাবল যে নিশ্চয়ই

কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। রিশতার তক্ষুনি ছুটে গেল ভিগলের কাছে। আমেরিকান আর পুলিশের উদ্দেশ্যে গাল পাড়ল ভিগল। আর ওকে ভরসা দিল এই বলে যে "ও তো মেজরের একটা কথার ওয়াস্তামাত্র"। তারপর বলল ওকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। দারুণ দুশ্চিন্তায় রাত কাটাল রিশতার। লিফটের শব্দে কান খাড়া করতে লাগল—মনে হল যে কোনো মুহূর্তেই গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে। ভোরে ভিগলের দোকানে গিয়ে হাজির হল। একটি মহিলা খদ্দেরকে বোঝাতে দারুণ ব্যস্ত ভিগল যে প্লাডিওলা গুচ্ছাকারে বুনলে ভালো হয় আর নার্সিসি বুনতে হয় কিনারায় কিনারায়।

কি বললেন তিনি?—অবশেষে মহিলাটি চলে যেতেই জিজ্ঞেস করল রিশতার।

ও ব্যাপারে উনি মাথা গলাতে চান না। গুরুতর কারণ আছে আমেরিকান-দের। ভালো কথা, এখানে আর এস না, মোটেই নিরাপদ নয়। তাছাড়া আমার বাড়িতেও না। এ কথা বলতে হচ্ছে বলে খুবই দুঃখিত, কিন্তু এই অবস্থায়—

রিশতারের দৃঢ় বিশ্বাস যে এর তলায় স্মিডল্-এর হাত রয়েছে। পালিয়ে আসার জন্যে কিছুতেই সে ওকে ক্ষমা করবে না। আর তার অর্থ হল এই যে ওর দফা নিকেশ।

মাতাল হয়ে ফিরে এল রিশতার তার টুপি পশারিনীর কাছে আর গোটা সন্ধ্যেটা স্মিডল্-এর বাপান্ত করে কাটাল।

কিন্তু কে এই স্মিডল?—হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

শুনবে সে কে?—বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিতে তাকিয়ে বলল রিশতার,—সে একটা ভয়ংকর দুর্বৃত্ত!

সৈনিক সংঘের আফিসে গেল রিশতার। কিন্তু ওকে শুরকের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকতে দিল না। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিল ভিগল। দু-দুবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডেকে পাঠাল পুলিশ অফিসে যে ও কি কাজ করত লাল-এলাকায় আর কি অবস্থায় সেটা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। নিঃসন্দেহ যে স্মিডল বলে দিয়েছে। ঐ আমেরিকান সাংবাদিকটার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদন লিখে পাঠাল শুরকের কাছে। তার সেক্রেটারি জানাল যে সে ওর চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছে শুরকের হাতে। কিন্তু কোনো জবাব আসে নি।

পারী থেকে ফেরার পরে পরেই শুরকে দেখা করল জেনারেল হয়েসের সঙ্গে। মেজাজ বিগড়ে ছিল জেনারেলের। জার্মানদের সঙ্গে দর কষাকষি, ফরাসীদের প্রতিবাদ, লেবার গভর্নমেন্টের কপট আচরণ, আর বন-এর অফুরন্ত বিতর্ক এসব নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। ওকে—জেনারেল হয়েসকেই চুরির দায়ে ধরছে সবাই। এ কথা কিছুতেই বুঝতে চায় না ওয়াশিংটন যে ইয়োরোপটা কী ভীষণ একটা ভিমরুলের চাক!

শুরকে যখন বলল যে ফ্রান্সে প্রচুর লোক আছে যারা ই, ডি, সি, পরিকল্পনাকে ভিতরে ভিতরে বানচাল করে দিচ্ছে, হঠাৎ ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল জেনারেল:

ফ্রান্স ফ্রান্স করে বারবার ঘ্যানরঘ্যানর করবেন না। ভুলে যান যে জার্মানরা সবাইকে চটিয়ে দিয়েছে। তার চাইতে বরং এখানে কি ঘটছে না ঘটছে সেদিকে

নজর দিন। সৈনিক সংঘ বহু সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে আড়াল করে আ-
রেখেছে। আপনার অতীত সম্পর্কে আমি তেমন মাথা ঘামাইনি। বি-
করেছিলাম আপনাকে। আর একজন সামরিক অফিসার হিসেবে আপনিও-
দিয়েছিলেন আমাকে যে আপনি ধর্মতঃ কাজ করে যাবেন। খুব মূল্য ব-
দেখছি আপনার কথার! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার সংঘের ভিতরে ভোগ
লাল আছেই আছে। জেনারেল স্পাইডেল জেলে আছে, জেলে আছে শুনে
আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তার পক্ষে জেলটা হচ্ছে বিশ্রামাগা-তো
বাজারের মেছুনীদের মতো আপনি দর কষাকষি করছেন। আপনার সাহায্য
ছাড়াও আমরা লোক সংগ্রহ করতে পারি। আর আপনার জেনারেলরা—কানা-
কড়ির মূল্যও নেই তাদের। তারা হারু সেনাপতি, বুঝলেন হের শুরকে!

জেনারেলের রক্তবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শুরকের মনে হল যে ও-
সংঘটাকে ভেঙেও দিতে পারে হয়তো। তা যদি হয় তবে ওকেও জেলেই যেতে
হবে। যা-ই হোক ওরা তো মালিক এখানকার। অবশ্য আর বছরখানেক, ব-
দুয়েকের ভিতরে ওরা অন্য সুরে গান গাইতে শুরু করে দেবে এটা ঠিক-
জার্মানদের ছাড়া কিছুতেই চলতে পারে না ওদের। কিন্তু এখন একটু সাবধানে
চলাই বরং ভালো। তাই ওকে একটু আপ্যায়িত করার সুরেই বলল শুরকে:

আমার কাজ হবে এটাই দেখা যাতে সৈনিক সংঘ আপনাদের একান্ত অনুগত
হয়ে চলে। আমরা জানি যে আমেরিকার সাহায্য ছাড়া কোনোদিনই জার্মানির
পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। আমাদের সংঘের সভা-ঘরে আপনার ফটো টাঙানো
আছে। অবশ্য এ-বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ভূতপূর্ব সৈনিকদের
ভিতরে এখনো এমন অনেক আছে যারা কিছুই বোঝে না। কিন্তু বলুন তো
আমাকে জেনারেল, ন্যাশনাল-লেবার রাইখ পার্টির মতো জঘন্য একটা সংগঠনের
কার্যকলাপ কেন আপনারা আস্কারা দিয়ে চলেছেন? ওর সভাপতি কে এক
রিশতার, বিখ্যাত স্থপতি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু লোকটা
এমন ধূর্তভাবে মিছে কথা বলে যায় যে প্রথমটায় আমি পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলাম।
লোকটার অতীত সন্দেহজনক, লাল এলাকায় কাটিয়ে এসেছে চার বছর। জলের
মতো টাকা খরচ করে। সম্ভবত সে টাকা পায় ও উলব্রিখটের কাছ থেকে।
তবুও পুলিশ চোখ বুজে আছে এ-ব্যাপারে। আপনারা জেনারেল স্পেইডেলকে
মুক্তি দিতে চান না। কিন্তু কি করেছে সে? সে যুদ্ধ করেছিল লালদের
বিরুদ্ধে আর সামরিক শৃংখলা মেনে চলেছে—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু
রিশতারের মতো একটা বেপরোয়া লোক যা খুশী তা-ই করতে পারে।

যদিও জেনারেল হয়েস খানিকটা নরম হয়েছে তবুও প্রত্যুত্তরে বিরক্তি কণ্ঠে
বলল:

যুদ্ধপরাধী হিসেবে সাজা দেয়া হয়েছে জেনারেল স্পেইডেলকে। তাছাড়া
সাজা দেয়া হয়েছে তার গ্রীসের কার্যকলাপের দরুণ রুশিয়ার দরুণে নয়। আর
ঐ রিশতারের ব্যাপারটা ওটা আমি দেখবখন। কিন্তু আমি যা বললাম সেটা
ভেবে দেখতে বলি আমি আপনাকে। আমার ছবি টাঙানোটা বড়ো কথা নয়।
চিত্র-তারকা নই আমি। ওতে চিড়ে ভিজবে না আমার কাছে। আমি চাই আনু-

শর্ণ সহযোগিতা। বুঝতে পারলেন আমার কথা?
...কের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটায় যা অবশিষ্ট ছিল তা মদ খেয়ে উড়িয়ে
...রশতার। আবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে হাজির হতে হল পুলিশের
শহর ছেড়ে না চলে যায় তার জন্যে ওকে সই দিতে হল একরারনামায়।
...ছেড়ে দিল, স্কচ টুইডের স্যুট আর আমেরিকান জুতো জোড়া দিল বিক্রি
... পুরনো কোটের পকেটে খুঁজে পেল সেই পাসপোর্টটা যেটা ও কিনেছিল
...ন থেকে। তারপর আবার ও হয়ে গেল কোয়নিগসবের্গ-এর বাসিন্দে
...ান স্যাকস। ছোট ছোট বিয়ারের দোকানে গিয়ে হানা দিতে লাগল গরম
...র জন্যে আর রাত কাটাতে লাগল ভাড়াটে শোয়ার ঘরে। রাস্তায় চলতো
... ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকায়, দেখে স্মিডল কোথাও আছে কি না। রাজ-
... সম্পর্কে ওর এতটুকুও আকর্ষণ নেই আর। খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়ে
...পড়লে জানতে পারত ঐ আমেরিকান সাংবাদিকটির প্রাণের ব্যর্থ অভিযানের
... কোনো রকমে দুটো খাওয়াপরার জন্যে কখনো মোট বয়, কখনো পোস্টার
... আবার কখনো বা ভিক্ষে করে পর্যন্ত। ওর পতনটা উন্নতির মতোই
... বিগত উচ্ছল দুটো মাস আজ মনে হয় যেন একটা অর্থহীন স্বপ্নের
... শেষ পর্যন্ত একটা স্থায়ী কাজ পেল—নির্জন রাস্তায় একটা বিরাট
...র ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার কাজ। ভাবতে ভাবতে একটু তিক্ত হাসি
...ওঠে ওর ঠোঁটের কোণে: ওরা যদি জানত যে আমি একজন স্থপতি, এত
জেনারেল গ্যাবলারের বাড়িটা আমিই তৈরি করেছিলাম.........
যখন স্মিডল-এর কথা একদম দূর করে দিয়েছে মন থেকে তখন হঠাৎ একদিন
...া দূরে দেখা হয়ে গেল স্মিডল-এর সঙ্গে। মুহূর্তে রিশতার ঘুরে দাঁড়াল।
... আমেরিকানটি ঠিকই চিনতে পারল ওকে।
...আরে, কি খবর হের রিশতার।
...ুল করেছেন আপনি—নিদারুণ আতঙ্কে তোতলাতে শুরু করে দিল
...ার,—রিশতার বলে কাউকে আমি চিনি না।
স্মিডল-এর তখন খুব খোস মেজাজ। জেনারেল হয়েস সংবর্ধনা জানিয়েছে
সকাল বেলা। ওর সাহসের জন্যে প্রশংসা করেছে আর বলেছে ওকে যে ওর
মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে কিছু দিনের বিশ্রাম নেয়া দরকার। স্মিডল ঠিক
...ছ এক মাসের জন্যে ও দেশে চলে যাবে। হয়েসের কাছে যা শুনেছে,
...র আর বেশি দিন বাঁচবেন না! ট্রানজকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনাটা
...নিতে হবে। আর তাছাড়া আর যা-ই হোক এই দুর্ভোগের পরে জ্যাকসনে
...য়ে একটু বিশ্রাম নিলে ক্ষতি কিছু হবে না। দিনটা ভারি চমৎকার—
...র দিন। এক যুবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছে স্মিডল। দুজনে
...মদও খেয়েছে প্রচুর। রিশতারকে দেখে ওর পরিহাস-প্রবণতায় সুড়সুড়ি
... মজুরের মতো পোশাক করেছে আর পাথর টানছে গাড়ি করে—নিশ্চয়ই
...মার্কামারা কিংবা গণতন্ত্রের। কিন্তু শয়তানটা বার্লিন থেকে পালিয়ে
...? ওর ভয়ে নিশ্চয়ই নয়—স্মিডলের ভয়ে? বোধহয় কোনো মেয়ে-
...ঙ্গে ফেঁসে পড়েছে। হিলদা বলেছিল লোকটা হুলো বেড়াল।

খুব বোকা বানাচ্ছ,—আপোসের সুরে বলল স্মিডল—গিন্নী কেমন আ
আমার কোন স্ত্রী নেই। আগেই তো বলেছি যে আমি রিশতার নই।
কে তৈরি করেছে বাড়িটা? হয়তো বলবে যে তুমি স্থপতি নও রা
কেমন! খুব চমৎকার অভিনয়! এই ধরনের ঘৃণ্য ছদ্মবেশটা আদৌ
বরদাস্ত করতে পারি না। নিজে নিজেই পাথর টানছো কেন? এটা
এলাকা নয়......তা যাক, এখানে এসে ঢুকলে কি করে বল তো?

চট করে কোন কথা যোগাল না রিশতারের মুখে। মনে হল ও
ব সেছে। একটা ঠেলার উপরে দাঁড়িয়ে রিশতার। মনে হচ্ছে যেন স্মি
চাইতে এক মাথা উঁচু কিন্তু ওকে এমন দীনহীন দেখাচ্ছিল যে ভারি
লাগছিল স্মিডলের। তাহলে ওকে দেখে ভয় পাচ্ছে বেকুবটা? ঠিক
মনে মনে যে ওকে শেষ করে দেবে: এসো তো, দেখি তোমার কাগজপত্র।

হো হো করে উঠল স্মিডল। রিশতার চার দিকে তাকাল। আ
কেউ কোথাও নেই। একটা পাথর তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল স্মিডলের
তারপর ছুটে পালিয়ে গেল। যতই ছুটছে মনে হচ্ছে যেন আমেরি
পি ধাওয়া করে ছুটে আসছে। জেটির কাছে এসে যখন পৌঁছাল,
একটা পোড়ো বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। রা
ঘাপটি মেরে পড়ে রইল সেখানে। একটা ইঁদুর কিচমিচ করে উঠল
হাতের ভিতরে মাথা গুঁজে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ রিশতার।

কুকুরকে হাওয়া খাওয়াতে বেরিয়েছিল একটি ঝি, দেখল পাকা
পরে একটা লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মনে হল যেন ওর মাথাটা রক্ত
চীৎকার করে উঠল। একজন মজুর ছুটে এল: মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে
আছে বুঝি?—বলল সে। চিৎ হয়ে থাকা লোকটার মাথায় জল ঢালতে লা
নড়ছে, বেঁচে আছে লোকটা,—ভরসা দিয়ে বলে উঠল ঝি।

যখন এম্বুলেন্স এল, স্মিডলের দিকে এক নজর তাকিয়েই বলল
এ এখন পুলিসের ব্যাপার।

এক ঘণ্টা পরে অপরাধের খবরটা পেঁছাল গিয়ে জেনারেল হয়েসের
দৃশ্যতঃ এটা সুস্পষ্ট যে জোহান স্যাক্স জনৈক রাজমিস্ত্রী স্মিডল
করে পালিয়ে গেছে। রেগে আগুন হয়ে উঠল জেনারেল। কী বল
ওয়াশিংটনে? এ ধরনের কোনো কিছু ঘটেনি কস্মিনকালেও।
প্রাগের ঘটনা চাপা দেয়ার জন্যেই লালগুলো খুন করেছে স্মিডলকে
কী ভীষণ পৈশাচিক ধৃষ্টতা—শহরের বুকের উপরে প্রকাশ্য দিনের
স্মিডলের জন্যে দুঃখ হল ওর। আজ সকালেই বসেছিল এই ঘরে
গল্প করছিল প্রাগের "নির্যাতন-কক্ষের" কথা, তৈরি করছিল কর্ক প
কল্পনা। মেজাজী লোক, সঙ্গী হিসেবে চমৎকার আর সাহসও ছি
আর এখন সে আর নেই.........। যে কোন মানুষের পক্ষেই এটা ঘ
এখানে পথ চলতে চলতে ওর নিজের গায়ে এসেও একটা গুলি অ
পারে। ...ল "ঠাণ্ডা-লড়াই"। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্মিডল প্রাণ হারা

বৃথাই বস্তি অঞ্চল চষে ফেলল পুলিশ। জোহান স্যাকস-এর খো
মিলল না। জনশ্রুতি যে সে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে লাল এলাকা